বিবেকানন্দ রচনাসংগ্রহ

[চতুর্থ খণ্ড]

সম্পাদক

শ্রীগোপাল হালদার

সহযোগী সম্পাদক

ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত

বইপত্র ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ১৩৬৫

প্রকাশক
শ্রীবিকাশ ঘোষ
বইপত্র
৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন,
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীঅভয় সাহা মণ্ডল
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৭৩ রমেশ দত্ত স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

বাঁধাই
কুইক বাইণ্ডার্স
৩৮।১এ বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

Vivekananda Rachana Samgraha
The Works of Swami Vivekananda
Volume IV

নিবেদন

সময়ের সঙ্গে তালরাখা যেমুস্কিল এটা কী নতুন করে আর বলার প্রয়োজন আছে? লোড-শেডিং-এর বহর কমার কোন লক্ষণই নেই। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা তো রয়েছেই। গ্রাহকদের অনেকেই প্রকাশিত খণ্ড সংগ্রহ না করায় অর্থের অভাবে প্রকাশনার কাজও ব্যাহত হচ্ছে।

তবু বিবেকানন্দ রচনাসংগ্রহ প্রকাশের কাজ এগিয়ে চলেছে সময়কে পেছনে ফেলে। চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হল নির্দিষ্ট তারিখের চারদিন আগে। গ্রাহকরা যদি সহযোগিতা করেন, অবশ্যই ১৯৭৭-এর জানুয়ারিতে এই সংগ্রহ প্রকাশনা সম্পূর্ণ হবে।

এই খণ্ডে অনুবাদকর্মে সাহায্য করেছেন সর্বশ্রী মনোরঞ্জন ঘোষ, সুকুমার গুপ্ত, প্রফুল্ল রায়চৌধুরী, ডঃ সোমেন মুখোপাধ্যায়, ডঃ অনিলেন্দু চক্রবর্তী, অনুপ মতিলাল, রাণা চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ সেনগুপ্ত। এঁদের সকলের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ। এই খণ্ডের পরিশিষ্টে স্বামী সারদানন্দ লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থের অংশবিশেষ প্রকাশিত হল। স্বামীজীর গুরুভ্রাতা ও অন্যতম প্রিয় সহকর্মী স্বামী সারদানন্দের এই অন্তরঙ্গ স্মৃতিচিত্রণ নিশ্চয়ই পাঠকদের অনুসন্ধিৎসা পূরণ করবে।

স্বামীজীর সহকর্মী, শিষ্য ও আত্মীয়দের লেখা স্মৃতিচিত্রণ প্রকাশে আমরা চেষ্টা করছি। নানা বাধা অতিক্রম করে এ বিষয়ে এগোনো হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো বা এই আশা পূরণও হবে না। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই যথাসম্ভব চেষ্টা আমরা করব।

এই খণ্ডে প্রকাশিত বক্তৃতা ও রচনাসমূহের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুটি বক্তৃতার মূল ইংরাজী প্রকাশিত হল। প্রতি খণ্ডেই স্বামীজীর রচনা অথবা বক্তৃতার মূল ইংরাজী প্রকাশিত হচ্ছে। এই খণ্ডেও সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হল।

উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা এবং অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত স্বামীজীর ইংরাজী রচনাসংগ্রহ এতকাল একমাত্র অবলম্বন ছিল। দেশবাসী এই দুই মহৎ প্রতিষ্ঠানের কাছে তাই ঋণী। এঁদের কাছে আমরাও অপরিসীম ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

এই সুলভ সংস্করণটি সর্বাঙ্গসুন্দর করতে আমরা এই দুই প্রতিষ্ঠান তথা সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও আশীর্বাদপ্রার্থী। স্বামীজীর অপ্রকাশিত রচনা অথবা স্বামীজী সম্পর্কিত যে কোন স্মৃতিচিত্রণ আমরা এই সংস্করণে প্রকাশে আগ্রহী। গ্রাহক তথা পাঠকদের মাধ্যমে এই দায় পালনে সকলের কাছে সহযোগিতার প্রার্থনা জানাচ্ছি।

বিনীত
প্রকাশক-পক্ষে
বিকাশ ঘোষ

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ

মে, ১৮৯৬

বক্তৃতাবলী ও প্রবন্ধ

ব্যবহারিক জীবনে বেদান্ত

প্রথম অংশ

[লণ্ডনে প্রদত্ত, ১০ই নভেম্বর, ১৮৯৬]

বেদান্ত-দর্শনের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে বলা হয়েছে। আমি আগেই তোমাদের বলেছি, মতবাদটি খুব ভাল বটে, কিন্তু আমরা কি ভাবে সেটিকে কাজে লাগাতে পারি? যদি কাজে লাগানো একেবারে অসম্ভব হয়, তাহলে কোন মতবাদেরই কোন মূল্য নেই, একমাত্র বুদ্ধির খেলা ছাড়া। অতএব ধর্ম হিসাবে বেদান্তকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত কার্যকর হতে হবে। আমাদের জীবনের সকল অবস্থাতেই এটিকে কাজে লাগাতে পারা চাই। শুধু তাই নয়, আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জীবনের মধ্যে যে কাল্পনিক প্রভেদ আছে তা দূর করে দিতে হবে, কারণ বেদান্ত শিক্ষা দেয় অখণ্ডতা—এক প্রাণ সর্বত্র বিদ্যমান। ধর্মের আদর্শ জীবনের সর্বক্ষেত্রকে অবশ্যই আবৃত করবে, আমাদের সমস্ত চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং কাজের মধ্যে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হবে। আমি ক্রমশ এর ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে বলব। কিন্তু এই বক্তৃতাধারা হচ্ছে ভিত্তিস্বরূপ, তাই আমরা প্রথমে মতবাদগুলির আলোচনায় নিযুক্ত হব, বুঝব সেগুলি কেমন করে গঠিত হয়েছে, অরণ্য-গুহা হতে নিঃসৃত হয়ে কর্মব্যস্ত রাজপথে ও শহরে পৌঁছেছে। এই মতবাদগুলির আর এক বিশেষত্ব :আমরা দেখি যে এই চিন্তাগুলির অনেকাংশই নির্জন অরণ্যজীবনের ফলে উত্থিত হয়নি, বরং যাঁদের আমরা সবচেয়ে বেশি কর্মব্যস্ত বলে মনে করি সেই শাসক নৃপতিদের কাছ থেকেই এসেছে।

শ্বেতকেতু ছিলেন আরুণি ঋষির পুত্র, যিনি খুব সম্ভব বানপ্রস্থী ছিলেন। শ্বেতকেতু বনেই বড় হয়ে উঠেছিল, তারপর সে একদিন পাঞ্চাল শহরে গেল এবং রাজা প্রবাহন জৈবালির সভায় উপস্থিত হল।

রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি জান মৃত্যুতে মানুষ এখান থেকে কোথায় যায়?'

—'না।'

—'তারা কেমন করে আবার ফিরে আসে, জান?'

—'না।'

—'তুমি কি পিতৃযান ও দেবযানের বিষয় জান?'

—'না।'

তারপর রাজা তাকে অন্যান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। সেগুলির উত্তর শ্বেতকেতু দিতে পারল না। তাতে রাজা তাঁকে বললেন যে, সে কিছুই জানে না। ছেলেটি তখন তার পিতার কাছে ফিরে গিয়ে ওই কথা বলাতে পিতা স্বীকার করলেন যে তিনি নিজেও ওই প্রশ্নগুলির উত্তর জানেন না। ছেলেকে এগুলি শেখাবার তাঁর অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিজেই জানেন না বলে শেখাতে পারেন নি। তখন সে রাজার কাছে ফিরে গিয়ে তাকে এই রহস্য সম্বন্ধে জানাতে বলল। রাজা বললেন যে এই বিষয়গুলি এতকাল শুধু রাজাদেরই জানা আছে, পুরোহিতরা কখনই এগুলি

জানতেন না। যাহোক, সে যা জানতে চেয়েছিল রাজা তাকে তাই শিখিয়ে দিলেন। বিভিন্ন উপনিষদে আমরা পেয়েছি যে বেদান্ত-দর্শন কেবল অরণ্যে ধ্যানলব্ধ নয়, এর সর্বোৎকৃষ্ট অংশগুলি প্রতিদিনের সাংসারিক কাজে ব্যস্ত মানুষেরাই ভেবে বের করেছেন এবং ব্যক্ত করেছেন। লক্ষ লক্ষ লোকের উপর শাসনকারী সার্বভৌম নৃপতির চেয়ে কর্মব্যস্ত মানুষের কল্পনা আমরা করতে পারি না, অথচ এই রাজাদের মধ্যে অনেকেই গভীর চিন্তাশীল ছিলেন।

বহু জিনিসই দেখিয়ে দেয় যে, এই দর্শন অত্যন্ত ব্যবহারিক। পরবর্তী কালের ভগবদ্গীতা—তোমরা অনেকেই বোধহয় সেটি পড়েছ—বেদান্ত-দর্শনের উপর সবচেয়ে ভাল ভাষ্য,—আশ্চর্যের বিষয় যুদ্ধক্ষেত্রকে এর উপদেশের স্থান বলে নির্বাচন করা হয়েছে, যেখানে কৃষ্ণ এই দর্শন সম্বন্ধে অর্জুনকে শিক্ষা দিয়েছেন ; গীতার প্রতি পৃষ্ঠায় এই নীতি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছে—তীব্র কর্মশীলতা, কিন্তু তার মধ্যে চির প্রশান্তি। এই হচ্ছে কর্মরহস্য, এই অবস্থা লাভ করাই বেদান্তের লক্ষ্য। নিষ্ক্রিয়তা বলতে আমরা বুঝি নিশ্চেষ্টতা, তা নিশ্চয়ই আদর্শ হতে পারে না। তা যদি হতো, তাহলে আমাদের চারপাশের দেওয়ালগুলো পরাজ্ঞানী হতো, কারণ তারা নিষ্ক্রিয়। মৃত্তিকাখণ্ড, বৃক্ষকাণ্ড এরাই জগতের সবচেয়ে বড় ঋষি হতো, কারণ তারা নিষ্ক্রিয়। আবার কামনা যুক্ত হলেই নিশ্চেষ্টতা কর্মে পরিণত হয় না। বেদান্তের লক্ষ্য যে প্রকৃত কর্ম, তা অনন্ত প্রশান্তির সঙ্গে জড়িত, যে প্রশান্তি কখনও নষ্ট হয় না, যাই ঘটুক না কেন চিত্তের সমতা কখনও ভঙ্গ হয় না। আমরা আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে কর্মের প্রতি এই মনোভাবই সবচেয়ে ভাল।

আমাকে বহুবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, আমরা কাজের যেমন একটা আগ্রহ বোধ করে থাকি, তেমন আগ্রহ না থাকলে কেমন করে কাজ করব? বহু বছর আগে আমিও এ রকম ভাবতাম, কিন্তু যত আমার বয়স হচ্ছে, যত বেশি অভিজ্ঞতা লাভ করছি, ততই দেখছি এটি সত্য নয়। কাজের ভেতর কামনা যত কম থাকে, ততই আমরা ভাল ভাবে কাজ করতে পারি। আমরা যত শান্ত হই, ততই ভাল এবং ততই আমরা বেশি কাজ করতে পারি। যখন আমরা আমাদের অনুভূতিগুলির রাশ ছেড়ে দিই, তখন আমরা বেশি শক্তি অপব্যয় করি, স্নায়ুমণ্ডলীর উপর চাপ বাড়ে, মন চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং কাজ খুব কমই হয়। যে শক্তি কাজে লাগা উচিত ছিল, সেটি হৃদয়াবেগেই ব্যয়িত হয়। মন যখন খুব শান্ত ও স্থির থাকে, তখন তার সমস্ত শক্তিই সৎকাজে ব্যয় হয়। যদি তোমরা জগতে বড় কর্মবীরদের জীবনী পড়, তাহলে দেখবে তাঁরা অদ্ভুত শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিছুই তাদের মনের সমতা নষ্ট করতে পারত না। সেজন্য যে লোক সহজেই রেগে যায়, সে খুব বেশি কাজ করতে পারে না, আর যে কিছুতেই রাগে না, সে অনেক কাজ করতে পারে। যে লেখক ক্রোধ, ঘৃণা বা কোন রিপুর বশীভূত হয়ে পড়ে, সে কাজ করতে পারে না ; সে নিজেকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলে এবং বস্তুত কিছুই করে উঠতে পারে না। শান্ত ক্ষমাশীল সমভাবাপন্ন স্থিরচিত্ত ব্যক্তিরাই সবচেয়ে বেশি কাজ করে।

বেদান্ত এই আদর্শই প্রচার করে। আমরা জানি আদর্শ বাস্তব থেকে—যাকে

আমরা কার্যকর কিছু বলে থাকি—অনেক উঁচুতে। মানুষের প্রকৃতিতে দুটি প্রবণতা আছে—একটি আদর্শকে জীবনের উপযোগী করা, অন্যটি জীবনকে আদর্শের উপযোগী করা। এটিকে বুঝতে পারা খুব বড় জিনিস, কারণ প্রথম প্রবণতাটি আমাদের জীবনের একটি প্রলোভন। আমার ধারণা আমি কোন এক বিশেষ ধরনের কাজ করতে পারি। হয়তো তার বেশির ভাগই মন্দ; হয়তো তার বেশির ভাগের পেছনে আছে ক্রোধ, ঘৃণা, স্বার্থপরতারূপ অভিসন্ধি। এখন যদি কোন লোক আমার কাছে বিশেষ এক আদর্শ প্রচার করতে আসে, যার প্রথম ধাপই হচ্ছে স্বার্থপরতা ত্যাগ, আত্মসুখ ত্যাগ। আমি ভাবি সেটা সম্ভব নয়। এখন যদি কেউ এমন এক আদর্শের কথা বলে যা আমার স্বার্থপরতার সঙ্গে মানিয়ে যায়, তাহলে আমি একবারে খুশিতে লাফিয়ে উঠি। সেটিই আমার উপযুক্ত আদর্শ। যেমন 'শাস্ত্রীয়' কথাটা নিয়ে নানা গোলমাল করা হয়, তেমনি 'কার্যকর' কথাটা নিয়েও করা হয়। 'আমি যা বুঝি তা শাস্ত্রীয়, তোমার মত অশাস্ত্রীয়।' 'কার্যকর'ও তাই। আমি যেটাকে কাজে লাগাবার মতো বলে মনে করি, জগতে সেটাই একমাত্র কার্যকর। যদি আমি দোকানদার হই, আমি মনে করি দোকানদারিটাই জগতে একমাত্র করার মতো কাজ। যদি আমি চোর হই, আমি মনে করি চুরি করার কৌশলই সবচেয়ে ভাল কাজ; অন্য কাজগুলো কিছু নয়। তোমরা দেখছ আমরা সকলে যে কাজ পছন্দ করি এবং যেটা করতে পারি, সেটার সম্পর্কেই কার্যকর শব্দটি ব্যবহার করি। অতএব আমি তোমাদের বুঝতে বলি যে বেদান্ত যদিও চূড়ান্তভাবে ব্যবহারিক, কিন্তু তা সাধারণ অর্থে নয়, আদর্শগত ভাবে। বেদান্ত কোন অসম্ভব আদর্শের প্রচার করে না, তা সে যত উঁচুই হোক না কেন, অবশ্য আদর্শ হিসাবে এটি যথেষ্ট উঁচু বটে। এক কথায়, এই আদর্শ হচ্ছে তুমিই ব্রহ্ম—'তত্ত্বমসি'। এই হচ্ছে বেদান্তের সার সত্য। এর নানারকম তর্ক বিচারের পর তুমি জানবে যে মানবাত্মা বিশুদ্ধ ও সর্বজ্ঞ, তুমি দেখবে যে আত্মা সম্পর্কে জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি কুসংস্কারের কথা বলা সম্পূর্ণ বাতুলতা। আত্মা কখনও জন্মায়নি, কখনও মরবে না এবং আমরা মরব বা মরণ-ভীতি—এ সমস্ত ধারণাই কুসংস্কারমাত্র। আমি এটা করতে পারি বা এটা করতে পারি না, এসব ধারণাও কুসংস্কার। আমরা সবকিছু করতে পারি। বেদান্ত শিক্ষা দেয় মানুষকে প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে। জগতে যেমন কোন কোন ধর্ম বলে—যে লোক নিজের থেকে পৃথক সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক; তেমনি বেদান্ত বলে যার নিজের উপর বিশ্বাস নেই, সে নাস্তিক। নিজের আত্মার মহিমায় বিশ্বাস স্থাপন না করাকেই বেদান্ত বলে নাস্তিকতা। অনেকের কাছে নিঃসন্দেহে এইটি ভয়ানক ধারণা; আর আমরা অনেকেই মনে করি এই আদর্শে কখনই পৌঁছানো যাবে না। কিন্তু বেদান্ত দৃঢ়ভাবে বলে এই সত্য প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পারে। এই আদর্শ উপলব্ধির পথে স্ত্রী-পুরুষ-বালকে কোন প্রভেদ নেই, জাতিভেদ বা লিঙ্গভেদ নেই, কোন কিছুই বাধা দিতে পারে না, কারণ বেদান্ত প্রমাণ করে এটি ইতিমধ্যেই উপলব্ধ হয়েছে, আগের থেকেই এটি আছে।

বিশ্বের সমস্ত শক্তিই আগের থেকেই আমাদের মধ্যে আছে। আমরা নিজেরাই

হাত দিয়ে নিজের চোখ ঢেকে চেঁচাচ্ছি—'অন্ধকার'। আমাদের চারপাশে কোন অন্ধকার নেই এটা জান। হাত সরিয়ে নাও, দেখবে সেখানে গোড়া থেকেই আলো ছিল। অন্ধকার কখনই ছিল না, দুর্বলতা কখনই ছিল না। আমরা বোকা বলেই চেঁচাই যে, আমরা দুর্বল, বোকা বলেই চেঁচাই যে, আমরা অপবিত্র। এইভাবে বেদান্ত শুধু বলে না যে, আদর্শটি বাস্তবসম্মত, বরং বলে,—এটা আগের থেকেই আমাদের উপলব্ধ এবং এই আদর্শ, এই বাস্তব সত্তা হচ্ছে আমাদের স্বরূপ। তুমি আর যা কিছু দেখছ, সবই মিথ্যা, অসত্য। যখনই তুমি বল, 'আমি ক্ষুদ্র মরণশীল জীব', তখনই তুমি মিথ্যে বলছ, তুমি নিজেকে সম্মোহিত করে অসৎ, দুর্বল, দুর্ভাগা করে ফেলছ।

বেদান্ত পাপ স্বীকার করে না, শুধু ভ্রম স্বীকার করে। আর বেদান্ত বলে সবচেয়ে বড় ভ্রম হচ্ছে—নিজেকে দুর্বল বলা, পাপী বলা, দুর্দশাগ্রস্ত জীব বলা এবং আমার কোন শক্তি নেই, আমি এটা করতে পারি না, ওটা করতে পারি না। যখনই তুমি ওইভাবে চিন্তা কর তখনই তোমার বন্ধন-শৃঙ্খলে তুমি আর একটি গ্রন্থি সংযোজন কর, নিজের আত্মার উপর আরও মায়ার আবরণ টেনে দাও। অতএব, যে কেউ নিজেকে দুর্বল বলে ভাবে, সে ভ্রান্ত; যে কেউ নিজেকে অপবিত্র মনে করে, সে ভ্রান্ত এবং সে জগতে এক অসৎ চিন্তা ছড়িয়ে দেয়। একথাটা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে বেদান্তে এই বর্তমান জীবনকে,—এই মোহমুগ্ধ জীবনকে আদর্শের সঙ্গে এক বোঝাপড়া করে নেবার কোন প্রচেষ্টা হয়নি; এই মিথ্যা জীবনকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং যে সত্য জীবন সদা বর্তমান তাকে প্রকাশ করতে হবে, বিকাশ করতে হবে। মানুষ পবিত্র থেকে পবিত্রতর হয়ে ওঠে না, আসলে হচ্ছে তার শুদ্ধ স্বভাব ক্রমশ প্রকাশিত হয়। আবরণ ঘুচে যায়, আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা নিজেকে প্রকাশ করতে থাকে। অনন্ত পবিত্রতা, মুক্তি, প্রেম ও শক্তি—সব কিছুই আমাদের গোড়া থেকেই আছে।

বেদান্ত আরও বলে, এটি যে শুধু বনে বা গুহার গভীরে উপলব্ধি করা যাবে তা নয়, জীবনের সম্ভাব্য সর্ব অবস্থাতেই মানুষের দ্বারা এটি উপলব্ধি করা যায়। আমরা দেখেছি এই সত্যকে যাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁরা বনে বা গুহায় বাস করতেন না, সাধারণ জীবিকা অনুসরণ করতেন না; কিন্তু—আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে—তাঁরা অত্যন্ত কর্মব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের সৈন্য পরিচালনা করতে হতো, সিংহাসনে বসে লক্ষ লক্ষ প্রজার কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখতে হতো—তখনকার দিনে রাজারা সার্বভৌম সম্রাট ছিলেন, এখনকার রাজাদের মতো শুধু সাক্ষীগোপাল ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তাঁরা এই সব তত্ত্ব চিন্তা করার, উপলব্ধি করার ও মানবসমাজকে সেগুলি শিক্ষা দেবার সময় পেতেন। তাহলে এগুলি আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা আরও কত সহজ, কারণ তাঁদের তুলনায় আমাদের জীবন তো অবসরে ভরা। এগুলি উপলব্ধি না করতে পারাটাই আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়, কারণ তাঁদের তুলনায় আমাদের হাতে বেশি সময় আছে এবং খুব কম কাজ করতে হয়। প্রাচীনকালের সম্রাটদের প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের তো কিছুই দরকার নেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাট সৈন্যবাহিনী পরিচালনাকারী অর্জুনের প্রয়োজনের তুলনায় আমার

প্রয়োজনে কিছুই নয়; অথচ এই যুদ্ধ কোলাহলের মধ্যে তিনি সর্বোচ্চ দর্শনের কথা শোনার সময় করতে পারলেন এবং তা জীবনে কার্যেও পরিণত করতে পেরেছিলেন। সেই তুলনায় মুক্ত, সহজ, আরামপ্রদ এই জীবনে আমাদেরও নিশ্চয় তা পারা উচিত। আমরা যদি সময়কে সত্যিই সৎভাবে ব্যবহার করতে ইচ্ছা করি, তাহলে দেখব আমরা যতটা ভাবছি তার চেয়ে অনেক বেশি সময় আমাদের আছে। যতটা অবসর আমাদের আছে, তাতে আমরা যদি ইচ্ছে করি তবে এক আদর্শ কেন, একশো আদর্শের আমরা অনুসরণ করতে পারি, কিন্তু তা বলে আদর্শকে কখনো নিচে নামিয়ে আনতে নেই। আমাদের কাছে কোন মানুষের রূপ ধরে বড় প্রলোভন আসে, যে আমাদের ভুলগুলির জন্য অজুহাত দেখিয়ে দেয় এবং আমাদের অর্থহীন বাসনা-কামনার জন্য নানা ওজর সৃষ্টি করে; আমরা মনে করি তাদের আদর্শটাই আমাদের পক্ষে একমাত্র প্রয়োজনীয় আদর্শ। কিন্তু তা তো নয়। বেদান্ত এ ধরনের কোন শিক্ষা দেয় না। বাস্তবকে আদর্শের সঙ্গে একীভূত করতে হবে, বর্তমান জীবনকে অনন্ত জীবনের সঙ্গে একীভূত করতে হবে।

তোমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে বেদান্তের মূল আদর্শ হচ্ছে এই একত্ব। কোন কিছুতে দুই নেই, দু ধরনের জীবন নেই, এমন কি দুটি জগতের জন্যও দুটি পৃথক ধরনের জীবন নেই। তোমরা দেখবে, বেদ প্রথমে স্বর্গ ও ওই ধরনের বিষয়ের কথা বলেছে, কিন্তু শেষে যখন দর্শনের উচ্চতম আদর্শের কথা বলতে আরম্ভ করা হয়েছে তখন ওই সকল বিষয় একেবারে ঝেড়ে ফেলা হয়েছে। জীবন একটিই, জগৎ একটিই, অস্তিত্ব একটিই। সবই সেই এক সত্তা, প্রভেদ শুধু পরিমাণগত, প্রকারগত নয়। আমাদের জীবনের মধ্যে প্রভেদ প্রকারগত নয়। পশুরা মানুষের থেকে পৃথক এবং তাদের খাদ্যরূপে ব্যবহার করার জন্য ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন—বেদান্ত এই কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে।

কয়েক ব্যক্তি দয়াপরবশ হয়ে 'ব্যবচ্ছেদ-বিরোধী সমিতি' (Anti-Vivisection Society) প্রতিষ্ঠা করল। তাদের এক সদস্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'বন্ধু, আপনারা খাওয়ার জন্য পশুবধ সম্পূর্ণ ন্যায় সংগত মনে করেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য দু-একটি পশুবধের বিরোধী কেন?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'পশুদের ব্যবচ্ছেদ করা বড় ভয়ানক ব্যাপার, কিন্তু বধ করা নয়, কারণ আমাদের খাওয়ার জন্যই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।'

সেই অখণ্ড সত্তার অংশ পশুগুলিও। যদি মানুষের জীবন অমর হয়, তবে পশুর জীবনও তাই। প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, প্রকারগত নয়। 'অ্যামিবা' ও আমি একই, সেই ক্ষুদ্র জীবাণুর সঙ্গে আমার প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, সর্বোচ্চ জীবনের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে দেখলে এই প্রভেদও ঘুচে যায়। ঘাস আর ছোট গাছের মধ্যে অনেক তফাৎ দেখা যায়, কিন্তু যদি খুব উঁচুতে ওঠ, তাহলে ঘাস আর বড় গাছকেও একই রকম দেখাবে। এইভাবে সেই উচ্চতম আদর্শের ভিত্তিতে নিম্নতম পশু আর মহত্তম মানুষ সমান। যদি তুমি বিশ্বাস কর ঈশ্বর আছেন, তবে পশু ও উচ্চতম প্রাণী নিশ্চয় সমান বলে মানতে হবে। যে ঈশ্বর তাঁর মানুষ নামে গণ্য পুত্রদের প্রতি

দয়ালু আর পশু বলে গণ্য পুত্রদের প্রতি নিষ্ঠুর, সেই ঈশ্বর দানবের চেয়ে খারাপ। এই রকম ঈশ্বরকে উপাসনা করার বদলে আমি শত শত বার মরতে প্রস্তুত। আমার সারা জীবন হয়ে উঠবে এমনিধারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। কিন্তু সত্যি কোন প্রভেদ নেই; যারা বলে আছে, তারা দায়িত্বজ্ঞানহীন, হৃদয়হীন, অজ্ঞ। এক্ষেত্রে কার্যকর শব্দটি ভুল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আমি নিজে গোঁড়া নিরামিষাহারী না হতে পারি, কিন্তু নিরামিষ-ভোজনের আদর্শ আমি বুঝি। যখন মাংস খাই, বুঝি সেটা অন্যায় করছি। এমন কি যদি কোন বিশেষ পরিবেশের প্রভাবে আমি খেতে বাধ্য হই, আমি জানি সেটা নিষ্ঠুরতা। আমি আদর্শকে নামিয়ে এনে আমার দুর্বলতার সমর্থনের চেষ্টা করব না। আদর্শ হচ্ছে মাংসাহার না করা, কোন প্রাণীর অনিষ্ট না করা, কারণ সব পশুই আমার ভাই। যদি তুমি তাদের তোমার ভাই বলে ভাবতে পার, তবে সর্বপ্রাণীর প্রতি ভ্রাতৃভাবের দিকে তুমি একটু অগ্রসর হয়েছ, মানুষের প্রতি ভ্রাতৃভাবের তো কথাই নেই! ওটা তো ছেলেখেলা! তুমি সাধারণত দেখবে এটা অনেকের কাছেই খুব সহজগ্রাহ্য হবে না, কারণ এটি বাস্তবকে ত্যাগ-আদর্শের দিকে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু তুমি যদি এমন কোন মতবাদের কথা বল, যা তাদের বর্তমান আচরণের সঙ্গে খাপ খায়, তবে তারা সেটাকে সম্পূর্ণ কার্যকর বলে মেনে নেবে।

মানুষের স্বভাবে শক্তিশালী রক্ষণশীল প্রবৃত্তি আছে, আমরা সামনের দিকে এক পা এগুতে চাই না। আমার মনে হয় বরফে জমে যাওয়া মানুষদের সম্বন্ধে যেমন পড়েছি, মানুষ জাত সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি বলা যায়। শোনা যায়, ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া মানুষেরা ঘুমাতে চায়, যদি তুমি তাদের জাগিয়ে রাখার চেষ্টা কর, তারা বলে, 'আমাকে ঘুমাতে দাও; বরফে ঘুমাতে বড় আরাম।'

সেই নিদ্রায়ই তাদের চিরনিদ্রা হয়। আমাদের প্রকৃতিও তেমনি। আমরাও সারা জীবন অমনি করছি, পা থেকে মাথা পর্যন্ত ক্রমশ জমে যাচ্ছে, তবু আমরা ঘুমাতে চাইছি। সেজন্য সর্বদাই আদর্শে পৌঁছাবার জন্য সংগ্রাম করবে। যদি কোন ব্যক্তি এসে আদর্শকে ছোট করে তোমার স্তরে নামিয়ে আনতে চায় এবং এমন এক ধর্ম শিক্ষা দিতে চায়, যার মধ্যে উচ্চতম আদর্শ নেই, তাহলে তার কথায় কান দিও না। আমার কাছে সেটা এক অবাস্তব ধর্ম। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এমন ধর্ম শিক্ষা দেয়, যার মধ্যে উচ্চতম আদর্শ আছে, আমি তাকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত। যখন কোন লোক মানসিক দুর্বলতা ও অহংকারকে সমর্থন করতে চায়, তখন তার সম্বন্ধে সাবধান হবে। আমরা ইন্দ্রিয়াবদ্ধ জীব হয়ে আছি, তার উপর যদি কেউ ওই রকম ধর্ম প্রচার করে, তাকে অনুসরণ করলে আমাদের কখনই উন্নতি হবে না। আমি এসব অনেক দেখেছি, জগৎ সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, আমার দেশে ধর্মসম্প্রদায়গুলি ব্যাঙের ছাতার মত গজায়। প্রতি বছর নতুন নতুন সম্প্রদায় জন্মায়। কিন্তু একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি, যে সম্প্রদায়গুলি ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষ ও সত্যানুসন্ধী মানুষের মধ্যে আপোস করে না, তারাই উন্নতি করে। যেখানেই সাংসারিক বাসনার সঙ্গে উচ্চতম আদর্শকে মেলাবার মিথ্যা ধারণা পোষণ করা হয়েছে,

ঈশ্বরকে মানুষের স্তরে টেনে নামাবার চেষ্টা হয়েছে, সেখানেই অবিশুদ্ধতা ঢুকেছে। মানুষকে সংসারের দাসত্বের মধ্যে টেনে নামানো ঠিক নয়, তাকে দেবত্বে উন্নত করতে হবে।

এই প্রশ্নের আর একটি দিক আছে। আমরা যেন অপরকে ঘৃণার চোখে না দেখি। আমরা সকলে একই লক্ষ্যের দিকে চলেছি। দুর্বলতা ও শক্তির মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিমাণগত; পাপ ও পুণ্যের মধ্যে পার্থক্য মাত্রাগত, স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে পার্থক্য মাত্রাগত, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য মাত্রাগত, জগতের সব পার্থক্যই পরিমাণগত, প্রকারগত নয়; কারণ সব কিছুর মূলে সেই একই সত্তা। সবই এক, যিনি নিজেকে প্রকাশ করছেন চিন্তারূপে, জীবনরূপে, দেহরূপে বা আত্মারূপে এবং প্রভেদ শুধু পরিমাণে। তাই, আমাদের কোন অধিকার নেই অন্যদের ঘৃণা করার, যারা ঠিক আমাদের সম-পরিমাণ উন্নতি করতে পারেনি। কারও নিন্দা করো না, সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে পার তো দাও। না পারলে হাত গুটিয়ে তাদের আশীর্বাদ জানাও এবং তাদের নিজের পথে চলতে দাও। টেনে নামানো ও নিন্দা করা কাজের কাজ নয়। তাতে কোন কাজ হয় না। অন্যের নিন্দা করে আমরা নিজেদের শক্তিক্ষয় করি। সমালোচনা ও নিন্দায় বৃথা শক্তিক্ষয় হয়, কারণ শেষে আমরা বুঝতে পারি যে সকলে একই জিনিস দেখছে, কোন না কোন ভাবে একই লক্ষ্যের দিকে চলেছে এবং আমাদের অধিকাংশ প্রভেদই হচ্ছে শুধু প্রকাশের পার্থক্য।

পাপের কথাটাই ধর। আমি একটু আগেই এ সম্বন্ধে বেদান্তের ধারণা ও 'মানুষ পাপী' এই ধারণার কথা বলছিলাম। এই দুটি ভাব বস্তুত এক, কেবল একটি ইতি-বাচক, অন্যটি নেতিবাচক। একটি মানুষকে দেখিয়ে দেয় তার শক্তি, অন্যটি দেখায় দুর্বলতা। বেদান্ত বলে, দুর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু তাতে মন খারাপ করো না, আমরা উন্নতি করতে চাই। মানুষ জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই রোগটা ধরা পড়েছে। সকলেই নিজের রোগটা জানে, অপর কারুকে তা বলে দিতে হয় না। কিন্তু সব সময় আমরা রোগী এটা ভাবলে তো আর অসুখ সারবে না, ওষুধের দরকার। আমরা বাইরের সব কিছু ভুলে যেতে পারি, বহির্জগতের সঙ্গে আমরা কপটতার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে সবাই নিজেদের দুর্বলতাটা জানি। বেদান্ত বলে, কিন্তু শুধু দুর্বলতা স্মরণ করিয়ে দিলেই বেশি উপকার হবে না, শক্তি দিতে হবে এবং দুর্বলতার কথা সর্বদা চিন্তা করলে শক্তি আসে না। দুর্বলতার প্রতিকার দুর্বলতা নিয়ে দুশ্চিন্তা নয়, শক্তি সম্বন্ধে চিন্তা। মানুষের মধ্যে পূর্ব হতেই যে শক্তি বিদ্যমান, তাই শিক্ষা দাও। মানুষকে পাপী না বলে বেদান্ত ঠিক তার উল্টোটাই বলে, 'তুমি পূর্ণ ও শুদ্ধস্বরূপ, যাকে তুমি পাপ বলো, তা তোমার নেই।' পাপ হচ্ছে আত্ম-প্রকাশের খুব নিচুস্তর, উচ্চস্তরের ভাবে নিজেকে প্রকাশ কর। এই বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে, আমরা সকলেই সেটা পারি। কখনও বলো না,—'না', কখনও বলো না,—'পারি না।' কারণ তুমি অনন্তস্বরূপ। তোমার প্রকৃতির তুলনায় স্থান ও কাল কিছুই নয়। তুমি সব কিছু করতে পার, তুমি সর্বশক্তিমান।

এই হলো মতবাদের মূলকথা। এবার মতবাদ থেকে নেমে এসে এর কার্যকর দিক

বিশদভাবে আমরা আলোচনা করব। আমরা দেখব এই বেদান্তকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, গ্রাম্য জীবনে, জাতীয় জীবনে এবং প্রতি জাতির নিজস্ব জীবনে। কারণ মানুষ যে অবস্থায় আছে, যে পরিবেশে আছে, তাতে ধর্ম যদি তাকে সাহায্য করতে না পারে তাহলে সে ধর্মের কোন উপযোগিতা নেই ; কয়েকজনের কাজে কেবল একটি মতবাদ রূপেই এর অস্তিত্ব থাকবে। ধর্ম দ্বারা যদি মানবজাতির কল্যাণ করতে হয়, তবে ধর্মকে প্রস্তুত ও সমর্থ হতে হবে মানুষকে সাহায্য করার জন্য, তা সে যে অবস্থাতেই থাকুক বদ্ধ বা মুক্ত, অধঃপাতের গহ্বরে বা পবিত্রতার শিখরে ;—সর্বত্র সমভাবে মানুষকে সাহায্য করতে সক্ষম হওয়া ধর্মের উচিত। বেদান্তের তত্ত্ব বা ধর্মের আদর্শ, বা যে নামই বলো না কেন, এই মহান কার্যে সক্ষম হলেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে।

আত্মবিশ্বাসের আদর্শই আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি সাহায্যকর যদি এই আত্মবিশ্বাস আরও ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও কার্যে পরিণত করা হতো, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের দুঃখ-দুর্দশার বেশির ভাগই দূর হয়ে যেত। সমস্ত মানবজাতির ইতিহাসে সমস্ত বড় নরনারীর জীবনে যদি কোন প্রেরণা বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে তা হচ্ছে এই আত্মবিশ্বাস। তাঁরা এই চেতনা নিয়ে জন্মেছিলেন যে তাঁরা বড় হবেন, আর তাই হয়েছেন। মানুষ যত দূর সম্ভব নিচে নামুক না কেন, এমন এক সময় আসবে যখন সেই অবস্থায় হতাশ হয়ে সে উন্নতির পথে আসবে এবং নিজের উপর বিশ্বাস অর্জন করতে শিখবে। কিন্তু গোড়া থেকেই আমাদের এই আত্মবিশ্বাসের কথা জেনে রাখা ভাল। নিজের উপর বিশ্বাস অর্জন করার জন্য কেন আমরা ওইসব তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে যাব? আমরা দেখি মানুষে মানুষে পার্থক্যের প্রধান কারণ হচ্ছে—তার নিজের উপর বিশ্বাস আছে, না নেই। আত্মবিশ্বাসের বলে সকলই সম্ভব। আমার নিজের জীবনে এটা দেখেছি এবং এখনও দেখছি ; যতই আমার বয়স হচ্ছে ততই এই বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্ম বলত যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। নতুন ধর্ম বলে যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। এই বিশ্বাস ক্ষুদ্র 'আমি' তে নয়, কারণ বেদান্তের নীতি 'একত্ববাদ'। এই বিশ্বাসের অর্থ সকলের উপর বিশ্বাস, কারণ তুমিই সব হয়েছ। নিজের প্রতি ভালবাসা মানে সকলের প্রতি ভালবাসা, জীবজন্তুর প্রতি ভালবাসা, সর্ববস্তুর প্রতি ভালবাসা, কারণ তোমরা সকলেই এক। এই মহান বিশ্বাস জগৎকে উন্নততর করবে। এ আমার নিশ্চিত ধারণা। সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ, যে সততার সঙ্গে বলতে পারে, 'আমি নিজের সম্বন্ধে সব জানি।' তোমরা কি জান তোমাদের এই দেহের ভেতর কত শক্তি, কত ক্ষমতা এখনও লুকিয়ে আছে? কোন বৈজ্ঞানিক মানুষের ভেতর যা আছে, তার সবটা জেনেছেন? মানুষের পৃথিবীতে প্রথম পদার্পণের পর লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেছে, কিন্তু তার শক্তির অতি নগণ্য অংশ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। তাই তুমি নিজেকে দুর্বল বল কী করে? তুমি কেমন করে জানছ বাহ্যত এই অবনতির পেছনে কী সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে? তোমার ভেতরে যা আছে তার অতি সামান্যই তুমি জান। তোমার পেছনে অনন্ত শক্তি ও আনন্দের মহাসমুদ্র রয়েছে।

'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ'! দিনরাত্রি শ্রবণ কর—তুমি সেই আত্মা। দিনরাত্রি এটি আবৃত্তি কর, যে পর্যন্ত না তোমার ধমনীতে ঢুকছে, যে পর্যন্ত না তোমার প্রতি রক্তবিন্দুতে মিশছে, যে পর্যন্ত না তোমার অস্থি-মজ্জার মধ্যে যাচ্ছে। সমস্ত দেহটা এই এক আদর্শে পূর্ণ করে তোল 'আমি জন্ম-মৃত্যুহীন, আনন্দময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, নিত্য জ্যোতির্ময় আত্মা।' দিনরাত্রি এই চিন্তা কর; যে পর্যন্ত এটি তোমার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায় এটি ধ্যান কর, এর থেকেই পরে কর্ম আসবে। 'হৃদয় পূর্ণ হলে মুখে বাণী জাগে'—হৃদয় পূর্ণ হলে হাতও কাজ করে। কর্ম আসবে। নিজেকে আদর্শে পূর্ণ করে নাও; যা কিছু কর, তা ভালভাবে ভেবে কর। তোমার সমস্ত কর্মই বৃহৎ, মহৎ, দেবভাবাপন্ন হয়ে উঠবে ওই চিন্তাশক্তির প্রভাবে। বস্তু যদি শক্তিশালী হয়, তবে চিন্তা সর্বশক্তিমান। সেই চিন্তাকে তোমার জীবনের উপর কাজ করতে দাও; তোমার সর্বশক্তিমত্তা, তোমার রাজকীয়তা, তোমার মহত্ত্বের চিন্তায় নিজেকে ভরে তোল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমাদের মাথায় যদি কুসংস্কারগুলি না প্রবেশ করত! ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি না আমরা জন্ম থেকেই কুসংস্কারের প্রভাব, আমাদের দুর্বলতা ও নীচতার পঙ্কর ধারণাগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত হতাম! ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি মানুষ অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে উচ্চতম ও মহত্তম সত্যগুলিতে পৌঁছাতে পারত। কিন্তু মানুষকে এই সবের মধ্যে দিয়েই যেতে হয়। তোমার পরে যারা আসছে তাদের জন্য পথটি আরও কষ্টকর করে তুলো না।

শিক্ষা দেবার পক্ষে অনেক সময় এই তত্ত্ব ভয়ানক বলে মনে হয়। আমি জানি, অনেকে এইসব মতবাদ শুনে ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু যারা এই আদর্শকে কার্যকর করতে চায়, তাদের কাছে এটাই প্রথম পাঠ। নিজেকে বা অপরকে কখনও দুর্বল বলো না। যদি পার লোকের ভাল কর, কিন্তু জগতের ক্ষতি করো না। অন্তরের অন্তঃস্থলে জানো যে, তোমাদের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব, নিজেকে ছোট করে কাল্পনিক কারও কাছে কান্না ও প্রার্থনা কুসংস্কার মাত্র। আমাকে এমন এক দৃষ্টান্ত দেখাও, যেখানে এই প্রার্থনার উত্তর পাওয়া গেছে। সমস্ত উত্তর যা আসে তা নিজের অন্তর থেকে। তুমি জান ভূত বলে কিছু নেই, কিন্তু যখনই অন্ধকারের মধ্যে যাও তোমার একটু গা-ছমছমে অনুভূতি জাগে। এর কারণ ছোটবেলায় নানারকম ভীতিকর ধারণা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আর কারুকে এই রকম সমাজ ও জনমতের ভয়ে, বন্ধু-বান্ধবদের ঘৃণার ভয়ে, কুসংস্কার নষ্ট হবার ভয়ে কিছু শেখাবে না। এই সব প্রবৃত্তি জয় কর। বিশ্বের একত্ব ও নিজের উপর বিশ্বাস ছাড়া ধর্মের আর কী শেখাবার আছে? হাজার হাজার বছর ধরে মানবজাতির সব কাজই হচ্ছে এই একটি লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং মানবজাতি এখনও তাই করে চলেছে। এবার তোমার পালা এবং তুমি ইতিমধ্যে সত্যটি জেনেছ। সকল দিক থেকেই এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কেবল দর্শন ও মনোবিজ্ঞান নয়, জড়বিজ্ঞানও এই এক কথা ঘোষণা করছে। এমন বিজ্ঞানী আজ কোথায় যিনি বিশ্বের এই একত্বের সত্যটি স্বীকার করতে ভয় পান? জগতের বহুত্ব প্রচার করতে কে এখন সাহস করে? এ সবই

কুসংস্কার। একটি মাত্র প্রাণ, একটি মাত্র জগৎ বিদ্যমান এবং সেই এক প্রাণ ও এক জগৎ আমাদের কাছে বহুরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। এই বহুত্ব হচ্ছে স্বপ্নের মতো। যখন তুমি স্বপ্ন দেখ, তখন এক স্বপ্নের পরে আর একটি আসে। তোমার স্বপ্ন তোমার জীবনে সত্য নয়। স্বপ্নের পর স্বপ্ন আসে, দৃশ্যের পর দৃশ্য তোমার সামনে উদ্ঘাটিত হয়। এই শতকরা নব্বইভাগ দুঃখ ও দশভাগ সুখের জগতও তাই। হয়তো কিছুকাল পরে এর নব্বইভাগ সুখে পরিপূর্ণ মনে হবে, তখন আমরা একে স্বর্গ বলব। কিন্তু সাধকের সামনে এমন অবস্থা আসে যখন সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ অদৃশ্য হয়ে গিয়ে ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয় এবং নিজের আত্মাকেও ব্রহ্ম বলে অনুভূত হয়। অতএব নানা জগৎ, নানা প্রাণ বলে কিছু নেই। এই বহুত্ব সেই একেরই প্রকাশমাত্র। সেই একই নিজেকে বহু রূপে প্রকাশ করছেন—জড়, চৈতন্য, মন, চিন্তা ও সবকিছু রূপে। সেই একই নিজেকে প্রকাশ করছেন বহুরূপে। অতএবঃআমাদের প্রথম সাধন হচ্ছে এই সত্য নিজেকে ও অন্যকে শিক্ষা দেওয়া।

পৃথিবী এই আদর্শ ঘোষণার ধ্বনিতে কেঁপে উঠুক, কুসংস্কার পালিয়ে যাক! দুর্বল মানুষকে এই কথা বলো, ক্রমাগত বলতে থাক,—তুমি শুদ্ধস্বরূপ, ওঠ, জাগো, হে শক্তিমান, এই নিদ্রা তোমার সাজে না! ওঠ, জাগো, এই মোহ তোমার মানায় না! নিজেকে দুর্বল, দুঃখী মনো করো না! সর্বশক্তিমান, ওঠ, জাগো, নিজের স্বরূপ প্রকাশ কর! নিজেকে পাপী বলে মনে কর,এটা তোমার শোভা পায় না। নিজেকে দুর্বল বলে ভাব, এটা তোমার উপযুক্ত নয়। জগৎকে এ কথা বল, নিজেকে এ কথা বল, দেখ এর বাস্তব পরিণতি কী হয়। দেখ, কেমন এক বিদ্যুৎ ঝলকে সব কিছু প্রকাশিত হয়, সব কিছু কেমন বদলে যায়। মানবজাতিকে এ কথা বল, তাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন কর। তারপর আমরা শিখব কী ভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই শক্তি প্রয়োগ করতে হয়।

যাকে আমরা বিবেক (বিচারশক্তি) বলি, তার ব্যবহার শিখতে হবে। শিখতে হবে জীবনের প্রতি মুহূর্তে, প্রতি কাজে, সৎ ও অসতের মধ্যে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে বিচার করা। আমাদের জানতে হবে সত্যের পরীক্ষা কী? তা হচ্ছে এই পবিত্রতা ও একত্ব। যাতে একত্ব হয়, তাই সত্য। প্রেম সত্য, ঘৃণা অসত্য। কারণ ঘৃণা বহুত্বের ভাব আনে। ঘৃণাই মানুষকে মানুষের থেকে পৃথক করে, তাই এটি অন্যায়, অসত্য। এট বিভাজনী শক্তি, এটি পৃথক করে, বিনষ্ট করে।

প্রেম বাঁধে, প্রেম একত্ব সম্পাদন করে। সকলে এক হয়ে যায়, মা সন্তানের সঙ্গে এক হয়, পরিবারগুলি সহরের সঙ্গে এক হয়ে যায়, সমস্ত জগৎ প্রাণীদের সঙ্গে এক হয়ে যায়। প্রেমই অস্তিত্ব, স্বয়ং ঈশ্বর ; সমস্তই সেই এক প্রেমের প্রকাশ—স্পষ্ট বা অস্পষ্ট-রূপে প্রকাশিত। প্রভেদ কেবল প্রকাশের মাত্রায় ; কিন্তু বাস্তবিক সকলই প্রেমের প্রকাশ। সেইজন্যে আমাদের প্রতিটি কাজে বিচার করতে হবে, সেটি একত্ব না বহুত্ব সম্পাদন করছে। যদি বহুত্ববিধায়ক হয়, তবে সেগুলি ত্যাগ করতে হবে ; আর যদি একত্ববিধায়ক হয়, তবে সেগুলি নিশ্চিৎ সৎকর্ম। আমাদের চিন্তা সম্বন্ধেও একই কথা। দেখতে হবে সেগুলি বহুত্ববিধায়ক, বিভাজনকারী, না একত্ববিধায়ক, আত্মায় আত্মায়

মিলনকারী, একই প্রভাব আনয়নকারী কি না। যদি তাই করে, তবে সেই ভাবগুলি আমরা গ্রহণ করব, যদি না করে তবে পাপচিন্তা বলে পরিত্যাগ করব।

বৈদান্তিক নীতিবিজ্ঞানের সার কথা হলো যে, এটি কোন অজ্ঞেয় বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয়, অজ্ঞাত কিছু এ শিক্ষা দেয় না। উপনিষদের ভাষায়—'যে ঈশ্বরকে তোমরা অজ্ঞেয় মনে করে উপাসনা করছ, তাঁর সম্বন্ধেই আমি তোমাদের কাছে প্রচার করছি।' আত্মার মাধ্যমেই তুমি সবকিছু জানছো। আমি এই চেয়ারটি দেখছি। কিন্তু চেয়ারখানি দেখতে হলে প্রথমে নিজের সম্বন্ধে ধারণা চাই, তারপর চেয়ার সম্বন্ধে। এই 'আমি' বা আত্মার মাধ্যমেই চেয়ারটি জ্ঞাত হয়। এই আত্মার মাধ্যমেই তুমি আমার কাছে জ্ঞাত হও, সমগ্র জগৎ জ্ঞাত হয়। অতএব আত্মাকে অজ্ঞাত বলা প্রলাপমাত্র। আত্মাকে সরিয়ে নাও, সমস্ত জগৎ অদৃশ্য হয়ে যাবে। আত্মার মাধ্যমেই সমস্ত জ্ঞান আসে। অতএব এটিই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। এটিই তুমি, যাকে তুমি 'আমি' বল। তুমি অবাক হতে পার এই আমার 'আমি' কেমন করে তোমার 'আমি' হতে পারে? তুমি আশ্চর্য হতে পার এই সান্ত 'আমি' কেমন করে অনন্ত অসীম হবে? কিন্তু তাই-ই। সান্ত 'আমি' শুধু কল্পনা। অনন্তকে যেন আবৃত করা হয়েছে, তার সামান্য একটু 'আমি'রূপে প্রকাশিত হয়েছে। অসীম কখন সসীম হয় না; এটি কল্পনা। অতএব সেই আত্মা স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, এমন কি পশুপক্ষী—সকলেরই জ্ঞাত। তাঁকে না জেনে আমরা থাকতে পারি না, নড়তে পারি না, হতে পারি না; সর্বেশ্বর প্রভুকে না জেনে আমরা এক মুহূর্ত বাঁচতে পারি না, একটি নিঃশ্বাসও ফেলতে পারি না। বেদান্তের ঈশ্বর সর্বাধিক জ্ঞাত এবং কল্পনাপ্রসূত নন।

যদি এটি প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের প্রচার না হয়, তবে আর প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের শিক্ষা কি ভাবে দেওয়া যায়? তাঁর চেয়ে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর আর কে আছেন, যাঁকে আমার সামনে দেখছি —যিনি সর্বত্র বিদ্যমান, সর্ব প্রাণীতে অধিষ্ঠিত, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির চেয়েও বাস্তব? কারণ তুমিই তিনি, সেই সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তোমার আত্মার আত্ম; আর যদি আমি বলি তুমি তা নও, তবে আমি মিথ্যা কথা বলছি। এটা আমি সব সময় উপলব্ধি করি বা না করি, তবু আমি এটি জানি। তিনি এক অখণ্ড সত্তা, সর্ব-বস্তুর একত্বস্বরূপ, সমস্ত জীবন ও অস্তিত্বের যথার্থ স্বরূপ।

বেদান্তের এই সব ভাব বিশদভাবে কার্যে পরিণত করতে হবে, তাই তোমার একটু ধৈর্যের দরকার। আমি আগেই বলেছি বিষয়টা আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে চাই এবং দেখতে হবে কী ভাবে এই আদর্শ নিম্নতর আদর্শগুলি থেকে জন্ম লাভ করে, একত্বের সেই মহান আদর্শ কী ভাবে বিকশিত হয়ে ক্রমশ সর্বজনীন প্রেমে পরিণত হয়েছে। বিপদ এড়াবার জন্য এগুলি আমাদের পর্যালোচনা করা উচিত। সর্বনিম্ন স্তর থেকে এটি কার্যকর করার মতো সময় জগৎ নাও পেতে পারে। কিন্তু আমাদের উচ্চতর স্তরে দাঁড়িয়ে থাকায় কী লাভ, যদি না পরবর্তী জনদের সত্যের সন্ধান দিতে পারি? অতএব বিষয়টির পর্যালোচনা করা ভাল এবং প্রথমত এটির জ্ঞানকাণ্ড ভালভাবে বোঝার একান্ত দরকার, যদিও আমরা জানি বুদ্ধি-বিচারের

বিশেষ মূল্য নেই, কারণ হৃদয়ই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হৃদয়ের দ্বারাই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হয়, বুদ্ধি দ্বারা নয়। বুদ্ধি কেবল ঝাড়ুদারের মতো আমাদের জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে দেয়। বুদ্ধি প্রহরীর মতো, কিন্তু সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রহরী একান্ত প্রয়োজনীয় নয়। সে কেবল গোলমাল থামাবার জন্য, অন্যায় নিবারণের জন্য—বুদ্ধির কাছ থেকে শুধু ওইটুকু কাজেরই দরকার। যখন তোমরা বুদ্ধিবিচারের বই পড়, তখন একবার তার বিষয়বস্তু আয়ত্ত হয়ে গেলে তোমাদের মনে হয়, 'ভগবানের আশীর্বাদের থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচেছি।' কারণ বিচারশক্তি অন্ধ, এর নিজের গতি নেই, হাত-পা নেই। অনুভূতিই কাজ করে, বিদ্যুৎ বা আরও দ্রুতগামী বস্তুর চেয়ে সে অনন্ত গুণ বেশি দ্রুত। প্রশ্ন এই—তোমরা কি অনুভব কর? তোমাদের হৃদয় আছে? যদি থাকে, তাহলে ঈশ্বরকে দেখতে পাবে। আজ তোমার হৃদয়ে যে অনুভবশক্তি আছে, সেটিই প্রবল হবে, দেবভাবাপন্ন হবে, সর্বোচ্চ স্তরে উঠবে, যতক্ষণ না সর্ববস্তুকে অনুভব করে, সর্বস্তর একত্বকে অনুভব করে, নিজের মধ্যে ও অন্যের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করে। বুদ্ধি কখনই তা পারে না। 'বিভিন্ন-রূপের বাকচাতুর্য, শাস্ত্রগ্রন্থ ব্যাখ্যা করার বিভিন্ন কৌশল,—এসব কেবল পণ্ডিতদের আনন্দের জন্য, মুক্তির জন্য নয়।' (বিবেকচূড়ামণি, ৫৮)

তোমাদের মধ্যে যারা টমাস-আ-কেম্পিসের গ্রন্থ পড়েছ, তারা জান প্রতিটি পাতায় তিনি অনুভবের উপর কেমন জোর দিয়েছেন। জগতের প্রায় সকল সাধু-পুরুষই এটির উপর জোর দিয়েছেন। বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োজন আছে, কারণ তা না থাকলে আমরা বিভ্রান্ত হই এবং নানা ধরনের ভুল করি। বুদ্ধি-বিবেচনা এগুলিকে নিবারণ করে, কিন্তু তার পরে এর উপর নির্ভর করো না, বুদ্ধি-বিবেচনার ভিত্তির উপর কিছু নির্মাণের চেষ্টা করো না। এটি এক নিষ্ক্রিয় গৌণ সহায়কমাত্র; প্রকৃত সহায়ক হচ্ছে অনুভূতি, প্রেম। তুমি কি অন্যের জন্য বোধ কর? যদি কর, তবে তোমার মধ্যে একত্বের ভাব বাড়ছে। যদি তুমি অন্যের জন্য কিছু বোধ না কর, তবে তুমি মহাপণ্ডিত হলেও তোমার কিছু হবে না, তুমি এক শুষ্ক বুদ্ধিজীবী এবং তাই হয়েই থাকবে। আর যদি তোমার অনুভূতি থাকে; তবে কোন বই না পড়তে পারলেও, কোন ভাষা না জানলেও তুমি ঠিক পথে চলেছ। তোমার ঈশ্বরলাভ হবে।

জগতের ইতিহাস থেকে তুমি কি জান না কোথা থেকে মহাপুরুষরা শক্তি পেয়েছেন? কোথায় ছিল সেই শক্তি? বুদ্ধি-বৃত্তিতে? তাঁদের মধ্যে কেউ কি দর্শন সম্পর্কে সুন্দর বই লিখে গেছেন? ন্যায়ের জটিল বিচার নিয়ে? কেউ তা করেন নি। তাঁরা শুধু কয়েকটি কথা বলে গেছেন। খ্রীষ্টের মতো হৃদয়বান হও, তুমিও খ্রীষ্ট হবে; বুদ্ধের মতো অনুভূতিসম্পন্ন হও, তুমিও বুদ্ধ হবে। অনুভূতিই জীবন, অনুভূতিই শক্তি, অনুভূতিই তেজ; অনুভূতি ছাড়া যতই বুদ্ধি খেলাও না কেন, কিছুতেই ঈশ্বরলাভ হবে না। বুদ্ধি হচ্ছে পঙ্গু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো, গতিশক্তি-হীন। অনুভূতি এসে তাকে গতি দেয়, যাতে সে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যের উপর কাজ করে। সারা জগতেই এমনিধারা হয়ে আসছে। এই বিষয়টি তোমরা সর্বদা

মনে রাখবে। বৈদান্তিক নীতিতত্ত্বে এটি এক বিশেষ কার্যকরী শিক্ষা। কারণ বেদান্ত বলে, তোমরা সকলে মহাপুরুষ, তোমাদের সকলকেই মহাপুরুষ হতে হবে। কোন শাস্ত্র তোমার আচরণের প্রমাণ নয়, কিন্তু তুমিই শাস্ত্রের প্রমাণ। তুমি কী করে জানছ শাস্ত্র সত্য শিক্ষা দিচ্ছে? তুমি সত্য অনুভব করে বল। বেদান্ত এই কথাই বলে। জগতের খ্রীষ্ট ও বুদ্ধদের বাক্যের প্রমাণ কি? তুমি-আমিও তাঁদের মতো অনুভব করি এবং তাতেই তুমি ও আমি বুঝি যে সেগুলি সত্য। আমাদের দিব্য-আত্মা তাঁদের দিব্য-আত্মার প্রমাণ। তোমার দেবত্বই ঈশ্বরের প্রমাণ। তুমি যদি মহাপুরুষ না হও, তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কিছু কখনও সত্য নয়। তুমি যদি ঈশ্বর না হও, তবে কোন ঈশ্বর কখনও ছিলেন না, কখনও হবেন না। বেদান্ত বলে, এই আদর্শ অনুসরণীয়। আমাদের প্রত্যেককে মহাপুরুষ হতে হবে, আর তুমি ইতিমধ্যেই তা। শুধু এটি জান। কখনও ভেব না আত্মার পক্ষে কিছু অসম্ভব। এমন ভাবা ভয়ানক নাস্তিকতা। পাপ বলে যদি কিছু থাকে, তবে এটিই একমাত্র পাপ—'আমি দুর্বল', 'অন্যেরা দুর্বল' এই সব বলা।

দ্বিতীয় অংশ

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১২ই নভেম্বর, ১৮৯৬]

আমি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হতে একটা খুব পুরানো গল্প তোমাদের বলব,—একটি বালকের কী ভাবে জ্ঞানলাভ হয়েছিল। গল্পের আঙ্গিকটা খুব স্থূল, কিন্তু তার ভেতর আমরা একটি সারতত্ত্ব পাই।

একটি ছোট ছেলে তার মাকে বলল, 'মা, আমি বেদ পড়তে যাব। আমার বাবার নাম আর গোত্র বল।'

তার মা বিবাহিতা ছিলেন না, আর ভারতবর্ষে অবিবাহিত নারীর সন্তানের সমাজে স্থান ছিল না; সে জাতিচ্যুত, বেদপাঠের অধিকারী নয়।

তাই তার মা বলল, 'বাছা, আমি তোমার বংশ-পরিচয় জানি না। আমি যৌবনে অনেকের পরিচর্যা করতাম, সেই অবস্থায় তোমায় লাভ করেছি। তোমার পিতার নাম আমি জানি না। শুধু জানি যে আমার নাম জবালা আর তোমার নাম সত্যকাম।'

ছোট ছেলেটি এক ঋষির কাছে গেল এবং তাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করার প্রার্থনা জানাল।

ঋষি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার পিতার নাম কি আর তোমার গোত্র কি?'

মার কাছ থেকে যা শুনেছিল, ছেলেটি তাই বলল।

ঋষি তৎক্ষণাৎ বললেন, 'নিজের সম্বন্ধে ক্ষতিকারক হলেও এমন সত্য ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ বলতে পারে না। তুমি ব্রাহ্মণ, আমি তোমায় শিষ্য করব। তুমি সত্য থেকে বিচ্যুত হওনি।'

ছেলেটিকে নিজের কাছে রেখে তিনি শিক্ষা দিতে লাগলেন।

এবার প্রাচীন ভারতের বিশেষ ধরনের শিক্ষাপ্রণালী শুরু হলো। গুরু সত্য-কামকে চার শত শীর্ণ দুর্বল গরুর সেবার ভার দিয়ে বনে পাঠালেন। সেখানে সে বেশ কিছুকাল বাস করল। গুরু তাকে বলেছিলেন যে যখন গরুর পাল বৃদ্ধি পেয়ে এক সহস্র হবে তখন যেন সে ফিরে আসে।

কয়েক বছর পরে সেই গরুগুলির মধ্যে একটি বড় বৃষ সত্যকামকে বলল, 'আমরা এখন এক হাজার হয়েছি; আমাদের তোমার গুরুর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চল। আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দেব।'

সত্যকাম বলল, 'বলুন, প্রভু!'

তখন বৃষ বলল, 'পূর্বদিক ব্রহ্মের এক অংশ; পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তরও তাঁর অংশ। চারদিক ব্রহ্মের চার অংশ। অগ্নিও তোমাকে ব্রহ্ম সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দেবেন।'

সেকালে অগ্নি ব্রহ্মের বিশিষ্ট প্রতীক ছিল এবং প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকে অগ্নিচয়ন করে তাতে আহুতি দিতে হতো।

পরদিন সত্যকাম গুরুগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করল। সন্ধ্যায় যখন সে স্নানাদি সেরে অগ্নিতে হোম করে আসনে উপবিষ্ট, তখন আগুনের মধ্যে থেকে সে এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, 'হে সত্যকাম!'

'প্রভু, আজ্ঞা করুন!' সত্যকাম বলল। (ওল্ড টেস্টামেণ্টে এমনি এক গল্প বোধহয় তোমাদের মনে আছে, স্যামুয়েল এক রহস্যময় বাণী শুনেছিলেন।)

—'সত্যকাম, আমি ব্রহ্ম সম্বন্ধে তোমাকে কিছু শিক্ষা দিতে এসেছি। এই পৃথিবী ব্রহ্মের এক অংশ। আকাশ এক অংশ, স্বর্গ এক অংশ, সমুদ্রও এক অংশ।'

তারপর অগ্নি বললেন যে, এক পক্ষীও তোমাকে কিছু শিক্ষা দেবে। সত্যকাম পুনরায় যাত্রা শুরু করল। পরদিন সন্ধ্যায় তার হোম সাঙ্গ হলে এক রাজহংস তার কাছে এসে বলল, 'আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দেব। হে সত্যকাম! যে অগ্নির তুমি উপাসনা করছ, তা ব্রহ্মেরই অংশ। সূর্য তাঁর অংশ, চন্দ্র তাঁর অংশ, বিদ্যুৎও তাঁর অংশ। মদ্গু নামে এক পাখি তোমায় আরও কিছু শেখাবে।'

পরদিন সন্ধ্যায় সেই পাখি এল এবং সত্যকাম শুনল, 'আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বলব। প্রাণ তাঁর অংশ, দৃষ্টি তাঁর অংশ, শ্রবণ তাঁর অংশ, মনও তাঁর অংশ।'

পরদিন বালক গুরুগৃহে পৌঁছাল এবং যথারীতিশ্রদ্ধাসহকারে গুরুর নিকট উপস্থিত হলো। গুরু শিষ্যকে দেখেই বললেন, 'সত্যকাম, তোমার মুখমণ্ডল ব্রহ্মবিদের মতো উদ্ভাসিত দেখছি। কে তোমাকে শিক্ষা দিল?'

সত্যকাম উত্তর দিল, 'কোন মানুষ নয়। কিন্তু আমার ইচ্ছা আপনি আমাকে কিছু শিক্ষা দিন, প্রভু! কারণ আমি আপনার মতো লোকদের কাছ থেকে শুনেছি যে একমাত্র গুরুদত্ত শিক্ষাই পরম কল্যাণের পথ দেখায়।'

তখন গুরু তাকে দেবতাদের নিকট হতে প্রাপ্ত সেই জ্ঞান দান করলেন। 'কিছুই আর বাকি নেই, হ্যাঁ, কিছুই আর বাকি নেই।'

এখন বৃষ, অগ্নি ও পক্ষী কী শিক্ষা দিল সেই রূপক বাদ দিলে আমরা দেখতে পাই সে যুগে চিন্তাধারার গতি কোন দিকে ছিল। আমরা এখন থেকে এই ধারণার আভাস পাচ্ছি যে ওই সব কণ্ঠের বাণী হচ্ছে নিজের অন্তরের বাণী। ওই সত্যগুলি যতই আমরা ভালভাবে উপলব্ধি করব, ততই দেখব ওই বাণীগুলি আমাদের হৃদয়ের। শিষ্য বুঝেছিল সে সব সময় সত্যকে জানছে, কিন্তু তার ব্যাখ্যাটি ঠিক নয়। সে ব্যাখ্যা করেছে কণ্ঠস্বর বহির্জগৎ থেকে আসছে, কিন্তু সর্বদাই সেটি এসেছে তার অন্তর থেকে। দ্বিতীয় যে তত্ত্ব আমরা পাচ্ছি তা হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োগ। জগৎ সর্বদা অন্বেষণ করছে ধর্ম থেকে কী ব্যবহারিক সত্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, আর এই সব গল্প থেকে আমরা পাই একত্বের ধারণা কী ভাবে প্রতিদিন ক্রমশ ব্যবহারিক জীবনের অন্তর্গত হচ্ছে। ছাত্ররা যে বস্তুগুলির সঙ্গে পরিচিত, তারই মাধ্যমে তাদের সত্যকে দেখিয়ে দেওয়া হতো। যে অগ্নির তারা উপাসনা করত, তা ব্রহ্ম; এই পৃথিবী সেই ব্রহ্মের অংশ এবং এই ধরনের সব।

পরের গল্পটি হচ্ছে সত্যকামের শিষ্য উপকোশল কমলায়নের। ইনি সত্যকামের কাছে শিক্ষালাভের জন্য কিছুকাল তাঁর সঙ্গে বাস করেছিলেন। একবার সত্যকাম দূরে কোথাও গিয়েছিলেন এবং শিষ্যটির খুবই মন খারাপ হয়েছিল। তখন গুরুপত্নী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন সে কিছু খাচ্ছে না।

বালকটি বলল, 'আমার মন এত খারাপ যে কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।'

তখন তার হোমের আগুন থেকে এক বাণী ভেসে এল,—'প্রাণ ব্রহ্ম, আকাশ ব্রহ্ম, সুখ ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে জান!'

বালকটি বলল, 'প্রভু, প্রাণ যে ব্রহ্ম তা আমি জানি, কিন্তু তিনি যে আকাশ ও সুখ তা জানি না।'

তখন তাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে আকাশ ও সুখ প্রকৃতপক্ষে একই বস্তুকে বোঝায়, অর্থাৎ অন্তরের বিশুদ্ধ বুদ্ধি। তাকে বোঝান হলো ব্রহ্ম প্রাণ ও আকাশ রূপে হৃদয়ে আছে।

তারপর অগ্নি বললেন,—'এই পৃথিবী, অন্ন, অগ্নি, সূর্য—তুমি যাঁদের উপাসনা কর, তাঁরা সকলেই ব্রহ্মের রূপ। রৌদ্রালোকে যে ব্যক্তিকে দেখছ, সেই তিনি। তিনি সকলের মধ্যে আছেন। যে এটি জানে এবং এইরূপে তাঁর উপাসনা করে, তার সকল পাপ নষ্ট হয়ে যায়, সে দীর্ঘায়ু ও সুখী হয়। যিনি দিক্-সকলে বাস করেন, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি ও অপ্, আমিই তিনি। যিনি এই প্রাণে, এই আকাশে, স্বর্গসমূহে ও বিদ্যুতে বাস করেন, আমিই তিনি।'

এখানেও আমরা ব্যবহারিক ধর্ম সম্বন্ধে একই ধরনের কথা পাচ্ছি। যে বস্তুগুলির তাঁরা উপাসনা করতেন, যেমন অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি যে বস্তুগুলির সঙ্গে তাঁরা পরিচিত ছিলেন, সেগুলিকেই গল্পের বিষয়বস্তু করে এক উচ্চতর অর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হলো। এটাই হলো বেদান্তের বাস্তব দিক, ব্যবহারিক দিক। বেদান্ত জগৎকে উড়িয়ে দেয় না, তার ব্যাখ্যা দেয়; বেদান্ত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে না, ব্যাখ্যা করে; আমিত্বকে বিনাশ করে না, প্রকৃত আমিত্ব কী তা বুঝিয়ে দিয়ে উপদেশ দান করে। বেদান্ত বলে না যে জগৎ বৃথা বা অস্তিত্ববিহীন, বরং বলে, 'জগৎ কী তা বোঝ, যাতে সেটি তোমার অনিষ্ট না করে।'

সেই বাণী উপকোশলকে এ কথা বলেনি যে অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ বা অন্য যা কিছু সে উপাসনা করছে, তা একেবারে ভুল; বরং বলেছিল, যে চৈতন্য সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি ও পৃথিবীর ভেতর আছে, তা তার ভেতরও আছে, অতএব উপকোশলের চোখে সবকিছুই আর এক রূপ ধারণ করল। যে অগ্নি আগে শুধু হোম করার জড় অগ্নি ছিল, তা এক নতুন রূপ ধারণ করল এবং ঈশ্বরস্বরূপ হলো। পৃথিবী আর এক রূপ ধারণ করল, প্রাণ আর এক রূপ ধারণ করল, সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র বিদ্যুৎ—সমস্তই আর এক রূপ ধারণ করল এবং ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়ে গেল। তখন তাদের প্রকৃত স্বরূপ জানা গেল। বেদান্তের উদ্দেশ্য সকল বস্তুতে ঈশ্বর দর্শন করা, বস্তুগুলি যেভাবে আপাত প্রতীয়মান হচ্ছে, সেভাবে তাদের না দেখে প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া।

উপনিষদ্ আর একটি বিষয়ে শিক্ষা দেয়:—'যিনি চক্ষের মধ্যে দীপ্তিরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন, তিনি ব্রহ্ম। তিনি সুন্দর ও জ্যোতির্ময়। তিনি সমগ্র জগতে ভাস্বর।' এক ভাষ্যকার বলেন, পবিত্রাত্মা পুরুষদের চোখে যে এক বিশেষ জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাই এখানে চাক্ষুষ জ্যোতির অর্থ এবং তাকেই সেই সর্বব্যাপী আত্মার জ্যোতি বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। সেই একই জ্যোতি সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারায় প্রকাশ পাচ্ছে।

এবার তোমাদের কাছে জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে সেই প্রাচীন উপনিষদগুলির মতবাদের কথা বলব। হয়তো তা তোমাদের ভাল লাগবে।

শ্বেতকেতু পাঞ্চালরাজের নিকট গমন করল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি জান মৃত্যু হলে মানুষ কোথায় যায়? তুমি কি জান তারা কী করে আবার ফিরে আসে? তুমি কি জান পরলোক পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে না কেন?'

বালকটি উত্তর দিল সে এসব জানে না। তারপর সে তার পিতার কাছে গিয়ে তাঁকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করল। পিতা বললেন, 'আমিও জানি না।'

তখন তিনি রাজার কাছে গেলেন। রাজা বললেন যে এই জ্ঞান পুরোহিতদের অজানা, শুধু রাজারাই জানেন এবং সেই জন্যই রাজারা পৃথিবী শাসন করেন। রাজা আরও বললেন যে তাঁকে এই জ্ঞান দান করবেন, সেইজন্য তিনি কিছুকাল রাজার কাছে অবস্থান করলেন।

তিনি বলেন, 'হে গৌতম, পরলোক অগ্নিস্বরূপ, সূর্য তার ইন্ধন, রশ্মিগুলি ধূম, দিবস শিখা, তারকারা স্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবতারা বিশ্বাস আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হতে সোম উৎপন্ন হয়।' তিনি আরও বলেন, 'তোমার এই ক্ষুদ্র অগ্নিতে হোম করার কোন প্রয়োজন নেই। সমগ্র জগৎ সেই অগ্নি, এই হোম এই পূজা সর্বদাই চলছে। দেবতা মানব সকলেই এর উপাসনা করছেন। মানুষ, তার দেহই হচ্ছে অগ্নির সবচেয়ে বড় প্রতীক।'

এখানেও আমরা দেখছি আদর্শকে কার্যে পরিণত করা হচ্ছে এবং সর্ববস্তুতে ব্রহ্ম-দর্শন হচ্ছে। এই সব গল্পের অন্তর্নিহিত নীতি হচ্ছে যে মানুষের সৃষ্ট প্রতীক হিতকর ও সাহায্যকর হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে ভাল প্রতীক আগে থেকেই রয়েছে, সেই প্রতীকের সমকক্ষ আমরা কোন দিনই সৃষ্টি করতে পারব না। তুমি ঈশ্বরের উপাসনার জন্য এক প্রতিমা নির্মাণ করতে পার, কিন্তু তার চেয়ে ভাল প্রতিমা তো আগের থেকেই রয়েছে—জীবন্ত মানব। ঈশ্বর-উপাসনার জন্য তুমি মন্দির নির্মাণ করতে পার, খুব ভাল কথা, কিন্তু তার চেয়ে উচ্চতর মহত্তর মন্দির পূর্ব হতেই রয়েছে—মানবদেহ।

তোমাদের মনে আছে যে বেদ দু ভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কালক্রমে অনুষ্ঠানাদি কর্ম এত বৃদ্ধি পেয়েছিল ও জটিল হয়েছিল যে তার থেকে মুক্ত হওয়ার আশা লোপ পাচ্ছিল, তাই উপনিষদ অনুষ্ঠানাদি একেবারে প্রায় পরিত্যাগ করেছে, ওগুলির অর্থ ধীরভাবে ব্যাখ্যা করেছে। আমরা দেখি অতি প্রাচীনকালে এইসব যাগযজ্ঞ প্রচলিত ছিল, তারপর জ্ঞানীদের আবির্ভাব হলো, তাঁরা অজ্ঞদের কাছ থেকে এইসব প্রতীক ছিনিয়ে নেওয়ার বদলে, আধুনিক সংস্কারকদের মতো নেতিবাচক ভূমিকা নেওয়ার বদলে এইগুলির উচ্চতর তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন।

তাঁরা বললেন, অগ্নিতে হোম কর, ভাল কথা! কিন্তু এই অগ্নি হচ্ছে তাঁর প্রতীক। এই পৃথিবীও তাঁর প্রতীক। কি সুন্দর, কি মহান প্রতীক। ছোট মন্দির করেছ, বেশ কথা, কিন্তু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই যে তাঁর মন্দির, মানুষ যেখানে ইচ্ছা উপাসনা করতে পারে। তোমরা বিশিষ্ট মূর্তি গড়ছ, মাটির উপর বেদী নির্মাণ করছ, কিন্তু সবচেয়ে

বড় বেদী হচ্ছে মানবদেহ, জীবন্ত চেতন মানবদেহ এবং এই মানবদেহরূপ বেদীতে পূজা অন্যান্য অচেতন প্রতীকের পূজার চেয়ে অনেক বড়।

এবার আমরা এক অদ্ভুত তত্ত্বে আসছি। আমি এটির বেশির ভাগই বুঝি না। যদি তোমরা এর কিছু বুঝতে পার, তাই তোমাদের কাছে উপনিষদের এই অংশটি পড়ে শোনাচ্ছি। যে ব্যক্তি ধ্যানবলে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে জ্ঞানলাভ করেছে, তার যখন মৃত্যু হয়, সে প্রথমে আলোকের কাছে যায়, তারপর আলোকের কাছ থেকে দিনের কাছে, দিন থেকে শুক্লপক্ষে, সেখান থেকে উত্তরায়ণের ছয় মাসের কাছে, মাস থেকে বৎসরে, বৎসর থেকে সূর্যলোকে, সূর্যলোক থেকে চন্দ্রলোকে. চন্দ্রলোক থেকে বিদ্যুৎ-লোকে, সেখানে এক অমানব সত্তার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয় এবং সেই সত্তা তাকে ব্রহ্মের (সগুণ) কাছে নিয়ে যান। এই হচ্ছে 'দেবযান'। যখন ঋষি ও জ্ঞানীদের মৃত্যু হয়, তাঁরা এই পথ দিয়ে গমন করেন এবং প্রত্যাবর্তন করেন না। এই মাস বৎসর প্রভৃতি শব্দের অর্থ কী, কেউ পরিষ্কার বোঝেন না। সকলেই নিজের ইচ্ছানুযায়ী ব্যাখ্যা করেন, আবার অনেকে বলেন এ সবই বাজে কথা। চন্দ্রলোক সূর্যলোক প্রভৃতিতে যাওয়ার অর্থ কী? আর এই যে অমানব সত্তা এসে বিদ্যুৎ-লোক থেকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান তার অর্থও কেউ জানে না। হিন্দুদের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে চন্দ্রলোকে জীবনের অস্তিত্ব আছে। সেখান থেকে জীবন কীভাবে পৃথিবীতে এসেছে এবার তা আমরা দেখব। যারা জ্ঞানলাভ করেনি, কিন্তু এই জীবনে শুভকর্ম করেছে, মৃত্যুর পরে তারা প্রথমে ধূম্রপথে গমন করে, পরে রাত্রি, তারপরে কৃষ্ণপক্ষ, তারপর দক্ষিণায়নের ছয় মাস, তারপর পিতৃলোকে, তারপর আকাশে, তারপর চন্দ্রলোকে, সেখানে দেবতাদের :খাদ্যে পরিণত হয় এবং পরে দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করে এবং যতকাল না পুণ্যক্ষয় হয় দেবলোকে বাস করে। পুণ্যকর্মের ফল শেষ হলে একই পথে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে। তারা প্রথমে আকাশে পরিণত হয়, তারপরে বায়ুতে, তারপরে ধূম, তারপরে কুয়াশা, তারপরে মেঘ, তারপরে বৃষ্টিকণারূপে পৃথিবীতে পতিত হয়; তারপরে শস্যকণারূপে মানুষদের দ্বারা ভুক্ত হয় এবং অবশেষে তাদের সন্তানাদিতে পরিণত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। যারা সৎকর্ম করেছিল, তারা সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে এবং যারা অসৎকর্ম করেছিল, তাদের নীচ জন্ম হয়, এমনকি পশুজন্মও। পশুরা পৃথিবী থেকে সমানে যাওয়া-আসা করছে। এইজন্য পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হয় ন', আবার একেবারে শূন্য হয় না।

এর থেকে আমরা কতকগুলি তত্ত্ব পেতে পারি, পরে হয়তো যার অর্থ ভালভাবে বুঝতে পারব এবং সেই অর্থের ভিত্তিতে আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারব। শেষ অংশটুকু, যেখানে বলা হয়েছে স্বর্গে গমনকারীরা কীভাবে আবার ফিরে আসে, সেটি প্রথম অংশের চেয়ে যেন স্পষ্ট মনে হয়। কিন্তু সমস্ত ধারণাটিই মনে হয় এই যে ঈশ্বর-উপলব্ধি ছাড়া অনন্ত স্বর্গবাস হয় না। এমন অনেকে আছেন যাঁরা ঈশ্বর উপলব্ধি করেননি, কিন্তু ইহলোকে কিছু সৎকর্ম করেছেন, যেগুলি ফল কামনা করেই করা হয়েছে, সেই ব্যক্তিদের মৃত্যু হলে তাঁরা এখান-ওখান নানাস্থানের মধ্যে দিয়ে শেষে স্বর্গে পৌঁছান এবং আমরা যেমন এখানে জন্মে থাকি, তাঁরাও ঠিক তেমনি

দেবতাদের সন্তানরূপে জন্মে থাকেন। যতদিন তাঁদের সৎকর্মের ফল শেষ না হয় ততদিন তাঁরা স্বর্গে বাস করেন। এর থেকে বেদান্তের একটি মূলতত্ত্ব পাওয়া যায় যে, যার নাম ও রূপ আছে সে নশ্বর। এই পৃথিবী নশ্বর, কারণ এর নাম-রূপ আছে; স্বর্গও নশ্বর, কারণ তারও নাম-রূপ আছে। অনন্ত স্বর্গ স্ববিরোধী বাক্য, কারণ যে কোন বস্তুর নাম-রূপ আছে, তার উৎপত্তি কালে, কালেই স্থিতি এবং কালেই বিনাশ। বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত স্থির, সুতরাং অনন্ত স্বর্গের ধারণা বাতিল করা হলো।

আমরা দেখেছি বেদের সংহিতাভাগে অনন্ত স্বর্গের কথা আছে, যেমন ধারণা খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত। মুসলমানরা এই ধারণাকে একটু বেশি স্থূল করেছেন। তাঁরা বলেন স্বর্গে বাগান আছে, নিচে দিয়ে নদী বয়ে চলেছে। আরবদেশের মরুতে জল অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়, সেইজন্য মুসলমানরা তাঁদের স্বর্গতে প্রচুর জল আছে এই ধারণা সর্বদা করেন। আমি যেদেশে জন্মেছি সেখানে বছরে ছ মাস বৃষ্টি পড়ে। আমার মনে হয় আমি স্বর্গকে শুষ্ক স্থান বলে কল্পনা করব, ইংরাজরাও তাই করবে। সংহিতার এই স্বর্গ অনন্ত এবং মৃতরা সেখানে সুন্দর দেহ লাভ করে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে চিরকাল সুখে বাস করে। সেখানে তাদের পিতামাতা স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তারা সর্বাংশে প্রায় এখানকার মতোই জীবন যাপন করে, শুধু সেটা আরও অধিক সুখকর। এই জীবনে সুখের যে সব বাধা-বিঘ্ন আছে, সেগুলি সব অদৃশ্য হয়ে যায়, কেবল জীবনের ভাল ও আনন্দদায়ক অংশগুলিই থাকে। কিন্তু মানুষ যতই আরামদায়ক এই অবস্থাকে ভাবুক না কেন, সত্য হচ্ছে এক জিনিস আর আরাম হচ্ছে আর এক জিনিস। অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে সত্য আরামদায়ক হয় না, যতক্ষণ না আমরা চরম সীমায় উপনীত হচ্ছি। মানুষের স্বভাব খুব রক্ষণশীল। মানুষ একবার কিছু করলে, তা ত্যাগ করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। মন নতুন চিন্তা গ্রহণ করতে চায় না, কারণ তাতে আরাম পাওয়া যায় না।

উপনিষদে আমরা দেখি পূর্বপ্রচলিত ধারণার বিশেষ ব্যতিক্রম। বলা হয়েছে যে এই সব স্বর্গ, যেখানে মানুষ মৃত্যুর পরে গিয়ে পূর্বপুরুষদের সঙ্গে বাস করে, সেগুলি কখনও নিত্য হতে পারে না। কারণ যে বস্তুর নাম ও রূপ আছে, তার বিনাশ হবেই। যদি স্বর্গের কোন আকার বা রূপ থাকে, তবে কালে সেই স্বর্গ নিশ্চয় ধ্বংস হবে; তার আয়ু লক্ষ লক্ষ বছর হতে পারে, কিন্তু এমন এক সময় আসবে, যখন তার ধ্বংস হবেই হবে। এই ধারণার থেকে আর একটি ধারণার উদয় হয় যে, স্বর্গবাসী আত্মাকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে এবং স্বর্গ হচ্ছে তাদের সৎকর্মের ফলভোগের স্থান; এই ফলভোগের কাল শেষ হলে তারা আবার পার্থিব জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। এর থেকে একটি কথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, প্রাচীনকালেও মানুষের কার্য-কারণ তত্ত্বের ধারণা ছিল। পরে আমরা দেখব, আমাদের দার্শনিকরা কীভাবে দর্শন এ ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায় এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু এখানে সেটি প্রায় শিশুসুলভ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এই সব গ্রন্থ পাঠ করার সময় তোমরা বোধহয়

লক্ষ্য করেছ যে এগুলি সবই অন্তরের অনুভূতি। যদি তোমরা আমায় জিজ্ঞাসা কর যে এগুলি ব্যবহারিক কিনা, আমার উত্তর হচ্ছে এগুলি প্রথমে ব্যবহারিক, পরে দর্শনে রূপায়িত হয়েছে। তোমরা দেখছ এগুলি প্রথমে অনুভূত হয়েছে, উপলব্ধ হয়েছে, পরে লিখিত হয়েছে। প্রাচীন ঋষিদের কাছে বিশ্বপ্রকৃতি কথা বলত। পশু-পক্ষী তাঁদের সঙ্গে কথা বলত, চন্দ্র-সূর্য কথা বলত। তাঁরা একটু একটু করে সকল বস্তু উপলব্ধি করতে লাগলেন এবং প্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ করলেন। চিন্তা দ্বারা বা বিচারশক্তি দ্বারা বা আধুনিককালের প্রথানুযায়ী অন্যের মগজ থেকে চুরি করে বড় বই লিখে কিংবা আমি যেমন তাঁদেরই লেখা নিয়ে বড় বক্তৃতা দিয়ে থাকি, সেভাবে তাঁরা সত্যকে আবিষ্কার করেননি, ধৈর্য-সহকারে অনুসন্ধান করে তাঁরা সত্যকে খুঁজে বের করেছিলেন। এর মূল সাধনা ছিল অভ্যাস এবং চিরকালই সেইরূপ থাকবে। ধর্ম চিরকালই ব্যবহারিক বিজ্ঞান, শুধু দেবতা-তত্ত্বের ভিত্তি ধর্ম কখনও ছিল না, কখনও হবে না। প্রথমে অভ্যাস, পরে জ্ঞান। আত্মা ফিরে আসে এ ধারণা উপনিষদেই আছে। যারা ফল কামনা করে সৎকর্ম করে, তারা ফল পায়, কিন্তু এই ফল নিত্য নয়। কার্য-কারণের ধারণা খুব সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে, কারণ অনুসারে কার্য হয়ে থাকে। কারণ যেমন, কার্যও তেমন হবে। কারণ যখন সীমিত, কার্যও সীমিত হবে। কারণ যদি চিরন্তন হতো, কার্যও চিরন্তন হতো। কিন্তু সৎকর্ম করা রূপ কারণগুলি অনিত্য, তাই তার ফল কখনও নিত্য হতে পারে না।

এই তত্ত্বের আর একটি দিকে এবার আমরা আসছি। অনন্ত স্বর্গ যেমন হতে পারে না, তেমনি সেই যুক্তিতে অনন্ত নরকও হতে পারে না। মনে কর আমি খুব খারাপ লোক, জীবনের প্রতি মুহূর্তে অসৎকর্ম করি। তবু আমার এখানকার সারা জীবনটা অনন্ত জীবনের তুলনায় কিছু নয়। যদি অনন্ত শাস্তি হয়, তবে তার অর্থ এই হবে যে সসীম কারণের দ্বারা অনন্ত ফলের উৎপত্তি হলো। কিন্তু তা তো হতে পারে না। সারা জীবন সৎকর্ম করলেও অনন্ত স্বর্গলাভ হয় না। সেরকম ধারণা করলে একই ভুল হবে। কিন্তু যাঁরা সত্যকে জেনেছেন, তাঁদের জন্য আর একটি তৃতীয় পথ আছে। এটি মায়ার আচরণ ভেদ করে বের হবার একমাত্র পথ—সত্যকে উপলব্ধি করা। উপনিষদ দেখিয়ে দেয় সত্য উপলব্ধি করা বলতে কী বোঝায়।

এর অর্থ ভাল মন্দ কিছুই স্বীকার করো না, কিন্তু জেনো সকলই আত্মা হতে প্রসূত; আত্মাই সবকিছু। এর অর্থ জগৎকে অস্বীকার করা; তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করা; ঈশ্বরকে স্বর্গ-নরক সর্বত্র দেখা, জীবন ও মৃত্যু সর্ব অবস্থাতেই তাঁকে দেখা। তোমাদের যে অধ্যায়টি পড়ে শুনিয়েছি তাতে এই ধরনের ভাব আছে—এই পৃথিবী ঈশ্বরের প্রতীক, আকাশরূপী তিনি, স্থানরূপী তিনি, সর্ববস্তুই ব্রহ্ম। এটি দেখতে হবে, অনুভব করতে হবে, শুধু আলোচনা বা চিন্তা করলে হবে না। আমরা দেখি এর যুক্তিসঙ্গত পরিণাম হচ্ছে যে যখন জীবাত্মা প্রতি বস্তুতে ব্রহ্ম উপলব্ধি করল, তখন সে স্বর্গ-নরক বা যেখানেই যাক, কিছু আসে যায় না; এই পৃথিবীতে জন্মাক বা স্বর্গে বাস করুক, একই কথা। সেই জীবাত্মার কাছে এগুলির

তখন আর কোন অর্থ হয় না, কারণ তখন সব জায়গাই সমান, সর্বস্থানই ঈশ্বরের মন্দির, সর্বক্ষেত্রই তীর্থক্ষেত্র এবং স্বর্গ-নরক বা অন্যত্র ঈশ্বর-সত্তা ছাড়া কিছু সে দেখে না। ভাল-মন্দ, জীবন-মৃত্যু বলে কিছু নেই, শুধু এক অনন্ত ব্রহ্ম আছেন।

বেদান্ত মতে মানুষ যখন এই উপলব্ধিতে পৌঁছায়, তখন সে মুক্ত হয়ে যায় এবং একমাত্র সেই মানুষই এই জগতে বাস করার উপযুক্ত, অন্যেরা নয়। যে জগতে অন্যায় দেখে, সে কী করে জগতে বাস করতে পারে? তার জীবন তো দুর্দশায় পূর্ণ। যে মানুষ বাধা-বিঘ্ন বিপদ দেখে, তার জীবন তো দুঃখে ভরা। যে মানুষ মৃত্যু দেখে, তার জীবন তো দুঃখময়। যে মানুষ সত্যকে উপলব্ধি করেছে, শুধু সেই জগতে বাস করার উপযুক্ত, শুধু সেই বলতে পারে,—'আমি এই জীবন উপভোগ করছি, এই জীবনে আমি সুখী, আমি সর্ববস্তুতে সত্যকে জেনেছি।'

কথা প্রসঙ্গে বলতে পারি যে, বেদে কোথাও নরকের কথা নেই। পরবর্তী কালের পুরাণে এই প্রসঙ্গ আছে। বেদের মতে চরম শাস্তি হচ্ছে এই পৃথিবীতে আবার ফিরে আসা, এই জগতে আর একটি সুযোগ পাওয়া। প্রথম থেকেই আমরা দেখি এক নৈর্ব্যক্তিক ভাবের ধারণা। পুরস্কার ও শাস্তির ধারণা খুবই জড়ভাবাত্মক এবং এগুলির সংগতি আছে মানবীয় ভাবাপন্ন দেবতাদের ধারণার সঙ্গে যাঁরা আমাদেরই মতো পরস্পরকে ভালবাসে, ঘৃণা করে। একমাত্র এরূপ ঈশ্বর-ধারণার সঙ্গে পুরস্কার ও শাস্তির ধারণা সঙ্গত হতে পারে। সংহিতার ঈশ্বর ওইরকম ছিলেন এবং সেই ধারণার সঙ্গে ভয়ও মিশ্রিত ছিল। কিন্তু যখন আমরা উপনিষদে আসি ভয়ের ভাব লোপ পেয়ে যায় এবং নৈর্ব্যক্তিক ধারণা তাঁর স্থান গ্রহণ করে। এটা স্বাভাবিক যে মানুষের পক্ষে এই নৈর্ব্যক্তিক ভাবটি বুঝতে পারা খুবই শক্ত ব্যাপার, কারণ সব সময় সে ব্যক্তিকে আঁকড়ে থাকে। এমন কি যাঁদের খুব বড় চিন্তাশীল বলে মনে হয়, তাঁরাও এই নির্গুণ ঈশ্বরতত্ত্বের উপর বিরক্ত। কিন্তু মানবদেহধারী ঈশ্বর-চিন্তাটাও আমার কাছে অবাস্তব। কোনটি উচ্চতর ধারণা—জীবন্ত ঈশ্বর না মৃত ঈশ্বর? অদেখা অজানা ঈশ্বর, না জানা ঈশ্বর?

নিরাকার ঈশ্বর হচ্ছেন জীবন্ত ঈশ্বর, একটি তত্ত্বস্বরূপ। সাকার ও নিরাকার ঈশ্বরের মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে এই যে, সাকার ঈশ্বর হচ্ছেন শুধু একটি ব্যক্তি আর নিরাকারের ধারণা হচ্ছে তিনি ঈশ্বর, দেবদূত, মানুষ, পশু এবং আরও কিছু যা আমরা দেখতে পাই না; কারণ নিরাকারের মধ্যে সমস্ত আকারই আছে, জগতের সমুদয় বস্তুর সমষ্টি এবং সীমাহীন আরও অনেক কিছু। 'যেমন একই অগ্নি জগতে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাচ্ছে এবং তাছাড়া সীমাহীন রূপে আছে', তেমনি নিরাকারও।

আমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে উপাসনা করতে চাই। আমি সারা জীবন ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু দেখিনি, তোমরাও তাই দেখেছ। এই চেয়ারখানি দেখতে হলে তুমি প্রথমে ঈশ্বরকে দেখ, তারপর তাঁরই ভেতর দিয়ে চেয়ারটি দেখ। তিনি সর্বত্র বিদ্যমান থেকে বলছেন, 'আমি আছি'। যে মুহূর্তে তুমি অনুভব কর 'আমি আছি', সেই মুহূর্তে তুমি সেই সত্তার অস্তিত্বে সচেতন হও। কোথায় আমরা ঈশ্বরকে খুঁজতে যাব, যদি না তাঁকে আমাদের অন্তরে এবং সমস্ত জীবিত প্রাণীর মধ্যে খুঁজে পাই? 'তুমি

পুরুষ, তুমি স্ত্রী, তুমি বালিকা, তুমি বালক, তুমি বৃদ্ধ, জীর্ণ দণ্ডে ভর দিয়ে বেড়াচ্ছ, তুমি যুবক স্বীয় বলদর্পে ভ্রমণ করছ।' যা কিছু বর্তমান, সবই তুমি—কি অদ্ভুত জীবন্ত ঈশ্বর! জগতে একমাত্র ঈশ্বরই বাস্তব। অনেকের কাছে এটি মনে হবে প্রচলিত ঈশ্বর-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী, যিনি আবরণের আড়ালে কোথাও আছেন এবং যাঁকে কেউ কখনও দেখতে পায় না। পুরোহিতরা আমাদের কেবল এই আশ্বাস দেন যে যদি তাঁদের নির্দেশ মানি, তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলি, তাহলে মৃত্যুর সময় তাঁরা আমাদের একখানি ছাড়পত্র দেবেন, যার দ্বারা আমরা ঈশ্বর দর্শনে সক্ষম হবো! ওই সব স্বর্গের ধারণা পুরোহিতদের অর্থহীন ক্রিয়াকাণ্ডের সরল ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

অবশ্য নিরাকার ঈশ্বর-ধারণা অনেক কিছু ভেঙে ফেলে দেয়, এটি পুরোহিতদের কাছ থেকে সব ব্যবসা কেড়ে নেয়, মন্দির গির্জা ইত্যাদি সব উড়ে যায়। ভারতে এখন দুর্ভিক্ষ চলছে, কিন্তু সেখানে এমন অনেক মন্দির আছে, যাতে রাজভাণ্ডারের মতোই ধনরত্ন আছে। যদি পুরোহিতরা লোককে এই নিরাকার ঈশ্বরের কথা বলে, তাদের ব্যবসা মাটি হয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও পৌরোহিত্যকে বাদ দিয়েই নিঃস্বার্থভাবে আমাদের এটি শিক্ষা দিতে হবে। তুমি ঈশ্বর, আমি ঈশ্বর—তবে কে কার হুকুম মানবে? কে কার উপাসনা করবে? তুমিই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ মন্দির, আমি কোন মন্দির কোন মূর্তি বা শাস্ত্র উপাসনা না করে বরং তোমার উপাসনা করব। লোকে এত পরস্পর-বিরোধী চিন্তা করে কেন? সেগুলি যেন আমাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে পালিয়ে যাওয়া মন্ত্রের মতো। তারা বলে তারা গোঁড়া বাস্তববাদী।' ভাল কথা। কিন্তু তোমাকে উপাসনা করার চেয়ে আর বেশি বাস্তব কী হতে পারে? আমি তোমাকে দেখছি, তোমাকে অনুভব করছি আর জানছি যে তুমি ঈশ্বর। মুসলমানরা বলেন আল্লা ছাড়া ঈশ্বর নেই। বেদান্ত বলে ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু নেই। তোমাদের অনেকে এ কথায় ভয় পেতে পার, কিন্তু ক্রমশ কথাটা বুঝতে পারবে। জীবন্ত ঈশ্বর তোমার মধ্যে রয়েছেন, তা সত্ত্বেও তুমি মন্দির গির্জা নির্মাণ করছ, আর সব কিছু কাল্পনিক বাজে জিনিসে বিশ্বাস করছ? মানবদেহে মানবাত্মাই একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর। অবশ্য জীবজন্তুরাও ঈশ্বরের মন্দির বটে, কিন্তু মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির—মন্দিরের মধ্যে তাজমহল। যদি সেই মন্দিরেই উপাসনা করতে না পারলাম, তবে অন্য কোন মন্দিরে কিছু উপকার হবে না। যে মুহূর্তে প্রতি মানবদেহে অবস্থিত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারব, যে মুহূর্তে প্রতি মানবের সামনে শ্রদ্ধাভরে দাঁড়াতে পারব এবং তার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখব—সেই মুহূর্তে আমি বন্ধন মুক্ত হব, সেই মুহূর্তে যা কিছু আমায় বদ্ধ করছে তা অন্তর্হিত হবে এবং আমি মুক্ত হব।

এটিই সবচেয়ে বেশি কার্যকর উপাসনা। তত্ত্বাদি ও অনুমানের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু একথা বললে অনেকে ভয় পায়। তারা বলে এটা ঠিক নয়। তারা তাদের পিতামহরা যে পুরানো আদর্শের কথা বলে গেছেন, তাই নিয়ে তত্ত্ব গড়ে তোলে। তাঁরা আবার কারও কাছে শুনেছিলেন যে স্বর্গের কোন স্থানে অবস্থিত কেউ তাঁকে বলেছিলেন আমিই ঈশ্বর। সেই সময় থেকে কেবল মতবাদেরই আলোচনা

চলেছে। তাঁদের মতে এটাই কাজের কথা, আর আমাদের মতগুলি অকাজের। বেদান্ত বলে সকলে নিজের পথে চলুক, কিন্তু পথটাই লক্ষ্য নয়। স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনাদি মন্দ নয়, কিন্তু সেটি সত্যে পৌঁছবার সোপানমাত্র, সত্য নয়। ওগুলি ভাল ও সুন্দর এবং কিছু মুগ্ধকর তত্ত্বও ওতে আছে, কিন্তু বেদান্ত প্রতিপদে বলে, "বন্ধু, তুমি যাঁকে অজ্ঞাত বলে উপাসনা করছ, তাঁকেই আমি 'তুমি' বলে উপাসনা করছি। যাঁকে তুমি অজ্ঞাত বলে সারা জগতে খুঁজে বেড়াচ্ছ, তিনি সর্বদা তোমার সঙ্গেই আছেন। তিনি আছেন বলেই তুমি জীবিত এবং তিনি জগতের চিরন্তন সাক্ষী-স্বরূপ। সমগ্র বেদ তাঁর উপাসনা করছে, শুধু তাই নয়, তিনি নিত্য 'আমি'তে সর্বদা বর্তমান, তিনি আছেন বলেই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আছে। তিনি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতি ও প্রাণস্বরূপ। তিনি যদি তোমাতে বর্তমান না থাকতেন, তুমি সূর্যকে দেখতে পেতে না, সমস্তই অন্ধকার জড়রাশি হতো। তিনি দীপ্তিমান, তাই তুমি জগৎ দেখছ।"

এই বিষয়ে সাধারণত একটি প্রশ্ন করা হয়ে থাকে—এর ফলে তো খুব গোলযোগ হতে পারে। আমাদের সকলেই মনে করবে 'আমি ঈশ্বর এবং আমি যা কিছু করি বা ভাবি তাই ভাল, কারণ ঈশ্বর কোন পাপ করতে পারে না।' প্রথমত এই ধরনের অপব্যাখ্যার আশঙ্কা স্বীকার করে নিলেও এটা কি প্রমাণ করা যেতে পারে যে অন্যমতে এই রকম আশঙ্কা নেই? লোকে তাদের থেকে আলাদা এক স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা করছে, যাঁকে তারা খুব ভয় করে। তারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জন্মেছে এবং সারা জীবনই এই ভাবে ভয়ে কেঁপে কাটিয়ে দেয়। এতে কি জগৎকে আগের চেয়ে ভাল করা গেছে? যাঁরা ব্যক্তিভাবাপন্ন সগুণ ঈশ্বরবাদ হৃদয়ঙ্গম করে উপাসনা করছে আর যাঁরা ব্যক্তিভাবশূন্য নির্গুণ ঈশ্বরবাদ হৃদয়ঙ্গম করে উপাসনা করছে, উভয়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায়ে জগতের মহান মানুষদের বেশি আবির্ভাব হয়েছে—বিরাট পুরুষ, বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন? নিশ্চয়ই নিরাকারবাদীদের মধ্যে। তুমি কেমন করে আশা কর ভয়ের মধ্যে নীতিবোধের বৃদ্ধি হবে? কখনও তা হতে পারে না। 'যেখানে একজন অপরকে দেখে, যেখানে একজন অপরকে শোনে, সেটিই মায়া। যখন একজন অপরকে দেখে না, যখন একজন অপরকে শোনে না, যেখানে সবই আত্মময়, সেখানে কে কাকে দেখে, কে কাকে শোনে?' তখন সর্বদা সবই তিনি বা সবই আমি। আত্মা পবিত্র হয়েছে। তখন—একমাত্র, তখনই আমরা বুঝতে পারি প্রেম কাকে বলে। ভয় থেকে এই প্রেম আসতে পারে না, এর ভিত্তি মুক্তি। যখন আমরা জগৎকে বাস্তবিক ভালবাসতে শুরু করি, তখনই সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবের অর্থ বুঝতে পারি, তার আগে নয়।

অতএব এটা বলা ঠিক নয় যে নিরাকার ভাব জগতে ভয়ংকর পাপ বৃদ্ধি করবে, যেন অন্য মতটি কখনও পাপের দিকে নিয়ে যায়নি, যেন সেটি সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির বন্যায় জগতে রক্তস্রোত বহায়নি, মানুষে মানুষে কাটাকাটি করায়নি। 'আমার ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ। এস, যুদ্ধ করে তা প্রমাণ করি।' সারা জগতে দ্বৈতবাদের ফল এই হয়েছে। প্রশস্ত উদার দিনের আলোয় এস, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ পথ পরিত্যাগ কর। অনন্ত আত্মা কি সংকীর্ণতার মধ্যে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন? আলোকের জগতে এস! এই বিশ্ব-

জগতের সবকিছুই তোমার, হাত বাড়িয়ে ভালবেসে তাদের জড়িয়ে ধর। যদি কখনও এমন করার ইচ্ছা অনুভব করে থাক, তাহলে তোমার ঈশ্বরানুভূতি হয়েছে।

বুদ্ধদেবের উপদেশের সেই অংশটি তোমাদের মনে আছে, কী ভাবে তিনি দক্ষিণে উত্তরে পূর্বে পশ্চিমে অধঃ উর্ধ্বে—সর্বত্র প্রেমের চিন্তাস্রোত প্রেরণ করতেন, যতক্ষণ না সারা জগৎ সেই মহান অনন্ত প্রেমে পূর্ণ হতো। যখন সেই ভাব তোমার মধ্যে জাগবে, তখনই তোমার প্রকৃত ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়েছে। তখন সমস্ত জগৎ এক ব্যক্তি হয়ে যায়—ক্ষুদ্র বস্তু চলে যায়। অসীমের জন্য ক্ষুদ্রকে ত্যাগ কর, অনন্ত আনন্দের জন্য ক্ষুদ্র সুখ পরিত্যাগ কর। এ সমস্তই তোমার, কারণ নির্গুণের মধ্যেই সগুণ আছে। অতএব ঈশ্বর সগুণ ও নির্গুণ দুই-ই। মানুষ—নির্গুণ অনন্তরূপী মানুষও নিজেকে সগুণ ব্যক্তি-রূপে প্রকাশ করছে। অনন্তস্বরূপ আমরা নিজেদের যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। বেদান্ত বলে অনন্তই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, এটি কখনও ঘুচবে না, চিরকাল থাকবে। কিন্তু আমরা কর্মের দ্বারা নিজেদের সীমাবদ্ধ করে ফেলি, কর্ম আমাদের গলার শেকল হয়ে সীমার মধ্যে আমাদের বেঁধে রেখেছে। শেকল ভেঙে মুক্ত হও! নিয়মকে পদদলিত কর! মানুষের প্রকৃত স্বরূপে কোন বিধি নেই, কোন দৈব নেই, কোন অদৃষ্ট নেই। অসীমের আবার বিধিনিয়মের বন্ধন কি? স্বাধীনতাই তার মূলমন্ত্র। স্বাধীনতাই তার স্বরূপ, জন্মগত অধিকার। মুক্ত হও, তারপরে যত ইচ্ছা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব রাখতে চাও, রেখ! তখন আমরা রঙ্গমঞ্চে অভিনেতাদের মতো অভিনয় করব। যেন একজন ভিখারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। তার সঙ্গে সত্যিকারের রাস্তার এক ভিখারীর তুলনা কর। দৃশ্য হয়তো উভয়ক্ষেত্রেই এক, কথাবার্তাও হয়তো এক, কিন্তু তবু কি পার্থক্য! ভিক্ষুকের অভিনয় করে একজন আনন্দ পাচ্ছে, অন্যজন দুর্দশায় কষ্টভোগ করছে। কেন এই পার্থক্য হয়? কারণ একজন মুক্ত, অন্যজন বদ্ধ। অভিনেতা জানে তার দারিদ্র্য সত্য নয়, শুধু অভিনয়ের জন্য সে এটি অনুমান করছে, কিন্তু প্রকৃত ভিখারী জানে এটি তার অবস্থা এবং ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক তাকে এটি সহ্য করতে হবে। এই হচ্ছে নিয়ম। যতক্ষণ না আমরা আমাদের প্রকৃত স্বভাব জ্ঞাত হচ্ছি, আমরা ভিখারী, প্রকৃতির অন্তর্গত সব শক্তি আমাদের বেঁধে রেখেছে, প্রকৃতির সর্ববস্তু আমাদের দাস করে রেখেছে; আমরা সারা জগতে সাহায্যের জন্য চীৎকার করে বেড়াই, কিন্তু সাহায্য পাই না; কাল্পনিক সত্তার কাছে সাহায্য চাই, তবু সাহায্য পাই না। তবু ভাবি সাহায্য আসবে, এইভাবে কেঁদে-কেটে চেঁচিয়ে আশায় আশায় একটি জীবন কেটে যায় এবং এই খেলাই চলতে থাকে।

মুক্ত হও! কারও কাছে কিছু আশা করো না। আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি, যদি তোমরা তোমাদের অতীত জীবনের দিকে ফিরে তাকাও, দেখবে যে সর্বদাই অন্যের কাছ থেকে সাহায্য পাবার বৃথা চেষ্টা করেছ, কখনও সে সাহায্য পাওনি। যা কিছু সাহায্য পেয়েছ, তা তোমার নিজের ভেতর থেকেই এসেছে। যে কাজ তুমি নিজে করেছ, তারই ফল পেয়েছ, তবু আশ্চর্যের বিষয় যে তুমি সব সময় অন্যের সাহায্যের আশা করেছ। ধনীলোকের বৈঠকখানা সব সময়েই ভরা, কিন্তু যদি লক্ষ্য করে দেখ তবে দেখবে একই লোক সেখানে সারাক্ষণ নেই। প্রার্থীরা সব

সময়েই আশা করছে ধনীর কাছ থেকে তারা কিছু পাবে, কিন্তু পায় না। আমাদের জীবনও তেমনি কেবল আশায় আশায় কেটে যায়। বেদান্ত বলে, আশা ত্যাগ কর। কেন আশা করতে যাবে? সবই তোমার আছে, বরং তুমিই তো সব। কিসের আশা করছ? যদি রাজা পাগল হয়ে নিজের দেশে 'রাজা কোথায়, রাজা কোথায়' বলে খুঁজে বেড়ায়, কখনও রাজার সন্ধান পাবে না, কারণ সে যে নিজেই রাজা। সে তার রাজ্যের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক নগর, প্রত্যেক গৃহ তন্ন তন্ন করে খুঁজতে পারে, কান্নাকাটি করতে পারে, কিন্তু কখনই রাজা খুঁজে পাবে না, সে তো নিজেই রাজা। অতএব ভাল হয় আমরা যদি জানি আমরাই ঈশ্বর এবং বোকার মতো তাঁর সন্ধান করে বেড়ানো ছেড়ে দিই। নিজেকে রাজা বলে জানতে পারলেই আমরা সুখী ও সন্তুষ্ট হব। উন্মাদের মতো অন্বেষণ পরিত্যাগ কর, জগতে তোমার ভূমিকায় অভিনয় করে যাও যেমন অভিনেতারা মঞ্চে করে

সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিই পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এই জগৎ অনন্ত কারাগারস্বরূপ না হয়ে ক্রীড়াঙ্গনে পরিবর্তিত হবে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র না হয়ে এটি নন্দনকানন হয়ে উঠবে, যেখানে ভ্রমরগুঞ্জন মুখরিত চিরবসন্ত। আগে যে জগৎকে নরককুণ্ড বলে মনে হচ্ছিল তা স্বর্গে রূপান্তরিত হবে। বদ্ধব্যক্তির দৃষ্টিতে জগৎ এক মহা যন্ত্রণার জায়গা, কিন্তু মুক্তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অন্যরকম। একই প্রাণ বিশ্ব প্রাণ, স্বর্গাদি এ স্থানেই। সর্ব দেবতা এখানেই মানুষেরই প্রতিরূপ। দেবতারা মানুষকে তাঁদের আদর্শ মতো সৃষ্টি করেননি, মানুষই দেবতাদের সৃষ্টি করেছে। এখানেই ইন্দ্র রয়েছেন, বরুণ রয়েছেন, বিশ্বের সব দেবতারাই আছেন। আমরাই আমাদের ক্ষুদ্র এক অংশকে বাইরে প্রক্ষেপ করছি, এই দেবতাদের মূল হচ্ছি আমরাই, আমরাই প্রকৃত উপাস্য দেবতা। এই বেদান্তের মত এবং এটিই এর ব্যবহারিক দিক। আমরা যখন মুক্ত হব, তখন উন্মত্ত হয়ে সমাজ সংসার ত্যাগ করে বনে বা গুহায় মরতে দৌড়াব না; যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকব, শুধু সমস্ত বিষয়ের রহস্য অবগত হব। পূর্ব বিষয় সবই থাকবে, কিন্তু নতুন অর্থে। আমরা এখনও জগতের স্বরূপ জানি না, দৈব আমাদের প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করে আছে। তাই আমরা দেখব তথাকথিত বিধি বা দৈব বা অদৃষ্ট আমাদের প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র অংশই যেন অধিকার করে থাকে। এটি প্রকৃতির শুধু একদিক, কিন্তু অন্যদিকে সদা মুক্তি। আমরা এটি জানতাম না, আর তাই আমরা পাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাড়া খাওয়া খরগোশের মতো মাটিতে মুখ লুকাই। ভ্রমবশত আমরা আমাদের স্বরূপ ভোলার চেষ্টা করছি, কিন্তু তা পারি না। সেটি সর্বদা আমাদের সম্মুখে আসছে। আমরা যে ঈশ্বর বা দেবতা বা বহির্জগতে স্বাধীনতা লাভের অনুসন্ধান করছি, সে সবই আমাদের স্বরূপের সন্ধান। এই বাণীকে আমরা ভুল বুঝি। আমরা ভাবি এই বাণী অগ্নি সূর্য চন্দ্র তারা বা কোন দেবতার কাছ থেকে আসছে; কিন্তু শেষে বুঝি সেই বাণী আমাদেরই অন্তরের। আমাদের মধ্যেই এই অনন্ত বাণী অনন্ত মুক্তির কথা শোনাচ্ছে; এই সঙ্গীত অনন্তকাল ধরে চলছে। আত্মার সঙ্গীতের কিছু অংশ এই পৃথিবী, এই বিধি, এই জগৎ; কিন্তু এই সঙ্গীতধ্বনি আমাদের নিজেদেরই ছিল এবং থাকবে। এক কথায় বেদান্তের

আদর্শ—মানুষের স্বরূপকে জানা এবং তার বাণী হচ্ছে—যদি তুমি ঈশ্বরের প্রকাশ স্বরূপ তোমার মানুষ-ভাইকে উপাসনা না করতে পার, তবে অপ্রকাশ ঈশ্বরকে কী ভাবে উপাসনা করবে?

বাইবেল কী বলে তোমাদের মনে নেই? 'যদি তুমি তোমার ভাইকে, যাকে তুমি দেখেছ, তাকে ভালবাসতে না পার, তবে যে ঈশ্বরকে দেখনি, তাঁকে কী করে ভালবাসবে?' যদি তুমি মানুষের মুখে ঈশ্বরকে না দেখতে পাও, তবে তাঁকে দেখে বা প্রাণহীন জড়বস্তুতে নির্মিত মূর্তিতে বা মস্তিষ্ক-কল্পিত কাহিনীতে কী করে দেখতে পাবে? যে দিন থেকে তোমরা সকল নরনারীতে ঈশ্বর দেখতে শুরু করবে, সেদিন থেকে আমি তোমাদের ধার্মিক বলব, তখনই তোমরা বুঝতে পারবে কেউ ডান গালে চড় মারলে তার দিকে বাঁ গাল ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ কী? যখন তুমি মানুষকে ঈশ্বররূপে দেখবে, তখন সকল বস্তু—এমন কি বাঘ পর্যন্ত তোমার কাছে এলে তাকে স্বাগত জানাবে। যা কিছু তোমার কাছে আসে, সবই সেই অনন্ত আনন্দময় প্রভু নানারূপে আসছেন—আমাদের পিতা-মাতা সখা সন্তান তিনিই। আমাদের আত্মাই আমাদের সঙ্গে খেলা করছে।

এইভাবে আমাদের মানবিক সম্পর্ককে দিব্যভাবাপন্ন করা যায়, যেমন পারা যায় ঈশ্বরের সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক স্থাপন করা। তাঁকে আমরা পিতা মাতা সখা বা প্রেমাস্পদরূপে দেখতে পারি। ঈশ্বরকে পিতা বলার চেয়ে মাতা বলা ভাবটি উচ্চতর। তার চেয়ে উচ্চতর হচ্ছে সখা বলা, আর উচ্চতম হচ্ছে তাঁকে প্রেমাস্পদ বলে ভাবা। তার কারণ হচ্ছে—প্রেমিক ও প্রেমাস্পদে কোন প্রভেদ থাকে না। তোমাদের হয়তো সেই প্রাচীন পারস্যদেশীয় গল্পটা মনে আছে। এক প্রেমিক এসে তার প্রেমাস্পদের ঘরের দরজায় টোকা দিল। জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কে?' সে বলল, 'আমি।' ভেতর থেকে কোন সাড়া এল না। দ্বিতীয়বার এসে সে বলল, 'আমি এসেছি।' কিন্তু দরজা খুলল না। তৃতীয়বার সে আসতে ভেতর থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কে ওখানে?' সে জবাব দিল, 'প্রিয়, আমি তুমিই।' তখন দরজা খুলল। ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে তেমনি। 'তুমি সকলেতে, তুমিই সব কিছু।' প্রত্যেক নরনারী সেই প্রত্যক্ষ জীবন্ত আনন্দময় ঈশ্বর। কে বলে ঈশ্বর অজ্ঞাত? কে বলে তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হবে? আমরা তাঁকে চিরকালের জন্য পেয়েছি। আমরা তাঁর মধ্যে চিরকাল বাস করছি, তিনি সর্বত্র। তিনি অনন্তকাল ধরে জ্ঞাত, অনন্তকাল উপাসিত।

আর একটি তত্ত্বও বুঝতে হবে,—অন্যান্য প্রকারের উপাসনা ভুল নয়। এই বিষয়টি কোন মতেই ভোলা উচিত নয় যে, যারা নানাপ্রকার অনুষ্ঠানাদি দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করে—সেগুলিকে আমরা যত অপরিণত মনে করি না কেন—তারা ভ্রান্ত নয়। এটি সত্য থেকে সত্যে গমন, নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে আরোহণ। অন্ধকার মানে অল্প আলো, মন্দ মানে অল্প ভাল, অপবিত্রতা মানে অল্প পবিত্রতা। এটা সব সময় মনে রাখতে হবে যে অন্যকে আমাদের প্রেম ও সহানুভূতির চোখে দেখা উচিত, বোঝা উচিত আমরা যে পথ পেরিয়ে এসেছি তারাও সেই একই পথে আসছে। যদি

তুমি মুক্ত হও, তবে নিশ্চয় জানবে অন্য সকলেও বিলম্বে বা শীঘ্র মুক্ত হবে। যদি তুমি মুক্ত, তবে অনিত্যতা তুমি কী করে দেখ? যদি তুমি বাস্তবিক পবিত্র হও, তবে তুমি অপবিত্রতা দেখ কী করে? কারণ যা ভেতরে আছে, তাই বাইরে দেখা যায়। নিজেদের মধ্যে অপবিত্রতা না থাকলে বাইরে অপবিত্রতা দেখতে পেতাম না। বেদান্তের এটি একটি ব্যবহারিক দিক এবং আমি আশা করি আমরা সকলে নিজেদের জীবনে এটি রূপায়িত করব। এটি বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদের সারা জীবন পড়ে আছে। একটি প্রধান বিষয় যা আমরা লাভ করলাম তা হলো শান্তি ও সন্তোষের সঙ্গে আমরা কাজ করে যাব। কারণ আমরা জানলাম সত্য আমাদের মধ্যেই নিহিত, আমাদের জন্মগত অধিকার তার উপর। আমাদের কাজ শুধু সেই সত্যকে প্রকাশ করা, প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করা।

তৃতীয় অংশ

[লণ্ডনে প্রদত্ত ভাষণ, ১৭ই নভেম্বর, ১৮৯৬]

ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা পড়েছি যে, দেবর্ষি নারদ ঋষি সনৎকুমারের কাছে গিয়ে তাঁকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যার মধ্যে একটি হচ্ছে, ধর্ম কি সর্ব বিষয়ের কারণ। সনৎকুমার ধাপে ধাপে তাঁকে আকাশ-তত্ত্ব বিষয়ে নিয়ে যান। তিনি বলেন যে, এই পৃথিবী থেকে উচ্চতর কিছু আছে এবং তার চেয়ে উচ্চতর কিছু আছে এবং এইভাবে আকাশে উপনীত হলেন। 'আকাশ তেজ থেকে মহত্তর, কারণ আকাশে চন্দ্র সূর্য বিদ্যুৎ তারা সব আছে। আকাশেই আমরা জীবন ধারণ করি, আকাশেই মৃত্যু বরণ করি।' এখন প্রশ্ন জাগে, আকাশ হতে মহত্তর কিছু আছে কিনা? সনৎকুমার তাঁকে প্রাণের কথা বলেন। বেদান্ত মতে এই প্রাণ হচ্ছে জীবনের মূল। আকাশের মতো এটি সর্বব্যাপী এবং দেহে বা অন্যত্র যে গতি দেখা যায়, সে সবই এই প্রাণের কাজ। প্রাণ আকাশের চেয়ে মহান এবং তার দ্বারাই সকল বস্তু জীবিত থাকে। প্রাণই মাতা, প্রাণই পিতা, প্রাণই ভগ্নী, প্রাণই আচার্য, প্রাণই জ্ঞাত'।

আমি তোমাদের কাছে উপনিষদের আর এক অংশ পড়ব, যেখানে শ্বেতকেতু তার পিতাকে সত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করছে। পিতা তাকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে শেষে বলেন, 'এই সকল বস্তুর সূক্ষ্ম কারণ যা, তা থেকেই এগুলি নির্মিত। এই-ই সব, এই-ই সত্য; হে শ্বেতকেতু, তুমিও তাই।'

তারপর তিনি এটি বোঝাবার জন্য নানা দৃষ্টান্ত দিতে লাগলেন, 'হে শ্বেতকেতু, যেমন মৌমাছি বিভিন্ন ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে একত্র করে এবং সেই বিভিন্ন মধু জানে না যে তারা বিভিন্ন বৃক্ষ থেকে এসেছে, তেমনি আমরাও সেই একই অস্তিত্ব (সৎ) থেকে জাত হয়ে জানি না যে আমরা কোথা থেকে এসেছি। এখন যেটি হচ্ছে সেই সূক্ষ্ম মূল, তাতেই অস্তিত্বসম্পন্ন সবকিছুই আছে। সেটিই সত্য। সেটিই আত্মা এবং শ্বেতকেতু তুমিও সেই আত্মা।' তিনি সমুদ্রগামী নদীগুলির উদাহরণও দিলেন। 'যেমন নদীগুলি সমুদ্রে পড়ার পর আর জানে না যে তারা বিভিন্ন নদী ছিল, জানে না তারা কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তেমনি আমরাও সেই সৎস্বরূপ থেকে এসেছি বটে, কিন্তু আমরা জানি না যে আমরা তাই-ই। হে শ্বেতকেতু, তুমিও তাই।'

এখন জ্ঞানলাভের দুটি সূত্র আছে। একটি সূত্র হচ্ছে যে আমরা কোন এক বিশেষকে সাধারণে এবং সাধারণকে সার্বিকে নিয়ে গিয়ে জ্ঞান লাভ করি। দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে যে কোন বস্তুর ব্যাখ্যা খুঁজলে, সেই বস্তুর স্বরূপ থেকে যতদূর সম্ভব ব্যাখ্যা করতে হবে। প্রথম সূত্রটি থেকে আমরা দেখি যে আমাদের সমস্ত জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে শ্রেণীবিভাগ, উচ্চ থেকে উচ্চতর শ্রেণীতে গমন। যখন কোন কিছু একবারমাত্র ঘটে আমরা তাতে সন্তুষ্ট হই না। যখন দেখানো যায় যে একই জিনিস বার বার ঘটছে, তখন আমরা সন্তুষ্ট হই এবং সেটিকে 'নিয়ম' বলে অভিহিত করি। যখন আমরা

একটা আপেল পড়তে দেখি, আমরা সন্তুষ্ট হই না; যখন আমরা দেখি সব আপেলই পড়ে, তখন আমরা খুশি হয়ে তাকে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলি। ব্যাপার এই যে, আমরা বিশেষ থেকে সাধারণ তত্ত্বে যাই।

যখন আমরা ধর্মালোচনা করতে চাইব, তখন এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত। এই একই সূত্র এখানেও কাজে লাগে এবং আমরা দেখি প্রকৃত পক্ষে সেই পদ্ধতিই সর্বত্র গ্রহণ করা হয়েছে। যে উপনিষদগুলির অনুবাদ আমি তোমাদের কাছে করছি, তাতেও দেখতে পাই সর্বপ্রথমে এই ভাবেরই উদয় হয়েছে—বিশেষ থেকে সাধারণে গমন। এইরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে ধারণায় আমরা দেখি প্রাচীন চিন্তাবিদ্‌রা উচ্চ থেকে উচ্চতরে উঠেছেন, সূক্ষ্ম বস্তু থেকে সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর পদার্থে গেছেন এবং এই বিশেষগুলি থেকে সর্বব্যাপী আকাশে (ইথার) উপনীত হয়েছেন এবং তার থেকে সর্বব্যাপী শক্তি বা প্রাণে পৌঁছেছেন। এগুলির মধ্যে থেকে আমরা এক তত্ত্ব পাই যে, এক বস্তু অন্য বস্তু থেকে পৃথক নয় এবং বস্তু থেকে শক্তি পৃথক নয়। আকাশই সূক্ষ্মতর রূপে প্রাণ, আবার প্রাণ স্থূলতর রূপে আকাশ; অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, প্রাণশক্তি স্থূল হয়ে আকাশে পরিণত হচ্ছে এবং আকাশ স্থূলতর বস্তু হতে থাকে এবং এই ভাবেই চলে।

সগুণ ঈশ্বর হচ্ছেন এই সামান্যীকরণ সূত্রের একটি উদাহরণ। আমরা দেখেছি কী ভাবে এই সামান্যীকরণে উপনীত হওয়া গেছে এবং বলা হয়েছে সগুণ ঈশ্বর হচ্ছেন সকল জ্ঞানের সমষ্টি। কিন্তু এতে একটি অসুবিধা আছে—এটি এক অসম্পূর্ণ সামান্যীকরণ। আমরা প্রাকৃতিক ঘটনার একটি দিক, জ্ঞানের দিকটি, নিয়েই তার উপর সামান্যীকরণ প্রণালীতে সগুণ ঈশ্বরে উপনীত হলাম। কিন্তু প্রকৃতির অন্য দিকটি বাদ গেল। তাহলে, প্রথমত এই সামান্যীকরণ ত্রুটিপূর্ণ। এতে আর একটি ত্রুটি আছে, যা আমাদের দ্বিতীয় মূলসূত্রের অন্তর্গত। প্রত্যেক বস্তুকে তার নিজস্ব প্রকৃতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা উচিত। অনেক লোক হয়তো ভাবত ভূতে মাটিতে আপেল ফেলে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম হলো তার ব্যাখ্যা। যদিও আমরা জানি এটি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়, তবু অন্য ব্যাখ্যার চেয়ে এটি ভাল, কারণ এটি বস্তুর স্বভাব থেকে লব্ধ আর অন্যটি বহিঃস্থ কারণ থেকে। তাই আমাদের সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডারের মধ্যে হচ্ছে—যে ব্যাখ্যা বস্তুর প্রকৃতি হতে লব্ধ, তা বৈজ্ঞানিক, আর যে ব্যাখ্যা বস্তুর বহির্দেশ থেকে লব্ধ, তা অবৈজ্ঞানিক।

সগুণ ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা—এই তত্ত্বটিকে সূত্রটি দ্বারা পরীক্ষা করা যাক। যদি সেই ঈশ্বর প্রকৃতির বাইরে থাকেন, যদি প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ না থাকে এবং যদি এই প্রকৃতি সেই ঈশ্বরের আদেশ অনুযায়ী শূন্য থেকে উৎপন্ন হয়, তাহলে সেটি হচ্ছে খুব অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। চিরকাল সগুণ ঈশ্বরবাদের এটি এক দুর্বলতা। এই দুটি ত্রুটিই আমরা সাধারণত সগুণ ঈশ্বরবাদে দেখি,—ঈশ্বর মানবগুণসম্পন্ন—শুধু সেই গুণগুলি বহু পরিমাণে বর্ধিত এবং ঈশ্বর শূন্য থেকে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, অথচ তিনি জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। একেশ্বরবাদ এই দুটি দোষযুক্ত।

আমরা দেখলাম, প্রথমত সগুণ ঈশ্বরবাদ যথেষ্ট সামান্যীকরণ নয় এবং দ্বিতীয়ত

এটি প্রকৃতি থেকে প্রকৃতির ব্যাখ্যা নয়। এই মতে কার্য কারণজাত নয়, কারণ কার্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু মানুষের সমস্ত জ্ঞানই প্রমাণ করে যে, কার্য হচ্ছে কারণের রূপান্তর। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি এই ধারণার দিকেই ইঙ্গিত করছে, যে আধুনিকতম তত্ত্ব সর্বজন গ্রাহ্য হয়েছে সেই ক্রমবিকাশবাদের নীতি হচ্ছে কারণের কার্যে রূপান্তর, কারণের আংশিক সংশোধন ও কারণের রূপ পরিগ্রহণ। শূন্য হতে সৃষ্টির তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানীরা হেসে উড়িয়ে দেবেন।

এখন ধর্ম কি এইসব পরীক্ষায় টিঁকে থাকতে পারে? যদি এমন কোন ধর্মমত থাকে যা এই দুটি পরীক্ষায় টিঁকে থাকবে, তাহলে সেটিই আধুনিক চিন্তাশীল মনের গ্রাহ্য হবে। আজকালকার মানুষকে পুরোহিত, গির্জা বা শাস্ত্রের অধিকারের দাবিতে কোন মতবাদে বিশ্বাস করতে বললে সে তা গ্রহণ করবে না, তার ফল হবে—ঘোরতর অবিশ্বাস। এমন কি যাদের বাইরে বিশ্বাসের কিছুটা প্রকাশ দেখা যায়, তাদের অন্তরে কিন্তু প্রচণ্ড অবিশ্বাস। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা ধর্ম থেকে দূরে সরে থাকে, তারা এটিকে শুধু পুরোহিতদেরই ক্রিয়াকর্ম বলে মনে করে।

ধর্ম এখন এক প্রকার জাতীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। প্রাচীন সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্মারকবস্তু, অতএব এটিকে রেখে দাও। আধুনিক লোকের পূর্বপুরুষ এটির জন্য প্রকৃতই যে প্রয়োজন বোধ করতেন, সেটি এখন ঘুচে গেছে; লোকে এখন আর ধর্মকে যুক্তিগ্রাহ্য মনে করে না। এই রকম সগুণ ঈশ্বর ও সৃষ্টির ধারণা, যাকে সব ধর্মে একেশ্বরবাদ বলা হয়, তা আর লোককে ধরে রাখতে পারে না। ভারতবর্ষে বৌদ্ধদের জন্য একেশ্বরবাদ প্রবল হতে পারেনি এবং প্রাচীনকালে এই যুক্তির জোরেই বৌদ্ধেরা জয়লাভ করেছিলেন। তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন যে যদি প্রকৃতিকে অনন্ত-শক্তিসম্পন্না বলে মানা হয় এবং যদি প্রকৃতি নিজের অভাব নিজে মেটাতে পারে, তবে প্রকৃতির অতীত কিছু অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করারও কোন প্রয়োজন নেই।

পদার্থ ও গুণ সম্বন্ধে আলোচনা খুবই পুরানো এবং তোমরা দেখবে সেই পুরানো কুসংস্কার এখনও আছে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই পড়েছ যে মধ্যযুগে—আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি তার অনেক পরেও—এটি এক বিচার্য বিষয় ছিল যে গুণগুলি কি দ্রব্যে সংশ্লিষ্ট, না গুণ ছাড়া দ্রব্যের অস্তিত্ব আছে? দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ কি যাকে আমরা জড়পদার্থ বলি তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, না এই গুণগুলি না থাকলেও পদার্থটির অস্তিত্ব থাকে। এ সম্পর্কে বৌদ্ধেরা বলেন, 'এ রকম পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করার তোমার কোনো যুক্তি নেই; এই গুণগুলিরই শুধু অস্তিত্ব আছে। তার বাইরে তুমি কিছু দেখতে পাও না।' এই হচ্ছে অনেক আধুনিক অজ্ঞেয়বাদীর মত। এই দ্রব্য ও গুণের বিচারকে একটু উচ্চস্তরে নিয়ে গেলে এটি ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্তার বিচারে পরিণত হয়। এই দৃশ্যজগৎ, নিত্য-পরিবর্তনশীল জগৎ আছে এবং এর পেছনে এমন কিছু আছে যার কখনও পরিবর্তন হয় না; কেউ কেউ এই দ্বিবিধ অস্তিত্বকে সত্য বলেন, আবার কেউ আরও ভাল যুক্তির সঙ্গে দাবি করেন যে দু ধরনের অস্তিত্ব মানবার কোন অধিকার তোমার নেই, কারণ আমরা যা দেখি,

অনুভব করি বা চিন্তা করি, তা 'দৃশ্য'মাত্র। দৃশ্যের অতিরিক্ত কোন কিছু মানার দাবি করা চলে না। এর কোন উত্তর নেই। একমাত্র উত্তর আমরা বেদান্তের অদ্বৈতবাদের মধ্যে পাই। এটি সত্য যে কেবল একটিমাত্র বস্তুরই অস্তিত্ব আছে, সেটিই কখনও দৃশ্য, কখনও অদৃশ্য। এটি সত্য নয় যে দুটি সত্তা আছে—একটি পরিবর্তনশীল, অনিত্য; অন্যটি অপরিবর্তনশীল, নিত্য। একটিই সত্তা—যাকে পরিবর্তনশীল বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি অপরিবর্তনশীল। নিত্যকেই অনিত্য বলে বোধ হয়। আমরা দেহ মন আত্মা প্রভৃতি নানা ভেদ জ্ঞান করে থাকি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি সত্তাই বিদ্যমান এবং সেটিই বিভিন্ন রূপে পরিদৃশ্যমান হচ্ছে। অদ্বৈতবাদীদের অতি পরিচিত উপমা অনুসারে বলা যায় রজ্জুতে সর্পভ্রম। কিছু লোক অন্ধকারের জন্য বা অন্য কারণে রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করে, কিন্তু যখন জ্ঞান হয় সর্পভ্রম ঘুচে যায় আর রজ্জুকে রজ্জু বলেই দেখতে পায়। এই উদাহরণ দ্বারা আমরা বুঝি যে মনে যখন সর্পজ্ঞান থাকে, তখন রজ্জু অদৃশ্য; আর যখন রজ্জুজ্ঞান থাকে, তখন সর্প থাকে না। যখন আমরা আমাদের চারধারে শুধু ব্যবহারিক সত্তাকে দেখি, তখন পারমার্থিক সত্তা থাকে না; কিন্তু যখন অপরিবর্তনশীল পারমার্থিক সত্তাকে দেখি তখন স্বভাবতই ব্যবহারিক সত্তা অদৃশ্য হয়ে যায়।

এখন আমরা প্রত্যক্ষবাদী ও আদর্শবাদী উভয়কেই ভালভাবে বুঝতে পারছি। প্রত্যক্ষবাদী কেবল ব্যবহারিক সত্তা দেখেন আর আদর্শবাদী পারমার্থিক সত্তা। প্রকৃত আদর্শবাদী, যিনি সত্যই নিত্য সত্তাকে দর্শন করার শক্তি অর্জন করেছেন, তাঁর কাছে পরিবর্তনশীল জগৎ অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তিনি বলার অধিকারী হন যে এ সমস্তই ভ্রম, অনিত্য কিছু নেই। প্রত্যক্ষবাদী তেমনি অনিত্যকেই দেখেন। তাঁর কাছে নিত্য অদৃশ্য থাকে এবং তাঁর বলার অধিকার আছে এ সমস্তই বাস্তব, প্রকৃত।

এই দর্শন-বিচারে ফল কি হলো? ফল হলো যে সগুণ ঈশ্বরতত্ত্ব যথেষ্ট নয়। আমাদের আরও উচ্চ কিছুতে যেতে হবে,—নির্গুণ তত্ত্বে। এটি একমাত্র যুক্তি-সংগত পদক্ষেপ, যা আমরা গ্রহণ করতে পারি। এর দ্বারা যে সগুণের ধারণা নষ্ট হবে তা নয়। সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই এই কথা আমরা প্রমাণ করছি না, কিন্তু আমরা সগুণের ব্যাখ্যার জন্যই নির্গুণে যাচ্ছি, কারণ নির্গুণ হচ্ছে সগুণের আরও উচ্চতর সামান্যীকরণ। কেবল নির্গুণই অনন্ত হতে পারে, সগুণ সান্ত। আমরা সগুণকে রক্ষা করি, বিনষ্ট করি না। অনেক সময় আমাদের সংশয় জাগে যদি নির্গুণ ঈশ্বরের ধারণায় সগুণ ধারণা নষ্ট হয়ে যায়, নির্গুণ জীবাত্মার ধারণায় যদি সগুণ জীবাত্মার ধারণা ধ্বংস হয়? কিন্তু বেদান্তের মত হচ্ছে ব্যক্তি-সত্তার বিনাশ নয়, তার প্রকৃতপক্ষে সংরক্ষণ। সেই সার্বিক সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া ব্যক্তিসত্তা কোন রকমেই প্রমাণ করা যায় না, ব্যক্তিসত্তা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সেই সার্বিক সত্তাই। যদি আমরা ব্যক্তিকে জগতের সব কিছু থেকে পৃথক ভাবি, তাহলে সেটি ক্ষণকালের জন্যও স্থায়ী হয় না। ওইরূপ বস্তুর অস্তিত্ব কোনকালে ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ পূর্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রের প্রয়োগে—অর্থাৎ সর্ববস্তুর ব্যাখ্যা বস্তুর প্রকৃতি থেকে আসবে—আমরা আরও দুর্বোধ্য ও দুঃসাহসিক তত্ত্বে উপনীত হই। যদি সকল

বস্তুকে তার স্বরূপ থেকে ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ স্তরে এই দাঁড়ায় যে সেই নির্গুণ পুরুষ আমাদের ভেতরেই রয়েছেন, আমরাই তিনি। 'হে শ্বেতকেতু, তত্ত্বমসি,' তুমিই তিনি। তুমিই সেই নির্গুণ সত্তা। যে ঈশ্বরকে তুমি সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে খুঁজে বেড়াচ্ছ, সর্বদাই তুমি সেই। কিন্তু ব্যক্তি অর্থে 'তুমি' নও, নির্গুণ অর্থে। আমরা এই যে মানুষকে জানছি, যাঁকে ব্যক্ত দেখছি, তিনি সগুণ ব্যক্তি; কিন্তু তাঁর প্রকৃত সত্তা নির্গুণ, অব্যক্ত। এই সগুণকে জানতে হলে আমাদের নির্গুণের ভেতর দিয়ে জানতে হবে, বিশেষকে জানতে হলে সাধারণের ভেতর দিয়ে জানতে হবে। সেই নির্গুণ সত্তাই সত্য, তিনিই মানুষের আত্মা।

এ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উঠবে। আমি ক্রমশ সেগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করব। অনেক জটিলতা জাগবে, কিন্তু প্রথমে আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে অদ্বৈত-বাদ কী। ব্যক্ত সত্তা রূপে আমরা যেন পৃথক হয়ে রয়েছি, কিন্তু আমাদের সত্যস্বরূপ একই; যতই আমরা নিজেদের সেই সত্তা থেকে কম পৃথক মনে করব, ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। যতই আমরা ওই সমষ্টি থেকে নিজেদের পৃথক মনে করব, ততই আমাদের দুর্দশা বাড়বে। এই অদ্বৈততত্ত্ব থেকে আমরা নীতির ভিত্তি পাই। আমি স্পর্ধার সঙ্গে বলতে পারি আর কোন মত থেকে আমরা কোনরকম নীতিতত্ত্ব পাই না। আমরা জানি নীতির প্রাচীনতম ধারণা ছিল কোন বিশেষ পুরুষ বা কয়েকজনের ইচ্ছা, কিন্তু এখন আর কেউ তা মানতে রাজি নয়, কারণ তা হবে শুধু আংশিক ব্যাখ্যা। হিন্দুরা বলেন এই কাজটি বা ওই কাজটি করা উচিত নয়, কারণ বেদ তাই বলেছে, কিন্তু খ্রীষ্টানরা বেদের কর্তৃত্ব স্বীকার করবেন না। খ্রীষ্টানরা বলেন তুমি এ কাজ করবে না বা ওই কাজ করবে না, কারণ বাইবেল তাই বলছে। যাঁরা বাইবেল মানেন না, তাঁরা এ কথা শুনবেন না। আমাদের এমন এক তত্ত্ব বের করতে হবে যা সর্বজন-গ্রাহ্য হবে। যেমন লক্ষ লক্ষ লোক সগুণ সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করতে প্রস্তুত, তেমনি এই পৃথিবীতে হাজার হাজার মনীষী আছেন, যাঁরা ওই ধারণা যথেষ্ট বলে মনে করেন না এবং তাঁরা এর চেয়ে উচ্চতর কিছু চান, আর যখনই ধর্ম এই মনীষীদের গ্রহণ করার মতো উদারভাবাপন্ন হয় না, তখনই দেখা যায় সমাজের উজ্জ্বলতম রত্নগুলি সর্বদা ধর্মের বাইরে থেকে যায়। বর্তমানকালে, বিশেষত ইউরোপে এই ব্যাপারটা যত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তেমন আর কোথাও কখনও দেখা যায় নি।

অতএব মনীষীদের ধর্মের ভেতর ধরে রাখতে হলে ধর্মকে অবশ্যই খুব উদার হতে হবে। ধর্ম যা কিছু ঘোষণা করবে তা যুক্তির দ্বারা বিচার্য। কেউ জানে না সব ধর্মই কেন দাবি করে যে তারা যুক্তি মেনে চলতে বাধ্য নয়। যুক্তির মাপকাঠি স্বীকার না করলে প্রকৃত বিচার সম্ভব নয়; এমন কি ধর্মের ক্ষেত্রেও। কোন ধর্ম হয়তো বীভৎস কিছু করতে নির্দেশ দিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর, মুসলমান ধর্ম মুসলমানদের অনুমতি দিল সব বিধর্মীকে হত্যা করতে। কোরানে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, 'বিধর্মীরা মুসলমান না হলে তাদের হত্যা কর।' এখন তুমি যদি কোন মুসলমানকে বল এটি ঠিক নয়, সে স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করবে, 'তুমি কি করে জানছ? তুমি কি করে জানলে এটি ভাল নয়? আমার শাস্ত্রে বলছে এটি ভাল কাজ।' তুমি যদি বল

তোমার শাস্ত্র প্রাচীন, তাহলে বৌদ্ধেরা বলবেন, 'আমাদের শাস্ত্র আরও প্রাচীন।' তারপর হিন্দুরা বলবেন—'আমার শাস্ত্র প্রাচীনতম।' অতএব শাস্ত্রের দোহাই চলবে না। তেমন আদর্শ কোথায় যা দিয়ে সব কিছু তুলনা করতে পার? তোমরা বলবে যীশুর 'পর্বতের শিখরে উপদেশ' দেখ, মুসলমান বলবেন কোরানের নীতি দেখ! এগুলির মধ্যে কোন্‌টি ভাল তার বিচারক কে হবে? বাইবেল ও কোরানে যখন ঝগড়া, তখন তাদের মধ্যে কেউ মধ্যস্থ হয়ে মীমাংসা করতে পারে না। কোন স্বতন্ত্র মীমাংসক চাই এবং তা কোন শাস্ত্রগ্রন্থ হতে পারে না, সর্বজনীন কোন কিছুর প্রয়োজন। যুক্তির চেয়ে সর্বজনীন আর কি আছে? অনেক সময় বলা হয় যে যুক্তি সব সময়ে সত্যানুসন্ধানে সাহায্য করে না। অনেক সময় যুক্তি ভুল করে বলে এই কি সিদ্ধান্ত করা হবে যে পুরোহিত সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বে বিশ্বাস? এমন ধরনের কথা আমায় এক রোমান ক্যাথলিক বলেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর কথা ন্যায়সঙ্গত মনে করিনি। অন্য দিকে আমি বলি যদি যুক্তি দুর্বল হয়, তবে পুরোহিত-সম্প্রদায় আরও দুর্বল, আমি তাঁদের কথা না শুনে যুক্তিই শুনব। কারণ যুক্তির দুর্বলতা সত্ত্বেও তার দ্বারা সত্যে পৌঁছাবার কিছু সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অন্য উপায়ে সেরকম কোন আশাই নেই।

অতএব আমাদের যুক্তি অনুসরণ করা উচিত, আর যারা যুক্তি অনুসরণ না করে কোন বিশ্বাসে উপনীত হয়, তাদের প্রতিও আমাদের সহানুভূতি দেখাতে হবে। কারও কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে দু কোটি দেবতায় বিশ্বাস করার চেয়ে যুক্তিকে অনুসরণ করে নাস্তিক হওয়া ভাল। আমরা চাই উন্নতি, বিকাশ, প্রত্যক্ষানুভূতি। কোন তত্ত্ব মানুষকে বড় করেনি। এক গাদা শাস্ত্রগ্রন্থ আমাদের পবিত্র হতে সাহায্য করে না। একমাত্র শক্তি আছে প্রত্যক্ষানুভূতিতে, সেই শক্তি আমাদের ভেতরেই আছে এবং চিন্তা থেকেই তা উদ্ভূত হয়। মানুষ চিন্তা করুক। মৃত্তিকাখণ্ড কখনও চিন্তা করে না, তাই সে মাটির ঢেলাই থেকে যায়। মানুষের মহত্ত্ব এই যে সে চিন্তাশীল জীব। মানুষের প্রকৃতিই হচ্ছে চিন্তা করা এবং এইজন্যই তার পশুদের সঙ্গে প্রভেদ। আমি যুক্তিকে বিশ্বাস করি এবং যুক্তিকে অনুসরণ করি, লোকের কথায় বিশ্বাস করে কত অনিষ্ট হয়, তা আমি দেখেছি। কারণ আমি যে দেশে জন্মেছি, সেখানে লোকের কথায় বিশ্বাস করা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।

হিন্দুরা বিশ্বাস করে সৃষ্টি বেদ থেকে হয়েছে। কি করে জানলে গরু আছে? কারণ 'গো' শব্দ বেদে আছে। জগতে মানুষ আছে কেমন করে জানলে? কারণ 'মনুষ্য' শব্দ বেদে আছে। সেখানে শব্দটি না থাকলে মানুষ বাইরেও থাকত না। এমনি কথাই তাঁরা বলেন। এ যে বিশ্বাসের চূড়ান্ত! আমি যেভাবে অধ্যয়ন করেছি, সেভাবে এটি অধীত হয়নি, তবু বহু তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ব্যক্তি এটি নিয়ে অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। তাঁরা যুক্তি-বিচার করে সমস্ত দার্শনিক তত্ত্বকে দাঁড় করিয়েছেন। সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণতম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সহস্র সহস্র বৎসর ধরে এই তত্ত্ব রূপায়িত করার কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। লোকের কথায় বিশ্বাসের শক্তি অনেক আর তাতে বিপদও অনেক। এটি মানবজাতির বিকাশের পথ রুদ্ধ

করে দেয় আর আমাদের ভোলা উচিত নয় যে এই বিকাশ আমাদের কাম্য। প্রকৃত সত্যের চেয়ে আপেক্ষিক সত্যের পিছনে আমাদের এই মননশক্তি নিয়োগ বেশি কাম্য। মননই আমাদের জীবন।

অদ্বৈতবাদের একটি গুণ এই যে আমরা যত ধর্মতত্ত্বের ধারণা করতে পারি তার মধ্যে সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ এইটি। অন্য সব কিছু তত্ত্ব, ঈশ্বর সম্বন্ধে যত ধারণা সবই হচ্ছে আংশিক, ক্ষুদ্র এবং ব্যক্তিভাবাপন্ন সগুণ ঈশ্বর যুক্তিগ্রাহ্য নয়। অদ্বৈতবাদের আর একটি বিরাটত্ব হচ্ছে যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে ওইসব আংশিক ধারণাকে বহু লোকের প্রয়োজন মনে করে একবারে উড়িয়ে না দিয়ে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নেয়। অনেক লোক বলে থাকে সগুণবাদ অযৌক্তিক। কিন্তু সেটি শান্তিপ্রদ, অনেকে শান্তি-দায়ক ধর্ম চায় আর আমরা বুঝি তাদের জন্য সেটা প্রয়োজন। সত্যের উজ্জ্বল আলো অনেক কম লোকই সহ্য করতে পারে, সেই অনুসারে জীবন যাপন তো দূরের কথা। তাই এই আরামপ্রদ ধর্মের অস্তিত্বেরও প্রয়োজন আছে, এটি অনেককে উচ্চতর জীবনে সাহায্য করে। যে ক্ষুদ্র মনের পরিধি সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্র সামান্য বস্তু যে মনের উপাদান, সে মন কখনও উচ্চ চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করতে সাহস করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা ও প্রতীক সম্বন্ধে তাদের ধারণা তাদের জন্য ভাল ও উপকারী। কিন্তু তোমাদের নির্গুণবাদ বুঝতে হবে, কারণ একমাত্র এই তত্ত্বের দ্বারাই অন্যগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ সগুণ ঈশ্বরের ধারণাটি নাও। জন স্টুয়ার্ট মিলের কথাই ধর —তিনি ঈশ্বরের নির্গুণভাব বোঝেন ও বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন সগুণ ঈশ্বর অসম্ভব এবং প্রমাণহীন। আমি তাঁর সঙ্গে একমত, তবে আমি বলি যে, মানবীয় বুদ্ধিতে নির্গুণের যত দূর ধারণা করা যেতে পারে, সেটিই সগুণ ঈশ্বর আর সেই পরম সত্তার বিভিন্ন ধারণা ছাড়া জগৎটি আর কি হতে পারে? এটি আমাদের সামনে উন্মুক্ত এক গ্রন্থের মতো, প্রত্যেকেই নিজের বুদ্ধি অনুসারে সেটি পড়ছে এবং প্রত্যেকের নিজে নিজেই পড়তে হবে। সকল মানুষের বুদ্ধি কতকটা এক রকম, সেজন্য কতকগুলি জিনিসকে মানুষের বুদ্ধিতে একই রকম মনে হয়। তুমি আর আমি একটা চেয়ার দেখছি, এতে প্রমাণিত হয় আমাদের দুজনেরই মন অনেকটা এক রকম। ধর অপর কোন ইন্দ্রিয়সম্পন্ন জীব এল, সে এই চেয়ারটি একেবারেই দেখতে পেল না। কিন্তু যারা একইরকমভাবে গঠিত, তারা একইরকম দেখবে। অতএব এই জগৎ হচ্ছে সেই নিত্যপারমার্থিক সত্তা আর ব্যবহারিক সত্তা সেটিকে বিভিন্নভাবে দর্শন করে। এর কারণ প্রথমত হচ্ছে ব্যবহারিক সত্তা সসীম। আমরা যে কোন বিষয় দেখি, অনুভব করি বা চিন্তা করি, সেটি আমাদের জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সসীম। আর সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করি, বস্তুত তাও একটি বিষয়। কার্য-কারণ ভাব কেবল ব্যবহারিক জগতে আছে এবং জগতের কারণরূপী ঈশ্বরকে স্বভাবতই সসীম রূপে ধারণা করতে হবে। তাহলেও তিনি কিন্তু সেই নির্গুণ ব্রহ্ম। আমরা পূর্বেই দেখেছি, এই জগৎ হচ্ছে আমাদের বুদ্ধির মধ্যে দিয়ে দেখা সেই নির্গুণ সত্তা। জগতে যা কিছু বাস্তব তা সেই নির্গুণ সত্তা এবং সব কিছু নাম ও রূপ আমাদের বুদ্ধি দ্বারাই দেওয়া হয়েছে। এই টেবিলের মধ্যে যেটুকু সত্য আছে

তা সেই সত্তা এবং এই টেবিলের আকৃতি—অন্যান্য সব কিছু আকৃতিই—আমাদের বুদ্ধি আরোপিত।

উদাহরণস্বরূপ গতির বিষয় ধর। ব্যবহারিক সত্তার এটি প্রয়োজনীয় সহচর, কিন্তু সার্বভৌম পারমার্থিক সত্তা সম্পর্কে এটি প্রযুক্ত হতে পারে না। প্রতি অণু, জগতের অন্তর্গত প্রতি পরমাণু সর্বদাই পরিবর্তনশীল ও গতিশীল, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে জগৎ অপরিবর্তনীয়; কারণ গতি ও পরিণাম আপেক্ষিক ভাবমাত্র, কোন গতিহীন পদার্থের সঙ্গে তুলনা করেই আমরা শুধু গতিশীল পদার্থের কথা ভাবতে পারি। গতি বুঝতে গেলে দুটি পদার্থের প্রয়োজন। সমগ্র জগৎকে গতিহীন একক বস্তু রূপে ধরতে হবে। কার সঙ্গে তুলনা করলে এটি গতিশীল হবে? এর পরিবর্তন হয় তাও বলা চলে না। কার সঙ্গে তুলনায় এর পরিবর্তন হবে? অতএব সেই সমষ্টিসত্তা নিরপেক্ষ, কিন্তু তার অন্তর্গত প্রতি পরমাণু গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। একই সঙ্গে এটি পরিবর্তনশীল ও অপরিবর্তনশীল, সগুণ ও নির্গুণ দুই-ই। এই হচ্ছে আমাদের গতি, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা এবং 'তত্ত্বমসি'র অর্থও এই। এইভাবে আমরা দেখি যে, নির্গুণ সগুণকে পরিত্যাগ করার বদলে, পরম আপেক্ষিককে বিনষ্ট করার বদলে সঠিক ব্যাখ্যা দ্বারা আমাদের বুদ্ধি ও মনকে সন্তুষ্ট করে। জগতে সগুণ ঈশ্বরাদি যা আছেন, তা সেই নির্গুণ সত্তাই আমাদের মনের মাধ্যমে দৃষ্ট। যখন আমরা মনকে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হব, আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তাকে বিসর্জন দিতে পারব, তখন সেই পরম সত্তার সঙ্গে এক হয়ে যাব। 'তত্ত্বমসি'র অর্থই তাই। আমাদের স্বরূপ সেই পরম সত্তাকে জানতে হবে।

সসীম ব্যক্ত মানব তার উৎসকে ভুলে যায় এবং নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে। সগুণ স্বতন্ত্র ব্যষ্টি আমরা নিজেদের স্বরূপ ভুলে যাই। অদ্বৈতবাদের শিক্ষা এই নয় যে বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান জগৎকে ত্যাগ করতে হবে, সেই শিক্ষা হচ্ছে তাদের স্বরূপ কী তা বোঝা। প্রকৃতপক্ষে আমরা সেই অনন্ত সত্তা এবং আমাদের ব্যক্তিসত্তা হচ্ছে বিভিন্ন শাখা যার মধ্যে দিয়ে সেই অনন্ত সত্তা নিজেকে প্রকাশিত করছেন এবং যে পরিবর্তনের ধারাকে আমরা ক্রমবিকাশ বলি, তা হচ্ছে আত্মার অনন্ত শক্তির উত্তরোত্তর প্রকাশের প্রচেষ্টা। অনন্তের এ পারে আমরা কোথাও স্থির হতে পারি না; আমাদের শক্তি, জ্ঞান, আনন্দ বর্ধিত হয়ে অসীম হয়ে উঠতে পারে। 'অনন্ত সত্তা', অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দ আমাদের রয়েছে। সেগুলি যে আমাদের অর্জন করতে হবে তা নয়, সেগুলি আমাদের নিজস্ব, আমাদের সেগুলি শুধু প্রকাশ করতে হবে।

এই হচ্ছে অদ্বৈতবাদের মূল তত্ত্ব এবং এটি বোঝা বেশ কঠিন। আমি বাল্যকাল থেকেই দেখছি সকলেই দুর্বলতা শিক্ষা দেয়, জন্মকাল থেকেই শুনে আসছি যে আমি দুর্বল। এখন আমার নিজের শক্তিকে উপলব্ধি করা আমার পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে উঠেছে। কিন্তু যুক্তি-বিচারের দ্বারা আমি আমার শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি এবং তা উপলব্ধি করি। এই জগতে যত জ্ঞান আছে তা কোথা থেকে এসেছে? তা আমাদের ভেতরেই ছিল। কোন জ্ঞান বাইরে আছে? কিছু নেই। জ্ঞান কখনও

জড়ে ছিল না, বরাবর মানুষের মধ্যেই ছিল। জ্ঞান কেউ কখনও সৃষ্টি করেনি, মানুষ অন্তর থেকে তা বাইরে প্রকাশ করে। এটি ভেতরেই আছে। যে বিরাট বটগাছ কয়েক কাঠা জায়গা জুড়ে রয়েছে, তা একটি ছোট বীজের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল, যেটি সর্ষের বীজের একের আট ভাগের চেয়ে বেশি নয়। এই মহাশক্তিরাশি ওর মধ্যেই বন্দী ছিল। আমরা জানি 'প্রোটোপ্লাজমিক সেলে'র মধ্যে প্রখর বুদ্ধি কুণ্ডলীকৃত হয়ে আছে, তাহলে অনন্ত শক্তি সেখানে কেমন করে না থাকতে পারে? আমরা জানি তা আছে। এটা হেঁয়ালির মতো মনে হলেও সত্য। আমরা সকলেই এক-একটি 'প্রোটোপ্লাজমিক সেল' থেকে এসেছি এবং আমাদের যা কিছু শক্তি তা সেখানেই সঞ্চিত ছিল। তোমরা বলতে পার না সেগুলি খাদ্য থেকে এসেছে, কারণ খাদ্য পর্বতাকারে স্তূপীকৃত করলেও তার থেকে শক্তি বের হয় কি? শক্তি নিঃসন্দেহে অব্যক্ত ভাবে ছিল এবং এখনও আছে। অতএব মানুষ জানুক বা না জানুক তার আত্মার মধ্যে অনন্ত শক্তি আছে। তার প্রকাশ নির্ভর করছে সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার উপর। ধীরে ধীরে সেই অনন্ত শক্তিশালী দৈত্য জেগে উঠে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে এবং যতই সে সচেতন হয়ে উঠছে, ততই তার একটির পর একটি বন্ধন খসে পড়ছে, শৃঙ্খল ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাচ্ছে এবং এমন দিন নিশ্চয় আসবে, যেদিন সে নিজের অনন্ত শক্তি ও জ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে নিজের পায় সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এস, আমরা সকলে সেই গৌরবান্বিত অবস্থাকে ত্বরান্বিত করার জন্য সাহায্য করি।

চতুর্থ অংশ

[লণ্ডনে প্রদত্ত ভাষণ, ১৮ই নভেম্বর, ১৮৯৬]

এ পর্যন্ত আমরা বেশীর ভাগ আলোচনা করেছি সার্বিক বিষয়বস্তু নিয়ে। আজ সকালে আমি তোমাদের কাছে 'সার্বিক'-এর সঙ্গে 'বিশেষ'-এর সম্পর্ক সম্বন্ধে বৈদান্তিক ধারণাটা বলবার চেষ্টা করবো, আমরা দেখেছি যে আদি যুগের দ্বৈতবাদী বৈদিক চিন্তায় প্রত্যেক সত্তারই একটি বিশিষ্ট এবং সীমিত আত্মা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, প্রত্যেক সত্তারই একটি বিশিষ্ট আত্মা আছে—এ নিয়ে অনেক মতবাদ আছে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রধান আলোচনা হয়েছিল প্রাচীন বৈদান্তিকদের সঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধদের। প্রথমদল বিশ্বাস করতেন প্রত্যেকটি বিশেষ আত্মাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। দ্বিতীয়দল এই ধরনের আত্মার অস্তিত্বই সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতেন। ইউরোপে যে বস্তু এবং তার গুণ নিয়ে আলোচনা হতো—অনেকটা সেই ধরনের। যেমন একদল বলতেন সব গুণের পেছনেই বস্তু আছে, গুণের অবস্থান বস্তুতেই। অন্যদল বস্তুর অস্তিত্বই অস্বীকার করতেন; বস্তুর কোন প্রয়োজন নেই, কারণ বস্তু ব্যতীতই গুণের অবস্থান সম্ভব। অবশ্য আত্মা সম্বন্ধে প্রাচীনতম মতবাদের ভিত্তি হলো 'আত্ম-নিরূপণ' যুক্তির ওপর। অর্থাৎ 'আমি সর্বকালেই আমি'—গতকালের আমি, আজকের আমি, আর আজকের আমিই হবো আগামী দিনের আমি। দেহের সব রকম পরিবর্তন সত্ত্বেও আমি সেই একই আমি। মনে হয়, যারা সীমিত অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশিষ্ট আত্মায় বিশ্বাসী—এটাই হলো তাদের মূল যুক্তি।

অন্যদিকে প্রাচীন বৌদ্ধরা এই অনুমানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতেন। তাঁদের যুক্তি ছিল যে যতটুকু আমরা জানতে পারি এবং জানা সম্ভব সেটা হলো—পরিবর্তন।

কোন অপরিবর্তনীয় এবং অপরিবর্তনশীল বস্তুর অনুমান একেবারেই নিষ্প্রয়োজন, তাছাড়া, এরকম কোন অপরিবর্তনশীল বস্তু থাকলেও তাকে আমরা কোনদিনই বুঝতে পারবো না এবং সে সম্বন্ধে কোন সত্যকারের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভও সম্ভব নয়। আজকের ইউরোপেও এই একই তর্ক দেখতে পাবে—যার একদিকে হলেন আস্তিকরা এবং আদর্শবাদীরা আর অন্যদিকে হলেন আধুনিক প্রত্যক্ষবাদী এবং অজ্ঞেয়বাদীরা। একদল বলছেন এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে যার কোন পরিবর্তন নেই (এঁদের মধ্যে আধুনিকতম হচ্ছেন তোমাদের Herbert Spencer) এবং এই অপরিবর্তনশীল অস্তিত্বে ক্ষণিক দর্পণ মেলাও সম্ভব। অপর পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করছেন আধুনিক কোঁতবাদীরা এবং আধুনিক অজ্ঞেয়বাদীরা। তোমরা যারা কয়েক বছর আগে Herbert Spencer এবং Fredric Harrison-এর বিতর্কে উৎসাহী ছিলে তারা দেখতে পাবে সেই বিতর্কের বিপদটাও এই পর্যায়ের ছিল। একদল, পরিবর্তনশীলতার পেছনে একটি বস্তুর অস্তিত্বের সমর্থক, অন্যদল এই অনুমানের কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। একদল বলছেন যে একথা ভাবাই যায় না যে অপরিবর্তনশীল কিছুর অস্তিত্ব ছাড়া পরিবর্তনশীল কোন কিছু থাকা সম্ভব। অন্যদল

বলছেন এই অনুমান অনর্থক এবং নিষ্প্রয়োজন। যার পরিবর্তন ঘটছে এমন কিছু আমরা ধারণায় আনতে পারি। কিন্তু যার কখনই পরিবর্তন ঘটছে না—এমন কিছুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতে বা বুঝতে পারি না—একেবারেই ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।

ভারতবর্ষেও এই বিরাট সমস্যার কোন সমাধান অতি প্রাচীনকালে হয়নি, কারণ আমরা দেখেছি যে গুণের পেছনে একটি নির্গুণ বস্তুর অস্তিত্ব—এই অনুমানটি কোনদিনই সপ্রমাণিত হতে পারে না। কেবল তাই নয়, স্মৃতি থেকে স্ব-নিরূপণ (Self-identity) যুক্তিও—যেমন, আমিই যে গতকালের আমি তা আমার স্মরণে আছে সুতরাং আমি একটা নিরবচ্ছিন্ন কিছু—প্রমাণযোগ্য নয়। আর একটি বাক্যসর্বস্ব তর্ক আছে যা শুধু বিভ্রান্তকারী—কথার খেলা, যেমন বলা হয়—'আমি করি', 'আমি খাই', 'আমি স্বপ্ন দেখি', 'আমি ঘুরি ফিরি', এই 'করা' 'খাওয়া' 'স্বপ্ন দেখা' ইত্যাদি ঘটনা কেবলই বদলাচ্ছে, কিন্তু যে এসব করছে অর্থাৎ 'আমি'র কোন পরিবর্তন নেই। সুতরাং তাদের সিদ্ধান্ত হলো—'আমি' এমন একটা কিছু যা নিত্য এবং একটি বিশিষ্ট সত্তা; যা কিছু পরিবর্তন তা দেহের। আপাতদৃষ্টিতে এই যুক্তি বেশ স্পষ্ট এবং বিশ্বাস-উদ্রেককারী, কিন্তু কথার খেলাই এর ভিত্তি। কাগজ কলমে 'আমি' এবং 'আমার খাওয়া', 'স্বপ্ন দেখা' ইত্যাদিকে হয়ত আলাদা করে দেখানো যায়, কিন্তু নিজের মনে এই পার্থক্য কেউ করতে পারে না।

আমি যখন আহার করি, আমার আহার-রত অবস্থাটার কথাই আমি মনে করি—আমার 'আহার-লিপ্ততার' সঙ্গে আমার 'একাত্মীকরণ' ঘটে। আমি যখন 'দৌড়াই' 'আমি' এবং আমার 'দৌড়ানো' পৃথক ঘটনা নয়, সুতরাং 'আত্ম-নিরূপণের' যুক্তি এমন জোরদার বলে মনে হয় না, স্মৃতির সাহায্যে 'আত্ম-নিরূপণের' প্রমাণও দুর্বল, আমার স্বরূপত্ব যদি আমার স্মৃতির মাধ্যমেই শুধু প্রমাণিত হয় তাহলে আমার স্মৃতির যখন বিস্মরণ ঘটে আমার স্বরূপত্বেরও তখন হানি হয়। আমরা জানি যে কোন বিশেষ অবস্থায় মানুষ তার পূর্বেকার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়। উন্মাদরা অনেক সময় নিজেদের কাঁচ দিয়ে তৈরী অথবা কোন জন্তু বলে মনে করে, তার অস্তিত্ব যদি স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে তাহলে তো সে ততক্ষণে কাঁচ হয়ে গেছে। তা যখন নয় তখন 'আত্ম-নিরূপণের' মতবাদ স্মৃতিশক্তির মত ক্ষীণ পদার্থের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে না, তাহলে আমরা দেখছি যে সীমিত আত্মাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নিত্য অথচ গুণ থেকে বিচ্ছিন্ন—একথা প্রমাণিত করা সম্ভব নয়। একটি সঙ্কুচিত এবং সীমিত অবস্থানের সঙ্গে কতকগুলি গুণকে সংযুক্ত করা যায় না।

অন্যদিকে প্রাচীন বৌদ্ধদের যুক্তি জোরদার বলে মনে হয়—আমরা গুণাবলীর বাইরে কিছু দেখি না এবং দেখবার ক্ষমতাও আমাদের নেই। তাঁদের মনে আত্মা হলো কতকগুলি গুণের সমষ্টি, গুণ হলো দেহানুভূতি ও অনুভূতি। এদের একত্রীভূত অবস্থাই আত্মা এবং প্রতিনিয়তই তার পরিবর্তন চলেছে।

অদ্বৈতবাদীদের আত্ম-বিষয়ক মতবাদ এই দুটি ভিন্ন চিন্তাধারার একটা সমন্বয় সম্ভব করেছে। অদ্বৈতবাদীদের বক্তব্য হলো বস্তুকে গুণ থেকে পৃথক করে ভাবা

যায় না এ কথা সত্যি। তেমনি নিত্য এবং অনিত্যকে একই সঙ্গে ভাবা যায় না। সত্যিই সেটা অসম্ভব। কিন্তু যা বস্তু তাই গুণ, বস্তু এবং তার গুণ অভিন্ন, যা অপরিবর্তনীয় তাই আবার পরিবর্তনীয় হয়ে দেখা দেয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপরিবর্তনীয় বস্তু তার থেকে পৃথক নয়। সংজ্ঞাগ্রাহ্য (intution) কোন কিছুই ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য কিছু থেকে পৃথক নয়। যা সংজ্ঞাগ্রাহ্য তাই ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তুর রূপ নেয়। অপরিবর্তনশীল আত্মা আছেন। অনুভূতি, প্রত্যক্ষানুভূতি, এমনকি দেহও—অর্থাৎ যা সবই পরিবর্তনশীল—ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখলে এরাও আত্মা। আমরা ভাবতে অভ্যস্ত যে আমাদের দেহ আছে, আত্মা আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বস্তুত যা আছে তা এক।

আমি যখন নিজেকে দেহ হিসাবে কল্পনা করি আমি তখন দেহমাত্র; তখন আমি আর কিছু সে কথা বলবার কোন মানে নেই। যখন আমি আমাকে আত্মা বলে ভাবি তখন দেহ অদৃশ্য হয়ে যায়, দেহের প্রত্যক্ষজ্ঞান লোপ পায়। যতক্ষণ দেহ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞান লুপ্ত না হয় ততক্ষণ আত্ম-সত্তার প্রত্যক্ষজ্ঞান কখনই সম্ভব হয় না। বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞানও সম্ভব হয় না যদি না তাদের গুণবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান অন্তর্হিত হয়।

'রজ্জুতে সর্পভ্রম'—অদ্বৈতবাদীদের এই সুপ্রাচীন উদাহরণটি দিয়ে ব্যাপারটা আর একটু ভাল করে বোঝানো যায়। মানুষ যখন ভুল করে রজ্জুকে সাপ ভাবে, রজ্জু আর সেখানে নেই। আবার যখন তাকে রজ্জুই মনে করে তখন সাপ আর সেখানে নেই, শুধু রজ্জুটাই আছে। অসম্পূর্ণ তথ্যাভিত্তিক যুক্তির ফলেই একাধিক অস্তিত্বের ধারণা জন্মায়। বইতে পড়ে এবং শুনে শুনেও আমাদের এই ভ্রমাত্মক ধারণাটিতেও বিশ্বাস জন্মায় যে দেহ এবং আত্মা সম্বন্ধে আমাদের দুটি ভিন্ন প্রত্যক্ষানুভূতি আছে। এই ধরনের ভিন্ন প্রত্যক্ষানুভূতি কখনই থাকতে পারে না। প্রত্যক্ষানুভূতি একটিই—কখন দেহের কখনও আত্মার। একথা প্রমাণের জন্য যুক্তির অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। তোমরা নিজেরা মন দিয়েই বুঝতে পারবে এ কথার সত্যতা।

নিজেকে দেহহীন আত্মা হিসেবে কল্পনা করবার চেষ্টা করো। দেখবে প্রায় অসম্ভব। যারা পারবে তারা দেখবে সে যখন নিজেকে আত্মা বলে অনুভব করেছ তখন দেহ সম্বন্ধে কোন ধারণাই আর নেই। তোমরা শুনে থাকবে অথবা দেখে থাকবে যে গভীর ধ্যান, আত্ম-সংবেশন (self-hypnotism), মূর্ছা অথবা ওষুধপ্রয়োগ এসবের ফলে মানুষের মনে একটা অন্যরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। এদের অভিজ্ঞতা থেকেও জানা যায় সে বহির্জগত সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ লুপ্ত মনোজগতে কিন্তু তাদের অনুভব শক্তিটা কাজ করছিল। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অবস্থিতি এক। একই বিভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়। এই বিভিন্ন প্রকাশের একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে।

কার্য কারণ সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হবার একটি ধারা আছে—সেটা হলো বিবর্তনের ধারা। বিবর্তনের ফলস্বরূপ এক অন্যতে রূপান্তরিত হয়। কখনও যেন কারণটি অদৃশ্য হয়ে শুধু ফলটিকেই রেখে যায়। আত্মা যদি দেহের কারণ

হয় আত্মা, মনে করা যেতে পারে, কিছু সময়ের জন্য অদৃশ্য হয়, তখন শুধু দেহটাই অবস্থান করে; আবার দেহ অদৃশ্য হলে আত্মার অবস্থিতি। বৌদ্ধেরা দ্বৈতবাদকে অস্বীকার করতে গিয়ে আত্মা এবং দেহের পৃথক অবস্থিতির অনুমানটি অগ্রাহ্য করতেন এবং তাঁদের বক্তব্য ছিল যে বস্তু এবং গুণ একই, কেবল ভিন্নরূপে প্রকাশিত। উপরোক্ত যুক্তি দিয়ে বৌদ্ধদের মতের সঙ্গে একটা মিল সম্ভব।

আমরা দেখেছি যে অপরিবর্তনীয়তার ধারণা শুধুমাত্র পূর্ণের ক্ষেত্রেই প্রমাণ করা সম্ভব। কিন্তু অংশের ক্ষেত্রে কখনই প্রযোজ্য নয়। অংশের ধারণাটাই আসে পরিবর্তন অথবা গতির ধারণা থেকে। যা কিছু সীমিত সেটাই আমাদের বোধগম্য হয়, কারণ তা পরিবর্তনশীল। যা পূর্ণ তা অবশ্যই অপরিবর্তনীয়, কারণ যার সঙ্গে তুলনায় পরিবর্তন প্রতীয়মান হবে এমন আর কিছুই ত নেই। যার পরিবর্তন নেই—থাকলেও সামান্য—তার সঙ্গে তুলনা করেই কেবল পরিবর্তনের ধারণা সম্ভব হয়। সুতরাং অদ্বৈত মতানুসারে, আত্মা সম্বন্ধে সার্বিক, অপরিবর্তনীয় এবং মৃত্যুহীন একটি ধারণা করা সম্ভব। অসুবিধায় পড়তে হয় 'বিশেষ'কে নিয়ে। কিন্তু পুরানো দ্বৈতবাদের সীমিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক-একটি আত্মার যে মতবাদ তাকে নিয়ে কি করা যায়? কারণ আমাদের সকলকেই এর ভিতর দিয়ে যেতে হয় এবং আমাদের স্বভাবও যথেষ্ট।

আমরা দেখেছি যে আমরা যেখানে পূর্ণ সেখানে আমরা মৃত্যুহীন। কিন্তু বিপদ হল যে পূর্ণের অংশ হিসাবেও মৃত্যুঞ্জয়ী হবার প্রবল বাসনা আমাদের, আমরা দেখেছি যে আমরা অসীম এবং সেটাই আমাদের সত্যকারের নিজস্ব সত্তা। কিন্তু আমাদের বাসনা হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মাগুলিরও স্বয়ংসত্তা থাকুক। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মা-গুলির একটা স্বয়ংসত্তা আছে কিন্তু তারা ক্রমবর্ধমান। তারা একই রকম আবার একই রকম নয়। কালকের আমি আজকেরও আমি; আবার তা নয়ও কারণ আজকের আমি কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত। এখন, আমরা যদি সকল পরিবর্তনশীলতার মধ্যেও একটি অপরিবর্তনীয়তার দ্বৈতবাদীয় এই ধারণাটি ছেড়ে আধুনিকতম বিবর্তনের ধারণাটি গ্রহণ করি তাহলে দেখি যে 'আমি' একটি নিয়ত, পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত সত্তা।

মানুষ যদি মল্যাস্কের একটি বিবর্তিত অবস্থা হয় তাহলে একটি মল্যাসক্‌ও একটি মানুষ—যদিও বিরাট ভাবে পরিবর্ধিত হবার পর। মল্যাস্ক্ থেকে মানুষ—অসীমের পথে একটি নিয়ত বিবর্তন। তাহলে সীমিত আত্মাকে বলা চলে একটি বিশেষ সত্তা যে প্রতিনিয়ত বিবর্তিত হচ্ছে অসীম সত্তার পানে। বিশেষ সত্তার পূর্ণতা আসবে যখন সে অসীম সত্তায় গিয়ে মিলিত হবে। কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত সে একটি ক্রমবর্ধমান, পরিবর্তনশীল ব্যক্তিত্ব। বেদান্তের অদ্বৈতবাদী চিন্তার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট হলো উপরোক্ত বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয় সাধন। অদ্বৈতবাদ অনেক ক্ষেত্রে দর্শনচিন্তার প্রভূত উপকার করেছে, কখনও আবার আঘাত হেনেছে। তোমরা যাকে বিবর্তন বলো আমাদের প্রাচীন দার্শনিকরা সে বিষয়ে অবগত ছিলেন, সব কিছুই যে ধীরে ধীরে

এক পা এক পা করে ক্রমবর্ধনের পথে অগ্রসর হয় একথা বুঝতেন বলেই তাঁরা উপরোক্ত ধারণাগুলির সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। সেই জন্যই কোন একটা ধারণাকেও একেবারে বাতিল করেননি। বৌদ্ধদের দোষ হলো যে তাদের এই ক্রমবিবর্তনের বিষয়টা সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না।

সেই কারণেই তারা কোনদিনই আদর্শে পৌঁছবার পূর্ব-প্রদর্শিত পন্থাগুলির সমন্বয় করবার কোন প্রচেষ্টাই করেননি। ব্যবহারের অনুপযুক্ত এবং ক্ষতিজনক বলে সবই বাতিল করে দিয়েছিলেন।

এই ধরনের প্রবণতা ধর্মের জগতে সবচাইতে বেশী ক্ষতিজনক। মানুষ নতুন এবং উন্নত চিন্তার সন্ধান পেলে তখন পেছনে ফেলে আসা ধারণাগুলির দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত করে যে সেগুলো অপ্রয়োজনীয় এবং পরিত্যাজ্য। সে ভুলে যায় যে ঐ অপেক্ষাকৃত অসংস্কৃত ধারণাগুলিই একদিন তার প্রয়োজনে লেগেছে এবং ঐ ধারণাগুলির সাহায্যেই সে তার আজকের উন্নত চিন্তায় পৌঁছেছে। আমাদের সকলেরই এই পথেই এগোতে হয়, প্রথমে অসংস্কৃত চিন্তা-ভাবনার মধ্যেই বাস করতে হয়, তাদের থেকে যতটুকু উপকার পাওয়া যায় সেইটুকু গ্রহণ করে, তারপর উচ্চতর চিন্তায় পৌঁছনো যায়। সেইজন্য পুরনো চিন্তাগুলির প্রতি অদ্বৈতবাদীদের সহৃদয়তা। অদ্বৈতবাদীরা সেইজন্য দ্বৈতবাদী বা চিন্তার জগতে যারা পূর্বসূরী তাদের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায় না। বরং এটাই বিশ্বাস করেন যে ওগুলোতেও একই সত্যের প্রকাশ পেয়েছে এবং অদ্বৈতবাদীদের মত একই সিদ্ধান্তেই পৌঁছবে।

মানুষ যেসব চিন্তাধারার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে—সেসব কিছুই সশ্রদ্ধভাবে সংরক্ষিত হওয়া উচিত। সেই জন্যই দ্বৈতবাদী চিন্তাকে বাতিল না করে বেদান্তে তাকে পূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। বেদান্তে তাই দ্বৈতবাদী ধারণা—বিশিষ্ট আত্মা সীমিত কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ—এর স্থান হয়েছে।

দ্বৈতবাদীদের মত অনুসারে মানুষ মৃত্যুর পর অন্য জগতে প্রবেশ করে। বেদান্তে এই ধারণাগুলিকে অপরিবর্তিত অবস্থাতেই স্থান দেওয়া হয়েছে। কারণ অদ্বৈত-চিন্তায় ক্রমবর্ধমানতাকে মেনে নেওয়ার ফলে এই মতবাদকে তার যথাযোগ্য স্থান দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এগুলো সত্যের আংশিক রূপ।

দ্বৈতবাদী চিন্তা অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কেবল বস্তু এবং শক্তি দ্বারা সৃষ্ট বলেই ভাবা যায়; এবং এই সৃষ্টি কোন ইচ্ছাশক্তির লীলা মাত্র। সেই ইচ্ছাশক্তিকেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে পৃথক বলে ভাবা হয়। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভাবলে মানুষের দ্বৈত সত্তা—আত্মা এবং দেহ। যে আত্মা সীমিত কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ। চিন্তার এই স্তরগুলি বেদান্তে রক্ষিত হয়েছে। সেই কারণে আমাকেও তোমাদের কাছে দ্বৈতবাদের কয়েকটি জনপ্রিয় মতবাদের কথা বলতে হচ্ছে। এই মতবাদ অনুসারে আমাদের অবশ্যই একটি দেহ আছে; কিন্তু এই দেহের অন্তরে, তারা বলে, আর একটি সূক্ষ্মদেহ আছে। এই সূক্ষ্মদেহটিও বস্তু দিয়ে সৃষ্ট, তবে সূক্ষ্মতর বস্তু। এটি আমাদের সকল 'কর্মের'—আমাদের সব কাজের এবং মানসিকতার ধারক বা আধার; এখান থেকে দৃশ্যমান জগতে উঠে আসবার জন্য প্রস্তুত থাকে তারা। যে কথাই আমরা ভাবি, যে

কাজই আমরা করি, কিছুকাল পরে সূক্ষ্মাকার ধারণ করে সেগুলো, বলা যেতে পারে, আকর বীজের রূপ নেয় এবং সূক্ষ্মদেহে ফলপ্রসূ হয়ে বিরাজমান হয় তারপর আবার কিছুকাল পরে আবির্ভূত হয়ে যথারীতি ফলবান হয়। ওই ফলই মানুষের জীবনাবস্থা নির্ধারণ করে। এই ভাবেই মানুষ তার স্ব স্ব জীবনকে নির্ধারণ করে। নিজের সৃষ্ট নিয়ম ব্যতীত মানুষ অন্য কোন নিয়মের কাছে বাধ্য হয় না। ভালই হোক, মন্দই হোক, যে জাল দিয়ে মানুষ নিজেকে জড়ায় সেটা তার চিন্তা, বাক্য এবং কর্মের সুতো দিয়েই বোনা। যে কোন রকম শক্তিকেই একবার যদি বল্গামুক্ত করি, তার পুরো দায়দায়িত্ব-টাই আমাদের, এরই নাম কর্ম ও কর্মফল। সূক্ষ্মদেহের অন্তরে হলো 'জীব' বা মানুষের আপন আত্মা। মানুষের নিজ নিজ আত্মার পরিমাণ বা আকার সম্বন্ধে অনেক ধরনের আলোচনা আছে। কেউ বলেন এই আত্মা পরমাণুর মত ক্ষুদ্র; কেউ আবার অতখানি ক্ষুদ্রতা স্বীকার করেন না; আবার কেউ বা বলে এই আত্মা আকারে বিরাট। 'জীব' সার্বিক বস্তুরই একটি অংশ এবং চিরকাল ধরেই এর অবস্থান—এর আরম্ভও নেই, শেষও নেই। নানা আকারের ভেতর দিয়ে এর অকৃত্রিম পবিত্রতাই প্রকটিত হচ্ছে, সেটা হলো এর সত্য স্বভাব। যে কোন কাজই এই প্রকটিত হওয়ার বাধাস্বরূপ—তাই অসৎ; চিন্তার ক্ষেত্রেও তাই। আর যে কোন কর্ম বা চিন্তা আত্মার সত্য স্বভাবকে প্রকটিত হতে সাহায্য করে সেগুলো সৎ।

একটি মতবাদ ভারতবর্ষে সর্বজন-স্বীকৃত—সব চাইতে অসংস্কৃত দ্বৈতবাদী থেকে সব চাইতে উন্নত অদ্বৈতবাদী পর্যন্ত সবাই মনে করেন যে আত্মার সকল ক্ষমতা বা সম্ভাবনা সবই তার অন্তর থেকেই সৃষ্ট এবং বাইরের কোথাও থেকে আসে না। তারা আত্মার অন্তরে ফলপ্রসূ সম্ভাবনা হয়ে অবস্থান করে এবং জীবনের কাজ হলো এই সম্ভাবনাগুলোকে ফলবান করা। তারা জন্মান্তরবাদেও বিশ্বাসী। স্থূল দেহটির ধ্বংস হলে 'জীব' আর একটি স্থূল দেহ লাভ করবে, সেটা ধ্বংস হলে আবার একটি। এমনি করেই চলতে থাকবে। এই ঘটনা এই পৃথিবীতেও ঘটতে পারে অথবা অন্য জগতে। অবশ্য এই পৃথিবীই অধিক বঞ্চিত কারণ আমাদের জন্য সব জগতের ভেতর এটাই শ্রেষ্ঠ। অন্য সব জগৎগুলি বহুলাংশে দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত বলে কল্পনা করা হয়। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই তারা বলে, উচ্চমানের চিন্তার জন্য সেগুলো প্রশস্ত স্থান নয়। আমাদের জগতে সুখ অল্প, দুঃখ-দুর্দশাই বেশী। সেই কারণেই যেন, 'জীব' কোন না কোন সময়ে জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং আপনার মুক্তির চিন্তা করে। পৃথিবীর ধনী ব্যক্তিদের যেমন উচ্চচিন্তার অবকাশ নাই, সেই রকম স্বর্গে বাস করলে 'জীবের' ও মুক্তির পথে অগ্রসর হবার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ স্বর্গে জীবের অবস্থা ধরণীতে ধনী ব্যক্তির মত বরং অধিকতর সুখের। সেখানে তার সূক্ষ্ম দেহে অবস্থান—রোগ নেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণাও নেই; তার সকল বাসনা পূর্ণ। 'জীব' সেখানে অনাবিল সুখ ভোগের মধ্যে বাস করে, ফলে সে তার সত্যস্বভাবের কথা বিস্মৃত হয়। তবে এমন কিছু উন্নততর জগৎ আছে যেখানে অনাবিল সুখভোগের ব্যবস্থা সত্ত্বেও বিবর্তন সম্ভব হয়। কোন কোন দ্বৈতবাদীর শেষ লক্ষ্য হলো সর্বোচ্চ অবস্থিত স্বর্গ। এই-সব আত্মারা চিরকালের জন্য ঈশ্বরে মিলিত হবে। তখন তাদের দেহ হবে সর্বাঙ্গ-

সুন্দর, রোগ নেই, মৃত্যু নেই সেখানে, মন্দ নেই এবং সমস্ত বাসনা পরিপূর্ণ হয় সেখানে। সেখান থেকে কখনও কখনও অন্য দেহ ধারণ করে কেউ কেউ ধরাধামে নেমে এসে জগৎবাসীকে ঈশ্বর লাভের পন্থা কি সেই শিক্ষা দেন। এরাই হন পৃথিবীর মহান শিক্ষাগুরু। তাঁরা মুক্ত পুরুষ, ভগবানের সান্নিধ্যে সর্বোচ্চ মার্গে বাস। কিন্তু পৃথিবীর আর্ত মানুষের জন্য সুগভীর ভালবাসা এবং সহানুভূতি থাকায় নবজন্ম নিয়ে পৃথিবীতে এসে স্বর্গের পথের সন্ধান দেন।

আমরা অবশ্যই জানি যে অদ্বৈতবাদীদের আদর্শ বা লক্ষ্য এরকম নয়; দেহ-হীনতাই আদর্শ। আদর্শ কখনও সীমিত হতে পারে না। অসীমই আদর্শ এবং দেহের অসীম অবস্থা কখনই হতে পারে না, সেটা অসম্ভব—কারণ সীমিত অবস্থা থেকেই ত দেহের আগমন। আমাদের দেহ এবং চিন্তা উভয়কেই অতিক্রম করতে হবে। এবং আমরা দেখেছি অদ্বৈতবাদ অনুসারে এই মুক্তি আমাদের আছেই, নতুন করে পাবার কিছু নেই। আমরা কেবল বিস্মৃত হই এবং অস্বীকার করি একে। পরোৎকর্ষ খোঁজবার প্রয়োজন নেই, আমাদের অন্তরেই আছে। অমরতা এবং আনন্দ সংগ্রহ করবার প্রয়োজন নেই, আমরা তার অধিকারী; চিরদিনই আমাদের আছে এ সব।

তুমি যদি সাহস করে বলতে পার তুমি মুক্ত, সেই মুহূর্তেই তুমি মুক্ত। তুমি যদি বল তুমি আবদ্ধ, তাহলে তুমি আবদ্ধ। এই হলো অদ্বৈতবাদের ঘোষণা। আমি তোমাদের দ্বৈতবাদের কথাও বলেছি। যেটা খুশী গ্রহণ করতে পারো তোমরা। বেদান্তর সর্বোচ্চ আদর্শকে হৃদয়ঙ্গম করা খুব কঠিন কাজ। তা নিয়ে মানুষ সর্বদাই বাদানুবাদে ব্যস্ত। সব চাইতে বিপদ হলো যখন কোন বিষয়ে তাদের একটা ধারণা প্রত্যয় হয় তখনই অন্য চিন্তাধারাকে অস্বীকার করে তাদের সঙ্গে বিবাদ লাগায়। তোমার পক্ষে যেটা গ্রহণীয় তাকে গ্রহণ করো এবং অন্যদের পক্ষে যা গ্রহণীয় তাদের সেটা গ্রহণ করতে দাও। তোমার যদি বাসনা হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তায় সীমিত মনুষ্য অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে তবে তাই করো, থাকুক তোমার সব বাসনা কামনা—তাই নিয়েই তুমি তৃপ্ত হও, খুশী থাকো। তোমার মানব-অভিজ্ঞতা যদি সুখের হয়—তাই নিয়েই থাকো তুমি যতদিন খুশী। তুমি তা করতে পার কারণ তুমিই তোমার ভাগ্যনিয়ন্তা। তোমার মানব-অবস্থা থেকে কেউ তোমাকে হটাতে পারে না। তুমি যদি স্বর্গের দূত হতে চাও তাই হবে তুমি—তাই হলো নিয়ম। কিন্তু এমন মানুষও থাকতে পারে যারা স্বর্গের দূতও হতে চায় না। সেইসব মানুষের ভাবনাগুলো ভয়ানক—একথা ভাববার কি অধিকার আছে তোমার? তুমি হয়ত একশ টাকা হারালেই ঘাবড়ে যাবে। কিন্তু এমন মানুষও আছে যথাসর্বস্ব হারিয়েও যাদের চোখের পাতা পড়বে না। এরকম মানুষ ছিলেন এবং এখনও আছেন। তোমার মাপকাঠি দিয়ে তাঁদের মাপবার সাহস হবে কেন তোমার? তোমার তুমি থাক না তোমার সব অসম্পূর্ণতা নিয়ে, ছোট ছোট পার্থিব চিন্তাগুলোই হোক না তোমার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সেখানেই তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাঁরা সত্যকে উপলব্ধি করেছেন এবং আর অসম্পূর্ণতার ভেতর থাকতে অসমর্থ,

এসব তাঁদের দেখা হয়ে গেছে এখন এসব পার হয়ে যেতে চান। পৃথিবী আর তার উপভোগের আয়োজন তাঁদের কাছে গোষ্পদের মত। তোমার চিন্তা নিয়ে তুমি তাঁদের আবদ্ধ করে রাখতে চাইবে কেন ? প্রত্যেককে নিজের নিজের স্থান করে নিতে দাও।

আমি একবার একটা গল্প পড়েছিলাম—ঝড়ে South Sea Islands-এ কতকগুলো জাহাজ আটকা পড়েছিল। Illustrated London News-এ তার ছবিও ছাপা হয়েছিল। একটি ইংরেজ-জাহাজ ছাড়া আর সবগুলি জাহাজই ভেঙে পড়েছিল। শুধু ইংরেজ-জাহাজই সেই ঝড়ের মুখে নিজেকে সামলাতে পেরেছিল। ছবিতে দেখিয়েছিল আশু নিমজ্জমান মানুষগুলো, ভাঙা জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে ঝড় ঠেলে যারা চলেছিল, তাদের উৎসাহ দিচ্ছিল। সাহসী হও এবং তাদের মত উদার হও। তুমি যেখানে আজ—অন্যকে সেখানে টেনে নামিও না। আরেকটা বোকার মত ধারণা হলো আমার আপন স্বকীয়তাটুকু না থাকলেই নৈতিকতার অবসান হবে, মানুষের ভবিষ্যতের আশাও থাকবে না। যেন সবাই সদা সর্বদা মানবগোষ্ঠীর জন্য আত্মবিসর্জন দিচ্ছে! ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন! প্রত্যেক দেশে যদি এমন দুশোজন নরনারী থাকতো যারা সত্যিই মানবজাতির উন্নতিতে আগ্রহী তাহলে পাঁচদিনে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতো। আমরা জানি মানবজাতির জন্য আমাদের প্রাণ কত কাঁদে! পৃথিবীর যারা শ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী তাঁরা তাঁদের ছোট ছোট স্বকীয়তাটুকুর কথা কখন চিন্তাও করেননি। যারা নিজেদের কথা যত বেশী ভাবে তারা ততই অপরের কিছু করতে অসমর্থ হয়। একটা হলো নিঃস্বার্থপরতা, অন্যটা হলো স্বার্থপরতা, ছোটখাটো উপভোগকে আঁকড়ে ধরে থাকা এবং সেই অবস্থাটাই চিরকাল ধরেই চলুক এরকম আশা করাই চরম স্বার্থপরতা, সত্যান্বেষণ থেকে এটা আসে না। এর জন্মসূত্র অপরের প্রতি করুণা নয়, মানব হৃদয়ের চরম স্বার্থপরতায়, এই চিন্তায় "আমার ষোল আনা চাই, অন্যের কি হলো তা দিয়ে দরকার নেই আমার।" আমার ত অন্তত সেইরকমই মনে হয়। আরও কিছু নৈতিক চরিত্রে উন্নত মানুষ দেখতে পেলে সুখী হতাম—সেই মুনি-ঋষিদের মত যারা জীব-হিতার্থে একশতবার প্রাণ বিসর্জন দিতে পারতেন। তোমাদের নৈতিকতার কথা আর অপরের ভাল করার কথা এ যুগের মূর্খতা!

এ কালে যদি নৈতিক চরিত্রে শুদ্ধ গৌতম বুদ্ধর মত কেউ থাকতেন। তিনি ব্যক্তিগত বিগ্রহ অবিশ্বাসী অথবা নিজস্ব একটি আত্মা, এ সব প্রশ্ন তোলেননি কখনও। সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী হয়েও যে কোন মানুষের জন্য প্রাণ দান করতে প্রস্তুত ছিলেন এবং সারাজীবন ধরে জীবের মঙ্গলকর্মে ব্রতী ছিলেন এবং অপরের মঙ্গল চিন্তা করতেন। তাঁর জীবনীকারা ঠিকই বলেছেন যে অপরের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যই তাঁর জন্ম বহুর্বমানবজীবনের আশীর্বাদের মতন। নিজের মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে তিনি বনে গিয়ে সাধনায় বসেননি। তিনি অনুভব করেছিলেন যে পৃথিবী যাতনায় জ্বলছে এবং এর থেকে নিষ্কৃতির পথ খুঁজে বের করতে হবে তাঁর সমস্ত জীবনে একটিই শুধু জ্বলন্ত প্রশ্ন ছিল "কেন এত দুঃখ যন্ত্রণা এই পৃথিবীতে ?" তোমরা কি মনে করো বুদ্ধর মত নৈতিক চরিত্র আমাদের কারু আছে ?

মানুষ যে পরিমাণে স্বার্থপর তার নৈতিক অবনতিও সেই পরিমাণে। জাতির ক্ষেত্রেও তাই। যে জাত নিজেকে নিয়ে যত ব্যস্ত, তারাই সব চাইতে নিষ্ঠুর এবং পৃথিবীতে নিকৃষ্টতম। আরবের প্রফেট যে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার চাইতে অধিক এই ধরনের দ্বৈতবাদ আর কোনও ধর্মে নাই এবং দ্বিতীয় আর কোন ধর্ম-বিশ্বাস নাই যারা এত রক্তপাত করেছে, মানুষের ওপর এত নিষ্ঠুরতা করেছে। কোরানে বলছে যে কোরানে অবিশ্বাসীদের হত্যা করাই বিধেয়; বিধর্মীকে হত্যা করাই দয়া, বিধর্মীকে হত্যা করাই বেহস্তে যাবার সব চাইতে নিশ্চিত পন্থা এবং সেই স্বর্গেই অপেক্ষমাণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব সুখ আর রূপসী সব হুরিরা।

খ্রীষ্টের ধর্মে অসংস্কৃত জিনিস অল্পই আছে। বেদান্তের সঙ্গে খ্রীষ্টের বিশুদ্ধ ধর্মে সামান্যই প্রভেদ। এখানে সমতার কথা পাওয়া যায়। যীশু অবশ্য সাধারণ মানুষের কাছে একটা সহজবোধ্য রূপ তুলে ধরবার জন্য দ্বৈতবাদের কথাও বলেছেন। যিনি বলেছেন "আমাদের পিতা যিনি স্বর্গে বাস করেন" তিনিই আবার বলেছেন, "আমি এবং আমার পিতা এক।" তিনি জানতেন "স্বর্গস্থিত পিতা" একদিন পথ দেখাবেন "আমি এবং আমার পিতা এক" এই আদর্শে। খ্রীষ্টের ধর্মে কেবল প্রেম আর শুভাশীর্বাদ। কিন্তু যখন অসংস্কৃত কিছু প্রবেশ করলো এর অবস্থা মহম্মদের ধর্মের চাইতে বেশী একটা উন্নত অবস্থায় রইল না। 'আমি'কে আঁকড়ে থাকার বিড়ম্বনা—বাস্তবিকই একটা অসংস্কৃত ব্যাপার—কেবল এই জীবনেই নয়—মৃত্যুর পরও এই ক্ষুদ্র 'আমি'কে আঁকড়ে থাকার বাসনা। এটাকে তাঁরা নিঃস্বার্থপরতা বলেন এবং এতেই নাকি নৈতিকতার ভিত্তি। এই যদি নৈতিকতার ভিত্তি হয় ঈশ্বর রক্ষা করুন। এঁরা মনে করেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'আমি'গুলি ধ্বংস হলেই নৈতিকতা ধ্বসে পড়বে এবং যদি শোনেন যে 'আমি'ত্বর বিনাশের ওপরই শুধু মাত্র নৈতিকতা দাঁড়াতে পারে তাহলে হতবাক হয়ে যাবেন তাঁরা। এর চাইতে আর একটু বেশী জ্ঞান এঁদের থাকতে পারতো। কে পরোয়া করে স্বর্গ-নরকের অস্তিত্ব নিয়ে, আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে? নিত্য কিছু আছে বা নেই তাতেই বা কি এসে যায়? এই তো পৃথিবী—দুঃখ-যন্ত্রণায় ভরা। বুদ্ধের মতই বেরিয়ে পড়ো, আপ্রাণ চেষ্টা কর দুঃখকে লাঘব করতে, নয়ত সেই প্রচেষ্টাতেই জীবন পাত করো, তুমি বিশ্বাসী হও, অবিশ্বাসী হও, অজ্ঞেয়বাদী অথবা বৈদান্তিক হও, খ্রীষ্টান হও অথবা মুসলমান হও, তোমার প্রথম পাঠ হলো—নিজের কথা ভুলে যাও। একটি শিক্ষা সবার কাছে প্রত্যক্ষ হোক—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'আমিত্ব'কে ধ্বংস করো এবং সত্য-সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করো।

দুটো শক্তি সমান্তরাল রেখায় কাজ করে চলেছে। একটা বলছে 'আমি', অপরটি বলছে 'না-আমি'। তাদের প্রকাশ শুধু মানুষে নয়, পশুতেও; শুধু পশুতে নয় ক্ষুদ্রতম কীটের মধ্যেও এর প্রকাশ। যে বাঘিনী তার খদন্ত মানুষের তপ্ত রক্তে ডুবিয়ে দেয় সেই আবার নিজেদের শাবকদের রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দেয়। সব চাইতে নিকৃষ্ট স্বভাব-দুর্জন মানুষ যে বিনা দ্বিধায় নরহত্যায় প্রবৃত্ত সেও হয়ত তার অভুক্ত স্ত্রী-পুত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে অবলীলাক্রমে প্রাণ বিসর্জন দেবে। এই রকম সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে এই দুটি শক্তির কাজ চলেছে পাশাপাশি। যেখানে একটিকে দেখতে পাবে, অন্যটিও

সেখানে। একটি স্বার্থপরতা, অন্যটি নিঃস্বার্থপরতা। একটা আহরণ, অন্যটি ত্যাগ। একটা নেয়, অন্যটি দেয়। সর্বনিকৃষ্ট থেকে সর্বোৎকৃষ্ট পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই দুটি শক্তিরই খেলা চলেছে নিরন্তর। একে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন নেই। এটা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট।

সমাজে কার এই অধিকার আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কাজ ও বিবর্তনকে এই দুটি শক্তির মধ্যে কেবল একটির ভিত্তিতে দেখা—যেটা হলো পরস্পরবিরোধিতা আর সংগ্রাম। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্মকাণ্ডকে শুধুমাত্র রিপু আর মারামারি, রেষারেষি এবং কলহের ওপর প্রতিষ্ঠা করবার অধিকার কার আছে? এর অস্তিত্ব আমরা মোটেই অস্বীকার করছি না। কিন্তু অন্য শক্তিটির ক্রিয়াকে অস্বীকার করবার অধিকারই বা কার আছে? কেউ কি অস্বীকার করতে পারে যে 'প্রেম', 'না-আমিত্ব' এই বৈরাগ্যই হলো পৃথিবীর সবটাই সুনিশ্চিত শক্তি? অন্য শক্তিটাও প্রেম-শক্তিরই অপপ্রয়োগ। ভালবাসার ক্ষমতা থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিতে পারে। প্রেমই প্রতিদ্বন্দ্বতার আসল উৎস। নিঃস্বার্থপরতাই কিন্তু মন্দের উৎস। যে অন্যায় সাধন করে সে সৎ, এবং তার কর্মের অন্তর্ফলটিও কুফল নয়। এ কেবল প্রেমের শক্তিকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনা। ক্ষুধার্ত পুত্রের প্রতি স্নেহপ্রণোদিত হয়েই হয়ত একজন মানুষ অন্য-একজন মানুষকে হত্যা করে। জগতের সমস্ত মানুষকে বাদ দিয়ে তার প্রেমটি সীমিত হয়ে গেছে তার শিশুপুত্রে। সীমিতই হোক আর অসীমিতই হোক সেই একই প্রেম ত বটেই।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ যে রূপই নিক না কেন তার পেছনের মূল শক্তি হলো নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ ও প্রেম। এই হলো বিশ্বচরাচরের একমাত্র সত্য শক্তি। এই জন্যই বৈদান্তিকরা সমতা বা একত্বর ওপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করেন। আমরা এই ব্যাখ্যাটির ওপর এত গুরুত্ব দেই এই কারণে যে আমরা বিশ্বসৃষ্টির দুটি কারণ মানতে পারি না। এই কথাটা যদি বিশ্বাস করি যে সকল নীচতা আর অন্যায় সেই আশ্চর্য সুন্দর প্রেমশক্তিরই একটা সীমিত প্রকাশ তাহলেই আমরা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যার মূলে একটি শক্তিকেই দেখতে পাবো। সে হলো প্রেমশক্তি। তা নইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যার দুটো শক্তিকে মেনে নিতে হয়—একটা সৎ, অন্যটি অসৎ, একটি প্রেম, অপরটি ঘৃণা। কোন্ ব্যাখ্যাটি বেশী যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। নিশ্চয়ই এক-শক্তিরই মতবাদটি।

এবার অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। যার সঙ্গে দ্বৈতবাদের বিশেষ সম্পর্ক নেই। আমি দ্বৈতবাদীদের সঙ্গে আর বেশীক্ষণ কাটাতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না। আমি দেখাতে চাই যে নিঃস্বার্থপরতা এবং নীতির শ্রেষ্ঠ আদর্শের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েই চলে অধিবিদ্যার উন্নততম ধারণাগুলি। এবং নীতিবিদ্যা ও নৈতিকতাকে বুঝবার জন্য ধারণাগুলিকে নিম্নমানের করবার কোন প্রয়োজন নেই। বরং নীতিবিদ্যা ও নৈতিকতাকে বুঝতে হলে দর্শনের এবং বিজ্ঞানের উন্নততম ধারণাগুলিকেই জানা প্রয়োজন। মানুষের জ্ঞান মানুষের স্বার্থবিরোধী নয়, বরং বিপরীতটাই সত্যি। জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে একমাত্র জ্ঞানই আমাদের রক্ষা করে—জ্ঞানেই আমাদের

উপাসনা। আমরা যতই জ্ঞান আহরণ করতে পারি ততই আমাদের মঙ্গল। বৈদান্তিক বলেন আপাতদৃষ্টিতে যা কিছু মন্দ সে সবই অসীমের সীমিত অবস্থা। প্রেমের যে সীমিত অবস্থা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারায় প্রবাহিত হয়ে মন্দরূপ ধারণ করে তারাই একদিন অপরপ্রান্তে পৌঁছে ঈশ্বররূপেই প্রকটিত হয়। বেদান্ত একথাও বলেন যে আপাতমন্দের সব কারণগুলিও আমাদেরই ভেতরে অবস্থিত। কোন অতিপ্রাকৃত শক্তিকে দোষী করো না, আবার আশা হারিয়ে হতাশও হয়ো না। একথাও ভেবো না যে কেউ এসে হাত বাড়িয়ে সাহায্য না করলে এ অবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি নেই। বেদান্ত বলছে তা হতে পারে না। আমরা রেশম-পোকার মত, আমরা আমাদের অন্তর্বস্তু থেকেই বার করছি সুতো, বুনছি গুটি পোকার জাল এবং কখন এক সময় সেই জালেই আমরা আটকা পড়ি। কিন্তু সেটা চিরকালের জন্য নয়। আমরা আমাদের চারিদিকে কর্মের জাল বুনেছি; এবং আমাদের অজ্ঞতায় আমরা ভাবি আমরা আবদ্ধ। আমরা কাঁদি, সাহায্যের জন্য বিলাপ করি। কিন্তু সাহায্য বাইরে থেকে আসে না; আমাদের আপন অন্তর থেকেই আসে। বিশ্বের সব দেবতার উদ্দেশ্যে কাঁদ। আমিও অনেক বছর ধরে কেঁদেছি এবং শেষকালে আমি দেখলাম আমি সাহায্য পেয়েছি। কিন্তু সে সাহায্য এসেছিল অন্তর থেকে। ভুল করে যত কাজ করেছিলাম—আগাগোড়া তাদের শুধরে নিতে হলো। আমার নিজের চারিদিকে যে জাল বুনেছিলাম—ছিন্ন করতে হলো তাকে। তার শক্তিও পেলাম নিজের অন্তর থেকে। একটা বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত যে ভ্রান্ত পথেই হোক আর অভ্রান্ত পথেই হোক আমার জীবনের কোন উচ্চাশাই বৃথা যায়নি, কিন্তু আমি আমার বিগত ভাল-মন্দ উভয়েরই সম্মিলিত ফল। জীবনে আমি বহু ভুল করেছি। কিন্তু আমি জানি যে ঐ ভুলগুলো না করলে আজ আমি যা কখনই তা হওয়া সম্ভব হতো না; তাই ঐ ভুলগুলো করেছি ভেবেই আমার সন্তোষ। আমি বলছি না যে বাড়ী ফিরে গিয়ে তোমরা সবাই ইচ্ছে করে ভুল করতে শুরু করো; মানে আমার কথাগুলো ভুল বুঝো না যেন। ভুল করেছো ভেবে নিরাশ হয়ো না, কারণ জেনে রেখো যে শেষ পর্যন্ত সবই ঠিক হয়ে যাবে। তার অন্যথা হবে না। কারণ সততা, পবিত্রতাই আমাদের স্বভাব এবং স্বভাব কখনও বিনষ্ট হয় না। প্রকৃত স্বভাব সব সময়ই একই ভাবে অবস্থান করে।

যে কথাটা আজকে আমাদের বুঝতে হবে সেটা হলো এই যে আমরা যাকে ভুল অথবা অন্যায় কাজ বলি সেগুলো আমরা করি আমরা দুর্বল বলে, আর আমাদের দুর্বলতার কারণ আমাদের অজ্ঞানতা। আমি ভুল কথাটাই ব্যবহার করতে পছন্দ করি। পাপ শব্দটির যদিও আদিতে খুবই ভাল ছিল কথাটা, ভেতরে এমন একটা ইঙ্গিত আছে যে ভাবতে ভয় পাই আমি। আমাদের অজ্ঞান অবস্থায় রাখে কে? আমরাই। আমরা হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখে অন্ধকার হলো বলে কাঁদতে বসি। হাতটি সরিয়ে নাও, অমনি ত আলো। আমাদের জন্য আলোর চিরকালের অবস্থান; মানবাত্মা স্বভাবতই আলোকোজ্জ্বল। তোমরা কি শোননি আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা কি বলছেন? বিবর্তনের মূল কারণ কি? বাসনা। পশু হয়ত একটা কিছু

করতে চায় কিন্তু সেই কাজটি সম্পাদনার পক্ষে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাটি সহায় নয়, তাই সে নতুন একটি দেহকে উদ্ভব করে। কে এটা উদ্ভব করলো? পশুটি নিজেই। তার ইচ্ছাশক্তি দিয়ে। তুমিও ক্ষুদ্রতম এমিবা থেকেই বিবর্তিত হয়ে আজ মানুষ হয়েছো। তোমার ইচ্ছা শক্তিকে ব্যবহার করো—আরও উন্নততর স্তরে তুমি পৌঁছবে, ইচ্ছাই সর্বশক্তিমান, তুমি অবশ্য বলতে পারো ইচ্ছাই যদি সর্বশক্তিমান আমি তাহলে সব কিছু করতে পারি না কেন? কিন্তু সেক্ষেত্রে তুমি তোমার ক্ষুদ্র আপন সত্তার কথাই শুধু ভাবছে। পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখো কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এমিবার অবস্থা থেকে আজ তুমি একটি মনুষ্য সত্তায় পরিণত হয়েছো; কে করলো এসব? তোমার অন্তর্নিহিত ইচ্ছাশক্তি। তুমি কি তবে সর্বশক্তিমান বলে স্বীকার না করে পারো? যে শক্তি তোমাকে এই সুউচ্চ স্তরে নিয়ে এসেছে সে তোমাকে আরও উচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে পারে। তোমার যা প্রয়োজন সে হলো চরিত্র—ইচ্ছার সুদৃঢ়করণ।

আমি যদি তোমাদের এই শিক্ষা দেই যে তোমাদের স্বভাবই অসৎ সুতরাং তোমরা বাড়ী ফিরে গিয়ে মোটা কাপড় পরে ছায়ের গাদায় বসে দুষ্কৃত কর্মের অনুশোচনায় কেঁদে সারা হও—তাতে করে তোমাদের কোন সাহায্য ত হবেই না—বরং আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। তাহলে তোমাদের সৎ পথের বদলে অসৎ পথই দেখানো হবে। যদি এই ঘরখানিতে হাজার বছরের অন্ধকার জমে থাকে আর সেই অন্ধকার ঘরে ঢুকে 'হা, অন্ধকার' বলে কাঁদতে থাকো আর বিলাপ করতে থাকো—তাহলেই কি অন্ধকার ঘুচবে? একটা দেশলাই জ্বাললেই আলো ফুটে উঠবে? "ওঃ হো, সারাজীবন আমি অপকর্ম করেছি, কত না ভুল করেছি"—এই কথা ভাবতে বসলে কি এমন উপকারটা হবে? কোন প্রেতাত্মার কাছে না শুনলেও এ কথাটা আমরা সহজেই বুঝবো। আলো নিয়ে এসো, মুহূর্তেই দুরাচার দূর হবে। চরিত্রকে গঠন করো, তোমার আলোকোজ্জ্বল, দীপ্ত, চির-পবিত্র সত্য স্বভাবকে প্রকাশিত করো, এবং চারপাশে যাদের দেখছো তাদের অন্তরের এই সত্য স্বভাবকেও আহ্বান জানাও। আহা! এমন যদি হতো যে আমরা প্রত্যেকেই এমন একটা মানসিক স্তরে পৌঁছতে পারতাম যেখানে দাঁড়িয়ে নিকৃষ্টতম মানুষের ভেতরও তার প্রকৃত আত্মসত্তাটিকে দেখতে পেতাম। যদি তাকে দোষী সাব্যস্ত না করে বলতে পারতাম, "হে দীপ্যমান, চিরপবিত্র, জন্ম মৃত্যুহীন সর্বশক্তিমান, তুমি জাগো, তোমার সত্য স্বভাবকে প্রকটিত করো। এই ক্ষুদ্রতার প্রকাশ তোমাতে শোভা পায় না," অদ্বৈতবাদের শিক্ষায় এই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। একমাত্র প্রার্থনা হলো আমাদের সত্য স্বভাবকে, আমাদের অন্তর্নিহিত ঈশ্বরকে অসীম, সর্বশক্তিমান, চির-মঙ্গল, চির-হিতকারী, আত্মত্যাগী, সর্বসীমার অতীত বলে বারংবার স্মরণ করা, এই স্বভাব নিঃস্বার্থ বলেই নির্ভীক এবং শক্তিমান; কারণ স্বার্থান্বেষীরাই শুধু ভীত হয়। যার নিজের জন্য কিছুমাত্র কামনা নেই সে কাকেই বা ভয় পাবে, তাকে কেই বা ভয় দেখাবে? মৃত্যুতেই বা তার ভীতি কোথায়? অসৎকেই বা তার ভয় কি? আমরা যদি অদ্বৈতবাদী হয়ে থাকি তাহলে এই মুহূর্ত থেকেই আমাদের ভাবতে হবে যে আমাদের পুরাতন সত্তার মৃত্যু হয়েছে, সে অপসৃত। প্রাক্তন Mr. Mrs. এবং মিস্

অমুচরা আর নেই, তারা শুধু একটা কুসংস্কারের মত ছিলেন। অবশিষ্ট যা রইল তা চির পবিত্র, চির শক্তিমান, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ—এই রকমই যদি আমরা হই তাহলে আমাদের অন্তর থেকে সর্বপ্রকার ভয়ভীতি চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়, সর্বব্যাপীকে কে আঘাত হানতে পারে? আমাদের সমস্ত দুর্বলতা দুরীভূত; এখন আমাদের একমাত্র কাজ অন্যের অন্তরে এই জ্ঞানকে জাগরিত করা। আমরা দেখছি যে তারাও সেই একই পবিত্র সত্তা; শুধু সেই কথাটা তাদের কাছে অজ্ঞাত। আমরা তাদের শিক্ষা দেবো, তাদের অন্তরের অনন্ত স্বভাবকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবো। আমি মনে করি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এইটাই সব চাইতে প্রয়োজনীয় কর্ম। এই প্রাচীন মতবাদ পৃথিবীর অনেক পর্বতের চাইতেও প্রাচীনতর সমস্ত সত্যই চির অনন্ত। সত্য কারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়; কোন মানুষ বা কোন জাতের এর ওপর একান্ত অধিকার নেই। সত্যই আত্মার আপন স্বভাব। তার ওপর কার আবার বিশেষ অধিকার থাকতে পারে? কিন্তু তাকে ব্যবহারিক জীবনে কার্যকরী করতে হবে; সহজবোধ্য করতে হবে। (সর্বোচ্চ সত্য সব সময়েই সহজবোধ্য।) তাহলেই সে প্রবেশ করবে মানব সমাজের প্রতিটি স্তরে, তখনই পণ্ডিত মূর্খ নির্বিশেষে, নরনারী, শিশু, যুবা নির্বিশেষে সকলে একই সঙ্গে এর সমান অধিকারী হবে। এই সব ন্যায়শাস্ত্রের কচকচি, গাদা গাদা অধিবিদ্যা, কতশত ধর্মশাস্ত্র আর যাগযজ্ঞ যথাকালে হয়ত সুফল দিয়েছে। কিন্তু এসো আজ আমরা একে সহজ করি। সুবর্ণময় দিন নিয়ে আসি। সেখানে প্রতিটি মানুষই হোক উপাসক আর তার উপাস্য দেবতা হোক মানুষের অন্তরের সত্যসত্তা।

সার্বিক ধর্ম উপলব্ধির পথ

[ইউনিভার্সালিস্ট চার্চ, প্যাসাডিনা, ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রদত্ত,
২৮শে জানুয়ারী, ১৯০০]

সব অনুসন্ধানী কার্যের মধ্যে মানুষের কাছে সব চাইতে আকর্ষণীয় হলো কোন পথে ঈশ্বরের আলোর নির্দেশ মিলবে। পুরাকালে অথবা আজকের যুগে, আত্মা, ঈশ্বর এবং মানুষের নিয়তি নিয়ে পড়াশুনোয় যত শক্তি ব্যয় হয়েছে—আর কিছুতেই তা হয়নি। আমরা আমাদের প্রাত্যহিক কাজকর্মে, উচ্চাভিলাষে, যতই মগ্ন থাকি না কেন, জীবন সংগ্রামের প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও ছেদ পড়ে কোন সময়ে। মন তখন থমকে দাঁড়িয়ে জানতে চায় পৃথিবীর পরপারের কথা। কখনও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার বাইরের ইঙ্গিত পায় মুহূর্তের জন্য। তখনই তার ফল কি জানবার জন্য প্রচণ্ড প্রয়াস শুরু হয়। সমস্ত দেশেই যুগযুগান্তর ধরে এই রকমই চলেছে। মানুষ দেখতে চেয়েছে সুদূর ওপারকে; নিজেকে প্রসারিত করতে চেয়েছে। এই যে খোঁজ—মানুষের নিয়তির খোঁজ, ঈশ্বরের, এই খোঁজার মাপকাঠি দিয়েই মাপা যায় আমরা যাকে বলি প্রগতি, বিবর্তন।

সমাজের দ্বন্দ্ব-প্রচেষ্টা রূপ পায় বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সংস্থাগুলির ভেতর। সেই রকম মানুষের আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব-প্রচেষ্টাও রূপ পায় বিভিন্ন ধর্মগুলির ভেতর। যেমন সামাজিক সংস্থাগুলির ভেতর একটা না একটা দ্বন্দ্ব লেগেই আছে, ঠিক সেইরকমই এক ধর্মের সঙ্গে আর এক ধর্মের চিরকালের দ্বন্দ্ব আর বাকবিতণ্ডা। সমাজের কোন একটি অংশ বা সংস্থার দাবি বেঁচে থাকবার অধিকার একমাত্র তারই; এবং যতক্ষণ সম্ভব দুর্বলকে দাবিয়ে সে তার অধিকারকে প্রয়োগ করে। যেমন আমরা এই মুহূর্তেই দেখছি এই ধরনের একটা দুঃসহ দ্বন্দ্ব চলেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। এই রকমই প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দাবি বেঁচে থাকার অধিকার একমাত্র তারই। সেই জন্যই আমরা দেখতে পাই যে মানুষের জীবনে ধর্ম যত মঙ্গলাশীর্বাদ এনেছে এমন আর কেউ আনেনি। তেমনি ধর্ম যতখানি ভয়াবহতা সৃষ্টি করেছে তেমনও আর কেউ করেনি। শান্তি আর প্রেমের বিস্তারে ধর্মের যা অবদান আর কারুরই তা নেই। ধর্মের চাইতে বেশী সুতীব্র হিংসার জন্ম দিতে আর কেউই পারেনি। ধর্ম যেমন ভাবে মানুষের ভ্রাতৃপ্রেমকে সম্ভব করেছে তেমন আর কেউ পারেনি। যেমন পারেনি মানুষে মানুষে তীব্র শত্রুতার সৃষ্টি করতে। ধর্ম মত দাতব্যসংস্থা স্থাপন করেছে মানুষের কল্যাণে, এমনকি পশুদের কল্যাণে যত দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছে তেমন আর কেউ করেনি; পৃথিবীকে রক্তস্রোতে এমন করে প্লাবিত করতেও আর কেউ পারেনি। আমরা জানি, এ সবের অন্তস্তল দিয়ে একই সঙ্গে ফল্গুধারার মত বয়ে চলেছে আর একটি চিন্তাধারা; কিছু মানুষ, কিছু দার্শনিক, তুলনাত্মক দর্শন শাস্ত্রের কিছু ছাত্র—তারা সবসময়ই ভেবেছে এবং এখনও ভাবছে যে এই ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভেতর কর্কশতা এবং অনেকের মধ্যেও কোন সমন্বয় করা সম্ভব কিনা। কোন কোন দেশে এই প্রচেষ্টা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সারা বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই চেষ্টার কোন সাফল্যই হয়নি।

বহু প্রাচীন কাল থেকে কয়েকটি ধর্ম আমাদের কাছে নেমে এসেছে যারা এই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ : সব সম্প্রদায়কেই বাঁচতে দাও ; প্রত্যেক সম্প্রদায়ের চিন্তাধারারই একটা অর্থ আছে, তাদের আপন অন্তরে কোন মহৎ চিন্ত নিবদ্ধ আছে এবং জগতে তার প্রয়োজন আছে বলেই তারা সহায়তালাভের যোগ্য। আধুনিক কালেও এই বিশ্বাস দেখা যায় ; এবং মাঝে মাঝে এ চিন্তাকে ব্যবহারিক রূপ দেবারও প্রচেষ্টা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাগুলো অবশ্য আমাদের আশানুরূপ হয়নি। প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব ছিল। খালি তাই নয়, আমরা কখনও হতাশ হয়ে দেখেছি যে আমরা আরও বেশী করে অন্তঃকলহে মেতেছি।

এখন, স্বমত-প্রধান ধর্মালোচনা বাদ দেওয়া যাক। সাধারণ বুদ্ধির বিচারে প্রথমেই আমরা দেখতে পাই যে পৃথিবীর সবগুলি বৃহৎ ধর্মেরই অনন্যসাধারণ প্রাণ-শক্তি আছে। যদি কেউ বলেন যে এ বিষয় সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তাহলে বলতে হবে অজ্ঞানতার কোন ক্ষমা নেই। যদি কেউ বলে যে, 'বহির্জগতে কি হচ্ছে সে বিষয়ে আমি কিছুই জানি না, সুতরাং বহির্জগতের কর্মকাণ্ড বলে কিছু নেই'— সে মানুষের কোন ক্ষমা নেই। তোমরা যারা পৃথিবীর ধর্মীয় চিন্তার ওঠানামার বিষয়ে পরিজ্ঞাত তারা সবাই জান যে বৃহৎধর্মের একটিরও আজ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটেনি। কেবল তাই নয়, তাদের প্রত্যেকেরই অগ্রগতি, খ্রীষ্টানরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, মুসলমানদেরও বৃদ্ধি হচ্ছে, হিন্দুদেরও তাই। ইহুদীদের সংখ্যাও দ্রুতপদেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় জটা ধর্মের পরিধিও ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

পৃথিবীর একটি মাত্র বৃহৎধর্ম লয়প্রাপ্ত হয়েছে সেটা হলো প্রাচীন পারস্যবাসীদের ধর্ম Zorastrianism। পারস্যে মুসলিম বিজয়ের পর প্রায় একলক্ষ পারস্যদেশীয় মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। কিছু মানুষ পারস্যদেশেই থেকে গিয়েছিল। মুসলমান অত্যাচারের ফলে এদের সংখ্যা কমতে কমতে দশ হাজারে দাঁড়িয়েছিল। ভারতবর্ষে তাদের সংখ্যা আশী হাজারের মত ; কিন্তু তাদের আর বৃদ্ধি হচ্ছে না। অবশ্য এদের একটা প্রাথমিক বিঘ্ন ছিল ; এরা কখনই অন্যকে নিজ ধর্মে ধর্মান্তকরণের চেষ্টা করেন না। তার ওপর এই মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ ক্ষতিজনক নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ প্রথার চলন থাকায় এদের বংশ বৃদ্ধি হয়নি। এই একটি মাত্র উদাহরণ বাদ দিলে, জগতের সবগুলি বৃহৎ ধর্ম জীবিত আছে, সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং বৃদ্ধিও হচ্ছে। এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে এই সবগুলি বৃহৎ ধর্মই সুপ্রাচীন, একালে একটিরও সৃষ্টি হয়নি এবং এদের সকলেরই উৎপত্তি-স্থান গঙ্গা এবং ইডফ্রেটস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। য়ুরোপে অথবা আমেরিকায় কোন ধর্মের জন্ম হয়নি, একটিও নয়। প্রত্যেক ধর্মেরই উৎপত্তি স্থান—এশিয়ায় এবং তারা এশিয়ারই অন্তর্গত। সব চাইতে উপযুক্তরাই শেষ পর্যত বেঁচে থাকে—বিজ্ঞানীদের এই কথা যদি ঠিক হয় তাহলে এই ধর্মগুলো তাদের সুদীর্ঘ জীবদ্দশা দিয়ে এই কথাই প্রমাণ করে যে কতকাংশ মানুষের কাছে এখনও তারা উপযুক্ত। এদের বেঁচে থাকবার একটা কারণ আছে, তারা বহু মানুষের জীবনে এখনও মঙ্গলের সূচনা করে। মুসলমানদের

দেখ, তারা দক্ষিণ এশিয়ার অনেক জায়গায় প্রসারিত, আফ্রিকায় ত' তারা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ছে, বৌদ্ধরা চিরকাল ধরেই মধ্য এশিয়ার সর্বত্র সম্প্রসারিত হচ্ছে, হিন্দুরা, ইহুদীদের মতনই, ধর্মান্তর করায় না। তবুও ধীরে ধীরে অনেক জাতি হিন্দুধর্ম বিশ্বাসের আওতায় এসে পড়ে, হিন্দুদের আচার ব্যবহার গ্রহণ করে হিন্দুদের মতই হয়ে যাচ্ছে প্রায়। খ্রীষ্টানদের প্রচার প্রয়াসে একটা বিশেষ ত্রুটি আছে—সেটা অবশ্য সব রকম পশ্চিমী সংস্থারই ত্রুটি। তাদের সংগঠন যন্ত্রের বেশী বাহুল্য, তাই শক্তির শতকরা নব্বই ভাগই যন্ত্রের পেছনে ব্যয় হয়ে যায়। ধর্মপ্রচার এশিয়াবাসী-দেরই কাজ চিরকাল ধরেই। পশ্চিমবাসীদের সামাজিক সংস্থা, সৈন্যবাহিনী, সরকার ইত্যাদি সংগঠন করবার ক্ষমতা অনন্যসাধারণ। কিন্তু ধর্মসংগঠনের ক্ষেত্রে তারা এশিয়াবাসীদের কাছাকাছি আসতে পারে না। কারণ ধর্মপ্রচারই এদের কাজ। তারা জানে এ কাজ কিভাবে সাধন করতে হয় এবং তাদের কাজ সংগঠন যন্ত্রের বাহুল্য বর্জিত।

তাহলে অধুনা মানবজাতির ইতিহাসে এটা একটি সত্য ঘটনা যে সব কয়টি বৃহৎ-ধর্মই জীবিত রয়েছে এবং তারা সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং তাদের বৃদ্ধিও হচ্ছে। এর নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছে একটা। যদি সর্বজ্ঞানাধার, সর্বদয়াময় ঈশ্বরের ইচ্ছা হতো সব ধর্মের মৃত্যু হয়ে কেবল একটিই বেঁচে থাকবে—তাহলে এতদিনে নিশ্চয়ই তাই ঘটতো। তাই যদি সত্যি হতো যে এর মধ্যে একটি ধর্মই সত্য আর সব মিথ্যা, তাহলে এতদিনে সেই সত্য ধর্মটিই সর্বত্র বিরাজ করতো। কিন্তু সেরকম ত ঘটেনি; কোন একটি ধর্ম সর্বত্র জুড়ে বিরাজ করছে না। সব ধর্মেরই কখনও অগ্রগতি, কখনও পতনোন্মুখী। একটা কথা ভেবে দেখো তোমরা, তোমাদের দেশে ষাট মিলিয়ন লোকের বাস; তাদের মধ্যে একুশ মিলিয়ন মানুষ অনেকগুলো ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত। তার মানে সব সময়ই অগ্রগতি হয় না। সব দেশেই, সম্ভবতঃ, যদি একটা সংখ্যা পরিগ্রহণ করে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে সব ধর্মেরই কখনও অগ্রগতি কখনও পশ্চাৎগতি। সম্প্রদায়গুলির সবসময়ই বৃদ্ধি হচ্ছে। যদি কোন ধর্মের দাবি হয় যে সব সত্যেরই তারা অধিকারী এবং ঈশ্বর সেই সব সত্য একটিমাত্র বইয়ের ভেতরেই প্রকাশ করেছেন, তাহলে এতগুলো সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকে কেমন করে? পঞ্চাশটা বছরও কাটে না যখন ঐ একই ধর্মগ্রন্থের ভিত্তিতে কুড়িটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। ঈশ্বর যদি বিশেষ কয়েকটি বইয়ের ভেতরই সব সত্য গ্রথিত করে থাকেন তার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই এই নয় যে ঐ বইয়ের তথ্য নিয়ে আমরা কলহ করি, কিন্তু ব্যাপার দেখে সেইরকমই মনে হয়। কিন্তু কেন? ঈশ্বর যদি সত্যিই একখানি বইতে ধর্মের সমস্ত তথ্য নিবদ্ধ করতেন তাতেও উদ্দেশ্য সাধন হতো না। কারণ কেউই সে বইয়ের মানে বুঝতো না। উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যাক বাইবেল আর খ্রীষ্ট ধর্মের ভেতর যত সম্প্রদায় আছে তাদের। তাদের প্রত্যেকেরই বাইবেল সম্বন্ধে নিজস্ব এক একটি ব্যাখ্যা আছে; এবং প্রত্যেকেই বলে যে তাদের ব্যাখ্যাটাই ঠিক এবং মূল অংশটি শুধু তারাই বুঝেছে আর সকলের বোঝাই ভুল। মুসলমানদের ভেতরও অনেক সম্প্রদায়, বৌদ্ধদেরও তাই আর হিন্দুদের ভেতর ত শতাধিক। এসব কথা এই জন্যই তুলছি যে সব ধর্মাবলম্বীকে

একই মতে নিয়ে আসবার প্রচেষ্টা কোনকালেই সাফল্যলাভ করতে পারেনি, এবং পারেও না। আজকের দিনেও কোন মানুষ যদি একটা নতুন মতবাদের সূচনা করে তাহলেও তাই হবে না। সে পঞ্চাশ মাইল দূরে যেতে না যেতেই তার অনুগামীরা কুড়িটি সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে যাবে, সেই রকমই সব সময়ে ঘটছে। সবাইকে দিয়ে একই জিনিস মানিয়ে নেবে তা হয় না। এটা একটা সত্য এবং সেজন্য ঈশ্বর ধন্যবাদই। আমি বহু সম্প্রদায়ের বিরোধী নই। বহু সম্প্রদায় আছে বলে আমি খুব খুশী এবং আমার একমাত্র ইচ্ছা যে কেবলই তাদের বংশবৃদ্ধি হোক। কেন? খুব সহজ হলো তুমি, আমি, আমরা সবাই যদি ঠিক একই রকম চিন্তা করি তাহলে শেষ পর্যন্ত কোন রকম চিন্তাই আর থাকবে না, আমরা জানি একাধিক শক্তির সংঘর্ষেই বেগের সৃষ্টি হয়। সেই রকম চিন্তার সংঘর্ষ, চিন্তার বিভিন্নতা থেকেই চিন্তার উদয় হয়। আমাদের সবার চিন্তাই যদি এক হয় তাহলে আমরা যাদুঘরে ইজিপ্টের মমীদের মত পরস্পরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবো শুধু—আর কিছু নয়। চলন্ত, জীবন্ত জলস্রোতেই ঘূর্ণী দেখা যায়। মরা গাঙে ঘূর্ণী ওঠে না। ধর্মের যখন মৃত্যু হবে, তখন আর সম্প্রদায়গুলিও থাকবে না, মানবজাতির যতক্ষণ চিন্তাশক্তি থাকবে—ততক্ষণ সম্প্রদায়গুলিও থাকবে। বৈচিত্র্য হলো প্রাণের চিহ্ন, জীবনে বৈচিত্র্য থাকতেই হবে। আমি প্রার্থনা করি যে এই বৈচিত্র্য বাড়তে বাড়তে এমন হোক যে পৃথিবীতে যতগুলো মানুষ ততগুলো দল হোক। প্রত্যেকেরই নিজস্বপন্থা, প্রত্যেকের স্বকীয় ধার্মিক চিন্তা।

এই অবস্থাটা কিন্তু এখনও আছে। আমরা প্রত্যেকেই নিজের মত করে ভাবছি। অবশ্য এই চিন্তার ধারাকে বারে বারেই বাধা দেওয়া হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। যদি তলোয়ার দিয়ে বাধা নাও দেওয়া হয়, বাধা দেবার অন্য অনেক ব্যবস্থা আছে। নিউইয়র্কের একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক কি বলেছেন শোন: ফিলিপিনোদের খ্রীষ্টীয় শিক্ষা দিতে হলে তাদের যুদ্ধ করে জয় করতে হবে—সেটাই একমাত্র পথ। ফিলিপিনোরা কিন্তু এমনিতেই খ্রীষ্টান। কিন্তু তিনি তাদের প্রেসবিটেরিয়ান করতে চান। আর সেই কারণে রক্তক্ষয়ের মত ভয়ানক পাপও তিনি স্বজাতির ওপর চাপিয়ে দিতে চান। কি ভয়ানক কথা! এবং এই মানুষটি দেশের একটি বিখ্যাত প্রচারক এবং উচ্চ শিক্ষিতদের একজন। যখন এই রকম একজন মানুষ নির্লজ্জের মত এই অর্থহীন প্রলাপ বকতে পারে—তখন পৃথিবীর অবস্থাটা একবার ভাবো। তার শ্রোতারা যখন তাকে হর্ষধ্বনি দেয়—তখনকার অবস্থাটাও ভাবো একবার। এই কি সভ্যতা? এ সেই চিরপুরাতন রক্ত-পিপাসা ব্যাঘ্রের, নর-খাদকের, জংলীর রক্ত পিপাসাই নতুন পরিবেশে, নতুন নামে দেখা দিয়েছে। তাছাড়া আর কি? আজকের দিনের অবস্থাই যদি এই হয় তাহলে বিগত দিনের অবস্থাটা ভাবো একবার। যেদিন সব সম্প্রদায়গুলো যে কোন উপায়ে পরস্পরকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলার প্রয়াস পাচ্ছিল। ইতিহাসে ত সেই কথাই বলে। বাঘটা ঘুমিয়ে আছে মাত্র, মরে যায়নি। সুযোগ বুঝলেই লাফিয়ে উঠে, সেই পুরনো দিনের মতই তার নখদন্তের সুব্যবহার করবে। তলোয়ার বা অন্যান্য অস্ত্র ছাড়াও

ভয়ানক সব অস্ত্র আছে—অবজ্ঞা, সমাজে অস্পৃশ্য করে রাখা সমাজ থেকে বার করে দেওয়া। আমাদের মত করে একই রকম ভাবে যারা ভাববে না তাদের ওপর সব অস্ত্রের চাইতেও এই মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু এমন কি কারণ আছে যে আমরা যা ভাবছি আর সবাইকেও সেইরকম ভাবতে হবে? আমি ত কোন কারণ দেখতে পাই না। আমি যদি যুক্তি-বাদী মানুষ হই তাহলে অন্যদের আমার মত একই ভাবনা ভাবতে না দেখলে ত খুশী হবো আমি, কবরখানায় বাস করতে চাই না আমি। চিন্তাশীল মানুষদের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য থাকবে, মতভেদই চিন্তার প্রথম চিহ্ন। আমি যদি চিন্তাশীল মানুষ হই আমি নিশ্চয়ই চিন্তাশীল মানুষদের মধ্যেই থাকতে চাইবো—যেখানে চিন্তার বিভিন্নতা আছে।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এত বিচিত্র মত সবগুলোই সত্য হচ্ছে কি করে? একটা মত যদি সত্য হয় তার না-সূচক বিপরীত মতটি সত্য হতে পারে না। কারণ একই সঙ্গে পরস্পরবিরোধী দুটো মত সত্য হতে পারে না। এই প্রশ্নের উত্তর দেবারই আমার ইচ্ছা। কিন্তু তার আগে আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করতে চাই; পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগুলোই কি পরস্পর-বিরোধী? আমি ধর্মের বহিরাঙ্গের কথা বলছি না, ধর্মের বিভিন্ন মন্দির মসজিদ, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধার্মিক কর্মকাণ্ড, বা বই সেসবের কথা বলছি না আমি। আমি ধর্মের নিগূঢ় আত্মার কথা বলছি। প্রত্যেক ধর্মেরই অন্তরে একটি আত্মা আছে। এক ধর্মের আত্মার সঙ্গে অন্য ধর্মের আত্মার প্রভেদও থাকতে পারে। কিন্তু তার মানেই কি তারা পরস্পর-বিরোধী? তারা পরস্পরের বিরোধী না পরিপূরক?—সেটাই হলো প্রশ্ন। শিশুকাল থেকেই এই কথাটা আছে আমার মাথায়—এবং সারাজীবন ধরেই এই প্রশ্নটা ভাবছি। তোমাদের কাজে লাগতে পারে ভেবে আমার সিদ্ধান্তটা আমি তোমাদের জানাচ্ছি। আমার ধারণা এরা পরস্পর বিরোধী নয়; এরা পরস্পরের পরিপূরক। প্রত্যেক ধর্মই বিরাট সার্বিক সত্যের খানিকটা অংশ পরিগ্রহণ করে তার স্বীয় সৃজনী শক্তি দিয়ে সত্যের সেই অংশটুকুকেই আদর্শস্বরূপ করে গড়ে তোলে। তার মানে হলো সংযোজন, বর্জন নয়। এক একটি বিরাট চিন্তাধারাকে বহন করে একের পর এক নীতি-পদ্ধতি এসেছে। একটি আদর্শের সঙ্গে আর একটি আদর্শ যুক্ত হয়েছে। এই ভাবেই চলেছে মানবগোষ্ঠীর যাত্রা। মানুষের প্রগতির পথ ভ্রম থেকে সত্য নয়; সত্য থেকে সত্যে, স্বল্প সত্য থেকে বৃহত্তর সত্যে—কিন্তু কখনই ভ্রম থেকে সত্যে নয়। পিতার থেকে তার সন্তান অনেক বেশী বড় হয়ে উঠতে পারে—তাই বলে কি পিতা অর্থহীন হয়ে পড়েন। পিতার সঙ্গে আরও কিছুর সংযোজন—তাই হলো সন্তান, তোমার শৈশবে যে জ্ঞান ছিল এখন সেই জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে বলে কি তুমি তোমার শৈশবকে অবজ্ঞা করবে? পেছন ফিরে তাকিয়ে তাকে কি তুমি অসার বলবে? শৈশবের জ্ঞানের সঙ্গে আর কিছুর সংযোগ হয়েই তোমার এখনকার জ্ঞান।

এছাড়াও আমরা জানি যে একই জিনিস সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পরস্পর-বিরোধী

বলেও মনে হতে পারে—যদিও সবগুলি দৃষ্টিভঙ্গীই একই জিনিসকে নির্দিষ্ট করছে, ধরা যাক একটি মানুষ সূর্যাভিমুখে যাত্রা করে. যাত্রাপথের বিভিন্ন স্তর থেকে সূর্যের একটা করে ছবি তুললো। ফিরে এসে সূর্যের অনেকগুলো ছবি দিল আমাদের। আমরা দেখলাম ছবির কোনটার সঙ্গেই কোনটার কোন মিল নেই। অথচ একথা কে অস্বীকার করবে যে সব ছবিগুলোই সূর্যের শুধু ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে দেখা। চারটে কোন থেকে এই গীর্জার চারটি ছবি নাও। কত তফাৎ হবে দেখতে কিন্তু তবুও একটি গীর্জাই ত বোঝাবে, সেই রকম বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একটি মাত্র সত্যকেই আমরা দেখছি, দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা নির্ভর করে আমাদের জন্মের, শিক্ষার, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই সবের ওপর। আমরা সত্যকেই দেখছি কিন্তু এইসব পারিপার্শ্বিকতার ওপর নির্ভর করে আমাদের সত্য দর্শনের ক্ষমতা—আমাদের হৃদয়ের রঙে সত্যকে রাঙাই, আমাদের স্বীয় বুদ্ধির ক্ষমতায় সত্যকে বুঝি, আমাদের নিজের মনের পরিধি দিয়ে সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করি। আমরা ততটুকুই সত্যকে বুঝি যতটুকু আমাদের বলা হয়, আর যতটুকু আমাদের গ্রহণ করবার ক্ষমতা। এই কারণেই মানুষে মানুষে পার্থক্য হয় এবং তার ফলে কখনও পরস্পরবিরোধী ধারণাও সৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু সেই একটি বিরাট সার্বিক সত্যের ভিতরই আমাদের সকলের অবস্থান।

সেইজন্য আমার ধারণা, বিভিন্ন ধর্মগুলি, ঈশ্বরের সংসারে কতকগুলি শক্তি মানব-কল্যাণে কাজ করে চলেছে, এবং তাদের একটিরও মৃত্যু হবে না এবং কেউ তাদের হত্যাও করতে পারবে না। প্রকৃতির রাজ্যে তুমি যেমন কোন শক্তিকে ধ্বংস করতে পারো না, আধ্যাত্মিক জগতের কোন শক্তিকেও ধ্বংস করতে পারো না, তারা হয়ত কখনও পশ্চাদগামী কখনও অগ্রগামী। গতিপথে কখনও হয়ত তাদের অঙ্গের ভূষণ খসে পড়বে, আবার কখনও নানারকমের ভূষণে ভূষিত হবে। সে যাই হোক আত্মার চির অবস্থান; সে কখনও হারায় না, প্রত্যেক ধর্ম যে আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে—তার মৃত্যু নেই এবং তাই প্রতিটি ধর্মই বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে চলে অগ্রসরের পথে।

তারপর, দার্শনিকদের স্বপ্ন সেই সার্বিক ধর্ম সেও ত আছে, এইখানেই আছে। পৃথিবীতে সার্বিক ভ্রাতৃত্ব যেমন আছে, সার্বিক ধর্মও তেমনি বিরাজমান। তোমাদের মধ্যে যারা পৃথিবীর দিগ্বিদিকে ভ্রমণ করেছো, তারা কি পৃথিবীর সর্বজাতির ভেতর ভ্রাতা-ভগ্নীর সন্ধান পাওনি? আমি:ত পৃথিবীময় তাদের পেয়েছি। ভ্রাতৃত্ব রয়েইছে, কেবল যারা এটা দেখতে পায় না তারা ভ্রাতৃত্ব ভ্রাতৃত্ব বলে চীৎকার করে অব্যবস্থার সৃষ্টি করে। সেইরকম সার্বিক ধর্মও রয়েছে, বিভিন্ন ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব যারা নিজেরাই নিজের কাঁধে নিয়েছেন তাঁরা যদি কয়েক মুহূর্তের জন্য ধর্ম ব্যাখ্যা অন্ততঃ বন্ধ করেন আমরা এইখানেই সার্বিক ধর্মের দেখা পাবো। সর্বদাই তারা একে বিপর্যস্ত করছেন—কারণ তাতেই তাদের স্বার্থসিদ্ধি। তোমরা দেখেছ সব দেশের ধর্মযাজকরাই ভয়ানক গোঁড়া প্রকৃতির হয়, কেন বলতো? খুব কম ধর্মযাজকই আছেন যাঁরা নেতৃত্ব দিয়ে জনসাধারণকে চালনা করেন, অধিকাংশ যাজকই সাধারণ মানুষের দ্বারা চালিত হন; তাদের দাস, ক্রীতদাস। তোমরা যদি বলো এটা

শুরু—তাঁরাও বলবেন তাই ; তোমরা যদি বলো কালো, তারাও অমনি বলবেন কালো। জনসাধারণ যদি অগ্রগতির পথে চলে, যাজকরাও অগ্রগতির পথে চলেন। তাঁরা তখন পিছিয়ে থাকতে পারেন না।

যাজকদের দোষারোপ করা যদিও একটা ফ্যাশান, কিন্তু সেটা করবার আগে তোমাদের নিজেদের ওপরই দোষারোপ করা সঙ্গত, যা তোমরা পাবার অধিকারী তাই তোমরা পেয়ে থাকো। তোমাদের নতুন এবং উন্নততর চিন্তা দিয়ে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা যদি কোন ধর্মযাজক করেন তার ভাগ্যে কি ঘটবে তখন? তার শিশুসন্তানরা সম্ভবত অনশনে দিন কাটাবে এবং তিনি ছিন্নবস্ত্র পরে বসে থাকবেন। যে জাগতিক নিয়ম দিয়ে তোমরা পরিচালিত সেই একই নিয়ম দিয়ে তিনিও পরিচালিত। তিনি বলবেন, "তোমরা যদি এগোতে চাও, তাহলে এগোনো যাক্," অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। এমন অনেকে আছেন যাঁরা জনমত দিয়ে পরিচালিত হন না, তাঁরা সত্যকে দেখতে পান এবং সত্যকেই কেবল মূল্য দেন, বলতে গেলে সত্য যেন তাঁদের গ্রাস করে এবং তাঁদের পক্ষে অগ্রগতি ছাড়া আর অন্য কোন পন্থা নেই। তাঁরা কখনও পশ্চাৎ পানে ফিরে তাকান না এবং তাঁদের অনুগামীর দলও থাকে না। তাঁদের একমাত্র সম্বল ঈশ্বর, তাঁদের সামনে ঈশ্বরই একমাত্র আলোক-বহ্নি, তাঁকে অনুসরণ করেই তাঁদের পথযাত্রা।

এই দেশেই আমার একটি জর্মন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে তাঁর ধর্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করবার প্রচেষ্টা দেখে আমি বলেছিলাম, "আপনার ধর্মবিশ্বাসের ওপর আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপারে আমাদের মতানৈক্য আছে। আমি হলাম সন্ন্যাসী আর আপনি বহু বিবাহে বিশ্বাসী। কিন্তু আপনি ভারতবর্ষে গিয়ে প্রচারকার্য চালান না কেন?" সেই কথা শুনে ভদ্রলোক আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, "সেকি, তুমি বিবাহেই বিশ্বাস করো না, আর আমরা বহুবিবাহে বিশ্বাসী। আর তুমি আমাকে তোমার দেশে গিয়ে প্রচার করতে বলছো?" আমি বলেছিলাম, "হ্যাঁ, আমার দেশবাসী, যে দেশের ধর্মের কথাই হোক না কেন, মন দিয়ে শুনবে। তুমি যদি প্রথমেই ভারতবর্ষে যেতে পারতে বেশ হতো, কারণ আমি বহু মতাবলম্বীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষে বেশ কিছু লোক আছে যারা ওখানকার কোন ধর্মমতেই সন্তুষ্ট নয়। সেই অসন্তোষের কারণেই, তারা কোন ধর্মেরই পরোয়া করে না। সম্ভবত তুমি তাদের কাউকে কাউকে পেয়ে যেতে পার। বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সংখ্যা যতই বাড়বে, অধিক সংখ্যার লোকের ধর্মাচরণের সম্ভাবনা ততই বাড়বে। হোটেলে সব ধরনের খাবার পাওয়া যায় তাই প্রত্যেকেরই বিভিন্ন রুচি তৃপ্ত হতে পারে। সেই জন্যই আমি চাই যে প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সংখ্যা কেবলই বৃদ্ধি পাক। তাতে করে আরও বেশী সংখ্যক মানুষের পক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনযাপন সম্ভব হবে একথা ভাববার কোন কারণ নেই যে মানুষ ধর্মাচরণ পছন্দ করে না। প্রচারকরা অনেকেই তাদের যা প্রয়োজন তা দিতে পারে না। অজ্ঞেয়বাদী, বস্তুবাদী ইত্যাদি বলে কুখ্যাত মানুষেরও এমন লোকের সঙ্গে দেখা হতে পারে

যিনি তাকে তার গ্রহণযোগ্য সত্যের সন্ধান দিতে পারেন। তার ফলে সেই মানুষটি হয়ত সেই সমাজের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী হতে পারে। আমরা সবাই কেবল আমাদের অভ্যস্ত ব্যবস্থাতেই আহার করতে পারি। যেমন ধরো, হিন্দুরা খাবার জন্য তাদের আঙুলগুলিকেই ব্যবহার করে। কারণ আমাদের আঙুল তোমাদের চাইতে অনেক বেশী নমনীয়। সেইজন্য তোমরা আমাদের মত করে আঙুলকে ব্যবহার করতে পারো না। সেইজন্য শুধু খাদ্য দিলেই হবে না, নিজস্ব প্রথায় তাকে গ্রহণ করবার সুযোগও দিতে হবে। আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা দিলেই শুধু হবে না, তোমার গ্রহণযোগ্য পন্থায় তাকে পরিবেশন করতে হবে। সে তোমার এবং তোমার আপন আত্মার ভাষায়। কথা বলবে শুধু মাত্র তখনই তোমার পূর্ণ সন্তোষ হবে। যখন কোন মানুষ এসে আমার আপন ভাষায় সত্যটিকে পরিবেশন করে, মুহূর্তে আমি বুঝতে পারি সে কথা, এবং চিরদিনের জন্য তাকে গ্রহণ করি।"

এথেকে বোঝা যাচ্ছে যে মানুষের মন অনেক ধরনের এবং বিভিন্ন সুরের এবং ধর্মগুলি স্বেচ্ছায় কি কর্তব্যের বোঝা মাথায় নেয়। একজন দু তিনটি তত্ত্ব নিয়ে এসেই দাবি জানায় যে তার প্রচারিত ধর্ম সমস্ত মানুষকেই সন্তুষ্ট করতে সমর্থ। তিনি ছোট একটি খাঁচা হাতে করে বেরিয়ে পড়েন, ভগবানের দেওয়া খাঁচা যেন সেটা, আর বলতে থাকেন, "ঈশ্বরই হোন, হাতিই হোক, সবাইকে ঢুকে পড়তে হবে এই খাঁচায়। হাতির পক্ষে এটা যদি কিছু অপরিসর হয়, তাহ'লে হাতিটাকে টুকরো করে কেটে নিলেই চলবে।" আবার হয় ত অন্য কোন সম্প্রদায়ের অনুবর্তীরা কিছু কিছু উন্নত চিন্তাধারা নিয়ে আসবে। তারাও বলবে, "সব মানুষকেই ঢুকতে হবে এটার ভেতর।" "কিন্তু সবার জায়গা হবে না যে ওখানে।" "কুছ্ পরোয়া নেই। কেটে ফেলে কোন রকমে ঢুকিয়ে দাও। এর ভেতর না ঢুকতে পারলে যে নরকবাস হবে ওদের।" আমি এমন কোন সম্প্রদায় বা প্রচারক দেখিনি যারা থমকে দাঁড়িয়ে একটু ভাববে, "আমাদের কথা শুনছে না কেন মানুষ?" বরং তারা মানুষকেই গাল দিয়ে বলবে, "ওরা সব অসাধু।" একবারের জন্যও তারা নিজেদের প্রশ্ন করবে না, "কি কারণে মানুষ আমাদের কথা শুনতে চায় না? আমি কেন তারা যে ভাষা বোঝে সেই ভাষায় কথা বলতে পারি না? আমি কেন তাদের সত্যদর্শন করাতে পারি না?" সত্যিই আর কিছু বেশী বোধশক্তি থাকা উচিৎ ছিল এদের। এরা যখন দেখে যে মানুষ তাদের কথা শুনছে না, তখন মানুষকে না শাপিয়ে নিজেদেরই শাপানো উচিৎ। কিন্তু তা নয়, দোষটা সব সময়ই মানুষের! তারা তাদের সম্প্রদায়কে কখনই যথেষ্ট সম্প্রসারণ করতে পারেন না যাতে করে সব মানুষের স্থান হতে পারে সেখানে।

এইখানেই আমরা দেখতে পারি কেন এত ক্ষুদ্র মানসিকতা: পূর্ণের অংশ হয়েও পূর্ণতা দাবি করা, ক্ষুদ্র সীমিত যা তারই অসীমত্বের দাবি, ভাবো একবার, মানুষের ভ্রান্ত বুদ্ধিসঞ্জাত ছোট ছোট মতাবলম্বীদের দল—কয়েক শত বছর বয়েসও যাদের হয়নি, কি উদ্ধত তাদের দাবি! ঈশ্বরের অসীম সত্যের পূর্ণজ্ঞান তাদের

দখলে। ঔদ্ধত্যটা ভাবো একবার। এথেকে এটাই শুধু প্রমাণ হয় যে মানুষ কত দাম্ভিক হতে পারে। সেইজন্য এদের সব দাবিই সে ব্যর্থ হয় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ঈশ্বরের করুণায় ব্যর্থতাই এদের ভাগ্যলিপি, এই ধরনের কার্যকলাপে মুসলমানরাই সব চাইতে বেশী পারদর্শী। তলোয়ার হাতে নিয়েই প্রতিটি পদক্ষেপ। একহাতে তলোয়ার আর এক হাতে কোরান। "হয় কোরানকে গ্রহণ করো নয়তো নিপাত যাও। নান্য পন্থা।" তোমরা ইতিহাস থেকে জানো কী অসামান্য সাফল্য হয়েছিল তাদের। ছশো বছর ধরে তাদের দুর্বার স্রোতকে কেউ রোধ করতে পারেনি, কিন্তু তারপরেই থামতে হলো। এই পথের পথিক হলে অন্য ধর্মের ভাগ্যেও একই ফল ঘটবে। আমরা এমনই বালখিল্য! আমরা কেবলই মানুষের শাশ্বত স্বভাবকে ভুলে যাই। আমরা যখন জীবন শুরু করি তখন অসাধারণ কিছু মনে হয় আমাদের ভবিতব্যকে এবং সে বিশ্বাসকে কিছুতেই আমাদের মন থেকে সরানো যায় না। কিন্তু বার্ধক্য যখন আসে অন্য কথাই ভাবি তখন আমরা। ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই, প্রথম পর্যায়ে যখন তাদের কিছু কিছু বিস্তার হয়, তখন তাদের ধারণা হয় যে কয়েক বছরের ভেতরেই সমস্ত মানবজাতির চিন্তাধারাকেই বদলে দেবে তারা, তখন মেরে কেটে গায়ের জোরেই ধর্মান্তকরণ শুরু হয়ে যায়। তারপর যখন পতন হয় তখন সুবুদ্ধির উদয় হয়। এই সব সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য যে সফল হয়নি মঙ্গল হয়েছে তাতে। ধর্মান্ধ কোন সম্প্রদায় সমস্ত জগৎকে জয় করে নিতে সফল হতো তাহলে পৃথিবীর মানুষের কি দশা হতো ভাবো একবার সে কথা। ঈশ্বরের আশীর্বাদ যে তা হয়নি। কিন্তু তবুও প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই একটি মহান সত্য নিহিত আছে। প্রত্যেক ধর্মের একটি বিশেষ মাহাত্ম্য আছে সেইটাই সেই ধর্মের আত্মাস্বরূপ। পুরনো একটা গল্প মনে পড়ছে। কতগুলো নরমাংসভোজী রাক্ষস ছিল। সেগুলো কেবল মানুষ মারত আর নানা রকমের অনাচার-অত্যাচার করতো। কিন্তু তাদের কেউ মারতে পারতো না। কারণ তাদের প্রাণগুলো থাকতো কতগুলো পাখীর ভেতর। সেই পাখিগুলোকে সন্ধান করে শেষ করতে না পারলে রাক্ষসগুলির মৃত্যু হতো না। পাখিগুলি যতক্ষণ নিরাপদে থাকতো রাক্ষসগুলিকে ধ্বংস করা অসম্ভব ছিল। সেই-রকম আমাদের সবারও যেন একটি করে পাখি আছে, সেইখানেই বুঝি আমাদের আত্মার অবস্থান।

একটা করে আদর্শ আছে আমাদের জীবনের একটা মহৎ উদ্দেশ্য। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এই রকমের একটি আদর্শ, একটি মহান উদ্দেশ্য সন্নিবিষ্ট আছে। তুমি আর যা কিছুই হারাও না কেন, যতক্ষণ তোমার আদর্শচ্যুতি না হয়, উদ্দেশ্য ব্যাহত না হয়, ততক্ষণ তোমার মৃত্যু নেই। ধনসম্পদ আসতে পারে, চলেও যেতে পারে, পর্বত প্রমাণ হয়ে উঠতে পারে তোমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু তোমার আদর্শ থেকে যদি বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি না ঘটে, কেউ তোমার মৃত্যু ঘটাতে পারবে না। শতবর্ষের বার্ধক্য আসতে পারে তোমার, তখনও যদি তোমার হৃদয়ে সেই মহান উদ্দেশ্যটি তরুণ সজীবতা নিয়ে সদাজাগ্রত থাকে—কার ক্ষমতা আছে তোমাকে ধ্বংস করবার? কিন্তু সেই আদর্শ যদি হারিয়ে যায়, উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়, কোন কিছুই তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। জগতে

সমস্ত সম্পদ, সমস্ত শক্তিও তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। জাতির ক্ষেত্রেও তাই। কারণ, জাতিতো ব্যক্তিরই সমষ্টি। প্রত্যেক জাতিরই একটি মহান উদ্দেশ্য আছে। যতক্ষণ সেই আদর্শ থেকে সে জাতির বিচ্যুতি না ঘটে তার ধ্বংস নেই। কিন্তু সে যদি তার মহান উদ্দেশ্য থেকে বিচলিত হয়ে বিপথগামী হয়, তার আয়ু সংক্ষিপ্ত হয়ে তার বিলয় ঘটে।

ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই। প্রাচীন ধর্মগুলি যে এখনও বিদ্যমান ত' থেকেই প্রমাণিত হয় যে তারা তাদের উদ্দেশ্যে অটল। সব ভুল-ভ্রান্তি, বাধা-বিপত্তি, কলহ-বিবাদ সত্ত্বেও প্রত্যেক ধর্মের হৃদপিণ্ডটি সুস্থ সবল ভাবে স্পন্দিত হয়ে বেঁচে আছে। মহম্মদীয় ধর্মের উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। খ্রীষ্টানরা সব চাইতে বেশী ঘৃণা করে এই ধর্মকে। তাদের মতে এর চাইতে অপকৃষ্ট ধর্ম পৃথিবীতে আর নেই। কিন্তু কোন ধর্ম যা করে না মহম্মদীয়রা তাই করে। যখনই কোন মানুষ এই ধর্মমতকে গ্রহণ করে মহম্মদীয়রা কোনরকম বাছ-বিচার না করে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ভাইয়ের মত গ্রহণ করবে তাকে। যদি তোমাদের কোন আমেরিকান নিগ্রো মুসলমান হয়, টার্কীর সুলতানও তার সঙ্গে এক পংক্তিতে আহার করতে কোন আপত্তি করবেন না। তার যদি মেধা থাকে, কোন যোগ্যস্থানে বসার পক্ষেও কোন বাধা তার থাকবে না। এদেশে ত' আমি আজ পর্যন্ত কোন সাদা আর কালা মানুষকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কোন গীর্জায় প্রার্থনা করতে দেখিনি। ভেবে দেখো কথাটা: ইসলামের কাছে তার অনুবর্তীদের ভিতর কোন প্রভেদ নেই। সবাই সমান। এটাই হলো মহম্মদীয় ধর্মের বিশেষ মাহাত্ম্য। পৃথিবীর কাছে মহম্মদীয়দের প্রচারের বিষয় হলো এটাই—এই ধর্মের অনুবর্তীদের মধ্যে ব্যবহারিক জীবনে সাম্য। এটাই মহম্মদীয় ধর্মের সারাংশ; স্বর্গ ও জীবন সম্বন্ধে আর যে সব কথা সেগুলো মহম্মদীয় নয়। সেগুলো শুধু কলেবর বৃদ্ধির বাহুল্য। হিন্দুদের ভেতর দেখবে জাতীয় চিন্তা একটাই—আধ্যাত্মিকতা, হিন্দুরা ঈশ্বরের সংজ্ঞা নির্ধারণ করবার জন্য যে বিপুল শক্তির নিয়োগ করেছে পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে কোন ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থে তার তুলনা পাবে না। আত্মার যে সংজ্ঞা তারা নির্ধারণ করবার চেষ্টা করেছেন এমন ভাবে যাতে জাগতিক কিছু তাকে স্পর্শ করে মলিন করতে না পারে। আত্মা স্বর্গীয়। আত্মাকে আত্মারূপে উপলব্ধি করে তার ওপর মনুষ্য-প্রকৃতি প্রয়োগ করা চলবে না। ঐক্য, ঈশ্বরোপলব্ধি, ঈশ্বরের সর্বব্যাপ্তি—একই কথা সমগ্রভাবে প্রচারিত হয়েছে। তাদের কাছে ঈশ্বর স্বর্গে বাস করেন ইত্যাদি ধারণা একেবারেই অর্থহীন। এগুলো নিতান্তই মানবীয় এবং মানবাত্মারোপক ধারণা। স্বর্গ যদি কখনও থাকে তাহলে এই মুহূর্তে এইখানেই তার অবস্থান। অসীম সময়ের এই মুহূর্তটি যা অপর মুহূর্তটিও ঠিক তাই। তুমি যদি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো এখানেই দেখতে পাবে তাঁকে। তাঁকে দেখবার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা নেই কেন? জগৎকে পরিত্যাগ করে শুধু মাত্র এই উদ্দেশ্যেই জীবনকে অতিবাহিত কর না কেন? ত্যাগ ও আধ্যাত্মিকতা হলো ভারতবর্ষের দুটি মহান চিন্তা। এই দুটি আদর্শে দৃঢ়তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে বলেই অন্যান্য ভুল ভ্রান্তির ফলও তেমন বড় হয়ে দেখা দেয় না।

খ্রীষ্টানরা তাদের যে চিন্তাধারা প্রচার করে আসছেন তার সার বক্তব্যও সেই

একই কথা: "লক্ষ করো আর প্রার্থনা করো, ঐ সামনেই দেখতে পাবে ঈশ্বরের রাজ্য।" তার মানে হলো মনকে পবিত্র করে প্রস্তুত হও। এবং আত্মার মৃত্যু নেই। স্মরণ করে দেখো যে সব চাইতে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন খ্রীষ্টান দেশে, চরম দুঃখের দিনেও, খ্রীষ্টানরা সদা সর্বদাই ঈশ্বরের আগমন অপেক্ষায় প্রস্তুত হবার প্রয়াস পাচ্ছে, অন্যকে সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, হাসপাতাল বানাচ্ছে এবং এই রকম আর সমস্ত কাজ সম্পাদন করছে। খ্রীষ্টানরা যতদিন তাদের এই আদর্শ বজায় রাখবে, তাদের ধর্মও বেঁচে থাকবে।

একটা আদর্শের চিন্তা মাথায় এসেছে আমার। হয়ত নেহাৎই একটা স্বপ্ন! জানি না এর বাস্তব রূপায়ণ পৃথিবীতে কোন দিন সম্ভব হবে কিনা তবে কখনও কখনও কঠোর বাস্তবতায় মরে যাওয়ার চাইতে স্বপ্ন দেখা ভাল। স্বপ্নে দেখা মহান সত্য বাস্তবের অসত্য থেকে অনেক ভাল, অতএব একটা স্বপ্ন দেখা যাক।

তোমরা জান অনেক রকম স্তরের মন আছে, তুমি হয়ত একজন বাস্তববাদী বুদ্ধিজীবী যুক্তিবাদী। ধর্মীয় কর্মকাণ্ড, মূর্তি, প্রতীক এসব তোমার পছন্দ নয়। তুমি চাও বুদ্ধিগ্রাহ্য, নির্ভেজাল তথ্য এবং একমাত্র তাতেই তোমার সন্তুষ্টি সম্ভব। আবার আছে অতিরিক্ত নিষ্ঠাবানরা, যেমন মহম্মদীয়রা, তারা তাদের উপাসনাকক্ষে একখানাও ছবি কিংবা মূর্তি রাখতে দেবে না। বেশ কথা! কিন্তু আর একজন মানুষ তার আবার শিল্পজনচিত মন। তার চাই অনেক রকমের শিল্পবস্তু, রঙ-রেখার বৈচিত্র্য ফুল, নানা আকার আকৃতি, তার চাই মোম, আলো আর ধর্মের কর্মকাণ্ডের সব উপাদান। তাহলেই সে ভগবানের দর্শন পায়। এই সব আকার আকৃতির ভিতর দিয়েই তার মন ভগবানকে অনুভব করে, তোমার যেমন করে বুদ্ধির ভেতর দিয়ে। তাছাড়া আছেন ভক্ত—তার আত্মা ঈশ্বরাবিষ্ট, তাঁর চোখে অশ্রুধারা। ঈশ্বর উপাসনা ছাড়া আর তাঁর গুণকীর্তন ছাড়া এর আর অন্য কোন চিন্তাই নেই। এ সব কিছুর বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন আরেক জন। তিনি দার্শনিক। তিনি ভাবছেন, "কি নির্বোধ এই মানুষগুলো! ঈশ্বর সম্বন্ধে কি সব ধারণা!"

এরা সবাই পর স্পরকে নিয়ে হাসাহাসি করতে পারে। কিন্তু এদের প্রত্যেকের জন্য জায়গা আছে পৃথিবীতে। বিভিন্ন মন, বিভিন্ন ধরন—সব কিছুরই প্রয়োজন আছে। যদি কোথাও কখন একটি আদর্শ ধর্ম আসে—তাহলে তার বিস্তার ও পরিধি যথেষ্ট বড় হতে হবে যাতে করে এদের সবার মনের খোরাককে মেটানো যায়। দার্শনিককে দিতে হবে দর্শনের শক্তি; ভক্তকে যোগাতে হবে ভক্তের হৃদয়। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের বিশ্বাসীকে দিতে হবে চমকপ্রদ প্রতীক। কবিকে খুলে দিতে হবে হৃদয়ের দরজা। এই রকম একটি উদার ধর্মকে তৈরী করতে হলে আমাদের চলে যেতে হবে সুদূর অতীতে যেখানে একদিন ধর্মের শুরু হয়েছিল। সেখানেই একত্রিত করতে হবে সকলকে। আমাদের মূলমন্ত্র হবে গ্রহণ, বর্জন নয়। কেবল মাত্র সহিষ্ণুতা নয়, কারণ তথাকথিত ধর্মসহিষ্ণুতা অনেক সময়ে অবজ্ঞায় পর্যবসিত হয়। আমি তাতে বিশ্বাস করি না। আমার বিশ্বাস স্বীকৃতিতে। সহিষ্ণুতা মানে হলো আমি জানি তোমার ধ্যান ধারণা সবই ভ্রমাত্মক, আমি তবুও তোমাকে বাঁচতে দিচ্ছি। তোমার

আমার পক্ষে এমন কথা বলা কি ঈশ্বরদ্রোহিতা নয়? অতীতের সব ধর্মকে আমি স্বীকার করি। তাদের সবাকার সঙ্গে একত্র উপাসনা করি। তারা যে যে ভাবেই ঈশ্বরকে উপাসনা করুন না কেন—আমি তাদের প্রত্যেকের সহযোগী। আমি মুসলমানের মসজিদে যাবো। খ্রীষ্টানের চার্চে গিয়ে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর সামনে নতজানু হবো। বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে বুদ্ধের স্মরণ নেবো। যে হিন্দুরা সর্ব-অন্ধকারহরণকারী আলোকসন্ধানী গভীর অরণ্যে গিয়ে তাদের সঙ্গে সাধনায় বসবো।

আমি শুধু তাই করবো না। ভবিষ্যতে যারা আসবে তাদের জন্যও হৃদয় উন্মুক্ত করে রাখবো। ভগবানের রচনা কি সমাপ্ত হয়েছে? নাকি প্রত্যাদেশ বাণী ক্রমাগত প্রকাশিত হচ্ছে? আধ্যাত্মিক প্রত্যাদেশগুলির সঙ্কলনের গ্রন্থটি অনবদ্য বাইবেল, বেদ, কোরান এই গ্রন্থেরই অন্তর্গত পত্রসমষ্টি। কিন্তু আরও অসংখ্য পত্র এখন অপ্রকাশিত রয়েছে। সকলের জন্যই উন্মুক্ত থাক তারা। আমরা বর্তমানের বুকে দাঁড়িয়ে অসীম ভবিষ্যতের কাছে নিজেদের উন্মুক্ত করি। অতীতের সব কিছুকে আমরা গ্রহণ করি, বর্তমানের আলোতে উদ্ভাসিত হই আর অনাগত ভবিষ্যতের জন্য হৃদয়ের সব জানালাগুলি খুলে দেই। অতীতের সব ধর্মপ্রবর্তকদের, বর্তমানের সব মহাত্মাদের, এবং ভবিষ্যতে যাঁরা আসবেন তাঁদের—এঁদের সকলকে আমার প্রণিপাত।

সার্বিক ধর্মের আদর্শ

[কি ভাবে এটি বিভিন্ন প্রকার মানুষ ও প্রণালীকে আকর্ষণ করবে]

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই হোক অথবা মনের গোচরীভূত চিন্তাই হোক—সব কিছুর মধ্যেই দুটি শক্তির অবিরাম পারস্পরিক সংঘাত আমরা দেখতে পাই। ফলত আমাদের চতুর্দিকে যাই আমরা দেখি অথবা মনে মনে অনুভব করি সব কিছুই পরস্পর বিরোধিতার একটা মিশ্র প্রকাশ। বহির্জগতে পরস্পর-বিরোধিতার প্রকাশ পায় আকর্ষণে আর বিকর্ষণে, অথবা অন্তর্মুখীতায় এবং বহির্মুখীতায়; অন্তর্জগতে এর প্রকাশ যেমন, প্রেম-ঘৃণা, সৎ-অসৎ। আমরা কাউকে আকর্ষণ করি আবার কাউকে বিকর্ষণ করি। কারো প্রতি আমারা আকৃষ্ট হই, কারুর ওপর বিরূপ হই, জীবনে বহুবার আমরা অকারণেই কোন মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এবং সেই রকমই কারুর ওপর আমরা অকারণেই বিরূপ হই, সকল ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। কর্মক্ষেত্র যতই উর্ধ্বতর হয় এই পরস্পরবিরোধিতা ততই চমকপ্রদ ও ফলপ্রসূ হয়ে দেখা দেয়। মানুষের জীবনে এবং চিন্তায় ধর্মই সর্বোচ্চ স্তর। সেখানে এই পরস্পরবিরোধিতার প্রকাশ সব চাইতে বেশী লক্ষণীয়। মানব অভিজ্ঞতায় প্রেমের চরম অভিব্যক্তি ধর্ম থেকেই সঞ্জাত, তেমনি মানব জীবনে জঘন্যতম বিদ্বেষও ধর্ম থেকেই উদ্ভূত। ধর্মজীবনে অধিষ্ঠিত মানুষের মুখ থেকেই পৃথিবীর মহত্তম শান্তির বাণী নিঃসৃত হয়েছে। আবার তীব্রতম বিষোদ্গারও মানুষ শুনেছে ধর্ম বিশ্বাসী মানুষের মুখ থেকেই। ধর্মের উদ্দেশ্য যতই মহত্তর হয়, তার সংস্থা যতই সুপরিকল্পিত হয়, তার কর্মধারা ততই চমকপ্রদ হয়ে ওঠে। ধর্মের প্রেরণার মত অন্য কোন প্রেরণা পৃথিবীকে রক্তগঙ্গায় প্লাবিত করতে পারেনি। আবার সেই একই প্রেরণা মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে রোগীর কল্যাণে অসংখ্য হাসপাতাল স্থাপন করতে, দরিদ্র মানুষের জন্য বাসভূমি স্থাপন করতে।

ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন পার্থিব শক্তি শুধু মানুষ নয় সমস্ত প্রাণী জগতের কল্যাণ কামনায় এমন যত্নবান হয়নি। একদিকে আমাদের নিষ্ঠুর করে তুলতে, অন্যদিকে আমাদের অন্তরকে কোমলতায় ভরিয়ে দিতে ধর্ম যেমন পারে আর কোন শক্তিই তা পারে না। বিগত কালেও এই ঘটেছে, এবং আগামী কালেও এই রকমই ঘটবার সম্ভাবনা। কিন্তু এই সব ধর্ম আর সম্প্রদায়ের উত্তাল কোলাহল, দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, ঈর্ষা-বৈরিতাকে অতিক্রম করে যুগে যুগে উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে শান্তি আর সংহতির ফলপ্রসূ বাণী। সে বাণী আর সব কলকণ্ঠকে নির্বাক করে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে।

ধর্মের ক্ষেত্রে প্রবল বৈরীতা সত্বেও নিরবচ্ছিন্ন সংহতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। সংহতির প্রশ্ন নিয়ে এই শতকের শেষভাগে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে। সমাজে নানা ধরনের পরিকল্পনা ভাবা হচ্ছে, চেষ্টা হচ্ছে সেইসব পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করবার। কিন্তু আমরা জানি কি দুঃসাধ্য এই কাজ। দেখা যায় জীবন সংগ্রামের তীব্রতাকে এতটুকু লাঘব করা, মানুষের নার্ভাস টেনসনকে সামান্য পরিমাণেও প্রশমিত করা দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা। মানবজীবনের স্থূল বহিরাংশে শান্তি

এবং সংহতি প্রতিষ্ঠা করাই যদি দুঃসাধ্য হয়, তাহলে তার অন্তঃপ্রকৃতিকে শান্তি এবং সংহতি দিয়ে শাসন করা সহস্রগুণে দুঃসাধ্য হবে।

এবারে আমি তোমাদের বলবো আপাতত বাক্যের জাল থেকে নিজেদের মুক্ত করো। আমরা সবাই শিশুকাল থেকেই এই সব কথাগুলি শুনে আসছি, যেমন, প্রেম, শান্তি, দয়া, সাম্য এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব। কিন্তু এগুলো এখন প্রায় অর্থহীন বাক্যসর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথাগুলি আমরা তোতাপাখীর মত বলি বারবার। অবশ্য এটা স্বাভাবিক; কারণ আমরা অনন্যোপায়। যেসব মহান্ আত্মা এই সব শব্দগুলির স্রষ্টা তাঁরা এই সব অনুভূতিগুলি অন্তরের গভীরে অনুভব করেছিলেন। পরবর্তী কালের জ্ঞানহীন মানুষরা এই বাক্যগুলিকে নিয়ে খেলা করেছে। ধর্মকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত না করে নিতান্তই বাক্যলীলায় পরিণত করেছে। তাই ধর্ম হয়ে দাঁড়াল "আমার পিতৃপুরুষের ধর্ম", "আমাদের দেশের ধর্ম"; "আমাদের জাতির ধর্ম"; ধর্মানুসরণটা হয়ে উঠলো দেশপ্রেমের একটা অঙ্গ মাত্র। আর দেশপ্রেম সবসময়েই খানিকটা 'একচোখো'। ধর্মের ক্ষেত্রে সংহতি ও সমন্বয় আনা দুরূহ ব্যাপার। তবুও আমরা ধর্মের ক্ষেত্রে সংহতির প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা করবো।

বিরাট এবং স্বীকৃত সবগুলো ধর্মের মধ্যেই আমরা তিনটি করে বিভাগ দেখতে পাই। প্রথম বিভাগ হলো: দর্শন। দর্শনের বিষয় হলো আদি তত্ত্বভিত্তিক মূল বিষয়বস্তু, লক্ষ্য, এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার পন্থা। দ্বিতীয় বিভাগ হলো: পৌরাণিক কাহিনী। দর্শনে খানিকটা জীবন্ত রূপ পাওয়া যায় মানুষ এবং অতি-প্রাকৃত জীবদের নিয়ে রচিত কাহিনীতে। অর্থাৎ দর্শনের চিন্তা-ভাবনাগুলি খানিকটা রূপায়িত হয়ে ওঠে কল্পিত নরনারী এবং অতিপ্রাকৃত জীবদের গল্প-কাহিনীর ভিতর দিয়ে। তৃতীয় বিভাগটি হলো: ধর্মীয় কর্মকাণ্ড। বহুরকমের প্রতীক, যাগযজ্ঞ, যোগভঙ্গী, পুষ্প, ধূপ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ভিতর দিয়ে দর্শন চিন্তা প্রকটতর হয়। সমস্ত স্বীকৃত ধর্মমতের মধ্যেই এই অংশ দেখতে পাওয়া যায়। কেউ হয়ত একটি অংশের ওপর গুরুত্ব দেন কেউ বা অন্য একটিতে।

প্রথমে, দর্শন নিয়ে আলোচনা করা যাক। সত্যিই সার্বিক দর্শন বলে কি কিছু আছে? এখনও পর্যন্ত নেই। প্রত্যেক ধর্মই তার নিজের তত্ত্বটিকে তুলে ধরে বোঝাতে চেষ্টা করে যে সেটাই একমাত্র সত্য। শুধু তাই নয়। তারা সবাই মনে করেন যে তাদের বিশেষ সত্যটিতে যারা বিশ্বাস করবে না জীবনান্তে তাদের স্থান হবে অতি ভয়াবহ কোন স্থানে। কেউ কেউ আবার তলোয়ার তুলেও অপরকে আপন ধর্মবিশ্বাসে বাধ্য করাতে চান। এসব কিন্তু দুষ্টু বুদ্ধি প্রণোদিত নয়। এ সবের মূল কারণ হলো মানব মস্তিষ্কের বিশেষ ধরনের একটি ব্যাধি—যার নাম হলো ধর্মান্ধতা। এই ধর্মান্ধ মানুষগুলির কিন্তু আন্তরিকতার কোন অভাব নেই; এদের মত আন্তরিকতা বোধহয় পৃথিবীর আর কোন মানুষেরই নেই। কিন্তু পৃথিবীর আর সব উন্মাদদের মতই এরাও দায়িত্বজ্ঞানহীন। ধর্মান্ধতা হলো মারাত্মক ব্যাধিগুলির অন্যতম। মানুষের অন্তানহিত সব নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলে

এই ব্যাধি। ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে, স্নায়ু উত্তেজিত হয় এবং মানুষ ব্যাঘ্র-প্রকৃতি ধারণ করে।

বিভিন্ন ধর্মের পুরাণ কাহিনীর মধ্যেই কি কোন মিল সংহতি আছে? অথবা এমন কোন পুরাণ কাহিনী কি আছে যাকে সার্বিক আখ্যা দেওয়া যায়? নিশ্চয়ই নয়। সব ধর্মেরই একটি করে নিজস্ব পুরাণ কাহিনী আছে। তারা প্রত্যেকেই বলবে, "আমার কাহিনীগুলি নিছক কল্পনা নয়।" একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক বিষয়টা। আমি উদাহরণটা দিচ্ছি কেবল বোঝানোর জন্য, কোন ধর্মের সমালোচনা করার কোন উদ্দেশ্য আমার নেই।

খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর ঘুঘু পাখীর রূপ নিয়ে ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাদের কাছে এটা পুরাণ নয়, এটা ইতিহাস।

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে গরুর ভিতর দিয়ে ঈশ্বর প্রকটিত। এ কথা শুনে খ্রীষ্টানরা বলবেন এই ধরনের বিশ্বাস নিতান্তই পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নয়। এটা একটা অন্ধ-বিশ্বাস। ইহুদীরা মনে করেন যে বাক্সের আকারে একটা প্রতীক তৈরী করে তার দুই পাশে যদি দুইটি দেব-শিশুর মূর্তি বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সেটা হয় পবিত্রতম বস্তু। জেহোভার কাছেও সেটা পূত-পবিত্র। কিন্তু ঐ মূর্তি যদি কোন সুদর্শন নর বা সুদর্শনা নারীর নয় তখনই তাঁরা বলে উঠবেন, "কি ভয়ানক পৌত্তলিকতা! এখনই ভেঙে ফেল।" আমাদের পৌরাণিক কাহিনীগুলির মধ্যে এই ধরনেরই মিল! কেউ যদি দাঁড়িয়ে উঠে বলে, "আমাদের Prophet এই সব অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়েছিলেন," তখনি অন্যরা বলবে, "ওগুলো নিতান্তই কুসংস্কার," কিন্তু একই সঙ্গে তারা বলবে, তাদের Prophet অবশ্য এসবের চাইতেও অনেক বেশী আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিয়েছেন। আমি যতদূর দেখেছি তাতে পৃথিবীতে কোন মানুষই তাদের মাথার ভেতর যে ধারণাগুলি আছে তা থেকে ইতিহাস এবং পুরাণের সূক্ষ্ম পার্থক্যটি বুঝে উঠতে পারে না। এই সমস্ত কাহিনীই—তা সে যে ধর্মেরই হোক না কেন—আসলে পৌরাণিক, হয়ত সামান্য কোথাও ইতিহাসের সঙ্গে মিলেছে।

তারপর হলো ধর্মীয় কর্মকাণ্ড। একেক সম্প্রদায়ের একেক রকম কর্মকাণ্ড। প্রত্যেকেরই ধারণা যে তাদের কর্মকাণ্ডই—সবচাইতে শুদ্ধ আর পবিত্র, আর অন্যদের কর্মকাণ্ডগুলি একেবারেই কুসংস্কার। এক সম্প্রদায় যদি একটি বিচিত্র ধরনের প্রতীক পূজা করে অন্য সম্প্রদায় বলবে, "ছিঃ, কি জঘন্য!" একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্। লিঙ্গ মূর্তি অবশ্যই একটা যৌন প্রতীক। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষের মন থেকে সেই ধারণাটা মুছে গেছে, এমন লিঙ্গ মূর্তি সৃষ্টিকর্তারই প্রতীক। যে জাতি লিঙ্গ মূর্তির উপাসক তারা সেই প্রতীককে কখনই লিঙ্গ জ্ঞানে উপাসনা করে না, কিন্তু অন্য কোন জাতি বা বিশ্বাসের কোন মানুষ ঐ মূর্তিকে লিঙ্গ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না এবং নিন্দাবাদ করতে শুরু করে। কিন্তু সেই মানুষই হয়ত এমন কিছু করে যেটা তথাকথিত লিঙ্গ-উপাসকদের কাছে বীভৎস বলে মনে হয়। দুটো উদাহরণ নেওয়া যাক, লিঙ্গমূর্তি এবং খ্রীষ্টানদের প্রতীক sacrament. খ্রীষ্টানদের কাছে লিঙ্গমূর্তি একটি

বীভৎস ব্যাপার। আবার হিন্দুদের কাছে sacrament হলো একজনকে হত্যা করে তার মাংস খাওয়া আর তার রক্ত পান করা হয় সেই মৃত ব্যক্তির সদ্‌গুণগুলি আহরণের জন্য—এটা নিতান্তই নরখাদকীয় কাণ্ড। সত্যিই কোন কোন বর্বরজাতির মানুষরা এই কাণ্ডই করে, কেউ যদি খুব সাহসী হয়, সেই বর্বররা তাকে হত্যা করে হৃদ্‌পিণ্ডটি খেয়ে ফেলে। কারণ তাদের ধারণা এই উপায়ে মৃত ব্যক্তির সাহস এবং বীরত্বের অধিকারী হওয়া যায়। Sir John Lubbock-এর মতন ভক্ত খ্রীষ্টানও মনে করেন যে sacrament প্রতীকের মূলে আছে এই বর্বরজনোচিত প্রথা। খ্রীষ্টানরা অবশ্যই এটা মানবেন না। এসব কথা তাঁদের মনেও আসে না। sacrament পবিত্রতার প্রতীক। সেইটুকু জানাই তাদের পক্ষে যথেষ্ট। দেখা যাচ্ছে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপারেও কোন সার্বিক প্রতীক নেই। তাহলে সার্বিকত্বটা কোথায়? এবং সার্বিক ধর্ম সম্ভবই বা হবে কি করে? তবুও বলছি সেরকম ধর্ম আছে। দেখা যাক্ কেমন তার রূপ?

আমরা সবাই বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা শুনতে পাই এবং এই আদর্শ প্রচারের জন্য কত সংস্থাই না গড়ে উঠছে। একটা পুরনো গল্প মনে হলো এই প্রসঙ্গে। ভারতবর্ষে মদ্যপানকে খুব গর্হিত কাজ বলে মনে করা হয়। দুটি ভাই ছিল, মদ্যপানের ইচ্ছা হওয়ায় একরাত্রে তারা খুব গোপনে সব ব্যবস্থা করলো, তাদের কাকা ছিলেন খুব গোঁড়া প্রকৃতির মানুষ, তিনি পাশের ঘরেই নিদ্রিত ছিলেন। তাই মদ্যপান শুরু করবার আগে তারা পরস্পরকে বলল, "একেবারে কোন শব্দ নয়, নইলে কাকা কিন্তু জেগে উঠবেন।" মদ্যপান শুরু করেই ওরা ক্রমশ উচ্চতর কণ্ঠে পরস্পরকে বার বার বলতে লাগল, "চুপ, কাকা জেগে উঠবেন।" তাদের ক্রমবর্ধমান চীৎকারের ফলে কাকা ঘুম ভেঙে তাদের ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। সমস্ত ব্যাপারটাই ফাঁস হয়ে গেল। আজকাল আমরাও সবাই ঐ মদ্যপ ভাইদুটির মতই চীৎকার করি, "বিশ্বভ্রাতৃত্ব! আমরা সবাই সমান, এসো আমরা দল গড়ি।" যেই দলটি গড়া হলে—আর সাম্যের কথা কেউ বলল না। সাম্যকেও আর দেখা গেল না, মুসলমানরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা বলে বটে কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা কি? যে মুসলমান নয় সে আর বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভিতর নেই। তখন তার গলাটা কাটা যাবারও সম্ভাবনা। খ্রীষ্টানরাও বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা বলে। কিন্তু যারা খ্রীষ্টান নয়, এদের বিশ্বাস, তারা মৃত্যুর পর এমন একটি স্থানে যাবে যেখানে তাদের চিরকাল ধরে আগুনে ঝলসানো হবে। অতএব পৃথিবীতে আমরা এমনি করেই বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং সাম্য খুঁজে বেড়াচ্ছি, যখন এই ধরনের কথা শুনবে একটুও আগ্রহ না দেখিয়ে বরং সাবধান হয়ো। শীতকালে কখনও কখনও বজ্রবাহী মেঘ দেখা যায়। এ মেঘ যত গর্জে তত বর্ষে না, কিন্তু বর্ষার মেঘ বিনা গর্জনেই পৃথিবীকে প্লাবিত করে। তাই যারা সত্যিকারের কর্মী, যারা সত্যিই বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা অন্তরে অনুভব করে, তাদের বাগাড়ম্বর নেই, তারা ছোট ছোট দলও বাঁধে না। কিন্তু তাদের কর্মধারা, তাদের আচরণ, তাদের জীবনযাত্রা দেখেই বোঝা যায় যে তাদের অন্তরে বিশ্বভ্রাতৃত্বের অনুভূতি, সকলের জন্য প্রেম ও সহানুভূতি। তারা কথা বলে না, তারা কাজ করে। এই দুনিয়াটায় বড় বেশী বাক্যের বহ্বাড়ম্বর। আমরা চাই আর একটু বেশী আগ্রহশীল কাজ আর কম কথা।

আমরা এ পর্যন্ত দেখেছি সর্বজনগ্রাহ্য একটি সার্বিক ধর্মকে খুঁজে পাওয়া একটি দুরূহ কাজ। কিন্তু আমরা জানি যে সেরকম একটি ধর্ম রয়েছে। আমরা সবাই মানুষ কিন্তু আমরা সবাই কি এক রকম? নিশ্চয়ই না। পাগল ছাড়া এমন কথা কেউ বলবে না। বুদ্ধিতে, শক্তিতে, দেহে—সবাই কি আমরা এক রকম? একজনের দেহের শক্তি আরেকজনের চাইতে বেশী, আবার একজনের মেধা আরেকজনের চাইতে বেশী, আমরা সবাই যদি সমান আর একই রকম হতাম—তাহলে অসাম্য কেন? কার সৃষ্টি এই অসাম্য? আমাদেরই সৃষ্টি, কারণ, আমাদের মধ্যে কারু ক্ষমতা বেশী কারু কম, কারু মেধা বেশী কারু কম, কারু শক্তি বেশী কারু কম। তাই আমাদের ভেতর অসমতা থাকবেই। কিন্তু তবু আমরা জানি যে সাম্যর বাণী আমাদের অন্তরে সাড়া জাগায়। আমরা সবাই মানুষ কিন্তু তার মধ্যে পুরুষও আছে, স্ত্রীলোকও আছে। কেউ কালো, কেউ আবার ফর্সা। তবু সবাই একই মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কত বিভিন্ন রকমের মুখ; জীবনে দুটি মুখ একরকম দেখিনি কখনও। তাহলে কেমন করে এক হলো সবাই? আমি জানি এই বৈচিত্র্যে ভরা বিভিন্ন মানুষের অন্তরেই একটি বৈষম্যহীন, বিমূর্ত মানবসত্তা অধিষ্ঠিত আছে। যখনই তাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে স্পর্শ করবার, বাহ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করি তখন তাকে হয়ত পাই না কিন্তু স্থির নিশ্চিতভাবে জানি যে সে আছে। কোন কিছু সম্বন্ধে আমার যদি সুনিশ্চিত প্রত্যয় থেকে থাকে সে হলো এই মানবসত্তা যার অধিকারী প্রতিটি মানুষ, সর্বজনে প্রতিষ্ঠিত এই সমসত্তাটির মধ্য দিয়েই আমি তোমাদের দেখছি—পুরুষ বা নারী হিসাবে। ঠিক সেই রকমই হলো সার্বিক ধর্ম, ঈশ্বররূপে এই সার্বিক ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত ধর্মবিশ্বাসের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত, অনন্তকাল ধরে সে আছে এবং থাকবে। 'মুক্তামালার মুক্তাগুলির ভিতর দিয়ে যে সূত্রটি বিদ্যমান—আমিই সেই সূত্র' এবং প্রত্যেকটি ধর্মই একটি মুক্তা এবং প্রত্যেকটি মুক্তার অন্তরেই সূত্রস্বরূপ ঈশ্বর বিরাজিত। কেবল মানবগোষ্ঠীর অধিকাংশের কাছেই একথা অপরিজ্ঞাত।

মহাবিশ্বের পরিকল্পনায় মূল কথা হলো: বহুর মধ্যে এক। আমরা সবাই মানুষ অথচ আমাদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন রূপ। মানবগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে আমি তোমাদের থেকে অভিন্ন আবার শ্রীযুক্ত অমুক হিসেবে আমি তোমাদের থেকে পৃথক। মানুষ হিসেবে পশুদের থেকে তোমরা ভিন্ন কিন্তু প্রাণধারী জীব হিসেবে নর, নারী, পশু, বৃক্ষাদি সবই একের অংশ এবং শুধু একটি সত্তা হিসেবে তোমরা মহাবিশ্বের মধ্যে একত্রীভূত। সার্বিক সত্তা হলেন ঈশ্বর, তাঁর ভেতরই মহাবিশ্বের মূল ঐক্য, তাঁর সত্তায় আমাদের সকলের সত্তাই বিলীন, কিন্তু মানবসত্তার বহিঃপ্রকাশে অসাম্য চিরকালের। আমাদের কর্মে, আমাদের প্রাণশক্তির প্রকাশভঙ্গীতে বিভিন্নতা আর পার্থক্য চিরকাল ধরেই থাকবে। সার্বিকধর্ম বলতে যদি ভাবা যায় একটা সর্বজনগ্রাহ্য মত সেটা হবে অসম্ভবের ভাবনা। সমস্ত মানবগোষ্ঠীর জন্য একটি সার্বিক পুরাণ কাহিনী সেইরকমই অসম্ভব। ধর্মের একটি সার্বিক কর্মকাণ্ডও ভাবা যায় না। এই ধরনের একটা সার্বিক অবস্থা কখনই হতে পারে না। যদি তাই হতো পৃথিবী তাহলে ধ্বংস হতো। কারণ বৈচিত্র্যই জীবনের প্রধান উপাদান। আমাদের এই দেহধারী অবস্থাটা সৃষ্ট হয়

কি থেকে? বিভিন্নতা থেকেই, পূর্ণ সমতা ধ্বংসের কারণ হতো, ধরো, এই ঘরের ভেতর যে উত্তাপটুকু আছে সেটা তার আপন স্বভাবেই চারিদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়তে চায়। কিন্তু যদি সত্যিই সমান এবং পরিপূর্ণভাবে ছড়িয়ে পড়তো তাহলে প্রকৃতপক্ষে উত্তাপেরই আর কোন অস্তিত্ব বজায় থাকতো না। গতি ব্যাপারটাই বা সম্ভব হয় কি করে? ভার-সাম্যের অভাব থেকেই। শুধুমাত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইতিতেই সমতা আসতে পারে, তা নইলে নয়।

প্রত্যেকটি মানুষ একই রকম চিন্তা করবে সেটা কখনই কাম্য নয়। কারণ তাহলে সব চিন্তারই অবসান হবে। তখন আমরা সবাই একই রকম হয়ে গিয়ে যাদুঘরে শায়িত ইজিপ্টের মমীর মত সব চিন্তা-ভাবনা হারিয়ে পরস্পরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবো। মানুষে মানুষে এই যে পার্থক্য, এই যে বিভিন্নতা, এই যে অসম অবস্থান—এটাই হলো প্রগতি আর চিন্তার আত্মস্বরূপ। এ হলো চিরকালের কথা।

তাহলে সার্বিক ধর্মের আদর্শ বলতে আমি কি বুঝবো? সর্বজনগ্রাহ্য একটি সার্বিক দর্শন, সার্বিক পুরাণ কাহিনী অথবা একটি সার্বিক ধর্মীয় কর্মকাণ্ডর কথা আমি বলছি না। কারণ আমি জানি যে নানা পাকে-চক্রে গঠিত অত্যন্ত জটিল ও অত্যন্ত বিস্ময়কর জগৎ-রূপী এই বিরাট যন্ত্র চিরকাল এইভাবেই চলবে।

তাহলে কি করতে পারি আমরা? আমরা এই বিশাল যন্ত্রটিকে যেন তৈলমসৃণ করে, এর গতিতে একটা স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে পারি। কিন্তু কিভাবে? বিভিন্নতা ও বৈষম্যের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়ে। অন্তরের সত্তার ঐক্য আমরা যেমন হৃদয়ঙ্গম করেছি, তেমনি বৈচিত্র্যকেও স্বীকৃতি দিতে হবে, আমাদের বুঝতে হবে যে লক্ষ পন্থায় একটি সত্যকে ব্যক্ত করা সম্ভব এবং এর প্রতিটি পন্থাতেই আছে সত্যের নির্দেশ। আমাদের এ কথাও বুঝতে হবে যে একশ রকমদৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখা গেলেও দৃষ্ট বস্তুটি কিন্তু একই। সূর্যের উদাহরণটি নেওয়া যাক, ধরা যাক কেউ একটি ক্যামেরা নিয়ে সূর্যে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। সূর্যে পৌঁছনো পর্যন্ত সে তার যাত্রার প্রতিটি বিভিন্ন স্তরে স্তরে সূর্যের অসংখ্য ছবি তুললো। বিভিন্ন স্তর থেকে তোলা সূর্যের বিভিন্ন ছবির রূপও হবে বিভিন্ন। সত্যি কথা বলতে যখন সে ফিরে আসবে মনে হবে অনেক রকমের সূর্যের অনেকগুলো ছবি নিয়ে সে ফিরেছে।

সৃষ্টিকর্তার বেলায় এই একই কথা প্রযোজ্য। উচ্চমান অথবা নিম্নমান দর্শনের মাধ্যমেই হোক, মহান অথবা নিকৃষ্ট পুরাণ কাহিনীর মাধ্যমেই হোক, পরিমার্জিত ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের অথবা অসার পৌত্তলিকতার মাধ্যমেই হোক, প্রতিটি আত্মা, প্রতিটি ধর্ম, প্রতিটি জাতি, প্রতিটি সম্প্রদায়, সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে, নিরন্তর প্রচেষ্টায় ঊর্ধ্ব-মুখেই চলেছে সৃষ্টিকর্তার পানে। মানুষ যখনই সত্যের কোন আভাস পায় সেটা সৃষ্টিকর্তারই আভাস। আর কারু নয়।

মনে করো আমরা সবাই এক একটি পাত্র নিয়ে পুকুর থেকে জল আনতে গেলাম। কেউ পেয়ালা, কেউ মগ, কেউ বা বালতি—এইরকম সব বিভিন্ন পাত্রে জল ভরে নেওয়া হলো। স্বাভাবিক নিয়মেই বিভিন্ন পাত্রের জল বিভিন্ন পাত্রগুলির আকারই

নেবে। যে পেয়ালা নিয়েছিল তার জল পেয়ালার আকার, যে মগ নিয়েছিল তার জল মগের আকার ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু প্রত্যেকটি পাত্রেই যা আছে তা শুধু জল আর জল। জল ছাড়া কিছুই নয়। ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই। আমাদের মনগুলি ঐ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রগুলির মতন। আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরানুভূতির পথে চলবার চেষ্টা করছি। ঈশ্বর জলের মতই বিভিন্ন পাত্রে অবস্থান করছেন। আপন অস্তিত্বের আভাস দিচ্ছেন ঐ পাত্রের রূপ নিয়ে। কিন্তু তিনি একম অদ্বিতীয়ম, সর্ব অবস্থাতেই তিনি আপন-স্বরূপ ঈশ্বর। সার্বিকতার এই একটিমাত্র পরিচয়ই আমরা পেতে পারি।

এটা হলো তত্ত্ব। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে ধর্মের ক্ষেত্রে এই সমন্বয়কে প্রয়োগ করবার কি কোন পন্থা আছে? সব ধর্মই যে সত্য এ স্বীকৃতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে, অনেক কাল থেকেই সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা ভাবা হয়েছে। এমন একটি দ্বন্দ্ব-বিহীন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করা যেখানে সব ধর্মের সপ্রেম মিলন হবে। ভারতবর্ষে, আলেকজেন্দ্রিয়ায়, চীনে, জাপানে এবং সবশেষে আমেরিকায় এই ধরনের প্রচেষ্টা কতই না হয়েছে। কিন্তু সব দেশই অকৃতকার্য হয়েছে। কারণ কেউই কোন বাস্তব পরিকল্পনা নিতে পারে নি। অনেক মানুষই এ কথা স্বীকার করে যে সব ধর্মই সত্য। কিন্তু এমন কোন বাস্তব পন্থা দেখাতে পারে না যার মাধ্যমে সমস্ত ধর্মকে একত্রীভূত করেও প্রত্যেক ধর্ম তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখতে পারে। স্বকীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি না দিয়েও অন্য ধর্মের সঙ্গে তার ঐক্যবিন্দুগুলি মানুষকে দেখিয়ে দেওয়াই হলো একমাত্র বাস্তব পরিকল্পনা। এখন পর্যন্ত ধর্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টাগুলির প্রস্তাবে যদিও সব ধর্মের মতকে নিয়েই একটি পথের কথা ভাবা হয়েছে, কিন্তু কার্যত বিশেষ কতগুলি মতের বাঁধনেই সবাইকে বাঁধবার চেষ্টা হয়েছে। ফলত সৃষ্টি হয়েছে নতুন সম্প্রদায়ের, তাদের অন্তর্কলহ; একের অপরকে হটাবার চেষ্টা।

আমারও একটি ছোট পরিকল্পনা আছে। আমি জানি না সেটা কার্যকরী হবে কিনা। তবুও আলোচনার জন্য সেটা তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। কি আমার পরিকল্পনা? প্রথমতঃ আমি সমস্ত মানবগোষ্ঠীর কাছ থেকে একটি নিয়মের স্বীকৃতি চাই: 'ধ্বংস করো না,' ধ্বংসাভিলাষী সংস্কারকরা পৃথিবীর কোন ভাল করে না। ভেঙে ফেলো না, কোন কিছুকেই টেনে নামিও না, গড়তে চেষ্টা করো। যদি সাহায্য করতে পার ত করো; যদি অপারগ হও, তাহলে সরে দাঁড়াও। সহায় না হতে পারো, কিন্তু আঘাত হেনো না। সরল আন্তরিকতায় মানুষ যা বিশ্বাস করে তার বিপক্ষে একটি কথাও উচ্চারণ করো না'। যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তাকে সেইখানেই গ্রহণ করে সামনে অগ্রসর হতে সাহায্য করো। একথা যদি সত্য হয় যে ঈশ্বরই সমস্ত ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু এবং আমরা সকলেই তাঁর দিকে কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে চলেছি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সবাই একদিন সেই কেন্দ্রে পৌঁছবই। কেন্দ্রাভিমুখী পথগুলি সবই কেন্দ্রে গিয়েই মিলিত হয়; সেখানে পৌঁছলেই তো সব বিরোধের অবসান। মানুষ তার আপন স্বভাব অনুযায়ী কেন্দ্রাভিমুখী পথগুলির মধ্যে যে কোন একটি পথ ধরে চলে, অন্য কেউ অন্য আর একটি পথ। আমরা যে যার নির্ধারিত পথে যদি এগিয়ে চলি আমরা অবশ্যই একদিন কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছবো, কারণ 'সব রাস্তাই রোমে

গিয়ে পৌঁছোয়।' আমরা প্রত্যেকেই স্বাভাবিক নিয়মে আপন স্বভাব অনুসারে বাড়ছি, এগিয়ে চলেছি। প্রত্যেকেই কোন একটা সময়ে শ্রেষ্ঠ সত্যটি জানতে পাবো। তুমি বা আমি কিই-বা করতে পারি? তুমি কি মনে করো একটা শিশুকেও শিক্ষা দেবার ক্ষমতা আছে তোমার? নেই, শিশু নিজেকেই নিজে শেখায়। তোমার কাজ হলো সুযোগ করে দেওয়া, শিক্ষার পথে কোন বাধা থাকলে তাকে সরিয়ে দেওয়া। চারাগাছ আপনিই বাড়ে। তুমি কি বাড়াতে পার তাকে? তোমার কর্তব্য সেটার চারদিকে বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে দেওয়া, কোন পশু যাতে ওটা খেয়ে না ফেলে। তোমার কর্তব্য ঐখানেই শেষ। মানুষের আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রেও তাই। কেউ তোমাকে শেখাতে পারে না, কেউ তোমাকে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারে না, শিখতে হবে নিজেকেই। তোমার অন্তর থেকেই তোমার ক্রমোন্নতি।

বাইরে থেকে গুরু কিই বা করতে পারেন? তিনি হয়ত পথের বাধাবিঘ্ন কিছু সরিয়ে দিতে পারেন এবং তাঁর কর্তব্য সেইখানেই শেষ। সুতরাং যদি পার তো সহায় হও, কিন্তু বিনষ্ট করো না। তুমি কোন মানুষকে আধ্যাত্মিক জীবন দিতে পার—ভুলে যাও সেকথা। অসম্ভব কথা। আপন আত্মা ছাড়া আর কোন গুরু নেই। মেনে নাও এ কথা। সমাজে আমরা কত বিভিন্ন স্বভাবের মানুষ দেখতে পাই। হাজারো রকমের বিচিত্র মন, বিচিত্র মনের গতি। তাদের সবাইকে নিয়ে একটা সর্বাত্মক সাধারণীকরণ করা একেবারেই অসম্ভব, কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োজনে সবাইকে মোটামুটি চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সেইটুকু করতে পারলেই যথেষ্ট। প্রথমতঃ, কর্মমুখী মানুষ অর্থাৎ কর্মী, সে কাজ চায়। তার পেশীতে আর স্নায়ুতে বিশাল কর্মের উৎস। তার লক্ষ্যই হলো কর্ম। সে হাসপাতাল বানায়, দানধ্যানে ব্যস্ত হয়, পরিকল্পনা নেয়, সংগঠন করে। দ্বিতীয়তঃ, ভাবাবেগী মানুষ। শিব ও সুন্দরের প্রতি তার অপরিমিত প্রেম ভালবাসা। সুন্দরের চিন্তায় মগ্ন থাকতে ভালবাসে সে, ভালবাসে প্রকৃতির রূপ-মাধুর্য উপভোগ করতে। প্রেমময় ঈশ্বরের প্রতি সে ভক্তিরসে আপ্লুত। সর্বকালের মহাপুরুষদের, ধর্মগুরুদের এবং ঈশ্বরের অবতারদের সে তার হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি দিয়ে ভালবাসে। বুদ্ধ এবং যীশুর অস্তিত্ব তার কাছে যুক্তি-প্রমাণসাপেক্ষ নয়। Serman of Mount কবে কোন তারিখে প্রচারিত হয়েছিল অথবা কৃষ্ণের জন্মমুহূর্তটি কখন ছিল—এসব নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। মহাপুরুষদের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের চিরসুন্দর অবয়ব—সেইটুকুই শুধু তার প্রয়োজন। এইরকমই তার আদর্শ; এই হলো ভাবাবেগী মানুষ, ভক্তের স্বভাব। তৃতীয়তঃ জীবন-রহস্য সন্ধানী মানুষ। এরা আত্ম-বিশ্লেষণ করতে চায়, বুঝতে চায় মানব মনের কর্মপদ্ধতি, জানতে চায় দেহের অন্তরালে কাজ করে কোন শক্তি? এসবই সে জানতে চায়। আরও জানতে চায় এই অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির ওপর অধিকার বিস্তার করবার পন্থাই বা কি? এই হলো জীবন রহস্য সন্ধানীর মনের কাঠামো। তারপর চতুর্থতঃ হলেন দার্শনিক বা তত্ত্বজ্ঞানী। তিনি সব কিছুকেই যুক্তির তুলাদণ্ডে ওজন করে বুঝতে চান। যুক্তির ব্যবহারে দর্শনের সম্ভাব্য পরিধিকেও অতিক্রম করতে চান।

মানবগোষ্ঠীর অধিকাংশকে তুষ্ট রাখতে পারবে এমন একটি ধর্মকে যদি কল্পনা করা

যায়, তাহলে সেই ধর্মকে এই সব রকমের ভাবধারার খোরাক জোগাতে হবে। সেই প্রকৃতি যদি তার না থাকে তাহলে এই বিভিন্ন ভাবের মানুষগুলি স্বভাবতই একমুখী হয়ে পড়বে। ধরো, তুমি একটি সম্প্রদায়ের কাছে গেলে, তারা শুধু প্রেম আর ভক্তির প্রচারক। তারা চোখের জলে ভেসে কীর্তন গায় আর প্রেমের কথা বলে। যখনই তুমি এদের বলবে, "বন্ধু, তোমাদের সব কথাই ঠিক, কিন্তু এ সবের চাইতে একটু শক্ত কিছু চাই যে আমার—একটু বুদ্ধি আর দর্শন", তখুনই তারা বলবে "পথ দেখো"। কেবল চলেই যেতে বলবে না, ক্ষমতায় কুলোলে তারা তোমাকে পরলোকের পথেও পাঠাত। তার মানে, এই সম্প্রদায় কেবল ভাবাবেগী ভক্ত ধরনের মানুষকেই সাহায্য করতে পারে। অন্য স্বভাবের মানুষদের তারা সাহায্য তো করবেই না বরং সর্বনাশ করতে পারে। সব চাইতে দুঃখের কথা হলো এই যে এরা সাহায্যবিমুখ হয়েই ক্ষান্ত থাকে না, অপরের আন্তরিকতায় পর্যন্ত এদের অবিশ্বাস। আবার অনেক দার্শনিক আছেন যারা ভারত এবং পূর্বদেশের জ্ঞানের বিষয়ে অনেক কথা বলেন আর সব দশ হাত লম্বা মনস্তাত্ত্বিক শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু আমার মত কোন সাধারণ মানুষ যদি তাদের কাছে গিয়ে বলে, "আমার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা জাগাবার মত কিছু বলতে পার?" প্রথমেই তারা একটু মৃদু হাসবেন। তারপর বলবেন, "তুমি বুদ্ধিতে আমাদের চাইতে অনেক নীচে রয়েছ। আধ্যাত্মিকতার বিষয় তুমি কিইবা বুঝতে পারবে?" এঁরা হলেন উন্নাসিক দার্শনিক। এঁরাও দরজা দেখিয়ে দেবেন। তারপর, জীবনরহস্য-সন্ধানীরা জীবনের বিভিন্ন মার্গ, মনের বিভিন্ন অবস্থান, মানসিক শক্তির কার্য পরাক্রম ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথাই বলেন। তুমি যদি একজন সাধারণ মানুষ হও এবং তাঁদের কাছে গিয়ে বলো, "আমাকে এমন কোন ভাল কাজ দেখাও যেটা আমি করতে পারি। দূর-কল্পনাটা আমার আসে না, আমার সাধ্যায়ত্ত এমন কিছু দিতে পার আমাকে?" তা শুনে তারা হাসবে, বলবে, "শোনো, এই মূর্খের কথা! কিছুই জানে না। ওর জীবনধারণই দেখছি বৃথা।" এই সব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উগ্র ধ্বজাধারীদের একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে ওদের উচ্চমার্গের ব্যঙ্গাত্মক হাসিগুলোর ছবি তুলে রাখতে ইচ্ছে হয় আমার।

এই হলো ইদানীংকালের ধর্মের অবস্থা। অন্য সব কিছুর অবস্থাও প্রায় তাই। আমি এমন একটি ধর্ম প্রচার করতে চাই যা সবরকম মনের কাজেই গ্রহণীয় বলে মনে হবে, সেই ধর্ম যতখানি দার্শনিক, ততখানি ভাবাবেগযুক্ত, ততখানি জীবনরহস্যভেদী এবং ততখানি কর্মপ্রেরণাশীল। যদি কলেজ থেকে অধ্যাপকরা আসেন—বৈজ্ঞানিক এবং পদার্থবিজ্ঞাবিদরা—তাঁরা চাইবেন যুক্তি। যত ইচ্ছে দিয়ে যান তাঁরা যুক্তি। একটা সময় আসবে যখন তাঁরা দেখবেন যে যুক্তিকে বিদায় না দিলে আর অগ্রসর হওয়া চলছে না। তখন তাঁরা বলবেন, "ঈশ্বর এবং মোক্ষলাভের ধারণাগুলি কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।" তার উত্তর হবে, "শ্রীযুক্ত দার্শনিক মহাশয়, তোমার এই দেহটিও একটি বৃহৎ কুসংস্কার, ওটাও ছেড়ে দাও। বাড়িতে আর খেতে ফিরো না, দর্শনের চেয়ারেও না, দেহটি ত্যাগ করো। আর তা যদি না পারো তাহলে শোধবোধ, বলে বসে পড়ো।" দর্শনের শিক্ষা হলো পৃথিবী এবং

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটিমাত্র সত্তাই বিদ্যমান; ধর্মের কাজ হলো এই দর্শনকে উপলব্ধি করবার পন্থা দেখিয়ে দেওয়া। জীবনরহস্য-সন্ধানীরা যদি আসেন, আমরা অবশ্যই তাঁদের স্বাগত জানাবো। মন-বিশ্লেষণের বিজ্ঞান এবং তার বাস্তব রূপায়ণও দেখিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকবো আমরা। যদি ভাবাবেগী ভক্তরা আসেন আমরা তাঁদের সঙ্গে বসবো; ঈশ্বরের নামে কীর্তনে আর কান্নায় মাতবো, 'প্রেমের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে পাগল হবো।' যদি শক্তিমান কর্মী পুরুষ আসেন, আমরাও আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে তাঁর সঙ্গে কাজে নামবো, চারটি বিভাগের এই ধরনের সম্মিলনই সার্বিক ধর্মের আদর্শের কাছাকাছি পৌঁছয়। আহা! ঈশ্বর যদি এই চারটি মানসিকতাকে সমানভাবে মিশিয়ে মানুষের মনকে তৈরী করতেন! যাদের ভেতর এই চারটি ভাবের একটি কি দুটোই থাকে আমি মনে করি তারা অসম্পূর্ণ, 'এক-চোখো'। জগৎটা এই 'একচোখো' মানুষ দিয়েই ভর্তি। যে যে পথের পথিক সেই পথটার কথাই শুধু জানে। তার বাইরে সব কিছুই তাদের কাছে বিপজ্জনক এবং ভয়াবহ বলে মনে হয়। আমার কাছে আদর্শ ধর্ম হলো এই চারটি ভাবধারার একটি নির্বিরোধ ভারসাম্য। এই আদর্শ ধর্ম লাভ করা যায়, ভারতবর্ষে যাকে বলে 'যোগ' সেই 'যোগের' মাধ্যমে। যোগ মানে হলো যুক্ত। যে কর্মী তাকে এই যোগ সমস্ত মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মভাবে যুক্ত করে দেয়। ভক্তকে প্রেমময় দেবতার সঙ্গে যুক্ত করে। জীবনরহস্য-সন্ধানী এই যোগের মাধ্যমে তার স্বভাবের নীচ-বৃত্তির সঙ্গে উচ্চতম বৃত্তিকে যুক্ত করে। দার্শনিক উপলব্ধি করেন বিশ্বচরাচরের ঐক্য। যোগ বলতে আমরা এই বুঝি, 'যোগ' কথাটা সংস্কৃত শব্দ। আবার এই চারটি ভাগের সংস্কৃত ভাষায় চারটি পৃথক নাম আছে। যে মানুষ 'যোগের' পথের পথিক তাঁকে বলা হয় যোগী। যিনি কর্মী তিনি হলেন 'কর্মযোগী'। যিনি এই পথে জীবনরহস্য ভেদ করে ঈশ্বরে যুক্ত হতে চান, তিনি 'রাজযোগী'। যিনি প্রেমের মাধ্যমে এই পথে ঈশ্বরে যুক্ত হতে চান তিনি 'ভক্তিযোগী'। আর যিনি এই পথে দর্শনের মাধ্যমে ঈশ্বরে বিলীন হতে চান তিনি 'জ্ঞানযোগী'। 'যোগী' কথাটা যোগের চারটি বিভাগকে নিয়েই সম্পূর্ণ।

প্রথমে রাজযোগের কথা বলা যাক। রাজযোগ মানে মনকে সম্পূর্ণভাবে নিজের বশীভূত করা। কিন্তু মানে কি তার? আমি জানি এই দেশে তোমরা 'যোগ' কথাটিকে নানা রকম ভূতপ্রেতের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছ। সুতরাং প্রথমেই বলে নিতে চাই যে 'যোগের' সঙ্গে ওসবের কোন রকম সম্পর্কই নেই। এইসব যোগীরা কেউই তোমাদের যুক্তিতর্ককে বর্জন করতে বলবেন না। অথবা কোন ধর্মযাজকের হাতে বুদ্ধি আর যুক্তিকে সমর্পণ করতেও বলবেন না। কোন অতি-মানবের আনুগত্য স্বীকার করে নেবার কথাও বলবেন না এইসব যোগীরা। এঁরা সকলেই তোমাদের বলবেন নিজেদের বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে।

জ্ঞান আহরণের জন্য প্রাণিজগতে, বলা যেতে পারে, তিনটি মানসিক যন্ত্র আছে। প্রথমটি হলো জন্মগত সহজ-প্রবৃত্তি (instinct)। পশুজগতেই এর বহুল বিস্তার। বলা যায় জ্ঞান আহরণের পদ্ধতি হিসেবে এটা নিকৃষ্টতম। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো—

বুদ্ধিযুক্ত বিচারক্ষমতা। এটা মনুষ্যজগতেই বিশেষভাবে জাগ্রত। জন্মগত সহজ প্রবৃত্তিটি জ্ঞান আহরণের পক্ষে যথেষ্ট কার্যকরী নয়। তবে পশুদের কর্মজগত খুবই সীমিত বলে সেই সীমিত পরিধিতে এটা কার্যকরী। মানুষের বেলায় দেখা যায় যে তাদের বিচারশক্তি খুবই উন্নত পর্যায়ে। তার কর্মজগতের পরিধিও অনেক বিরাট।

তবুও সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভের পক্ষে বিচারশক্তি অনেকাংশেই অক্ষম। বুদ্ধি বা বিচারশক্তি দিয়ে কিছুদুর অগ্রসর হওয়া যায়। তারপরই থামতে হয় তাকে। তবুও যদি গায়ের জোরে যুক্তিকে তারপরেও চালনা করা হয় তখন সৃষ্টি হয় বিভ্রান্তির। যুক্তিই পরিণত হয় অযৌক্তিকতায়। যুক্তিতর্ক তখন কেবলই বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যা ভিত্তি—অর্থাৎ বস্তু এবং শক্তি—উদাহরণ হিসেবে তাদেরই নেওয়া যাক। বস্তু কি? যার ওপর শক্তির ক্রিয়া হয়। শক্তি কি? যা বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে। দেখতে পাচ্ছ জটিলতাটা কোথায়? ন্যায়শাস্ত্রবিদরা একেই বলেন চক্রাকারে তর্ক, অর্থাৎ একটা কথার অর্থ নির্ভর করছে অন্য আর একটি কথার ওপর, আবার শেষোক্ত কথাটির অর্থ নির্ভর করছে প্রথম কথাটির ওপর। একটা সীমায় পৌছে দেখা যায় যুক্তির সামনে একটি দুর্লঙ্ঘনীয় অবরোধ দাঁড়িয়ে আছে। তাকে অতিক্রম করা যুক্তির পক্ষে অসম্ভব। যদিও যুক্তি ওপারের অনন্তের ভিতর প্রবেশের জন্যই অধৈর্যে আকুল হয়ে ওঠে।

বুদ্ধিগ্রাহ্য যা কিছু অর্থাৎ মনের গোচরীভূত যে বিশ্বজগৎ সেটা চেতনাস্তরে অভিক্ষিপ্ত অনন্তের কণিকা মাত্র। তাছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের চেতনার জাল যতটুকু বিস্তৃত সেই সীমিত পরিধির মধ্যেই বুদ্ধি বা যুক্তি কাজ করতে পারে। তার বাইরে নয়। সুতরাং এমন কোন ব্যবস্থা চাই যা আমাদের চেতনার সীমিত পরিধির বাইরে নিয়ে যেতে পারে। তার নাম স্বজ্ঞা (intution)। তাহলে বলা যেতে পারে, সহজাতবৃত্তি, যুক্তি এবং স্বজ্ঞা এই তিনটি হলো জ্ঞান সঞ্চয়ের তিনটি মানসিক যন্ত্র। সহজাত বৃত্তি হলো পশুদের, যুক্তি মানুষের আর স্বজ্ঞা পরমপুরুষদের। কিন্তু মানুষের ভিতর এই তিনটি মানসিক যন্ত্রের বীজই অল্পবিস্তর জাগ্রত অবস্থায় বিদ্যমান। বীজ অন্তর্নিহিত না থাকলে এইগুলির ক্রমঃ অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। এবং একথাটাও মনে রাখতে হবে যে একটি অন্যটির পরিণত রূপ; সুতরাং এদের ভিতর কোন অন্তর্বিরোধ নেই। যুক্তি বা বুদ্ধির পরিণত রূপ হলো স্বজ্ঞা। সুতরাং স্বজ্ঞা বুদ্ধির বৈরী নয়, পরিপূরক। বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝা যায় না স্বজ্ঞা সেখানে আলোকপাত করে। বার্ধক্য শৈশবের পরিপন্থী নয়, পরিপূরক। তবে একটা বিষয় সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে নিকৃষ্ট পর্যায়ের যন্ত্রটিকে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের বলে ভুল করলেই বিশেষ বিপদ ঘটবে। এই পৃথিবীতে বহুবার সহজবৃত্তিকে স্বজ্ঞা বলে চালাবার চেষ্টা হয়েছে। সেই সঙ্গেই এসেছে সব ভুয়া ভবিষ্যৎবাণী। মূর্খ অথবা অর্ধ-উন্মাদ তার মাথার বিভ্রান্ত ধারণাগুলিকেই স্বজ্ঞা মনে করে, এবং তখন তার সাধ হয় যে জনসাধারণ তার অনুসরণ করুক। পৃথিবীতে যত পরস্পরবিরোধী,

অযৌক্তিক এবং অর্থহীন কথা প্রচারিত হয়েছে তা সবই উন্মত্ত মস্তিষ্কের বিভ্রান্ত চিন্তার দুর্বোধ্য ভাষা। তাকেই চালাবার চেষ্টা হয়েছে স্বজ্ঞার প্রকাশ বলে।

সত্যকারের জ্ঞানের কথার প্রথম প্রমাণ হলো যে সেটা যুক্তি বিরোধী কিনা। তোমরা দেখেছো সে সব যোগের ভিত্তি এরই ওপরে। রাজযোগের কথাই ধরো, যে পন্থায় মনশ্চালনা দিয়ে অনন্তের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা বলে। এ বিষয়টি বিরাট। আমি শুধু এর মোদ্দা বক্তব্যটি তোমাদের সামনে তুলে ধরতে পারি। নিকৃষ্ট মানুষই হোক আর শ্রেষ্ঠ যোগীই হোন সব মানুষের জন্যই জ্ঞান আহরণের পদ্ধতি একটিই। সেটা হলো মনঃসংযোগ।

বিজ্ঞানাগারে কর্মরত রসায়নবিদ গভীর মনঃসংযোগ করে তার মানসিক সমস্ত শক্তিকে একত্রীভূত করে সেই শক্তি মৌলিক পদার্থগুলির ওপর প্রতিফলিত করে তাদের বিশ্লেষণ করছেন। বিশ্লেষণ থেকেই জ্ঞানের উদ্ভব হয়। জ্যোতির্বিদও মনঃসংযোগ দিয়ে মানসিক ক্ষমতাগুলিকে একত্রীভূত করেন; সেই একত্রীভূত শক্তি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দ্রষ্টব্য বস্তুগুলির প্রতি প্রেক্ষিত হয়। তারকামণ্ডলী তখন তাঁর সামনে এসে তাদের গোপন তথ্যগুলিকে উন্মোচন করে দেয়। ক্লাস-ঘরের চেয়ারে অধ্যাপক, বই হাতে ছাত্র, যে যেখানেই জ্ঞানের সাধনায় যুক্ত, সবার ক্ষেত্রেই এই একই কথা প্রযোজ্য। তোমরা আমার বক্তৃতা শুনছো। আমার কথা যদি সত্যিই তোমাদের মনকে আকর্ষণ করে তোমরা তাহলে সেই কথাতে মনঃ-সংযোগ করবে। তখন যদি কোন ঘড়িতে ঘণ্টা বাজে সেটা তোমরা শুনতে পাবে না। কারণ তখন তোমাদের মন অন্য জায়গায় সংযোজিত। আর যতবেশী মনঃসংযোগ করতে পারবে ততই বেশী ভাল করে বুঝতে পারবে আমার কথা। আমিও যত বেশী আমার প্রেম এবং ক্ষমতাকে সংযোগ করতে পারবো আমিও যে কথাটা তোমাদের বোঝাতে চাইছি সেটা আরও ভাল করে ব্যক্ত করতে পারবো। মনঃ সংযোগ যত বেশী, জ্ঞান আহরণও তত বেশী। কারণ এ ছাড়া জ্ঞানলাভের আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। এমন কি, ঐ যে 'জুতো-পালিস' ছেলেটাও যদি বেশী করে মনঃসংযোগ করতে পারে ওর জুতোটা আরও বেশী ঝকঝকে হয়ে উঠবে। মনঃসংযোগের ফলে রাধুনীর হাতের রান্নাও অনেক বেশী সুস্বাদু হয়ে উঠবে। টাকাই বানাও কিংবা ভগবানকেই ডাকো বা যা কিছুই করো না কেন, যত বেশি গভীরতার সঙ্গে মনঃসংযোগ করতে পারবে, ততবেশি ভাল হবে সেই কাজ। এ দিয়েই প্রকৃতির বন্ধ দরজা উন্মুক্ত হয়, জ্ঞানের আলো উদ্ভাসিত হয়। জ্ঞানের মণিকোঠার দরজা খোলবার একমাত্র চাবি হলো এই মনঃসংযোগের ক্ষমতা। রাজযোগের প্রণালী মুখ্যত মনঃসংযোগেরই বিবরণ। আমাদের যা দৈহিক অবস্থা তাতে আমরা বিক্ষিপ্ত, আমাদের মনের শক্তি একশো রকম তুচ্ছ কারণে ক্ষরিত হচ্ছে। আমি যখন মনে প্রশান্তি এনে কোন একটা বিষয়ে মনঃসংযোগের চেষ্টায় নিযুক্ত, তখন হাজার রকমের অবাঞ্ছিত আবেগ ছুটে আসবে মনে, হাজার চিন্তা আসবে মাথায় আর আঘাত হানবে আমার মনঃসংযোগে। এই সব বাধা-বিঘ্নকে রুদ্ধ করে কী ভাবে মনকে আত্মবশীভূত করা যায় রাজযোগের মূল বিষয়বস্তু সেটাই।

এরপর কর্মযোগ অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বর লাভ। এই সমাজে বিভিন্ন মানুষ যে বিভিন্ন রকম কাজ করার জন্যে জন্মেছে সে কথা বলাই বাহুল্য। এই সব মানুষরা শুধুমাত্র চিন্তায় মনঃসংযোগ করতে পারে। এদের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হলো তাদের কল্পনাতে ধরা-ছোঁয়ার জগৎকে বাস্তবে রূপায়িত করা। একে সম্ভব করার জন্য এক রকমের জীবন-বিজ্ঞানের প্রয়োজন। যদিও আমরা সবাই কোন না কোন কর্মে নিযুক্ত, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের কর্মশক্তি বৃথায় ক্ষয় হয়। কারণ কর্মের গুহ্য তত্ত্বটি আমাদের অজ্ঞাত। এই গুহ্য তত্ত্বটির ব্যাখ্যা করে কর্মযোগ আমাদের শেখায় কোথায় কি ভাবে কর্মে নিযুক্ত হতে হবে; কী পন্থায় কর্মে শক্তি নিয়োগ করলে শক্তির সর্বাধিক সদ্ব্যবহার হবে। কিন্তু এই গুহ্য তত্ত্বটির সঙ্গে কর্মের বিপত্তির কথাও ভাবতে হবে। কর্মের বিপত্তি হলো এই যে কর্মই দুঃখের আকর। আসক্তি থেকেই সমস্ত দুঃখবেদনার সৃষ্টি। আমি কাজ করতে চাই, আমি মানুষের ভাল করতে চাই। কিন্তু একশো জনের ভেতর নব্বইজন উপকৃত মানুষই শেষ পর্যন্ত অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে আমারই বিরুদ্ধাচরণ করবে, সেটাই হবে আমার দুঃখের কারণ। কর্মের বিপত্তি এই রকম। দুঃখ-বেদনার আশঙ্কাই কর্ম ও শক্তিকে বহুলাংশে বিনষ্ট করে। কার কী হলো বা না হলো অথবা কেনই বা হলো সে সব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কর্মযোগ আমাদের নিরাসক্তভাবে কর্ম করতে শেখায়। কর্মযোগী আপন স্বভাবেই কর্মে ব্রতী হন। কারণ তিনি মনে করেন কর্মই তাঁর মঙ্গল, এর অধিক তাঁর আর কোন কামনা নেই। এই জগতে তিনি দাতা, কখনই গ্রহীতা নন। তিনি জানেন তিনি দিচ্ছেন, পরিবর্তে কিছু পাবার অভীপ্সা নেই। তাই তিনি বেদনামুক্ত। মানুষ যেখানেই আসক্ত সেখানেই সে দুঃখের করায়ত্ত।

তারপর হলো ভাবাবেগী ভক্তের 'ভক্তিযোগ'। ঈশ্বর প্রেমই তাঁর কাম্য। বহুরকমের ধার্মিক কর্মকাণ্ড, সুদৃশ্য মন্দির, ফুল, সুগন্ধি ধূপ, মূর্তি—এসবের উপরে তিনি নির্ভরশীল। তোমরা কি মনে করো এসব ভুল? একটি পরম সত্য তোমাদের আজকে আমি বলবো, বিশেষ করে তোমাদের দেশের মানুষদের এই কথাটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। যেসব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পুরাণ কাহিনী এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরম ঐশ্বর্যমণ্ডিত তারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক মহামানবদের জন্মদাতা। ঈশ্বরকে নিরাকার রূপে কল্পনা করে অথবা উৎসববিমুখ হয়ে যেসব সম্প্রদায় ঈশ্বর উপাসনার প্রয়াস করেছে তারাই ধর্মের যা কিছু সুন্দর এবং মহান তাকেই নির্মমভাবে ধ্বংস করেছে। তাদের ধর্ম হলো ধর্মোন্মত্ততা। অথবা খুব বেশী হলে শুষ্ক, রুক্ষতা। সেই জন্যই বলছি পুরাণকে আর ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে হেয় করো না। এসবে যাদের আকাঙ্ক্ষা তাদের থাক না এসব। তাই বলে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলো না, "ওরা মূর্খ! ওরা থাক ঐসব নিয়ে।" মোটেই তা নয়। আমার জীবনে অধ্যাত্মজীবনের অত্যুচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত যেসব মহাপুরুষদের আমি দেখেছি তাঁরা সকলেই একদিন ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সকল নিয়ম প্রতিপালন করেছেন, আমি তাঁদের পদপ্রান্তে বসবারও যোগ্য নই—আমি তাঁদের সমালোচনা করবার কে? আমি কি করে জানবো যে মানুষের মনের ওপর এসবের প্রতিক্রিয়া কি? কোনটা গ্রহণীয়, কোনটা বর্জনীয়? অনধিকার সমালোচনার

একটা প্রবণতা আছে আমাদের। পুরাণ যখন প্রেরণা যোগায়, থাক না ওদের মত খুশী পুরাণ কাহিনী। এই কথাটা মনে রেখো তোমরা যে ভক্ত মানুষরা সত্যের কোন বিমূর্ত সংজ্ঞার্থ (abstract definition) নিয়ে কখনই মাথা ঘামান না। ঈশ্বর তাঁদের ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে, ঈশ্বরই তাঁদের একমাত্র সত্য বস্তু। তাঁরা ঈশ্বরকে স্পর্শ করেন, শ্রবণ করেন, দর্শন করেন, ভালবাসেন। থাক না তাঁদের ভগবান তাঁদের কাছে। তোমরা যুক্তিবাদীরা অনেকটা সেই মূর্খের মত মনে হয়, যে পাথরের নয়নাভিরাম মূর্তিকে ভেঙে তার ভেতরটা কি মালমসলায় তৈরী তাই দেখতে চেয়েছিল। ভক্তিযোগ ভক্তকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখায়, ঈশ্বর প্রেমেই মঙ্গল, শুধু সেই কারণেই ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভালবাসা। সম্পদের আশায়, সন্তান কামনায় অথবা কোনকিছুরই কামনা নেই এর পেছনে। ভক্তিযোগের শিক্ষা : প্রেমই প্রেমের পূর্ণ প্রতিদান। ঈশ্বরই প্রেম। ভক্তিযোগের শিক্ষা ঈশ্বরে নানা উপাধি অর্পণ করতে। তিনি বিশ্বস্রষ্টা, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পিতা ও মাতা। মানুষের ভাষায় ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, মানুষের চিন্তায় ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্পনা—তিনি প্রেমের দেবতা। যেখানে প্রেম সেখানে ঈশ্বর. "যথায় আছে প্রেম, তথায় আছেন তিনি। তিনিই বিদ্যমান।" স্ত্রীর প্রতি স্বামীর চুম্বনে ঈশ্বরেরই প্রকাশ; শিশুর প্রতি মাতার চুম্বনে ঈশ্বরেরই বিকাশ, বন্ধুর আলিঙ্গনেও প্রেমের দেবতা ঈশ্বরই মূর্ত হয়ে ওঠেন। যখন কোন মহৎ মানুষ মানবকুলকে সাহায্যের জন্য অবতীর্ণ হন, ঈশ্বর তখনই তাঁর মানবপ্রেমের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে মুক্তহস্তে দান করেন। যেখানেই প্রেমে হৃদয় উদ্বেলিত হয়, সেখানেই তিনি প্রকাশিত। ভক্তিযোগ এই সবই শিক্ষা দেয়।

আমাদের শেষ আলোচনার বিষয় জ্ঞানযোগী, যে দার্শনিক দৃশ্যমান জগতের পারে যেতে চান। সংসারের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন না। দৈনন্দিন জীবনের খাওয়া-পরার উর্ধ্বে তিনি উঠতে চান, হাজার হাজার পুঁথি-পত্তর তাঁকে শান্তি দিতে পারে না, সমগ্র বিজ্ঞান তাঁকে তুষ্ট করতে পারে না, বড় জোর তারা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটাকে তাঁর আর একটু সামনে তুলে ধরে। তাহলে কিসে তাঁর সন্তোষ? অসংখ্য বিশ্বজগৎ তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না, কারণ তাঁর কাছে এ সবই অস্তিত্বের সমুদ্রে জলবিন্দু মাত্র। তাঁর আত্মা এ সমস্ত পার হয়ে সত্তার অন্তরে প্রবেশ করতে চায়; দেখতে চায় সত্তার সত্যরূপ, সত্তাকে উপলব্ধি করে তাদাত্ম্য হয়ে সেই সার্বিক সত্তার সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। এই হচ্ছে জ্ঞানী। ঈশ্বর পিতা বা মাতা বিশ্বস্রষ্টা, জগতের রক্ষাকর্তা ও পথপ্রদর্শক ইত্যাদি কথা তাঁর কাছে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাঁর কাছে ঈশ্বর হচ্ছেন তাঁর জীবনের জীবন, তাঁর আত্মার আত্মা। ঈশ্বর তাঁর নিজেরই আত্মা। ঈশ্বর ব্যতীত তাঁর কাছে আর কিছুই নেই। তাঁর সমস্ত নশ্বর অংশ বিচারের দৃঢ় আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। শেষে সত্যই যেটুকু থাকে তা হচ্ছে স্বয়ং ঈশ্বর।

একই গাছে দুটি পাখি রয়েছে—একটি উপরে, অন্যটি নীচে। উপরের পাখিটি শান্ত, স্তব্ধ, মহিমান্বিত, স্বীয় মহিমায় বিভোর। নীচের পাখিটি ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায়, কখনও মিষ্ট ফল, কখনও তিক্ত ফল খায় এবং কখনও সুখী, কখনও দুঃখী

হয়। কিছুকাল পরে নীচের পাখিটি এক অত্যন্ত তিক্ত ফল খেয়ে বিরক্ত হয়ে উপর দিকে তাকাল এবং অন্য পাখিটিকে দেখতে পেল—সেই অপূর্ব সোনালী পাখার পাখি, যে মিষ্ট বা তিক্ত কোন ফলই খায় না এবং যে সুখীও নয়, দুঃখীও নয়, বরং শান্ত, আত্মসমাহিত এবং নিজের আত্মা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। নীচের পাখিটি ওই অবস্থা লাভ করার জন্য আগ্রহী হলো, কিন্তু একটু পরেই সেকথা ভুলে গিয়ে আবার ফল খেতে শুরু করল। একটু পরে আর একটি অসাধারণ তিক্ত ফল খেল, তাতে সে ভয়ানক কষ্ট পেল এবং আবার উপর দিকে দেখল। উপরের পাখিটার কাছে একটু অগ্রসর হবার চেষ্টা করল। কিন্তু আবার ভুলে যায়, আবার তিক্ত ফলের অভিজ্ঞতা লাভ, আবার খানিকটা উপরের দিকে অগ্রসর। এমনি করে করে সে কখন যেন উপরের অপরূপ পাখিটার খুব কাছে এসে পড়ল। তখন অপর পাখিটার পাখা থেকে জ্যোতির ছটা এসে তার দেহের চারদিকে আবর্তিত হতে লাগল, তার মনে হলো কি যেন এক পরিবর্তন আসছে তার ভেতরে, সে যেন কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর যখন আরও কাছে এল, তখন তার চারধারের সব কিছু মিলিয়ে গেল এবং অবশেষে সে এই অদ্ভুত পরিবর্তনের অর্থ বুঝল। নীচের পাখিটা যেন উপরের পাখিটার ছায়া, রক্তমাংস-সম্বলিত ছায়া। বস্তুত সারাক্ষণই উপরের পাখিটির সারবস্তু ছিল তার মধ্যে। নীচের ছোট পাখিটির এই মিষ্ট ও তিক্ত ফল খাওয়া এবং পর্যায়ক্রমে সুখ-দুঃখ বোধ করা এ সবই মিথ্যা মরীচিকা, স্বপ্ন। সেই শান্ত, স্তব্ধ, মহিমান্বিত, শোকদুঃখাতীত উপরের প্রকৃত পাখিটি সর্বক্ষণই বিদ্যমান ছিল। উপরের পাখিটি পরমাত্মা, জগতের প্রভু আর নীচের পাখিটি হচ্ছে জীবাত্মা, সংসারের তিক্ত-মধুর ফলের ভোক্তা। মাঝে মাঝে জীবাত্মার উপর প্রচণ্ড আঘাত আসে। সে কিছুক্ষণের জন্য সংসার-রসাস্বাদন বন্ধ করে অজ্ঞাত ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয় এবং তার অন্তরে আলোর বন্যা আসে। সে মনে করে এই জগৎ মিথ্যা দৃশ্যমালা। তবু ইন্দ্রিয়গুলি আবার তাকে টেনে নামিয়ে আনে এবং সে আগের মতোই আবার সংসারের তিক্ত-মধুর ফল আস্বাদন করে চলে। আবার এক অত্যন্ত কঠোর আঘাত আসে। আবার তার হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে দিব্য-আলোক প্রবেশ করে। এইভাবে সে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয় এবং যতই সে অগ্রসর হয়, ততই অনুভব করে তার পুরানো সত্তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। যখন সে অত্যন্ত কাছাকাছি আসে তখন দেখতে পায় সে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নয় এবং সে বলে ওঠে, 'যাঁকে আমি তোমাদের কাছে জগতের জীবন এবং অণু-পরমাণু ও চন্দ্র-সূর্যে বিদ্যমান বলেছিলাম, তিনি আমাদেরও নিজস্ব জীবনের ভিত্তিস্বরূপ, আমাদের আত্মার আত্মা। শুধু তাই নয়, তুমিই সেই—তত্ত্বমসি!'

জ্ঞানযোগ আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। এ মানুষকে বলে তুমি মূলত স্বর্গীয়। এ মানুষকে সত্তার প্রকৃত একত্ব দেখিয়ে দেয়। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বর স্বয়ং জগতে প্রকাশিত হচ্ছেন। আমাদের সকলেই—পদদলিত ক্ষুদ্র কীট হতে সর্বোচ্চ সত্তা, যাঁকে আমরা সবিস্ময়ে ও সভয়ে নিরীক্ষণ করি,—সবাই একই পরমাত্মার প্রকাশ মাত্র।

সবশেষে বলছি, এই সব বিভিন্ন যোগ আমাদের অভ্যাস করা একান্ত কর্তব্য, শুধু সেগুলি নিয়ে তত্ত্বালোচনা করলে কোন লাভ হবে না। প্রথমে এগুলি সম্বন্ধে শুনতে হবে, তারপরে এগুলি নিয়ে চিন্তা করতে হবে। আমাদের এগুলি বিচার সহকারে বুঝতে হবে, মনের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে, এগুলি নিয়ে ধ্যান করতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে—যে পর্যন্ত না এগুলি আমাদের জীবনের সর্বস্ব হয়ে ওঠে। তখন ধর্ম কেবলমাত্র একগাদা মতবাদ ও তত্ত্বরূপে থাকবে না, শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্যরূপে থাকবে না, একবারে আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে। বুদ্ধিগ্রাহ্য ভেবে আজ হয়তো আমরা অনেক অর্থহীন বিষয়কে গ্রহণ করতে পারি এবং কাল আবার সম্পূর্ণ মত পরিবর্তন করতে পারি। কিন্তু প্রকৃত ধর্মের কোন পরিবর্তন হয় না। ধর্ম উপলব্ধির বিষয়; সেটি বাগাড়ম্বর, মতবাদ বা নিছক তত্ত্ব নয়, তা সে যত সুন্দরই হোক না কেন। ধর্ম মানে হওয়া,—জীবনে পরিণত করার বস্তু, শুধু শোনার বা মেনে নেওয়ার নয়। এ হচ্ছে স্বীয় বিশ্বাসের পথে সমগ্র আত্মার রূপান্তর, বিশ্বাসের বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হওয়া। তারই নাম ধর্ম।

। খেতড়ির মহারাজার অভিনন্দনের উত্তর ।

ভারত—ধর্মভূমি

আমেরিকা প্রবাস কালে, ৪ মার্চ, ১৮৯৫ সালে খেতড়ি মহারাজার কাছ থেকে স্বামীজী নিম্নোক্ত অভিনন্দনপত্রটি পেয়েছিলেন :

প্রিয় স্বামীজী,

এই বিশেষ কার্যের জন্য আহূত এই দরবারের প্রধান হিসাবে, আমেরিকার শিকাগো নগরে আহূত, Parliament of Religion-এ আপনার হিন্দুধর্মের মহতী প্রতিনিধিত্বের জন্য আমি, আমার এবং আমার প্রজাগণের পক্ষ হইতে, আনন্দিত চিত্তে, আমাদের রাজ্যের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিদেশী ভাষার স্বাভাবিক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ইংরাজী ভাষায় হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বের যে পরিবেশন আপনি করিয়াছেন ইহা হইতে অধিক প্রাঞ্জল এবং নির্ভুল আর কিছু হইতে পারিত বলিয়া আমি মনে করি না। বিদেশে আপনার বক্তৃতা এবং আপনার ব্যবহারের প্রভাবে বিভিন্ন জাতির মানুষ এবং ধর্মের মধ্যে আপনার প্রতি সপ্রশংস শ্রদ্ধা ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; শুধু তাহা নহে, আপনাকে সর্বত্র সুপরিচিত করিয়া আপনার অনাসক্ত কর্মের পরিধিকে বিস্তৃত করিতে সহায় হইয়াছে। ইহার প্রশংসার ভাষা আমাদের নাই। আপনি যে কষ্ট স্বীকার করিয়া বিদেশ ভ্রমণ করিয়া Parliament of Religion-এ আমাদের হৃদয়ের ধন হিন্দুধর্মের ব্যখ্যা করিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা যদি এই সামান্য কয়টি ছত্র লিখিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানাইতাম তাহা হইলে আমাদের কর্তব্যে বিচ্যুতি ঘটিত। আপনার ন্যায় একটি সক্ষম প্রতিনিধি পাইয়া ভারত আজ গৌরবের অধিকারী হইয়াছে।

যে মহান আত্মাদের উদ্যোগে Parliament of Religion সফল হইয়াছে এবং যাঁহারা আপনাকে মহা উৎসাহভরে অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন তাঁহারা সকলেই ধন্যবাদার্হ। ঐ দেশে আপনি সম্পূর্ণ পরদেশী ভাবেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। আপনার বহুবিধ গুণাবলীর প্রতি তাঁহাদের প্রীতির জন্যই তাঁহারা আপনার প্রতি আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাও তাঁহাদের মহান চরিত্রের পরিচায়ক। এই সঙ্গে এই পত্রের কুড়িটি নকল পাঠাইতেছি। একখানি আপনার জন্য রাখিয়া বাকিগুলি অনুগ্রহ করিয়া আপনার বান্ধবগণের মধ্যে বিতরণ করিবেন।

সসম্মানে
ইতি ভবদীয়
খেতড়িরাজ অজিত সিং বাহাদুর

স্বামীজী নিম্নোক্ত উত্তরটি পাঠিয়েছিলেন :

এই কথাগুলি, হে মহানুভব রাজন্, গীতায় বর্ণিত অনন্ত সত্তার বাণী; এতে ধ্বনিত হয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডর আধ্যাত্মিক শক্তির জোয়ার-ভাঁটার স্পন্দন। এই পরিবর্তন বার

বায় আপন নিয়মের অমোঘ ছন্দে প্রকাশ পায়। যে কোন মহা পরিবর্তনের মতই এই পরিবর্তনেও তার আবর্তের অন্তর্গত ক্ষুদ্রতম অংশটিকেও প্রভাবিত করে। কিন্তু সবচাইতে বেশী প্রভাবিত হয় সেই অংশগুলি যাদের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি একটা স্বভাব-প্রবণতা আছে।

সার্বিক অর্থে, আদিপর্বে সমস্ত গুণরাজিগুলির সমাবস্থা থাকে। সেই ভারসাম্যে কোন বিঘ্ন হলেই আলোড়ন ওঠে এবং ভারসাম্যর পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দুর্বার প্রচেষ্টা চলতেই থাকে এবং তারই অঙ্গ হিসেবে প্রকটিত হয় আমরা যাকে বলি প্রকৃতি, যাকে বলি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। যতদিন না সেই আদিপর্বের সমাবস্থানের অবস্থা ফিরে আসে ততদিন পর্যন্তই এদের অবস্থান। খানিকটা সীমিত অর্থে আমাদের পৃথিবীতেও দেখতে পাই—বিভিন্নতা এবং তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিরূপ, মানবজাতি যতক্ষণ পর্যন্ত এইরকমই থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সমাবস্থায় পৌছবার জন্য নিরন্তর সংগ্রামও চলবে এবং তাতেই সৃষ্টি হয়েছে বৈচিত্র্যময় বিভিন্নতা—সারা পৃথিবী জুড়ে জাতিতে জাতিতে বৈচিত্র্যময় বিভিন্নতা, উপজাতির ক্ষেত্রেও তাই, এমনকি প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেও এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্নতা।

কল্পনা করা যেতে পারে যে নিরপেক্ষভাবে বিভক্ত এবং ভারসাম্যে অবস্থিত পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের জাতগুলো যেন এক একটা বিস্ময়কর ডায়নামো। এক একটি ডায়নামো এক একটি বিশেষ ধরনের শক্তির ধারক এবং পরিবেশক, অন্যান্য জাতীয় সম্পদের ভেতর এই বিশেষ ধরনের শক্তিটি হলো সেই জাতির বৈশিষ্ট্য, মানবীয় স্বভাবের যে কোন অংশেই পরিবর্তনের কোন ঢেউ উঠলে যদিও অল্পবিস্তর প্রভাব সকলের উপরই পড়বে, কিন্তু ঐ পরিবর্তনটি যে জাতির-বৈশিষ্ট্য সেই জাতিকেই সব চাইতে বেশী গভীরভাবে আলোড়িত করবে এবং সেই জাতিই হবে এই বিশেষ আলোড়নের কেন্দ্র। তাই ধর্মীয় জগতের কোন আলোড়ন ভারতবর্ষে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনবে—কারণ ভারতবর্ষই বার বার সুদূর বিস্তৃত ধর্মীয় আলোড়নের কেন্দ্র হয়ে দেখা দিয়েছে। সর্বোপরি, ভারতবর্ষ হলো ধর্মভূমি।

প্রত্যেক মানুষই যার মাধ্যমে তার জীবনাদর্শকে চরিতার্থ করবার সুযোগ পায় তাকেই যথার্থ বস্তু বলে মনে করে। সংসারী মানুষের পক্ষে যা কিছুকেই অর্থে পরিণত করা যায় সেটাই যথার্থ বস্তু, এবং যা দিয়ে তা করা যায় না সেটাই অবাস্তব। প্রভুত্বকামী মানুষের কাছে যার সাহায্যে যথেচ্ছ প্রভুত্বের অভিশাপকে পূরণ করা যাবে —সেটাই বাস্তব; আর সব কিছুই নয়, মানুষ যেখানেই তার হৃদয়-বাসনার প্রতিধ্বনিটি শুনতে পায় না সেখানটাই তার কাছে অলীক বলে মনে হয়।

যাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য শক্তিকে ভাঙিয়ে তার বদলে অর্থ, প্রতিষ্ঠা অথবা অন্যান্য সুখভোগ, যাদের কাছে যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনীই শক্তির একমাত্র প্রকাশ, যাদের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আরামই জীবনের একমাত্র শান্তি—তাদের কাছে ভারতবর্ষ একটি বিরাট মরুভূমি বলে প্রতীয়মান হবে। তারা যাকে জীবন বলে মনে করে সেই ধরনের জীবনের সম্প্রসারণের পক্ষে এ দেশের প্রতিটি বাত্যা-প্রবাহই মারাত্মক বাধা হবে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ওপার থেকে যে স্রোতস্বতী অমৃতধারায় প্রবাহিত সেখান থেকে পান করে জীবনের সব তৃষ্ণা যার নিবৃত্ত হয়েছে, কাম, অর্থ আর খ্যাতি এই তিন বন্ধনকে যাঁর আত্মা নির্মোকের মত পরিত্যাগ করেছে, যিনি শান্তির উচ্চ শিখরে থেকে প্রেম ও অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন কত কত ক্ষুদ্র কলহ, ইন্দ্রিয়-পুষ্ট জীবদের 'সুখের' নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোনায় মোড়া ধুলোর ভরা ফাঁপা খেলনা নিয়ে কত না হিংসা আর কত না দ্বন্দ্ব; পূর্বার্জিত সুকর্মের সঞ্চিত শক্তির ফলে যাদের চোখ থেকে অজ্ঞানতা খসে পরে গিয়ে যারা নামযশের অসারত্বে অভিহিত হয়েছেন,—তাঁদের কাছে আধ্যাত্মিকতার মাতৃভূমি ও আকর. ভারতবর্ষ, বাহ্যাকৃতির পরিবর্তিত রূপে আলোকোজ্জ্বল স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে আশার নির্দেশ দিচ্ছে প্রতিটি মানুষকে যাঁরা মুহূর্তে বিলীয়মান ছায়ায় ভরা বিশ্বে খুঁজতে বেরিয়েছেন সেই পরম পুরুষকে, যিনি একমাত্র সত্য সত্তা।

অধিকাংশ মানুষই শক্তির রূপ তখনই শুধু বুঝতে পারে যখন তাদের নিজ ধারণা অনুসারে শক্তির একটা জীবন্ত চেহারা দেখতে পায়। তাদের কাছে যুদ্ধের মাতামাতি আর উত্তেজনাই হচ্ছে খুব বাস্তব একটা কিছু, যে প্রাণের প্রকাশ ঘূর্ণিবাত্যার মত সব কিছু লণ্ডভণ্ড করতে করতে আসে না—এদের কাছে সেটা প্রাণ নয়, সেটা মৃত্যু। শতাব্দীর দাসত্বে পদানত, মুক্তি প্রয়াসে অক্ষম, দেশপ্রেমবিবর্জিত হীন ঐক্য এই ভারতবর্ষকে এদের কাছে নিশ্চয়ই মনে হতে পারে গলিত অস্থি আর পচনশীল বস্তুর একটা প্রাণহীন সমষ্টিমাত্র।

বলা হয়, সর্বাপেক্ষা যে উপযুক্ত শেষ পর্যন্ত সেই কেবল রক্ষা পায়। তাহলে এটা কেমন করে সম্ভব হলো যে সাধারণ মাপকাঠিতে যে জাত সব চাইতে অক্ষম সেই জাতটা সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এতকাল ধরে—মৃত্যুর কোন লক্ষণ নেই। পৃথিবীর তথাকথিত শক্তিমান এবং কর্মঠ জাতিগুলির যখন বৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে তখন দুর্নীতিপরায়ণ (?) ভারতীয়রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে—এটাই কেমন করে হলো? যারা মুহূর্তমধ্যে পৃথিবীকে রক্তগঙ্গায় প্লাবিত করতে পারে—তারা বিজয়মাল্যের অধিকারী সন্দেহ নেই। যারা কয়েক লক্ষ মানুষকে প্রাচুর্যের ভেতর রাখবার জন্য পৃথিবীর অর্ধেক মানবকুলকে উপবাসে রাখতে পারে তাদের গৌরব কিছু কম নয়। কিন্তু যারা অন্যের মুখের গ্রাস না কেড়ে নিয়ে কোটি কোটি মানুষকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে পারে তাদের কি কোন কৃতিত্বই নেই? শত শত শতাব্দী ধরে যারা অপরকে সামান্যতম আঘাত না হেনেও অগণিত মানুষকে লালন পালন করেছে, তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে, তারা কি কোন শক্তিরই পরিচয় দেয়নি?

সব প্রাচীন দেশের পুরাণকাহিনীকারদের কাছে আমরা বীরযোদ্ধাদের কথা শুনতে পাই যে তাদের প্রাণ নাকি দেহের কোন একটি স্থানে আবদ্ধ থাকতো এবং সেই বিশেষ স্থানটি স্পর্শ করতে না পারলে সেই বীর অমর, অজেয়। সেই রকমই মনে হয় প্রত্যেক জাতেরই বুঝি একটা প্রাণকেন্দ্র আছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেই প্রাণকেন্দ্রে হাত না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত হাজারো দুঃখ এবং দুর্ভাগ্য সেই জাতকে ধ্বংস করতে পারে না।

ধর্মেই ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি। হিন্দুজাতি যতদিন পর্যন্ত তার পিতৃপিতামহের এই বিরাট ঐতিহ্যকে বিস্মৃত না হবে পৃথিবীর কোন শক্তি তাকে নিধন করতে পারবে না। বলা হয় যে এত বেশী পশ্চাৎমুখীতাই ভারতবর্ষের দুঃখের কারণ। আমার কিন্তু মনে হয় এর উল্টো কথাটাই ঠিক।

হিন্দুরা যতদিন তাদের অতীতকে ভুলে ছিল ততদিনই তারা জড়তায় আচ্ছন্ন ছিল। যে মুহূর্ত থেকে পেছনের দিকে ফিরে তাকিয়েছে, দিকে দিকে জীবনের নব নব প্রকাশ দেখা দিয়েছে। বিগত দিন থেকেই ভবিষ্যতের সৃষ্টি, অতীতই হবে ভবিষ্যৎ।

সুতরাং হিন্দুরা যত বেশী তাদের অতীত ইতিহাস জানবে তাদের ভবিষ্যৎও ততই গৌরবময় হবে। যে মানুষ অতীত গৌরবের কাহিনী আজকের মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেবে সেই হবে জাতির পরম হিতৈষী। তার প্রাচীন রীতি-নীতিগুলো অহিতকর ছিল বলে ভারতবর্ষের অবনতি ঘটেনি, অবনতির কারণ সেই রীতিনীতি-গুলোকে তার সঙ্গত পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়া হয়নি।

প্রত্যেক সন্ধানী ছাত্রই একথা জানে যে ভারতবর্ষের সামাজিক রীতিনীতিগুলো যুগধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তনশীল ছিল। বিরাট একটা সর্বাত্মক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অংশ ছিল এই রীতিনীতিগুলো। এই রীতিনীতিগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ রূপ নিতে পারতো।

দূরদর্শী প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা সুদূর অনাগত ভবিষ্যৎকে এমন ভাবে দেখতে পারতেন যে তাঁদের প্রজ্ঞাকে বুঝতে পৃথিবীর মানুষকে কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়েছে। অধস্তন পুরুষরা আপন অজ্ঞতায় সেই বিরাট পরিকল্পনাটির মর্মোদ্ধার করতে পারেনি এবং ভারতবর্ষের অধঃপতনের সেইটাই হলো একমাত্র কারণ।

বহু শতাব্দী ধরে প্রাচীন :ভারতবর্ষ, তার দুটি প্রধান শ্রেণীর—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের উচ্চাভিলাষের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

একদিকে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা, তাঁরা ক্ষত্রিয়দের স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ ক্ষাত্রয়রা তখন জনসাধারণকে আইনত নিজেদের ভোগ্য-বস্তু বলে ভাবতো। অন্যদিকে পুরোহিতের আধ্যাত্মিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে, তাদের ক্রমবর্ধমান অসংখ্য যাগযজ্ঞের শৃঙ্খলে মানুষকে বেঁধে ফেলার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষমতাধারী একমাত্র রাজপুত :শক্তিই' কিছু পরিমাণে সাফল্য লাভ করেছিল।

ক্ষমতার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের আদিমতম পর্ব থেকেই শুরু হয়েছিল— শ্রুতি'র যুগে এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অল্পকালের জন্য এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভাঁটা পড়েছিল, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষাত্রশক্তি এবং জ্ঞানীদের পুরোভাগে থেকে এই বিবদমান শ্রেণী দুটির ভেতর একটা সামঞ্জস্য এনেছিলেন। তাই ফলস্বরূপ হলো গীতা—দর্শনের, স্বাধীনতার এবং ধর্মের সারমর্ম। তবুও বিবাদের বীজটা কার্য-কারণ সম্পর্কের কারণের মতই রয়ে গিয়েছিল। তাই অনিবার্যভাবে তার ফলও দেখা দেবে।

দরিদ্র এবং অজ্ঞান মানুষদের ওপর প্রভুত্বলাভের বাসনা দুই শ্রেণীর অন্তরেই নিহিত ছিল। ফলে আবার প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব দেখা দিল। সেই যুগের সামান্য পুঁথিপত্র যা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তা থেকে অতীতের এই বিরাট দ্বন্দ্বের কিছু প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই। শেষ পর্যন্ত কিন্তু জয় হলো ক্ষাত্রশক্তির এবং জ্ঞানের। যাগযজ্ঞের পতন হলো—কিছু কিছুও চিরকালের জন্যই। এই আলোড়নকে বলা হয় বৌদ্ধ সংশোধন ; ধর্মের দিক থেকে এর মানে হলো যাগযজ্ঞের হাত থেকে মুক্তি ; রাজনৈতিক ফল হলো ক্ষত্রিয় শক্তির কাছে পুরোহিত শক্তির পরাজয়।

একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো প্রাচীন ভারতের দুটি অসামান্য পুরুষই ক্ষত্রিয়বংশ-জাত—শ্রীকৃষ্ণ এবং বুদ্ধ। তার চাইতেও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো এই দুই মহামানবই জাতি-জন্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে জ্ঞানের দরজাটি সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের নৈতিক শক্তি সত্যিই অসাধারণ। তবে কিন্তু এরা ধ্বংসাভিলাষী সংস্কারের বিশ্বাসী। এর শক্তির বহুলাংশ না-সূচক কাজে ব্যয় হয়েছে। তাই একদিন জন্মস্থানেই এর মৃত্যু ঘটেছিল। অবশিষ্ট যেটুকু বেঁচেছিল তারা কুসংস্কার এবং যাগযজ্ঞ আঁকড়ে রইল। যাকে দমন করতে চেয়েছিল তার চাইতে শতগুণে অসংস্কৃত রূপ নিয়ে বেঁচে রইল এরা। অবশ্য বেদের পশুবলিকে কিয়দংশে নির্মূল করেছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম সমস্ত দেশটাকে মন্দির, মূর্তি, প্রতীক আর ঋষিদের হাড়গোড় দিয়ে ভরে দিয়েছিল।

সর্বোপরি, বৌদ্ধরাই সৃষ্টি করেছিলেন আর্য, মঙ্গোলীয় এবং আদিবাসীদের সংমিশ্রণ, যার ফলে একদিন অজ্ঞাতসারেই জঘন্য 'বামাচারী' প্রথার দেখা দিয়েছিল। মহান ধর্মগুরু বুদ্ধদেবের জ্ঞানোপদেশের এই হাস্যকর বিকৃতরূপকে শ্রীশঙ্করাচার্য এবং তাঁর অনুবর্তী সন্ন্যাসীরা একদিন এই দেশ থেকেই বিতাড়িত করেছিলেন।

সেই সময়ে ভারতের ইতিহাসে নতুন একটি অধ্যায়ের শুরু হলো। প্রাচীন ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণরা অস্তিত্বহীন হয়ে বাস করতে লাগলেন। আর্যদের পিতৃভূমি, কৃষ্ণ এবং বুদ্ধের জন্মক্ষেত্র, ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিদের লীলাক্ষেত্র, হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্যন্ত বিস্তৃত আর্যভূমি মৌনী হলো। বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সংঘাত এলো ভারত উপ-দ্বীপের অপরপ্রান্তবাসী এক অচেনা জাতির কাছ থেকে। তাদের ভাষাও অচেনা, চেহারাও অচেনা। তাঁরা প্রাচীন ব্রাহ্মণদের বংশোদ্ভব বলে আত্মপরিচয় দিলেন।

আর্যাবর্তের ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণদের কি হলো ? তারা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অদৃশ্য হলেন। কেবল কিছু মিশ্রজাতি ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় বংশকুল দাবি করে এখানে ওখানে ছড়িয়ে রইল। তাঁরা অবশ্য উচ্চস্ফীত আত্মম্ভরিতার সঙ্গে দাবি করতেন যে পৃথিবীকে শিক্ষাদানে তাঁদেরই অগ্রজের অধিকার। তাহলেই ভস্ম মেখে, মোটা কাপড় পরে সবিনয় সৌজন্যে দক্ষিণবাসীদের পদতলে বসেই শিক্ষা নিতে হয়েছিল এদের। ফল হলো ভারতবর্ষে বেদের পুনরাগমন। বেদান্তের এ হেন পুনরুত্থান ভারতবর্ষ এর আগে কখনও দেখেনি। সেদিন গৃহীরাও আরণ্যক অধ্যয়নে মন দিয়েছিলেন।

বৌদ্ধ জাগরণের নেতৃত্বটা বস্তুত ক্ষত্রিয়দের হাতেই ছিল। ক্ষত্রিয়রা দলে দলে

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, সংস্কার এবং ধর্মান্তরকরণ করার উৎসাহে সংস্কৃত ভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দেশজ ভাষাগুলিরই সমধিক ব্যবহার হতো, ফলে অধিকাংশ ক্ষত্রিয়ই বৈদিক সাহিত্য এবং সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সংস্রব হারিয়েছিলেন। তাই দাক্ষিণাত্যের সংস্কারের ঢেউ যখন আর্যাবর্তে এসে পৌঁছল তখন সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-শ্রেণীরাই বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের জন্য কিন্তু অভূতপূর্বভাবেই শৃঙ্খল তৈরী হলো।

ক্ষত্রিয়রাই চিরকাল ভারতবর্ষের মেরুদণ্ডস্বরূপ, বিজ্ঞান এবং স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষকও তাঁরাই। অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও তাঁদেরই কণ্ঠস্বর বার বার ধ্বনিত হয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় তাঁরাই পুরোহিততন্ত্রের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে একমাত্র অলঙ্ঘনীয় বাধাস্বরূপ ছিলেন। তাঁদেরই বিরাট একটা অংশ অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবলো। অন্য অংশটির সঙ্গে মধ্য এশিয়ার বর্বরদের রক্ত সংমিশ্রণ ঘটলো এবং এরাই ব্রাহ্মণ পুরোহিতের রাজত্বের গোড়াপত্তনের সাহায্যে সশস্ত্রে এগিয়ে এলো।

তখন পাপের পাত্র পূর্ণ হলো। ভারতবর্ষের ভরাডুবি হলো। যতদিন পর্যন্ত না ক্ষত্রিয়রা পুনরুত্থিত হয়ে, নিজেরাও স্বাধীনতা লাভ করলেন এবং অন্যের পদশৃঙ্খলও ভাঙলেন—ততদিন পর্যন্ত দেশে এই অবস্থাই চলেছিল।

হে রাজন্! আপনার পূর্বসূরীরাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যকে আবিষ্কার করেছিলেন—সে সত্য হলো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবই এক। তাই যদি হয় তাহলে কি নিজেকে আঘাত না করে অন্যকে আঘাত হানা যায়? ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের স্বৈরাচারী অত্যাচার দশগুণ হয়ে তাদের ওপরই বর্তালো। কর্মফলের অমোঘ নিয়মে হাজার বছরের হীনতা আর দাসত্ব হলো ত্যাগের ভাগ্যলিপি।

আপনারই পূর্বপুরুষের একজন, অবতার বলা হতো যাকে, তিনি বলেছিলেন, "যাদের মন সমতাবোধে নিশ্চিত হয়েছে তারা ইহজীবনেই আপেক্ষিকতাকে জয় করেন"—আমরা সবাই তাঁকে অবতার বলেই জানি। তাহলে তাঁর কথা কি বৃথা, অর্থহীন? যদি তা না হয়, এবং আমরা জানি যে তা নয়, তাহলে সৃষ্টির সর্বসমতার বিরুদ্ধাচরণ মহা ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয় এবং সমতার ধারণায় যে পৌঁছতে পারবে না, তার মুক্তির কোন পথ নেই।

সুতরাং হে মহান নৃপতি, বেদান্তর শিক্ষাকে অনুসরণ করুন—কিন্তু টীকাদারদের ভাষ্য নয়—আপনার অন্তরের অন্তর্যামী যেমন হৃদয়ঙ্গম করবেন তেমনই, সর্বোপরি সর্বসমতার মহান মতবাদকে অনুসরণ করুন। সর্বভূতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করুন।

এই হলো মুক্তির পথ। অসাম্য হলো বন্ধনের। কোন মানুষ অথবা কোন জাতি বাহ্যিক-সমতা ছাড়া বাহ্যিক-স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না। সেই রকম মানসিক জগতেও সমতাবোধ ছাড়া মুক্তি সম্ভব নয়।

অজ্ঞানতা, অসাম্য এবং বাসনা—এই তিনটি হলো দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ এবং একটি অন্যটির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। মানুষ কি কারণে অন্য কোন মানুষের, এমন কি পশুর চাইতেও নিজেকে উর্ধ্বে মনে করবে? সবই যে এক।

"তুমিই মানুষ, তুমিই রমণী, তুমিই যুবক, তুমিই যুবতী।" অনেকে বলতে

পারেন, "সন্ন্যাসীদের পক্ষে না হয় এসব সম্ভব, কিন্তু আমরা যে গৃহী।" একথা অবশ্য ঠিক যে সংসারী মানুষকে নানা ধরনের কর্তব্য করতে হয় এবং সম্পূর্ণভাবে সাম্য-বোধ হয়ত তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু তবুও এই তার আদর্শ হওয়া উচিত। কারণ সমবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, সব সমাজের, সমগ্র মানবগোষ্ঠীর, পশুজগতের, সর্ব প্রকৃতির একমাত্র আদর্শ।

অসাম্য—মানবজীবনের অভিশাপ, সর্ব দুঃখের কারণ; দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সকল বন্ধনের উৎপত্তিস্থল।

"ঈশ্বর সর্বস্থলে সমভাবে উপস্থিত ইহা জানিয়া সে আপনার দ্বারা আপনার অনিষ্ট করে না এবং উচ্চতম লক্ষ্যে গমন করে।" এই একটি বাক্যের সামান্য কয়টি কথায়, মোক্ষলাভের সার্বিক পন্থার ইঙ্গিত।

আপনারা রাজপুতরা প্রাচীন ভারতের গৌরব। আপনাদের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় অধঃপতন। ক্ষত্রিয়র বংশধররা ব্রাহ্মণদের বংশধরদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যদি দুর্বলকে সাহায্য করতে, অজ্ঞানকে জ্ঞানের আলোক দিতে, পিতৃপুরুষের পুণ্য-ভূমির অপহৃত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে কৃতসঙ্কল্প হন তবেই ভারতের উদ্ধারের আশা।

সময় অনুকূল। ভাগ্যচক্র আবার ঘুরেছে। ভারতবর্ষ থেকে আবার স্পন্দন উঠেছে। সে স্পন্দন অদূর ভবিষ্যতে অমোঘ গতিতে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পৌছবে। একটি কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে। তার প্রতিধ্বনি আবর্তে আবর্তে এগিয়ে চলেছে, প্রতিদিন সঞ্চিত হচ্ছে নূতনতর শক্তি। এ কণ্ঠস্বর পূর্বসূরীদের কণ্ঠস্বরের চাইতেও উদাত্ত। কারণ তাঁদের সকলের সমন্বয় হয়েছে এখানে। আর একবার শোনা গেল সেই কণ্ঠস্বর যা সরস্বতীর তীরে বসে শুনেছিলেন ঋষিরা। যে কণ্ঠস্বর হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিধ্বনিত হয়ে নেমে এসেছিল সমভূমিতে, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যের মাধ্যমে, বন্যার মত ভাসিয়েছিল পৃথিবী। সেই কণ্ঠস্বর আবার ধ্বনিত হয়েছে। আবার খুলেছে দুয়ার। তোমরা সবাই আলোকোজ্জ্বল রাজ্যে প্রবেশ করো—দ্বার অবারিত।

আর আপনি, আমার প্রিয় মহারাজ, আপনি তো সেই জাতিরই একজন, যাঁরা এই সনাতন হিন্দুধর্মের জীবন্ত স্তম্ভ, এর রক্ষক এবং সাহায্যকারী। আপনি কৃষ্ণ এবং রামের বংশজাত—আপনি কি দাঁড়িয়ে থাকবেন বাইরে? আমি জানি তা হয় না, আমার স্থির বিশ্বাস আপনিই সর্বপ্রথম প্রসারিত হস্তে এগিয়ে আসবেন ধর্মের রক্ষায়। রাজা অজিত সিং, "আপনার ভিতরে, আপনাদের পরিবারের সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাধুজন-বাঞ্ছিত পবিত্রতা আর মানবজাতির প্রতি অপরিসীম প্রেম। আপনার কথা যখন ভাবি তখন এ কথা বিশ্বাস না করে পারি না যে আপনারা পুনরুদ্ধারের কাজে লাগলে সনাতন ধর্মের গৌরবময় পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

আপনি এবং আপনারা চিরদিন ধরে শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য হয়ে, দীর্ঘজীবন লাভ করে সত্যের প্রচার করুন—সদাসর্বদা এই প্রার্থনারত।

বিবেকানন্দ

সামাজিক সম্মেলনের ভাষণ

'ঈশ্বর নেটিভদের সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বর ইউরোপীয়দের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সংকর জাতির সৃষ্টি করেছে অন্য কেউ'—আমরা এক ভীষণ ঈশ্বর-নিন্দুক ইংরাজকে বলতে শুনেছিলাম।

আমাদের কাছে আছে ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনের সংস্কার-উৎসাহের বাণীদানকারী মিঃ জাস্টিস রানাডের উদ্বোধনী ভাষণ। তাতে আছে, প্রাচীনকালের অসবর্ণ বিবাহের এক বিরাট তালিকা, প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের উদার ভাব সম্বন্ধে বহু কথা, ছাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ ভাল উপদেশ—সবই আন্তরিক সদিচ্ছা ও মধুর ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে, যা সত্যি প্রশংসনীয়।

যাহোক, বক্তৃতার শেষাংশে উপদেশ দেওয়া হয়েছে পাঞ্জাবের প্রবল নতুন আন্দোলনটির জন্যে একদল আচার্য গঠন করতে, আমরা ধরে নিচ্ছি সেটি হচ্ছে এক সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠিত আর্য-সমাজ। এই কথায় আমরা অবাক হচ্ছি এবং আমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে:

দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছেন, ক্ষত্রিয়দেরও সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সন্ন্যাসীদের সৃষ্টি করল কে?

প্রতিটি জানা ধর্মেই সন্ন্যাসী বা মোহন্তরা ছিলেন ও আছেন। হিন্দু সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী, এমন কি ইসলামধর্মে বৈরাগ্যকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে এবং ভিক্ষুক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে গ্রহণ করতে হয়েছে।

নানা ধরনের কেশবিশিষ্ট সন্ন্যাসী আছেন—পুরো মাথা কামানো, খানিকটা কামানো, দীর্ঘ-কেশ, হ্রস্ব-কেশ, জটাধারী প্রভৃতি।

এঁদের বেশও নানা ধরনের—দিগম্বর, চীরাম্বর, গৈরিক-ধারী, পীতবস্ত্র-ধারী, কৃষ্ণ-পোশাক-ধারী খ্রীষ্টান, নীল পোশাকধারী মুসলমান। তারপর আছেন বিভিন্নভাবে দেহ-পীড়নকারী তপস্বীরা, আর একদল দেহকে সুস্থ ও সবল রাখায় বিশ্বাসী। প্রাচীনকালে প্রতি দেশেই বীর সন্ন্যাসীরা ছিলেন। এই একই ভাবের প্রকাশ ও বিকাশ সমান্তরালভাবে নারী সন্ন্যাসীদের মধ্যেও দেখা যায়। মিঃ রানাডে শুধু ভারতীয় সমাজ সম্মেলনের সভাপতি নন, তিনি নারীদের মর্যাদারক্ষাকারী এক ভদ্রলোকও। শ্রুতি ও স্মৃতির উল্লেখিত সন্ন্যাসীরা তাঁর সম্পূর্ণ মনোমত বলেই বোধ হয়। প্রাচীনকালের অবিবাহিতা ব্রহ্মবাদিনীরা, যাঁরা বড় বড় দার্শনিকদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করে এক রাজসভা থেকে অন্য রাজসভায় ঘুরে বেড়াতেন, তাঁরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের মুখ্য উদ্দেশ্য যে বংশবৃদ্ধি তাতে বাধা দিয়েছেন বলে তাঁর মনে হয় না। মিঃ রানাডের মতে পুরুষেরা সন্ন্যাসী হয়ে যেমন মানবীয় অভিজ্ঞতার পূর্ণতা ও বৈচিত্র্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, নারীরা সেই একই ধারায় আচরণ করে তেমনি বঞ্চিত হয়েছেন, তা বোধ হয় না।

অতএব আমরা প্রাচীন সন্ন্যাসীদের ও তাঁদের আধুনিক আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীদের আলোচনার ঊর্ধ্বে বলে বাদ দিচ্ছি।

চূড়ান্ত অপরাধী পুরুষকেই শুধু রানাডের সমালোচনার সব চোট সহ্য করতে হচ্ছে, দেখা যাক এই চোট সে সামলাতে পারে কিনা।

বোধহয় মনীষীদের মধ্যে সুচিন্তিত ধারণা হচ্ছে যে এই বিশ্বব্যাপী সন্ন্যাসাশ্রমের প্রথম উৎপত্তি আমাদের এই অদ্ভুত দেশে, মনে হয় 'সমাজসংস্কারে'র একান্ত প্রয়োজন থেকেই হয়েছে।

গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয় প্রকার গুরুই বেদের মতোই প্রাচীন। বর্তমানে এটি সিদ্ধান্ত করা কঠিন যে সোমপায়ী বিবাহিত 'সর্ব বিষয়ে' অভিজ্ঞ ঋষিরাই প্রথমে উদয় হয়েছিলেন কিংবা মানবোচিত অভিজ্ঞতাহীন সন্ন্যাসী ঋষিরাই আদিম। সম্ভবত মিঃ রানাডে তথাকথিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের উড়ো কথার উপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে আমাদের এই সমস্যার সমাধান করে দেবেন; ততদিনে এই প্রশ্নটি প্রাচীনকালের সেই হেঁয়ালির মতোই থাকবে—ডিম আগে, না মুরগী আগে?

কিন্তু উৎপত্তির ক্রমান্বয় যাই হোক না কেন, শ্রুতি ও স্মৃতির সন্ন্যাসী উপদেষ্টারা গৃহস্থ উপদেষ্টাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মঞ্চে দাঁড়িয়ে, সেটি হচ্ছে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য।

যদি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান বৈদিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হয়, তবে ব্রহ্মচর্য যে জ্ঞানকাণ্ডের ভিত্তি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রক্তপাতকারী যজ্ঞকর্তারা উপনিষদ্বক্তা হতে পারলেন না কেন?

একদিকে রয়েছেন বিবাহিত ঋষি তাঁর কতকগুলি অর্থহীন অদ্ভুত, না, ভয়ঙ্কর অনুষ্ঠান নিয়ে,—খুব কম করে বললেও বলতে হয়, তাঁদের নীতিজ্ঞানটা ধোঁয়াটে ধরনের; আবার অন্যদিকে আছেন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ঋষিরা, যাঁরা মানবোচিত অভিজ্ঞতার অভাব সত্ত্বেও এমন উচ্চ ধর্মনীতি ও আধ্যাত্মিকতার উৎসমুখ খুলে দিয়েছিলেন, যা সন্ন্যাসের বিশেষ পক্ষপাতী জৈন ও বৌদ্ধের থেকে শুরু করে শংকর, রামানুজ, কবীর, চৈতন্য পর্যন্ত গভীরভাবে পান করে তাঁদের অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংস্কারগুলি প্রচার করার শক্তিলাভ করেছিলেন এবং যা পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে তিন-চার হাত ঘুরে এসে আমাদের সমাজ সংস্কারকদের, সন্ন্যাসীদের পর্যন্ত সমালোচনা করার শক্তি দিয়েছে।

বর্তমান কালে আমাদের সমাজ-সংস্কারকদের বেতন ও সুবিধাগুলির তুলনায় ভিক্ষুক সন্ন্যাসীরা কী সাহায্য, কী বেতন পেয়ে থাকেন? আর সন্ন্যাসীদের নীরব নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কার্যের তুলনায় সমাজ-সংস্কারকরা কী কাজ করে থাকেন?

কিন্তু সন্ন্যাসীরা আত্মপ্রচারের আধুনিক কৌশলটা শেখেননি।

হিন্দুরা মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে শিখে থাকে এই জীবনটি কিছু নয়—স্বপ্নমাত্র! এ বিষয়ে সে পাশ্চাত্যদের সঙ্গে একমত, কিন্তু পাশ্চাত্যরা এর পরে আর কিছু দেখে না, তার সিদ্ধান্ত চার্বাকের মতোই, 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ'। 'এই পৃথিবীটা এক দুঃখপূর্ণ গহ্বর, এখানে যে বিন্দুমাত্র সুখ আছে তা পুরোমাত্রায় উপভোগ করে নেওয়া যাক।' অন্যদিকে হিন্দুদের দৃষ্টিতে ঈশ্বর ও আত্মাই একমাত্র সত্য, এ জগৎ যতটা সত্য তার চেয়ে অনন্তগুণে সত্য; সুতরাং ঈশ্বর ও আত্মার জন্য জগৎকে ত্যাগ করতে সে সর্বদা প্রস্তুত।

যতদিন জাতীয় মনোভাব এইরকম থাকবে, আর আমরা প্রার্থনা করি বরাবর এটি থাকবে, তখন আমাদের পাশ্চাত্যভাবাপন্ন দেশবাসীদের ভারতীয় নরনারীর 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সর্বস্বত্যাগ করার প্রবৃত্তিকে বাধা দেবার কী আশা থাকতে পারে?

আর সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে পচা মড়ার মতো যুক্তিটা—ইউরোপে প্রোটেস্ট্যাণ্ট সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথম ব্যবহৃত, বাঙালী সংস্কারকদের দ্বারা ধার করা এবং বর্তমানে বোম্বাইয়ের ভ্রাতৃবৃন্দ দ্বারা আঁকড়ে-ধরা—অবিবাহিত থাকার দরুন সন্ন্যাসীরা 'সম্পূর্ণরূপে ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার' মধ্যে দিয়ে জীবনকে জানা থেকে বঞ্চিত। আশা করি এবার ওই মড়াটা চিরকালের জন্য আরবসাগরে বিসর্জিত হবে, বিশেষ করে এই প্লেগের দিনে, এবং ওই স্থানের উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষদের সুখ্যাতির প্রতি পিতৃভক্তি থাকা সত্ত্বেও, যদি পৌরাণিক কাহিনীগুলির কোন মূল্য থাকে তাদের বংশপরিচয় নির্ণয় করার।

কথা প্রসঙ্গে, ইউরোপে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরাই বেশির ভাগ ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন, যাদের পিতামাতা বিবাহিত হলেও 'জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার' রসাস্বাদ করতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন।

তারপর অবশ্য ঈশ্বর আমাদের প্রবৃত্তি দিয়েছেন কোন না কোন কাজের জন্য। অতএব সন্ন্যাসীরা বংশবৃদ্ধি না করে অন্যায় করছেন—তাঁরা পাপী। বেশ, তাহলে তো কাম, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, চুরি, ডাকাতি, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি সকল প্রবৃত্তিই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন, আর তাদের মধ্যে প্রতিটিই সৎ বা অসৎ সামাজিক জীবন রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন। এগুলি সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদীরা কী বলেন? জীবনে সব অভিজ্ঞতা চাই, এই মত অনুসারে কি ওইগুলিও পুরোদমে চালাতে হবে? অবশ্য সমাজ-সংস্কারকদের সঙ্গে যখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য ভালভাবে জানা আছে, তখন প্রশ্নটির জবাবে 'হ্যাঁ' বলতেই হবে। আমাদের কি বিশ্বামিত্র, অত্রি প্রভৃতিদের উগ্রতার জন্য অনুসরণ করতে হবে, বিশেষ করে নারী। সাহচর্যে 'পুরোমাত্রায় নানা ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জনকারী' বশিষ্ঠদলের অনুসরণ করতে হবে? কারণ বেশির ভাগ গৃহস্থ ঋষিই বেদগান ও সোমপানের জন্য যেমন প্রসিদ্ধ, তেমনি যখন যেখানে পেরেছেন পুত্রোৎপাদনের উদারতা দেখিয়েছেন বলে প্রসিদ্ধ; এঁদের, না যেসব অবিবাহিত সন্ন্যাসী ঋষি ব্রহ্মচর্যকেই আধ্যাত্মিকতার মূলমন্ত্র বলে প্রচার করেছেন, তাঁদের অনুসরণ করব?

তারপর সাধারণ ভ্রষ্টাচারীরা তো আছেই—যেসব সন্ন্যাসীরা আদর্শ অনুযায়ী চলতে পারেনি—দুর্বল, অসৎ—তাদের উপর দিয়ে নিন্দার ঝড় বয়ে যাওয়াই উচিত।

কিন্তু আদর্শ যদি সরল ও দৃঢ় হয়, তবে একজন ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীও যে কোন গৃহস্থের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, সেই নীতি অনুসারে—'ভালবেসে না পাওয়া ভাল না বাসার চেয়ে ভাল।'

যে কখনও উন্নত জীবন লাভের প্রচেষ্টা করেনি, সেই ভীরুর তুলনায় ভ্রষ্ট সন্ন্যাসী বীর।

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের সন্ধানী-আলোক যদি সমাজ-সংস্কারকদের ভেতরের ব্যাপারের উপর ফেলা যায়, তবে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের মধ্যে ভ্রষ্টাচারীর সংখ্যা শতকরা কত তার হিসেব দেবতারাই বের করতে পারেন, এবং সেই বিচারক-দেবতা আমাদের নিজেদের অন্তরেই আছেন।

তারপর এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার ব্যাপারটা? সব সাহায্য ত্যাগ করে, একলা দাঁড়িয়ে জীবনের ঝড়-তুফান বুক পেতে নিয়ে, কোন পুরস্কারের আশা না রেখে, কাজ করে যাওয়া, এমন কি বস্তাপচা কর্তব্যের ভাবটাও বাদ দিয়ে। সারা জীবন মুক্ত ভাবে সানন্দে কর্ম করে যাওয়া—কারণ মিথ্যা মানবীয় মোহ বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার দাস হয়ে জুতোর ঠোক্কর খেয়ে সে কাজ করে না।

এটি কেবল সন্ন্যাসীরাই পারে। ধর্মের কথা কি বল? এটা থাকবে, না লোপ পাবে? যদি থাকে, এ সম্বন্ধে দক্ষ ব্যক্তিদের দরকার, এর সৈন্যদলের দরকার, সন্ন্যাসী হচ্ছেন সেই দক্ষ ধার্মিক, কারণ ধর্মকেই তিনি জীবনের মূল লক্ষ্য করেছেন। তিনি ঈশ্বরের সৈনিক। যতদিন একনিষ্ঠ একদল সন্ন্যাসী থাকে, ততদিন কোন্ ধর্ম লোপ পায়?

প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের প্লাবনে কেন কেঁপে উঠছে?

বেঁচে থাকুন রানাডে ও সমাজ-সংস্কারকরা! কিন্তু হে ভারত! পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ভারত! বৎস, ভুলো না, এই সমাজে এমন সব সমস্যা আছে, যার তুমি বা তোমার পশ্চিমী গুরু এখনও মানেই বুঝতে পারনি—সমাধান তো দূরের কথা!

জগতের কাছে ভারতের বাণী

[নিম্নলিখিত লেখাগুলি স্বামী বিবেকানন্দের কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর একটি বই লেখার ইচ্ছা ছিল এবং সেই কাজের রূপরেখা হিসাবে বেয়াল্লিশটি চিন্তাসূত্র লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু বইটির ভূমিকাসহ মাত্র কয়েকটি চিন্তাসূত্রই তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছিলেন এবং কাজটি অসমাপ্ত থেকে যায়। পাণ্ডুলিপি যেমন পাওয়া গিয়েছিল তেমনি দেওয়া হলো।]

রূপরেখা

(১) পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশে আমার বাণী বলিষ্ঠ। দেশবাসীর উদ্দেশে বলিষ্ঠতর।

(২) বিস্ময়কর পাশ্চাত্যে চার বছর বাস করার ফলে ভারতবর্ষকে আরও ভালভাবে বুঝেছি। অন্ধকার দিকগুলি গাঢ়তর ও আলোকিত দিকগুলি উজ্জ্বলতর।

(৩) পর্যবেক্ষণের ফল—ভারতবাসীদের অধঃপতন হয়েছে সত্য নয়।

(৪) প্রত্যেক দেশে যে সমস্যা, এখানেও সেই সমস্যা—বিভিন্ন জাতির আত্মীকরণ, কিন্তু এখানকার মতন আর কোথাও এটি এত বিরাট নয়।

(৫) ভাষাগত ঐক্য, শাসন-ব্যবস্থা ও সর্বোপরি ধর্ম—একীকরণের শক্তিরূপে কাজ করেছে।

(৬) অন্যান্য দেশে এই প্রচেষ্টা 'শক্তি'র দ্বারা করা হয়েছিল, অর্থাৎ এক জাতির সংস্কৃতি জোর করে অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে ক্ষণস্থায়ী প্রাণবন্ত জাতীয় জীবন; তারপর ধ্বংস।

(৭) অন্যদিকে, ভারতবর্ষে সমস্যা যত বিরাট, সমাধানের প্রচেষ্টা তত শান্তভাবে। প্রাচীনকাল থেকে আচার-পদ্ধতি, বিশেষ করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মকে মেনে নেওয়া হয়েছে।

(৮) যেখানেই সমস্যা সামান্য এবং ঐক্য স্থাপনের জন্য যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, বস্তুত সেখানেই ফল হয়েছে প্রধান গোষ্ঠীর ছাড়া বিভিন্ন গোষ্ঠীর উন্নতির বিচিত্র জীবাণুগুলিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হয়েছে। শুধুমাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর মস্তিষ্ক বিরাট সমষ্টিকে নিজের ভালর জন্যই ব্যবহার করেছে। এইভাবে আধিপত্য-বিস্তারকারী শ্রেণী যখন নিজেকে ক্ষয় করে ফেলে তখন আপাত দুর্ভেদ্য সৌধ গুঁড়িয়ে ধ্বংস হয়ে যায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রীস, রোম, জার্মান।

(৯) একটি সাধারণ ভাষার বিশেষ অভাব অনুভূত হতে পারে। কিন্তু একই সমালোচনা এ সম্পর্কেও খাটে,—প্রচলিত বিভিন্ন ভাষাগুলির প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করে দেওয়া।

(১০) একমাত্র সমাধান হচ্ছে এমন এক মহান পবিত্র ভাষা খুঁজে বের করা, যার সন্ততিস্বরূপ অন্য সমস্ত ভাষাকে মনে করা হয় এবং এটি সংস্কৃতের মধ্যে পাওয়া যায়।

(১১) দ্রাবিড় ভাষাগুলি সংস্কৃত হতে উদ্ভূত হতে পারে বা নাও হতে পারে; কিন্তু

এখন বাস্তব ক্ষেত্রে তারা প্রায় সংস্কৃতই হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনের পর দিন নিজেদের প্রাণবন্ত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তাদের ক্রমশ আদর্শের দিকে অগ্রসর হতে আমরা দেখছি।

(১২) একটি জাতীয় পটভূমি পাওয়া গেল—আর্যজাতি।

(১৩) মধ্য এশিয়া থেকে বাল্টিক পর্যন্ত আর্য বলে অভিহিত কোন বিশিষ্ট পৃথক জাতি বাস করত কিনা তা অনুমানের বিষয়।

(১৪) তথাকথিত বিশেষ ধরন। বিভিন্ন জাতি সর্বদাই মিশ্রিত ছিল।

(১৫) সোনালী চুল ও কালো চুল।

(১৬) তথাকথিত ঐতিহাসিক কল্পনা থেকে সাধারণ বুদ্ধির বাস্তব জগতে আগমন। প্রাচীন নথিপত্র অনুসারে আর্যরা ছিল তুর্কিস্তান, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম তিব্বতের মধ্যবর্তী দেশে।

(১৭) বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্তরের সংস্কৃতির মিশ্রণের দিকে এটি নিয়ে যায়।

(১৮) যেমন সংস্কৃত হচ্ছে ভাষাসমস্যার সমাধান, তেমনি 'আর্য' জাতিগত সমস্যার সমাধান। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রগতি ও সংস্কৃতির এবং সর্বপ্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হচ্ছে ব্রাহ্মণত্ব।

(১৯) ভারতের মহান আদর্শ—ব্রাহ্মণত্ব।

(২০) সম্পদহীন, স্বার্থহীন, নৈতিক নিয়ম ছাড়া কোন আইনের, কোন শাসকের বাধ্য নয়।

(২১) জন্মগত ব্রাহ্মণত্ব—অতীতে ও বর্তমানে বহু জাতি ব্রাহ্মণত্বের দাবি করেছে ও অধিকার লাভ করেছে।

(২২) মহৎ কর্মের অধিকারীরা কোন দাবি করেন না, একমাত্র অলস অকর্মণ্য মূর্খেরাই করে।

(২৩) ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র আদর্শের অবনতি। পুরাণে আছে কলিযুগে কেবল অব্রাহ্মণেরাই থাকবে। সেটা সত্য, দিনে দিনে আরও সত্য হয়ে উঠছে। তবু কিছু ব্রাহ্মণ এখনও আছেন—শুধু ভারতবর্ষেই।

(২৪) ব্রাহ্মণ হতে হলে আমাদের ক্ষাত্রধর্মের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। অতীতে কেউ কেউ হয়তো এইভাবে উন্নত হয়েছেন, কিন্তু বর্তমানেও এটি দেখাতে হবে।

(২৫) কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনাটি ধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে উঠবে।

(২৬) একই জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীরা একটি বংশগত নামে একই ধরনের দেবতার উপাসনা করে, যেমন ব্যাবিলনীয়দের 'বাল' এবং হিব্রুদের 'মোলোক'।

(২৭) ব্যাবিলনীয়দের সব 'বাল' দেবতাকে 'বাল-মেরোডাচ'-এ পরিণত করার এবং ইস্রায়েলীদের সব 'মোলোক'কে 'মোলক-ইয়োবাহ' বা 'ইয়াহ্'তে পরিণত করার প্রচেষ্টা।

(২৮) ব্যাবিলোনীয়রা পারসিকদের দ্বারা ধ্বংস হয়। হিব্রুরা ব্যাবিলনীয়দের

পৌরাণিক কাহিনী গ্রহণ করে, নিজেদের প্রয়োজন মতো গড়ে নেয় এবং একেশ্বরবাদী দৃঢ় ধর্ম গড়তে সমর্থ হয়।

(২৯) একেশ্বরবাদ স্বৈর রাজতন্ত্রের মতো দ্রুত হুকুম তামিল করায় এবং বিরাট কেন্দ্রীভূত শক্তি, কিন্তু এর আর কোন বিকাশ হয় না। একেশ্বরবাদের সব চেয়ে খারাপ লক্ষণ হচ্ছে এর নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন। যেসব জাত এর প্রভাবাধীন হয়, তারা অল্পকালের জন্য হঠাৎ উন্নতি লাভ করে খুব তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়।

(৩০) ভারতবর্ষে সেই সমস্যা দেখা দিয়েছিল, সমাধান পাওয়া গেল—একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। সর্বপ্রকার সাফল্যের পিছনে এটিই মূলমন্ত্র, তোরণের কেন্দ্রশিলা।

(৩১) ফলস্বরূপ—বৈদান্তিকদের বিস্ময়কর সহনশীলতা।

(৩২) অতএব বড় সমস্যা হচ্ছে বিভিন্ন উপাদানের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট না করে ঐক্য ও সংহতি সাধন।

(৩৩) স্বর্গ বা মর্ত্যের কোন ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল কোন ধর্মসম্প্রদায় এটি করতে সক্ষম নয়।

(৩৪) এখানেই অদ্বৈতবাদের মহিমা। এটি আদর্শের প্রচারক, কোন ব্যক্তির নয়, অথচ মানবীয় বা স্বর্গীয় ব্যষ্টির পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ করে দেয়।

(৩৫) চিরকাল এটি চলে আসছে; এই অর্থে আমরা সর্বদা অগ্রসর হচ্ছি। মুসলমান রাজত্বের মহাপুরুষরা।

(৩৬) প্রাচীনকালে এই আদর্শ পূর্ণ সচেতন ও শক্তিশালী ছিল, বর্তমানকালে অপেক্ষাকৃত কম; এই অর্থে আমাদের অধঃপতন হয়েছে।

(৩৭) এইরকম ভবিষ্যতেও হবে। যদি কিছুকালের জন্য একটি গোষ্ঠী অন্যদের শ্রমের দ্বারা শক্তির বিকাশ করে আশ্চর্য ফললাভ করে থাকে, তাহলে এখানে বহুকাল ধরে যেসব জাত রক্ত ও আদর্শের মধ্য দিয়ে, ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে মিলিত ও একাত্ম হচ্ছে, তাদের সমন্বয়ে যে ভবিষ্যৎ মহাশক্তি ক্রমে পরিণত হবে, তা আমি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। ভারতের ভবিষ্যৎ—পৃথিবীর সব জাতের মধ্যে সবচেয়ে মহিমামণ্ডিত, তরুণতম, আবার প্রাচীনতমও।

(৩৮) আমাদের কোন্ পন্থায় কাজ করতে হবে। সামাজিক আচারপদ্ধতি বাধাস্বরূপ কয়েকটি স্মৃতি দ্বারা নির্ধারিত। কোনটিই শ্রুতি থেকে আসেনি। সময়ের সঙ্গে স্মৃতির পরিবর্তন হবে। এটি নিয়মরূপে স্বীকৃত।

(৩৯) বেদান্তের নীতিগুলি শুধু ভারতবর্ষে নয়, বাইরেও প্রচার করতে হবে। আমাদের চিন্তা প্রত্যেক জাতির মানস-গঠনে প্রবেশ করাতে হবে। শুধু লেখার দ্বারা নয়, ব্যক্তির দ্বারাও।

(৪০) কলিযুগে দানই একমাত্র কর্ম। কর্মের দ্বারা শুদ্ধ না হলে কেউ জ্ঞানলাভ করতে পারে না।

(৪১) পরা ও অপরা বিদ্যাদান।

(৪২) ত্যাগ—ত্যাগীর দল—জাতীয় আহ্বান।

প্রস্তাবনা

পাশ্চাত্যের জনগণের উদ্দেশ্যে আমার বাণী তেজোদীপ্ত। আমার প্রিয় স্বদেশবাসীগণ, তোমাদের কাছে আমার বাণী আরও তেজোদীপ্ত। প্রাচীন ভারতের বাণী আমার সাধ্যানুসারে প্রতীচ্যের নবীন জাতিগুলির কাছে প্রচার করার চেষ্টা করেছি—ভাল করেছি কি মন্দ করেছি, ভবিষ্যতে তা নিশ্চয়ই বোঝা যাবে। কিন্তু সেই ভবিষ্যতের বলদীপ্ত কণ্ঠ ইতিমধ্যেই মৃদু কিন্তু স্পষ্টভাবে গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে, দিনের পর দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে—সেটিই ভারতের বাণী, বর্তমান ভারতের কাছে ভবিষ্যৎ ভারতের বাণী।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে অনেক আশ্চর্য প্রথা ও বিধি, অনেক বিস্ময়কর শক্তি ও ক্ষমতার প্রকাশ লক্ষ্য করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি ও শক্তির আপাত বৈচিত্র্যের অন্তরালে একই বালষ্ঠ মানব-হৃদয়ে একই আনন্দ-বেদনা, সবলতা ও দুর্বলতার আবেগে স্পন্দিত হচ্ছে।

ভাল-মন্দ সব জায়গাতেই আছে। তাদের ভারসাম্য আশ্চর্যভাবে একই রকম। কিন্তু সবার উপরে সর্বত্র সেই গৌরবদীপ্ত মানবাত্মা, তার ভাষায় কথা বলতে জানলে যে কখনও কারুকে ভুল বোঝে না। প্রত্যেক জাতির মধ্যে এমন নরনারী আছেন, যাঁদের জীবন মানবজাতির পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ। যাঁরা সম্রাট ধর্মাশোকের সেই বাণীর প্রমাণস্বরূপ—'প্রত্যেক দেশেই ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা বাস করেন।'

আমি পাশ্চাত্য দেশগুলির কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ যে উষ্ণ ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁরা আমায় গ্রহণ করেছেন, তা একমাত্র পবিত্র ও নিঃস্বার্থ হৃদয়ই দিতে পারে। কিন্তু এই মাতৃভূমির প্রতিই আমার সারা জীবনের আনুগত্য এবং যদি আমাকে সহস্রবার জন্ম গ্রহণ করতে হয়, তবে সেই সহস্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, আমার স্বদেশবাসীরা, আমার বন্ধুরা—তোমাদেরই সেবায় ব্যয় হবে।

কারণ আমার যা কিছু আছে—দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—তার জন্য আমি এই দেশের কাছে ঋণী এবং যদি আমি কোন কিছুতে সফল হয়ে থাকি, সে গৌরব তোমাদের, আমার নয়। আমার দুর্বলতা ও ব্যর্থতাই শুধু আমার নিজের, কারণ আমার দেশবাসীকে যে শিক্ষা আজন্ম ঘিরে থাকে তার অভাববশত সেগুলি হয়েছে।

আহা কী দেশ! বিদেশী বা স্বদেশী যে কেউ এই পবিত্রভূমিতে দাঁড়ালে—যদি তার আত্মা জ্ঞানহীন পশুর স্তরে অধঃপতিত না হয়ে থাকে—ইতিহাসের বিস্মৃত অতীত হতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম যে সন্তানেরা পশুসত্তাকে দিব্যসত্তায় উন্নত করার সাধনা করে গেছেন, তাঁদের জীবন্ত চিন্তারাশি দ্বারা নিজেকে পরিবৃত অনুভব করবেন। সমগ্র বায়ুমণ্ডল আধ্যাত্মিকতার স্পন্দনে ভরা। দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতা, যা কিছু মানুষকে অন্তর্নিহিত পশুসত্তার থেকে রক্ষার অবিরাম সংগ্রামে সাময়িক শান্তি এনে দেয়, যেসব শিক্ষা মানুষকে পশুত্বের আবরণ উন্মোচিত করে জন্ম-মৃত্যুহীন চিরপবিত্র অমর আত্মারূপে প্রকাশিত হতে সাহায্য করে—এই দেশ সেই সবকিছুরই পুণ্যভূমি। এই দেশ—যেখানে আনন্দের পাত্রটি পূর্ণ হয়েছিল, বেদনার পাত্রটি পূর্ণতর হলে মানুষ সর্বপ্রথম উপলব্ধি করল যে এ সবই

অসার। এখানেই যৌবনের প্রারম্ভে, বিলাসের ক্রোড়ে, গৌরবের উচ্চচূড়ে, ক্ষমতার প্রাচুর্যে মানুষ মায়ার শৃঙ্খল মুক্ত হয়েছে। এইখানে, এই মানবতার সমুদ্রে সুখ-দুঃখ, সবলতা-দুর্বলতা, ধন-দারিদ্র্য, হাসি-অশ্রু, জীবন-মৃত্যুর তীব্র স্রোত সংঘাতে অনন্ত শান্তি ও নীরবতার বিগলিত ছন্দে উত্থিত হয়েছিল বৈরাগ্যের সিংহাসন! এই দেশেই জীবন ও মৃত্যুর মহাসমস্যা, জীবন-তৃষ্ণা, জীবন রক্ষার জন্য অসার উন্মাদ সংগ্রামের ফলে সঞ্চিত দুঃখরাশি—এই সমস্তই আয়ত্তে এনে সমাধান করা হয়েছিল—এমন সমাধান তার আগে কখনও হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। এখানে, একমাত্র এখানেই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় যে, এই জীবন অনিত্য, যা একমাত্র সত্য, তারই ছায়া মাত্র। এই দেশ, একমাত্র যেখানে ধর্ম হচ্ছে বাস্তব সত্য, এখানেই নরনারী সাহসের সঙ্গে লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য ঝাঁপ দেয়, ঠিক যেমন অন্যান্য দেশে দুর্বল ভাইদের লুট করে জীবনের সুখ উপভোগ করার জন্য নরনারীরা ঝাঁপ দেয়। এখানে, একমাত্র এখানেই মানুষের হৃদয় প্রসারিত হয়ে শুধু মানুষকেই নয়, পশুপক্ষী, তরুলতাকেও স্থান দিয়েছে, মহত্তম দেবগণ হতে বালুকণা পর্যন্ত, উচ্চতম ও নিম্নতম সকলকেই হৃদয়ে ধারণ করে তা বিশাল হয়েছে, অসীম। একমাত্র এখানে মানবাত্মা সমগ্র বিশ্বকে এক অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের প্রতিভূ বলে শিক্ষালাভ করেছে, যার প্রতিটি স্পন্দন হচ্ছে তার নিজের নাড়ী-স্পন্দন।

আমরা সকলে ভারতের অধঃপতন সম্বন্ধে বহু কথা শুনছি। এক সময় আমি এ কথায় বিশ্বাস করতাম। কিন্তু আজ অভিজ্ঞতার দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়িয়ে সংস্কার-মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে, এবং সবচেয়ে বড় কথা, অন্যান্য দেশের প্রকৃত সংস্পর্শে এসে তাদের অতিরঞ্জিত ছবিগুলির সঠিক রং দেখে সবিনয়ে স্বীকার করছি যে আমার ভুল হয়েছিল। হে পবিত্র আর্যভূমি, তোমার তো কখনও অবনতি হয়নি। কত রাজদণ্ড ভেঙে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, কত শক্তির দণ্ড এক হাত থেকে অন্য হাতে চলে গেছে, কিন্তু ভারতে রাজা ও রাজসভা অল্প মানুষেরই মন ছুঁয়েছে। উচ্চতম শ্রেণী হতে নিম্নতম শ্রেণী পর্যন্ত বিশাল জনসমষ্টি নিজেদের অনিবার্য পথে এগিয়ে গেছে, জাতীয় জীবনস্রোত কখনও মৃদু ও অর্ধচেতন ভাবে, কখনও প্রবল ও জাগ্রতভাবে বয়ে চলেছে। কয়েক কুড়ি উজ্জ্বল অবিচ্ছিন্ন শতাব্দীর শোভাযাত্রার সামনে আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে, সেই শৃঙ্খলের কোন কোন অংশ ম্লান হয়েছে শুধু পরক্ষণে ঔজ্জ্বলতায় জ্বলে ওঠার জন্যেই এবং তার মাঝখান দিয়ে রানীর মতো পদক্ষেপে আমার দেশমাতা এগিয়ে চলেছেন তার গৌরবময় ভবিষ্যতের দিকে—পশুমানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত করার দিকে। স্বর্গে বা মর্তে কোন শক্তি নেই এ জয়যাত্রায় বাধা দিতে পারে।

সত্যই গৌরবময় ভবিষ্যৎ, হে ভ্রাতৃবৃন্দ! কারণ উপনিষদের যুগ থেকে আমরা সাহস করে পৃথিবীকে শুনিয়েছি—ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ—সন্তান দ্বারা নয়, ধন দ্বারা নয়, ত্যাগের দ্বারাই অমৃত লাভ হতে পারে। জাতির পর জাতি আমাদের বাণীকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছে এবং তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে জগৎ-রহস্য বাসনার জগতে থেকে সমাধান করতে। তারা অতীতে ব্যর্থ হয়েছে—প্রাচীন জাতিগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে ক্ষমতা ও অর্থলোলুপতা হতে অদ্ভুত অসাধুতা ও

দুর্দশার চাপে এবং নবীন জাতিগুলিও ধ্বংসের পথে গড়িয়ে চলেছে। এই প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয়নি—শান্তি না যুদ্ধ, ধৈর্য না অসহিষ্ণুতা, সততা না খলতা, বুদ্ধিবল না বাহুবল, আধ্যাত্মিকতা না ঐহিকতা, এদের মধ্যে কোনটি টিঁকে থাকবে? বহু যুগ আগে আমরা এই সমস্যার সমাধান করেছি, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের মধ্যে দিয়ে সেই সমাধানকে আঁকড়ে আছি এবং শেষ অবধি সেটিকেই ধরে রাখতে চাই। আমাদের সমাধান অপার্থিবতা—ত্যাগ।

এটিই ভারতীয় জীবন-সাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সংগীতের মূল সুর, তার অস্তিত্বের মেরুদণ্ড, ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণী। জীবনের এই লক্ষ্যপথ হতে সে কখনও বিচ্যুত হয়নি, তাতার বা তুর্কি, মোগল বা ইংরাজ, যেই তাকে শাসন করুক না কেন।

আমি সকলকে আহ্বান করছি ভারতের ইতিহাসে কেউ এমন একটা যুগ দেখিয়ে দিন, যখন ভারতে সমস্ত জগৎকে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা পরিচালিত করতে পারে এমন মহাপুরুষের অভাব ছিল। তার কাজ আধ্যাত্মিক, সে কাজ রণবাদ্য বা সৈন্যদের অভিযানের দ্বারা হতে পারে না। ভারতের প্রভাব চিরকাল পৃথিবীতে নীরব শিশিরপাতের মতো সকলের অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, অথচ পৃথিবীর সুন্দরতম ফুলগুলিকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছে। এই প্রভাবের শান্তস্বভাবের জন্য নিজের দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশে প্রতীক্ষা করতে হয়েছে, যদিও স্বদেশের গণ্ডীর মধ্যে তার কাজের কোনদিন বিরাম ছিল না। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই জানেন যে, এর ফলে যখনই সাম্রাজ্য গঠনকারী তাতার, পারসিক, গ্রীক বা আরব এ দেশের সঙ্গে বাইরের জগতের সংযোগ সাধন করেছে, তখনই আধ্যাত্মিকতার ব্যাপক প্রভাব জগৎ প্লাবিত করে দিয়েছে। সেই একই ধরনের ঘটনা আবার আমাদের সামনে এসেছে। ইংরাজের জলপথ ও স্থলপথ এবং ওই ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসীদের বিস্ময়কর শক্তির বিকাশের ফলে আর একবার ভারতের সমস্ত জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং সেই একই কর্ম ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। আমার কথা লক্ষ্য করুন, এ কেবল সামান্য সূচনামাত্র, বড় জিনিস পিছনে আসছে। বর্তমানে ভারতের বাইরে যে কাজ হচ্ছে, তার ফলাফল কী হবে আমি সঠিক বলতে পারি না; কিন্তু এটি আমি নিশ্চিত জানি লক্ষ লক্ষ লোক—আমি দৃঢ়ভাবে বলছি, লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি সভ্য দেশে সেই বাণীর জন্য অপেক্ষমাণ, যে বাণী বর্তমানকালে অর্থোপাসনার ফলে বস্তুবাদের ভয়ংকর গহ্বরের দিকে তাদের ঠেলে নিয়ে চলার হাত হতে রক্ষা করবে। নতুন সামাজিক আন্দোলনের বহু নেতারা ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন যে বেদান্তের উচ্চতম ভাবধারাই তাঁদের সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষার অধ্যাত্ম রূপ দিতে সক্ষম। এই বিষয়ে আমি শেষের দিকে আবার ফিরে আসব। তাই আমি অন্য প্রধান বিষয়টি নিচ্ছি—দেশের ভিতরে কাজ।

এই সমস্যার দুটো দিক, শুধু অধ্যাত্ম-রূপান্তর নয়, যে বিভিন্ন উপাদানে এই জাতি গঠিত, তার সমীকরণ। প্রত্যেক জাতির জীবনে সাধারণ কর্তব্য হচ্ছে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একাত্মকরণ।

থিয়োজফি সম্বন্ধে দু-এক কথা

এ বছর থিয়োজফিস্টদের রজত-জয়ন্তী, এদের পঁচিশ বছরের কার্যকলাপের কিছু কিছু বিবরণ কাগজে দেখছি।

হিন্দুরা যে মারাত্মক রকমের উদার হয়ে ওঠেনি সে কথা আজ আর কেউ বলতে পারবে না। দেখছি একদল হিন্দু যুবক এই আমেরিকান অধ্যাত্মবাদের চারাগাছের কলমটিকে—তার ঠোকাঠুকির যন্ত্র এবং মহাত্মা নামক গোলা ছোঁড়াছুঁড়ির সাজ-সরঞ্জাম-সহই স্বাগত জানিয়েছে।

থিয়োজফিস্টদের দাবি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি তত্ত্বজ্ঞানটি তাদের কাছেই রক্ষিত আছে। খুবই আনন্দের কথা, আরও আনন্দের কথা যে তারা তাদের তত্ত্বজ্ঞানটি সতর্ক পাহারায় গোপন করে রাখবেন, সামান্য নরদেহী হিন্দু আমরা! ঐ তত্ত্বজ্ঞানটি আমাদের ওপর ছাড়লে কি বিপদই না হতো আমাদের! আধুনিক থিয়োজফি মানেই হলো Mrs. Besant Blavatskism এবং Olcottism তো এখন পেছনের সারিতে। Mrs. Besant-এর উদ্দেশ্যটা অন্তত সাধু এবং তাঁর অধ্যবসায় এবং উৎসাহও অনস্বীকার্য।

অবশ্য ছিদ্রান্বেষী সমালোচকও অনেক আছে, আমরা দেখছি থিয়োজফির সবই ভাল—যেটা সোজাসুজি হিতকর সেটা তো ভালই আবার থিয়োজফিস্টরা যেসব বলেন যেটা অহিতকর সেটাও ভাল, আমরা বলি পরোক্ষে ভাল—বিভিন্ন স্বর্গের এবং সেখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে নিখুঁত ভৌগোলিক জ্ঞান, দৃশ্য জগতে বসে কলাকৌশল দক্ষ আঙুলের সাহায্যে জীবন মানুষের ভৌতিক আলাপন—এ সবই ভাল, যে injection করলে এক জাতীয় অদ্ভুত পোকা সুস্থ বলে চালু কতকগুলো মাথায় অবধারিত ভাবে বাসা বাঁধে, থিয়োজফি হলো সেই injection-এর সর্বশ্রেষ্ঠ Serum.

থিয়োজফিস্টদের সংস্থা অথবা অন্য কোন সংস্থার সংকার্যের নিন্দা করবার আমাদের কোনই বাসনা নেই। তবু বলি অতিরঞ্জন আমাদের জাতির সর্বনাশের একটি কারণ, লক্ষ্ণৌর Advocate কাগজে থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি সম্বন্ধে যে লেখাগুলি ছাপা হয়েছে তা যদি লক্ষ্ণৌর মনোভাবের পরিচায়ক হয় তাহলে তাদের জন্য আমরা দুঃখ বোধ করছি। অপপ্রশংসাও যেমন অন্যায় অতিরঞ্জিত প্রশংসাও তেমনি ক্ষতিকারক।

দুর্বোধ্য কতগুলি আধ্যাত্মিক শব্দের বদলে কিছু সংস্কৃত শব্দকে সহায় করে আমেরিকান অধ্যাত্মবাদের ভারতীয় চারা-কলমটির আমদানি। আর ভৌতিক ঠুকঠাকের পরিবর্তে মহাত্মা নামক ক্ষেপণাস্ত্র, ভূতাবিষ্টতার বদলে মহাত্মা-প্রেরণা। Advocate-এর লেখকের এসব বিষয়ে কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে বলে আমাদের মনে হয় না। কিন্তু তিনি নিজেকে এবং তার থিয়োজফিস্টদের সঙ্গ মহান হিন্দুজাতির সঙ্গে গোলমাল করে মিলিয়ে না ফেলেন, কারণ অধিকাংশ হিন্দু প্রথম থেকেই থিয়োজফি নামক অদ্ভুত বিষয়টির স্বরূপ বুঝতে পেরেছেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর

অনুসরণে নিজেদের এ থেকে সরিয়ে রেখেছেন। স্বামীজীর কাছে ব্যাপারটা যে মুহূর্তে ধরা পড়েছিল সেই মুহূর্ত থেকেই Blavatskism স্বামীজীর দাক্ষিণ্য হারিয়েছিল।

পত্রিকার ঐ লেখকের পূর্বানুরাগ যাই থাক না কেন হিন্দুদের এই কলিযুগেও ধার্মিক শিক্ষা অথবা শিক্ষাগুরুর কোন অভাব নেই। তাদের রুশীয় অথবা আমেরিকান মৃত প্রেতাত্মার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই।

উক্ত লেখাটি হিন্দুজাতি এবং হিন্দুধর্মের প্রতি অসম্মানজনক নিন্দাবাদ। এই ধরনের লেখকরা শেষবারের মতন জেনে রাখুন যে পশ্চিম দেশ থেকে কোনরকম ধর্ম আমদানি করবার প্রয়োজন নেই হিন্দুদের, ইচ্ছেও নেই। প্রায় সবকিছুই যে আমদানি করতে হচ্ছে—অমর্যাদার গ্লানি তাতেই যথেষ্টরও বেশী। আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে ধর্ম আমদানি করবার প্রয়োজন যদি কারু থাকে সেই পশ্চিমের এবং আমরা সেই পথেই কাজ করে চলেছি। পশ্চিমদেশে হিন্দুধর্মের প্রচারের জন্য থিয়োজফিস্টরা কোনরকমই ভূমি তৈরী করতে তো পারেনই নি বরং তাদের হস্ত-কৌশলজনিত ভেল্কির ফলে পর্বত-প্রমাণ বাধাই পার হতে হয়েছিল। ঐ লেখকের জানা উচিত ছিল Max Muller-এর মত পণ্ডিতকে, Edwin Arnolds-এর মত কবিকে আশ্রয় করেই থিয়োজফিস্টরা পশ্চিম সমাজের বুকে হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছবার চেষ্টা করেছিল; অথচ তাঁদেরই নিন্দাবাদ করে নিজেদেরই সাবিক তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র উপযুক্ত আধার বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিল। সোয়াস্তির কথা এইটুকুই যে এরা এদের তত্ত্বজ্ঞানকে গোপন রাখছে। আজকে পশ্চিমের মানুষের মনে যে হিন্দুধর্ম, হাতুড়ে প্রবঞ্চনা, আর ফকিরের ভানুমতী কি খেল—সব একাকার হয়ে গেছে—তার জন্য মূলত দায়ী এরাই এবং হিন্দুধর্মের প্রতি এটাই হলো এদের একমাত্র অবদান।

প্রত্যেক দেশেই থিয়োজফির আশু ও মহৎ সুফল যা দেখছি, তা হলো স্বাস্থ্যবান, অধ্যাত্মবাদী কর্মঠ ও দেশভক্তদের থেকে আধ্যাত্মিকতার মুখোসধারী ভণ্ড, রুগ্ন ও অধঃপতিতদের পৃথকীকরণ, যেমন প্রোফেসার Koch-এর যক্ষ্মারোগীদের ফুসফুসে জীবাণুদের পৃথকীকরণের ইনজেকশন।

রামায়ণ

[১৯০০ সালের ৩১শে জানুয়ারি তারিখে ক্যালিফোর্নিয়ার পাসাডেনায় শেকসপীয়ার ক্লাবে প্রদত্ত ভাষণ।]

সংস্কৃত ভাষায় দুটি মহৎ মহাকাব্য আছে, উভয়েই সুপ্রাচীন। অবশ্য আরও শত শত মহাকাব্যধর্মী কাব্যও আছে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছে। যদিও দুহাজার বছরের বেশি হল সংস্কৃত আর কথ্যভাষা নেই। এখন আমি আপনাদের কাছে দুটি সবচেয়ে প্রাচীন মহাকাব্যের কথা বলব — সে দুটি হল রামায়ণ ও মহাভারত। এ দুটিতে প্রাচীন ভারতীয়দের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, সমাজের অবস্থা, সভ্যতা প্রভৃতি মূর্ত হয়ে রয়েছে। এ দুটির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন মহাকাব্যটির নাম রামায়ণ, "রামের জীবন-কাহিনী"। এর আগেও কিছু কাব্যিক রচনা ছিল—হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদের অধিকাংশ এক ধরনের ছন্দে লিখিত ছিল। কিন্তু ভারতে সর্বসম্মতিক্রমে এই গ্রন্থখানিকেই কাব্যের একেবারে আদি বলে গণ্য করা হয়।

এই কবি বা ঋষির নাম বাল্মীকি। পরবর্তী কালে অনেকগুলি কাব্যময় কাহিনী এই প্রাচীন কবির উপর আরোপ করা হয়েছিল। ক্রমশ তাঁর নয় এমন অনেক কবিতা তাঁর বলে চালানো নিতান্ত সাধারণ আচারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই সমস্ত প্রক্ষেপ সত্ত্বেও রামায়ণ আমাদের কাছে এক অতি চমৎকার কাহিনী হিসাবে প্রবাহিত হচ্ছে, বিশ্বসাহিত্যে যার জুড়ি নেই।

এককালে একটি যুবক কোন মতেই নিজের পরিবার প্রতিপালন করতে পারছিল না। গায়ের জোর ও মনের উৎসাহের উপর ভরসা করে শেষ পর্যন্ত সে রাজপথে ডাকাতি শুরু করল। পথিকদের মেরে-ধরে টাকা-পয়সা কেড়ে নিত, তাই দিয়ে মা-বাবা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের খাওয়াত। এমন সময় একদিন পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন নারদ নামে মহর্ষি। দস্যু তাঁকে ধরল। ঋষি দস্যুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার উপর ডাকাতি করতে যাচ্ছ কেন? লুট-পাট, মানুষ খুন মহাপাপ। এত পাপ কি জন্য করছ?" দস্যু বলল, "কেন, এই টাকা দিয়ে আমি আমার পরিবার প্রতিপালন করতে চাই।" ঋষি বললেন, "আচ্ছা তুমি কি মনে কর তারা তোমার পাপেরও ভাগ নেবে?" দস্যু জবাব দিল, "নিশ্চয়ই নেবে।" ঋষি বললেন, "বেশ, আমাকে এখানে নিরাপদে বেঁধে রাখ, আর বাড়ি গিয়ে তোমার পরিবারকে জিজ্ঞাসা করে এস তারা তোমার ধনের যেমন ভাগ নিচ্ছে পাপেরও তেমনি ভাগ নেবে কিনা।" লোকটি সেইভাবে তার বাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা, আপনি কি জানেন কিভাবে আমি আপনাকে ভরণপোষণ করি?" বাবা বললেন, "না, আমি জানি না।" "আমি দস্যু, মানুষ খুন করি, লুট-পাট করি।" "কি! আমার ছেলে হয়ে তুমি এই কর? দূর হও! সমাজভ্রষ্ট!" সে তখন মায়ের কাছে গেল, তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "মা, তুমি কি জান কিভাবে তোমায় আমি ভরণপোষণ করি?" তিনি জবাব দিলেন, "না।" "ডাকাতি আর খুন করে।" মা চিৎকার করে উঠলেন, "কি ভয়ানক কথা!" ছেলে বলল, "কিন্তু তুমি কি আমার পাপের ভাগ নাও?"

মা উত্তর দিলেন, "কেন নেব ? আমি কখনও ডাকাতি করিনি।" তখন সে গিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি জান কিভাবে আমি তোমাদের সবাইকে প্রতিপালন করি ?" সে জবাব দিল, "না"। লোকটি তখন বলল, "আমি তো পথে পথে ডাকাতি করি। বছরের পর বছর মানুষের সর্বস্ব লুট করছি, সেইভাবেই তোমাদের সকলকে প্রতিপালন ও ভরণপোষণ করছি। এখন আমি জানতে চাই তুমি আমার পাপের ভাগ নিতে রাজী আছ কিনা ?" "মোটেই না, তুমি আমার স্বামী, তোমার দায়িত্ব আমায় ভরণপোষণ করা।"

দস্যুর চোখ খুলে গেল। "এইতো পৃথিবীর রীতি, যাদের জন্য ডাকাতি করছিলাম আমার সেই নিকটতম আত্মীয়েরা পর্যন্ত আমার অদৃষ্টের ভাগ নেবে না।" ঋষিকে যেখানে বেঁধে রেখেছিল সেখানে ফিরে এসে সে তাঁর বাঁধন খুলে দিয়ে পায়ে পড়ে গেল। যা ঘটেছে সব শুনিয়ে বলল, "আমাকে রক্ষা করুন! বলুন কি করব ?" ঋষি বললেন, "তোমার বর্তমান জীবনধারা ছেড়ে দাও। দেখলে তো তোমার পরিবারের লোকেরা কেউ তোমায় সত্যিকারের ভালোবাসে না, কাজেই এসব মোহ বর্জন কর। তারা তোমার সুসময়ের সমৃদ্ধির ভাগীদার হবে, কিন্তু যে মুহূর্তে তোমার কিছু থাকবে না, ছেড়ে চলে যাবে। তোমার মন্দের ভাগ কেউ নেবে না, কিন্তু সবাই তোমার ভালর ভাগ নেবে। কাজেই তাঁকেই ভজনা কর যিনি আমরা ভাল-মন্দ যাই করি না কেন পাশে দাঁড়াবেন। তিনি আমাদের কখনও ছাড়বেন না, কারণ ভালবাসা কখনও নীচে নামায় না, লেন-দেন জানে না, স্বার্থপরতা জানে না।"

তারপর ঋষি তাকে শেখালেন কেমন করে আরাধনা করতে হয়। লোকটি তখন সব কিছু ছেড়ে বনে চলে গেল। সেখানে প্রার্থনা ও ধ্যানে মগ্ন হল। শেষ পর্যন্ত নিজেকে সে এমন ভুলে গেল যে উইরা যে তাকে ঘিরে ঢিপি বানিয়ে ফেলেছে তা সে জানতেই পারল না। বহু বছর পরে একদিন একটি বাণী শুনতে পেল : "ঋষিবর ওঠ।" জেগে উঠে লোকটি অবাক হয়ে বলল, "ঋষি! আমি তো দস্যু!" জবাব এল : "না, আর দস্যু নয়, এখন তুমি পরিশুদ্ধ ঋষি।" তোমার পুরানো নাম বিদায় নিয়েছে। তোমার তপস্যা এত গভীর, এত মহৎ যে শরীর ঘিরে উইঢিপিটিকে পর্যন্ত তুমি গ্রাহ্য করনি, তাই এখন থেকে তোমার নাম হবে বাল্মীকি অর্থাৎ বল্মীক থেকে যার জন্ম।" এইভাবে তিনি ঋষিতে পরিণত হলেন।

আর কবি হলেন কেমন করে ? ঋষি বাল্মীকি যখন একদিন পূতসলিলা গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছিলেন তখন দেখলেন একজোড়া বক গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে পরস্পরকে চুমো খাচ্ছে। চোখ তুলে দেখে তাঁর বড় ভাল লাগল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে একটি তীর সাঁ করে তাঁকে পেরিয়ে পুরুষ-বকটিকে মেরে ফেলল। বকটি মাটিতে পড়ে গেল। শোকে অস্থির স্ত্রী-বকটি সাথীর মৃতদেহ ঘিরে বারবার পাক দিতে লাগল। কবি করুণায় আপ্লুত হলেন, চোখ ফিরিয়ে ব্যাধকে দেখতে পেলেন। চিৎকার করে উঠলেন, "হতভাগ্য তুমি, লেশমাত্র দয়া নেই! তোমার ঘাতকহস্ত প্রেমের জন্যও নিবৃত্ত হল না ?" বলেই মনে মনে ভাবলেন "এ আমি কি বললাম ? আগে তো কখনও এমন করে কথা বলিনি।" তখন একটি বাণী শোনা গেল : "ভয় নেই। তোমার

মুখ থেকে যা বেরিয়ে এল তা কবিতা। পৃথিবীর উপকারের জন্য কাব্যিক ভাষায় তুমি রামের জীবন-কাহিনী লেখ। এইভাবেই কাব্যের শুরু। প্রথম শ্লোকটি আদি কবি বাল্মীকির মুখনিঃসৃত হয়েছিল করুণা থেকে উৎসারিত হয়ে। আর তারপরই তিনি লিখলেন চমৎকার রামায়ণ "রামের জীবন-কাহিনী"।

প্রাচীন ভারতে একদা অযোধ্যা নামে এক শহর ছিল। শহরটি আধুনিক কালেও আছে। যে প্রদেশে এই শহর অবস্থিত তার নাম অযোধ্যা, ভারতের মানচিত্রে আপনারা অনেকেই হয়তো দেখেছেন। সেই ছিল প্রাচীন অযোধ্যা। প্রাচীনকালে সেখানে দশরথ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর তিন রানী ছিল, কিন্তু রানীদের কোনও সন্তান হয়নি। নিষ্ঠাবান হিন্দুদের মত রাজা ও রানীরা তীর্থে তীর্থে পরিক্রমা করলেন, উপবাস ও প্রার্থনা করলেন যাতে সন্তান লাভ করতে পারেন। যথাসময়ে চারটি ছেলে হল। সবার বড় হলেন রাম।

এবারে চারভাই যথারীতি শিক্ষার সকল বিভাগে পারদর্শী হলেন। ভবিষ্যতে বিবাদ এড়ানোর জন্য ভারতবর্ষে একটা প্রাচীন প্রথা ছিল যে রাজা বেঁচে থাকতেই বড় ছেলেকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতেন। উত্তরাধিকারীকে বলা হত যুবরাজ, অর্থাৎ তরুণ রাজা।

এদিকে আর একজন রাজা ছিলেন—তাঁর নাম জনক। রাজা জনকের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিলেন, তাঁর নাম সীতা। সীতাকে শস্যক্ষেত্রে পাওয়া গিয়েছিল; তিনি ছিলেন ধরিত্রীর কন্যা, বাবা-মা ছাড়াই তাঁর জন্ম হয়েছিল। প্রাচীন সংস্কৃতে সীতা শব্দের অর্থ হল লাঙ্গলের ফলায় তৈরি খাত। ভারতের প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীতে দেখতে পাবেন অনেক লোক শুধু বাবা বা শুধু মা থেকে জন্মেছে, অথবা বাবা-মা ছাড়াই জন্মেছে, হোমাগ্নি থেকে জন্মেছে, শস্যক্ষেত্র থেকে জন্মেছে এই রকম সব ভাবটা যেন আকাশ থেকে পড়ল। ভারতের পৌরাণিক গাথায় নানারকম অলৌকিক জন্ম প্রায়ই দেখা যেত।

ধরিত্রীর কন্যা বলে সীতা ছিলেন পবিত্র, নিষ্কলুষ। রাজা জনক তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন। বিয়ের বয়স হলে রাজা তাঁর জন্য একটি যথাযোগ্য পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন।

প্রাচীন ভারতে স্বয়ম্বর নামে একটি প্রথা ছিল, এতে রাজকন্যারা স্বামী বেছে নিতেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক রাজপুত্র নিমন্ত্রিত হতেন, ঝকঝকে পোশাকে মালা হাতে রাজকন্যা ঢুকতেন। সঙ্গে থাকত ঘোষক; প্রতিটি রাজপুত্রের বিশেষ দাবির বিবরণ ঘোষণা করত। সমবেত পাত্রমণ্ডলীর সামনে দিয়ে রাজকন্যা একে একে পার হয়ে যেতেন, যে রাজপুত্রকে তাঁর পছন্দ হত তাঁর গলায় মালা দিয়ে তাঁকে পতিত্বে বরণ করতেন। তারপর মহাসমারোহে তাঁদের বিয়ে হত।

বহু রাজপুত্র সীতার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। এ ক্ষেত্রে যে পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল তা হল হরধনু নামে এক বিশাল ধনুক ভাঙা। সমস্ত রাজপুত্র প্রাণপণে চেষ্টা করলেন ধনুক ভাঙতে, কিন্তু পারলেন না। শেষ পর্যন্ত রাম সেই বিশাল ধনুক তুললেন ও অনায়াসে দুখণ্ডে ভেঙে ফেললেন। অতএব সীতা রাজা দশরথের পুত্র রামকে

পাত্রিত্বে বরণ করলেন। মহানন্দে তাঁদের বিয়ে হল। রাম স্ত্রী নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। বুড়ো বাবা ভাবলেন এবার তাঁর অবসর নেওয়ার ও রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করার সময় এসেছে। সেইমত উৎসবের আয়োজন করা হল, সারাদেশে আনন্দের বন্যা বইল। এমন সময় মেজরানী কৈকেয়ীর দাসী রাজা দশরথের অনেক আগেকার দুটি প্রতিশ্রুতির কথা রানীকে মনে করিয়ে দিল। এক সময়ে তিনি রাজাকে খুব খুশি করেছিলেন, তাই রাজা তাঁকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। রাজা বলেছিলেন, "আমার ক্ষমতার মধ্যে কুলোয় এমন যে কোনও দুটি বর চাও, আমি দেব।" রানী তখন কোনও অনুরোধ করেন নি। সে কথা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। কিন্তু কুটিলা দাসী তাঁর ঈর্ষায় ইন্ধন যোগাতে লাগল। কেবল জপাতে লাগল রাম না হয়ে তাঁর নিজের ছেলে সিংহাসনে বসলে তাঁর পক্ষে কি চমৎকারই না হবে! শেষ পর্যন্ত রানী ঈর্ষায় প্রায় পাগল হয়ে গেলেন। তখন দাসী পরামর্শ দিল রাজার কাছে আগেকার সেই বর দুটি চাইতে: একটি হল তাঁর নিজের ছেলে ভরত সিংহাসনে বসবে, অপরটি হল রামকে বনবাসে পাঠাতে হবে ও চোদ্দ বছরের জন্য নির্বাসিত করতে হবে।

এদিকে বুড়ো রাজার রামই মন, রামই প্রাণ। ওই নিষ্ঠুর অনুরোধ শুনে তিনি বুঝলেন যে রাজা হিসাবে যে কথা দিয়েছিলেন তা ভাঙতে পারবেন না। কিন্তু কি যে করবেন ভেবে পেলেন না। তখন রাম এসে উদ্ধার করলেন এবং স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছেড়ে নির্বাসনে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন যাতে তাঁর বাবা সত্যভঙ্গের অপরাধে অপরাধী না হন। অতএব রাম চৌদ্দ বছরের জন্য বনে গেলেন, সঙ্গী হলেন প্রেমময়ী স্ত্রী সীতা ও ভক্ত ভাই লক্ষ্মণ, যাঁরা কোন মতেই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে রাজী নন।

আর্যরা জানতেন না এই সব আদিম বনে-জঙ্গলে কারা বাস করত। তখনকার দিনে অরণ্যচারী অধিবাসীদের তাঁরা "বানর" বলতেন। আর এই তথাকথিত "বানরদের" কেউ কেউ যদি অসাধারণ বলবান ও ক্ষমতাশালী হত তবে তাদের "দানব" নাম দেওয়া হত।

তারপর রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবার দানব ও বানর-অধ্যুষিত বনে চললেন। সীতা যখন রামের সঙ্গে যেতে চাইলেন রাম বললেন, "তুমি রাজকন্যা, কেমন করে কষ্ট সহ্য করবে, কেমন করে অজানা বিপদসঙ্কুল বনে আমার সঙ্গে যাবে?" কিন্তু সীতা জবাব দিলেন, "যেখানে রাম, সেখানে সীতা। 'রাজকন্যা', 'রাজকুলে জন্ম' এসব কথা কি বলে তুমি আমায় বললে? আমি তোমার সঙ্গেই যাব।" অতএব সীতা চললেন। আর ছোট ভাই? তিনিও সঙ্গে সঙ্গে চললেন। গভীর বনের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে গোদাবরী নদী এসে পড়ল। নদীতীরে তাঁরা ছোট ছোট কুটির তুললেন। রাম লক্ষ্মণ হরিণ শিকার করতেন আর ফলমূল আহরণ করতেন। কিছুকাল এমনি করে কাটার পর একদিন এক দানব রাক্ষসীর আবির্ভাব হল। সে হল লঙ্কার (সিংহল) রাক্ষস-রাজা রাবণের বোন। বনে বেড়াতে বেড়াতে সে রামকে দেখতে পেল, অতি সুপুরুষ দেখে তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রেমে পড়ে গেল। কিন্তু রাম ছিলেন মানুষের মধ্যে

সবার চেয়ে পবিত্র, তার উপর আবার বিবাহিত। কাজেই তিনি তাঁর প্রেমের প্রতিদান দিতে পারলেন না। প্রতিশোধ নেবার জন্য রাক্ষসী তার ভাই রাক্ষস-রাজের কাছে গিয়ে রামের সুন্দরী স্ত্রী সীতার কথা জানাল।

রাম ছিলেন মরজগতে সবচেয়ে বলবান। রাক্ষস, দানব, কি অন্য কারও শক্তি ছিল না রামকে হারায়। কাজেই রাক্ষসরাজকে ছলনার আশ্রয় নিতে হল। সে গিয়ে আর এক রাক্ষসকে ধরল। সে রাক্ষসটি ছিল মায়াবী। তাকে এক সুন্দর সোনার হরিণ বানিয়ে ফেলল। হরিণ রামের কুটিরের আশেপাশে নেচে বেড়াতে লাগল। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সীতা রামকে বললেন হরিণটা ধরে আনতে। সীতাকে লক্ষ্মণের জিম্মায় রেখে রাম বনে গেলেন হরিণ ধরতে। তখন লক্ষ্মণ কুটিরের চারপাশে আগুনের গণ্ডি জেলে সীতাকে বললেন, "আমার মনে হচ্ছে আজ আপনার কিছু একটা হতে পারে। কাজেই এই যাদুগণ্ডির বাইরে যেতে আমি আপনাকে বারণ করছি। বাইরে গেলে আপনার বিপদ হতে পারে।" ইতিমধ্যে রাম মায়া-হরিণকে তীর মেরেছেন। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেহ ধরে সে মরে গেল।

তৎক্ষণাৎ কুটিরে রামের আর্তস্বর ভেসে এল: "ভাইরে লক্ষ্মণ, আমায় সাহায্য কর।" সীতা বললেন "লক্ষ্মণ, রামকে সাহায্য করতে এখুনি বনে যাও।" লক্ষ্মণ প্রতিবাদ করলেন, "এ রামের গলা নয়।" কিন্তু সীতার পীড়াপীড়িতে লক্ষ্মণকে রামের সন্ধানে যেতেই হল। যেই তিনি চলে গেলেন ভণ্ড সন্ন্যাসীর রূপ ধরে রাক্ষস রাজা কুটিরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইল। সীতা বললেন, "আমার স্বামী আসা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করুন, আপনাকে প্রচুর ভিক্ষা দেব।" সন্ন্যাসী বলল, "সুভদ্রে, অপেক্ষা করতে পারব না। আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, যা আছে তাই দাও।" কুটিরে কিছু ফল ছিল, এই শুনে সীতা তাই বের করলেন। কিন্তু ভণ্ড সন্ন্যাসী সীতাকে অভয় দিল যে তার মত ধার্মিক লোককে ভয় পাবার কিছু নেই। পীড়াপীড়ি করে সীতাকে রাজী করল ভিক্ষা দিতে তাঁর কাছ পর্যন্ত আসতে। কাজেই সীতা যাদুগণ্ডির বাইরে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভণ্ড সন্ন্যাসী সীতাকে জোর করে ধরে নিজের মায়ারথ ডাকল, সেই রথে ক্রন্দনরতা সীতাকে তুলে পালিয়ে গেল। বেচারি সীতা! তিনি তখন সম্পূর্ণ অসহায়, সাহায্য করতে আসার মত কেউ নেই। রাক্ষস যখন তাঁকে নিয়ে চলল তিনি হাত থেকে কিছু অলঙ্কার খুলে মাঝে মাঝে মাটিতে ফেলে গেলেন।

সীতাকে নিয়ে রাবণ আপন রাজ্য লঙ্কায়, অর্থাৎ সিংহল দ্বীপে গেল। সীতাকে বলল তার রানী হতে, রাজী করানোর জন্য নানাভাবে লোভ দেখাল। কিন্তু সীতা ছিলেন মূর্তিমতী সতী, তিনি রাক্ষসের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বললেন না। রাক্ষস তার শাস্তি বিধান করল যতক্ষণ রাজী না হন দিবারাত্র এক গাছের তলায় বাস করতে হবে।

রাম, লক্ষ্মণ কুটিরে ফিরে এসে দেখলেন সীতা নেই, তাঁদের দুঃখের আর অবধি রইল না। সীতার কি যে হল তা তাঁরা কল্পনাও করতে পারলেন না। সীতার সন্ধানে দুইভাই ক্রমাগত ঘুরতে লাগলেন, কিন্তু কোনও খোঁজ পেলেন না। বহু

সন্ধানের পর তাঁদের একদল "বানরের" সঙ্গে দেখা হল, তাদের মধ্যে ছিলেন "দেবতুল্য বানর" হনুমান। পরে দেখা যাবে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান রামের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ভৃত্য হলেন এবং সীতা উদ্ধারে রামকে সাহায্য করলেন। রামের প্রতি তাঁর এত ভক্তি গভীর ছিল যে ভগবানের যথার্থ সেবক হিসাবে এখনও হিন্দুরা তাঁর পূজা করেন। লক্ষ্য করবেন "বানর" ও "দানব" বলতে দক্ষিণ-ভারতের আদি-বাসীদের বোঝান হচ্ছে।

রাম শেষ পর্যন্ত বানরদের সঙ্গী হলেন। তারা বলল যে তারা আকাশ দিয়ে এক রথ উড়ে যেতে দেখেছে, সে রথে এক দানব ছিল। এক পরমাসুন্দরী মহিলাকে নিয়ে দানব পালাচ্ছিল, তিনি ব্যাকুলভাবে কাঁদছিলেন। রথটি যখন তাদের মাথার উপর দিয়ে যায় তখন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিনি তাঁর একটি অলঙ্কার ফেলে দিয়েছিলেন। তারপর তারা রামকে অলঙ্কারখানি দেখাল। লক্ষ্মণ অলঙ্কারটি হাতে নিয়ে বললেন, "এ কার অলঙ্কার আমি জানি না।" তাঁর হাত থেকে রাম নিলেন ও তৎক্ষণাৎ চিনতে পেরে বললেন, "হ্যাঁ, এ সীতার।" লক্ষ্মণ অলঙ্কারটি চিনতে পারেননি কারণ ভারতবর্ষে বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে এত শ্রদ্ধা করা হত যে তিনি সীতার বাহু ও কণ্ঠ কোনও দিন চোখ তুলে দেখেননি। অলঙ্কারটি ছিল একটি কণ্ঠহার। কাজেই বুঝছেন কার অলঙ্কার তিনি চিনতে পারেননি কেন। এই কাহিনীটির মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় রীতিনীতির একটা স্পর্শ পাওয়া যায়। বানররা রামকে জানাল এই দানব রাজা কে, কোথায় সে বাস করে। তারপর সবাই মিলে তাকে খুঁজতে চলল।

এদিকে বানররাজ বালি ও তাঁর ছোট ভাই সুগ্রীব তখন রাজ্যের জন্য পরস্পর যুদ্ধ করছিলেন। বালি সুগ্রীবকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। সুগ্রীব রামের সাহায্য পেলেন ও বালির কাছ থেকে রাজ্য পুনরুদ্ধার করলেন। রামের সাহায্যের প্রতিদানে সুগ্রীব তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁরা সারা দেশ খুঁজে ফেললেন কিন্তু সীতার সন্ধান পেলেন না। শেষ পর্যন্ত, হনুমান ভারতের উপকূল থেকে এক লাফে সিংহল দ্বীপে পড়লেন এবং সীতার খোঁজে সারা লঙ্কা ঘুরলেন, কিন্তু কোথাও তাঁকে পেলেন না।

ব্যাপার হল রাক্ষসরাজ দেব, নর, বস্তুত সমগ্র পৃথিবীকে পরাস্ত করেছিলেন ও সকল সুন্দরী রমণী সংগ্রহ করে নিজের উপপত্নীতে পরিণত করেছিলেন। অতএব হনুমান ভাবলেন "সীতা প্রাসাদে এদের মধ্যে থাকতেই পারেন না। এমন জায়গায় থাকারচেয়ে তিনি বরং প্রাণত্যাগ করবেন।" কাজেই হনুমান অন্যত্র সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। শেষ পর্যন্ত দিগন্তের প্রান্তে ক্ষীণ শশিকলার মত কৃশ ও পাণ্ডুর সীতাকে এক বৃক্ষতলে দেখতে পেলেন। এবার ক্ষুদ্র এক বানরের রূপ ধরে হনুমান বৃক্ষশাখায় আশ্রয় নিলেন। সেখান থেকে দেখতে পেলেন রাবণের চেড়ীরা সীতাকে ভয় দেখিয়ে নতি স্বীকার করানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু তিনি রাক্ষসরাজের নাম পর্যন্ত শুনতে চাইছেন না।

তখন হনুমান সীতার আরও কাছে এলেন। কি করে তিনি রামের দূত হলেন তা জানিয়ে বললেন সীতা কোথায় খুঁজে বের করার জন্য রাম তাঁকে পাঠিয়েছেন। হনুমানকে চেনানোর জন্য রাম তাঁর হাতে যে অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দিয়েছিলেন তা তিনি

সীতাকে দেখালেন। সীতাকে একথাও জানালেন যে সীতা কোথায় আছেন জানতে পারলেই রাম সসৈন্যে আসবেন, রাক্ষসকে পরাস্ত করে সীতা উদ্ধার করবেন। হনুমান বললেন তবে সীতা যদি চান তো তিনি সীতাকে কাঁধে নিয়ে এক লাফে সাগর পার হয়ে রামের কাছে তাঁকে পৌঁছে দিতে পারেন। কিন্তু সীতা সতীত্বের প্রতিমা, স্বামী ছাড়া কাউকে স্পর্শ করতে পারেন না, কাজেই এ প্রস্তাব তিনি আমলই দিতে পারলেন না। অতএব সীতা যেখানে ছিলেন সেখানেই রইলেন। তবে কেশপাশ থেকে একটি মণি খসিয়ে তিনি হনুমানকে দিলেন রামের কাছে নিয়ে যাবার জন্য। হনুমান সেটি নিয়ে প্রস্থান করলেন।

হনুমানের কাছে সীতার কথা সব শুনে রাম এক সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করলেন ও সসৈন্যে ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তের দিকে চললেন। রামের বানরেরা সেতুবন্ধ নামে এক বিরাট সেতু বেঁধে ভারতের সঙ্গে সিংহলের সংযোগ স্থাপন করল। ভাঁটার সময়ে জল খুব কম থাকলে বালির চড়াগুলির উপর দিয়ে এখনও ভারত থেকে পার হয়ে সিংহলে যাওয়া সম্ভব।

রাম ছিলেন মূর্তিমান :ভগবান, তা নইলে এত কাণ্ড তিনি করলেন কি করে? হিন্দুদের বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি ছিলেন ভগবানের অবতার। ভারতে হিন্দুরা রামকে ভগবানের সপ্তম অবতার বলে.মনে করেন।

বানররা গোটা গোটা পাহাড় খসিয়ে আনল। সেগুলি সমুদ্রে ফেলে তার উপর গাছ ও পাথর সাজিয়ে বিশাল এক বাঁধ বাঁধল। কথিত আছে যে একটি কাঠবিড়ালী বালিতে গড়িয়ে গড়িয়ে তারপর ছুটে গিয়ে গা ছেড়ে ফেলছিল। এইভাবে সে তার ছোট্ট কায়দায় রামের সেতুতে বালি যোগাচ্ছিল। বানররা হাসছিল। তারা গোটা গোটা পাহাড়, বন, বিশাল বিশাল বালির বোঝা এনে সেতুতে ফেলছিল, তাই ছোট্ট কাঠবিড়ালীর বালিতে গড়িয়ে তারপর গা ঝাড়া দেখে তাদের হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু রাম দেখতে পেয়ে মন্তব্য করলেন, "ছোট্ট কাঠবিড়ালীর কল্যাণ হোক; সে তার যথাসাধ্য কাজ করছে, আর তাই সে তোমাদের মধ্যেকার মহত্তমের মতই মহৎ।" এই বলে কাঠবিড়ালীর পিঠে তিনি আদর করে দুটি টোকা দিলেন। আজ পর্যন্ত রামের আঙুলের দাগ কাঠবিড়ালীর পিঠে লম্বালম্বি দেখা যায়।

সেতু শেষ হলে রাম ও তাঁর ভাইয়ের নেতৃত্বে সমগ্র বানর সেনাবাহিনী সিংহলে প্রবেশ করল। তারপর কয়েক মাস ধরে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও রক্তপাত চলল। শেষ পর্যন্ত দানবরাজা রাবণ পরাজিত ও নিহত হল। খাঁটি সোনায় তৈরি তার প্রাসাদরাজি ও অপরাপর সব কিছু সহ রাজধানী বিজিত হল। ভারতের দূর-দূরান্তের গণ্ডগ্রামে গিয়ে আমি যখনই বলি আমি সিংহল গিয়েছিলাম তখন সরল গ্রামবাসীরা বলে, "সেই যে, আমাদের পুঁথিতে লেখা আছে যেখানকার ঘরবাড়ি সোনার তৈরি।" এই সব স্বর্ণপুরী রামের দখলে এল, রাবণের ছোট ভাই বিভীষণের হাতে রাম সব তুলে দিলেন। যুদ্ধের সময়ে মূল্যবান সাহায্যের প্রতিদানে বিভীষণকে রাম রাবণের সিংহাসনে বসালেন।

তারপর রাম সীতা ও অনুচরদের নিয়ে লঙ্কা ত্যাগ করলেন। কিন্তু অনুচরদের মধ্যে একটা গুঞ্জন চলল। তারা বলতে লাগল, "পরীক্ষা! পরীক্ষা! রাবণের পুরীতে সীতা যে সম্পূর্ণ পবিত্রা ছিলেন তার পরীক্ষা এখনও হয়নি।" রাম বললেন, "পবিত্রা! সীতা তো মূর্তিমতী সতীত্ব।" লোকে তবু বলতে লাগল, "তা হোক, পরীক্ষা চাই।" শেষ:পর্যন্ত এক বিশাল হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করা হল। সীতাকে তাতে ঝাঁপ দিতে হল। সীতাকে হারাতে হল মনে করে রাম তো যন্ত্রণায় অস্থির। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে এক সিংহাসন মাথায় নিয়ে স্বয়ং অগ্নিদেব আবির্ভূত হলেন, সিংহাসনের উপরে সীতা। তারপর সকলের সে কি আনন্দ, সবাই সন্তুষ্ট হল।

নির্বাসনের সময়কার গোড়ার দিকে রামের ছোট ভাই ভরত এসেছিলেন। বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুসংবাদ দিয়ে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করেছিলেন রাম যাতে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রামের নির্বাসনকালে ভরত কোনও মতেই সিংহাসনে আরোহণ করেননি। রামের প্রতি শ্রদ্ধাবশত রামের অভাবে তাঁর পাদুকাকে তিনি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তারপর রাম রাজধানীতে ফিরলেন এবং প্রজাগণের সকলের সম্মতিতে অযোধ্যার রাজা হলেন।

পুরাকালে প্রজার কল্যাণের জন্য যেসব শপথ করতে হত রাজ্য ফিরে পাওয়ার পর রাম সেসব শপথ নিলেন। রাজা প্রজাপুঞ্জের দাস, জনমতের কাছে তাঁকে মাথা নোয়াতে হয়। সে কথা আমরা পরে দেখব। সীতাকে নিয়ে কয়েক বছর রাম সুখে কাটালেন। কিন্তু আবার লোকের মধ্যে গুঞ্জন উঠল সীতাকে দানব অপহরণ করেছিলেন, সমুদ্রের পরপারে নিয়ে গিয়েছিল। আগেকার পরীক্ষায় তারা সন্তুষ্ট নয়, গুঞ্জন উঠতে লাগল হয় আবার পরীক্ষা নেওয়া হোক, না হলে সীতাকে নির্বাসনে পাঠাতে হবে।

প্রজার দাবি পূরণের জন্য সীতাকে নির্বাসিত করা হল। ঋষি ও কবি বাল্মীকির তপোবনে তাঁকে বনবাসে পাঠান হল। রোরুদ্যমানা ও নিঃসঙ্গ সীতাকে দেখে ও তাঁর করুণ কাহিনী শুনে বাল্মীকি তাঁকে নিজ আশ্রমে আশ্রয় দিলেন। সীতা শিগগিরই মা হওয়ার আশা করছিলেন। তাঁর যমজ পুত্র হল। কবি ছেলেদের কখনও জানতে দেননি তারা কে। তিনি তাদের ব্রহ্মচারী জীবনধারায় অন্যদের সঙ্গে একত্রে লালন-পালন করতেন। তারপর তিনি রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করলেন, তাতে সুর দিলেন ও নাট্যরূপ দিলেন।

ভারতবর্ষে নাটক অতি পবিত্র বস্তু ছিল। নাটক ও সঙ্গীতকে ধর্ম বলে মনে করা হত। যে কোনও সঙ্গীত—সে প্রেমসঙ্গীতই হোক বা অন্য কিছু হোক—যদি কেউ তাতে সমগ্র মন প্রাণ ঢেলে দেয় তাহলে সে মোক্ষ লাভ করে, অন্য কিছু করার দরকার হয় না। লোকে বলে তপস্যা যে লক্ষ্যে পৌঁছয় সঙ্গীতও সেই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

অতএব বাল্মীকি রামায়ণের নাট্যরূপ দিলেন এবং রামের দুই পুত্রকে তা আবৃত্তি ও গান করতে শেখালেন।

এক সময়ে পুরানো রাজাদের মত রামও এক বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। কিন্তু ভারতে কোনও বিবাহিত পুরুষ তাঁর স্ত্রী ছাড়া ধর্মানুষ্ঠান করতে

পারেন না। তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে থাকতেই হবে, তাই স্ত্রীর আর এক নাম সহধর্মিণী বা ধর্মে সহকারিণী। হিন্দু গৃহস্থকে শত শত ধর্মাচার করতে হয়। কিন্তু কোনটাই শাস্ত্রানুযায়ী করা যায় না যদি স্ত্রী তাঁর নিজের ভূমিকা দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ না করেন।

এদিকে রামের স্ত্রী নির্বাসিতা, কাজেই তিনি রামের সঙ্গে নেই। লোকে রামকে আবার বিবাহ করতে বলল। কিন্তু এই অনুরোধের ক্ষেত্রে রাম জীবনে প্রথম প্রজাদের বিপক্ষতা করলেন। তিনি বললেন, "তা হতে পারে না। আমার জীবন সীতারই।" কাজেই যজ্ঞানুষ্ঠান যাতে হতে পারে তার জন্য বিকল্প হিসাবে সীতার স্বর্ণমূর্তি গড়া হল। এই মহোৎসবে ধর্মভাব বাড়ানোর জন্য একটা নাট্যানুষ্ঠান পর্যন্ত আয়োজিত হল। মহর্ষি ও মহাকবি বাল্মীকি দুই শিষ্যকে অর্থাৎ রামের দুই অজ্ঞাত পুত্র লব ও কুশকে সঙ্গে নিয়ে আগমন করলেন। মঞ্চ তৈরি হয়ে গিয়েছে, নাট্যানুষ্ঠানের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রজাপুঞ্জ ও অমাত্যসহ রাম ও তাঁর ভ্রাতারা নাটক শোনার জন্য উপস্থিত, সে এক বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলী। বাল্মীকির পরিচালনায় লব ও কুশ রামায়ণ গাইতে শুরু করল। মনোহর কণ্ঠস্বর ও কান্তিতে তারা সকলকে মুগ্ধ করল। বেচারা রাম পাগলের মত হয়ে গেলেন, সীতার নির্বাসনের দৃশ্য যখন এল তখন তিনি কি যে করবেন তার ঠিক নেই। তখন ঋষি বললেন, "দুঃখ কর না, আমি তোমার সীতাকে দেখাব।" তারপর সীতাকে মঞ্চে আনা হল, সীতাকে দেখে রাম উল্লসিত হলেন। হঠাৎ সেই পুরানো গুঞ্জন উঠল, "পরীক্ষা! পরীক্ষা!" বেচারী সীতা নিজের সুনামের উপর বারংবার এই নিষ্ঠুর আঘাতে এত বিচলিত হলেন যে তাঁর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। তিনি দেবতাদের কাছে আবেদন করলেন তাঁর নিরপরাধের সাক্ষী দিতে, ধরণী যখন দ্বিধা হল সীতা বললেন, "এই নাও পরীক্ষা", এই বলে তিনি ধরিত্রীর বুকে বিলীন হলেন। এই বিয়োগান্তক পরিণতিতে লোকেরা অবাক হয়ে গেল। আর রাম দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

সীতার অন্তর্ধানের কয়েকদিন পর রামের কাছে দেবতাদের দূত এলেন। দূত জানালেন পৃথিবীতে রামের কাজ শেষ হয়েছে, তাঁর এবার স্বর্গে ফিরে যেতে হবে। এই খবর তাঁকে তাঁর প্রকৃত সত্তাকে চিনিয়ে দিল। তাঁর রাজধানী বিধৌত করে প্রবাহিত খরস্রোতা সরযূ নদীর জলে তিনি ঝাঁপ দিলেন ও পরলোকে সীতার সঙ্গে মিলিত হলেন।

এই হল ভারতের মহিমময় প্রাচীন মহাকাব্য। রাম ও সীতা ভারতীয় জাতির আদর্শ। সমস্ত ছেলে-মেয়েরা, বিশেষত মেয়েরা সীতাকে পূজা করে। নারীর সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা হল সীতার মত পূতচরিত্রা, নিষ্ঠাবতী, সর্বংসহা হওয়া। সব চরিত্রগুলি অনুশীলন করলেই আপনারা দেখতে পাবেন ভারতের আদর্শ পশ্চিমের থেকে কত তফাত। জাতির কাছে সীতা দুঃখ সওয়ার আদর্শ হিসাবে বিরাজ করেন। পশ্চিম বলে, "কাজ কর! কাজ করে তোমার ক্ষমতা দেখাও।" ভারত বলে, "দুঃখ সয়ে তোমার ক্ষমতা দেখাও।" মানুষ কত বেশি পেতে পারে পশ্চিম সে সমস্যার সমাধান করেছে: ভারত সমাধান করেছে মানুষ কত কম পেতে পারে সে সমস্যার। দুই

চরম আর কি। সীতা ভারতের আদর্শরূপে চিত্রিত ভারতের প্রতিরূপ। প্রশ্ন এই নয় যে তাঁর অস্তিত্ব আদৌ ছিল কিনা, কাহিনীটি ইতিহাস কি ইতিহাস নয়, আমরা জানি এই আদর্শ আছে। আর কোনও পৌরাণিক কাহিনী সমগ্র জাতির এমন রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেনি, জাতির প্রতিটি রক্তবিন্দুকে এমন চঞ্চল করেনি যেমন করেছে সীতার আদর্শ। ভারতে যা কিছু ভাল, যা কিছু নিষ্কলঙ্ক, যা কিছু পবিত্র, নারীর মধ্যে যা কিছুকে আমরা নারীত্ব বলি ভারতে তারই নাম সীতা। পুরোহিত কোনও নারীকে আশীর্বাদ করতে হলে বলেন, "সীতা হও।" যদি কোনও বাচ্চাকে আশীর্বাদ করেন তো বলেন, "সীতা হও।" তারা সব সীতার সন্তান, সংগ্রাম করছে সর্বংসহা, চির-বিশ্বস্তা, চির-পবিত্রা স্ত্রী সীতা হওয়ার জন্য। এত দুঃখ সহ্য করেও তিনি রামের বিরুদ্ধে একটি কঠোর শব্দ উচ্চারণ করেন নি। তিনি একে তাঁর কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছেন ও নিজের ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। সীতাকে বনে নির্বাসন দেওয়ার ভয়ঙ্কর অবিচারের কথা একবার ভাবুন। কিন্তু সীতা তিক্ততা জানেন না এও আবার ভারতীয় আদর্শ। প্রাচীন বুদ্ধ বলেছিলেন, "কেউ যখন তোমায় আঘাত করে আর তুমি প্রত্যাঘাত করার জন্য ফিরে দাঁড়াও তাতে তো প্রথম ক্ষত নিরাময় হয় না, তাতে শুধু পৃথিবীতে আর একটি দুষ্কৃতির জন্ম হয়।" সীতা স্বভাবে প্রকৃত ভারতীয়, তিনি কখনও প্রত্যাঘাত করেন না।

কে জানে কোন্ আদর্শটি অধিকতর সত্য? পাশ্চাত্য যা মনে করে সেই আপাত ক্ষমতা ও শক্তি, না প্রাচ্য যা মনে করে সেই দুঃখ-সহিষ্ণুতা।

পশ্চিম বলে, "আমরা অনিষ্টকে জয় করে তাকে কমাই।" ভারত বলে, "আমরা অনিষ্টকে ধ্বংস করি দুঃখ সওয়ার ভিতর দিয়ে যতক্ষণ না অনিষ্ট আমাদের কাছে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে, দুঃখ সওয়া রীতিমত উপভোগ্য হয়ে ওঠে।" দেখুন, দুই-ই মহৎ আদর্শ। কে জানে শেষ পর্যন্ত কোনটা টিঁকবে। কে জানে কোনটা মানবজাতির সব চেয়ে বেশি উপকার করবে। কে জানে কোনটা পাশবিকতাকে নিরস্ত্র ও পরাস্ত করবে। কোনটা পারবে—দুঃখ সওয়া না কাজ করা।

ইতিমধ্যে আমরা যেন পরস্পরের আদর্শকে ধ্বংস করার চেষ্টা না করি। আমরা উভয়েই একই কাজ করতে উৎসুক; তা হলো অনিষ্টকে ধ্বংস করা। আপনারা আপনাদের পদ্ধতি নিন, আমরা আমাদের। আদর্শকে যেন ধ্বংস না করি। আমি পশ্চিমকে বলি না "আমাদের পদ্ধতি নিন।" নিশ্চয়ই নয়। লক্ষ্য এক, কিন্তু পদ্ধতি কখনও এক হতে পারে না। তাই আমি আশা করি যে ভারতবর্ষের আদর্শের কথা শোনার পর আপনারা ভারতকে একইভাবে বলবেন "আমরা জানি আমাদের উভয়ের পক্ষেই লক্ষ্য ও আদর্শ ঠিকই আছে। আপনারা আপনাদের নিজস্ব আদর্শ অনুসরণ করুন। আপনারা নিজেদের কায়দায় নিজেদের পদ্ধতি অনুসরণ করুন। আপনাদের সাফল্য কামনা করি।" আমার জীবনবাণী হল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে বলা পৃথক আদর্শ নিয়ে ঝগড়া না করতে, বরং তাদের দেখানো যে যতই বিপরীত বলে মনে হোক লক্ষ্য উভয় ক্ষেত্রেই এক। আপন আপন দিশায় বিভ্রমাচ্ছন্ন জীবন-উপত্যকা পরিক্রমায় আসুন আমরা পরস্পরের সাফল্য কামনা করি।

মহাভারত

[ক্যালিফোর্নিয়ার পাসাডেনায় শেক্সপীয়ার ক্লাবে ১৯০০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারিতে প্রদত্ত ভাষণ]

আজ সন্ধ্যায় আপনাদের কাছে আমি অন্য যে মহাকাব্যটির কথা বলতে যাচ্ছি তার নাম মহাভারত। এতে আছে রাজা ভরতের বংশধরদের কাহিনী। ভরত ছিলেন দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র। মহা মানে মহৎ, আর ভারত মানে ভরতের বংশধর। ভরত থেকে ভারতবর্ষ নাম হয়েছে। মহাভারত মানে মহান ভারতবর্ষ অথবা মহান ভরত-বংশীয়দের কাহিনী। এই মহাকাব্যের ঘটনাস্থল হল কুরুদের প্রাচীন রাজধানী, আর কাহিনীটি কুরু ও পাঞ্চালদের পাণ্ডবদের মধ্যে যে মহাযুদ্ধ হয়েছিল তার ভিত্তিতে রচিত। কাজেই বিবাদের এলাকাটি বেশি বড় নয়। ভারতে এই মহাকাব্যটি সবচেয়ে জনপ্রিয়। হোমারের কাব্য গ্রীকদের উপর যে প্রভাব ফেলত মহাভারতও ভারতীয়দের উপর তাই ফেলে। যুগ-যুগান্ত ধরে এতে ক্রমাগত নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মহাভারত প্রায় এক লক্ষের উপর শ্লোকের এক বিরাট গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। কালে কালে এতে নানা রকম গল্প, রূপকথা, পুরাকাহিনী, দার্শনিক নিবন্ধ, ইতিহাসের ছিটেফোঁটা এবং বহুবিধ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এ এক সুবিপুল সাহিত্য-কীর্তিতে পরিণত হয়েছে। আর তার মধ্যে দিয়েই আদি কাহিনীটি এগিয়ে চলেছে। মহাভারতের কেন্দ্রীয় কাহিনী হল ভারত-সাম্রাজ্যের জন্য দুই জ্ঞাতি পরিবারের মধ্যে অর্থাৎ কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধের কাহিনী।

আর্যরা ছোট ছোট দলে ভারতে এসেছিল। আস্তে আস্তে এই উপজাতিগুলির কলেবর বৃদ্ধি হতে থাকে ও তারা ভারতে একচ্ছত্র শাসকে পরিণত হয়। তারপর শুরু হয় একই পরিবারের এই দুই শাখার মধ্যে প্রাধান্যলাভের যুদ্ধ। আপনাদের মধ্যে যাঁরা গীতা পড়েছেন তাঁরা জানেন কিভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে দুই প্রতিপক্ষের সৈন্য-বাহিনীর মুখোমুখি সমাবেশের বিবরণ দিয়ে তার শুরু। সেই হল মহাভারতের যুদ্ধ।

দুই ভাই ছিলেন সম্রাটের দুই পুত্র। বড়র নাম ধৃতরাষ্ট্র, অন্যের নাম পাণ্ডু। বড় ছেলে ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ। ভারতীয় বিধান অনুযায়ী কোনও অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, ক্ষয়রোগগ্রস্ত বা অপর কোনও সহজাত ব্যাধিগ্রস্ত লোক উত্তরাধিকারী হতে পারে না। সে কেবল ভরণপোষণ পেতে পারে। কাজেই বড় ছেলে হওয়া সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে বসতে পারলেন না, পাণ্ডু সম্রাট হলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের একশ পুত্র ছিল, পাণ্ডুর মোটে পাঁচ, পাণ্ডুর অকালমৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্র কুরুদের রাজা হলেন এবং নিজের সন্তানদের সঙ্গে পাণ্ডুর পুত্রদেরও লালন-পালন করতে লাগলেন। বড় হওয়ার পর ছেলেদের মহান পুরোহিত-যোদ্ধা দ্রোণের শিষ্যত্বে দেওয়া হল। তাঁরা রাজপুত্রের যোগ্য বিভিন্ন বৈষয়িক কলা ও বিজ্ঞানে পারদর্শী হলেন। রাজপুত্রদের শিক্ষা সমাপ্ত হলে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরকে তাঁর পিতার সিংহাসনে বসালেন। যুধিষ্ঠিরের অত্যুৎকৃষ্ট গুণাবলী ও তাঁর অপর

ভ্রাতাদের ভক্তি ও শৌর্য অন্ধ রাজার পুত্রদের মনে ঈর্ষা জাগাল। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দুর্যোধনের প্ররোচনায় পাণ্ডবদের পঞ্চ ভ্রাতাকে ধর্মীয় উৎসবের অছিলায় বারণাবত পরিদর্শনে রাজী করান হল। সেখানে দুর্যোধনের আজ্ঞায় আগে থেকে শন, ধুনো, গালা ও অপরাপর দাহ্য পদার্থ দিয়ে প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছিল। সেইখানে পাণ্ডবদের থাকতে দেওয়া হল ও পরে গোপনে তাতে অগ্নিসংযোগ করা হল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের সৎভাই সাধু বিদুর দুর্যোধন ও তাঁর দলবলের অসদুদ্দেশ্য জানতে পেরে ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে পাণ্ডবদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কাজেই পাণ্ডবরা অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে পারলেন। যখন কুরুরা দেখলেন গৃহটি ভস্মীভূত হয়েছে তখন তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন ও ভাবলেন তাঁদের পথের কাঁটা দূর হল। তারপর ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা রাজ্য দখল করলেন। পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের মা কুন্তীকে নিয়ে বনে পালিয়ে গেলেন। তাঁরা ভিক্ষা করে জীবনধারণ করতে লাগলেন ও ব্রাহ্মণ ছাত্রের ছদ্মবেশে রইলেন। গহন বনে তাঁদের অনেক কষ্ট সইতে হয়েছিল, অনেক ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। কিন্তু মানসিক স্থৈর্য ও বল ও শৌর্য তাঁদের সমস্ত বিপদ অতিক্রম করতে সক্ষম করেছিল। এমনি করেই দিন কাটছিল, এমন সময়ে তাঁরা প্রাতিবেশী রাজ্যের রাজকন্যার আসন্ন বিবাহের খবর পেলেন।

কাল রাত্রে আমি আপনাদের প্রাচীন ভারতীয় বিবাহের একটি বিশেষ রূপের কথা বলেছি। তার নাম স্বয়ম্বর, অর্থাৎ রাজকন্যার নিজে বর পছন্দ করে নেওয়া। রাজপুত্র ও অমাত্যদের একটি বিরাট সমাবেশের ভিতর থেকে রাজকন্যা স্বামী পছন্দ করতেন। ভেরীবাদক ও ঘোষকদের পিছনে পিছনে ফুলের মালা হাতে রাজকন্যা প্রবেশ করতেন। প্রত্যেক পাণিপ্রার্থীর সিংহাসনের সামনে থেমে ঘোষকরা তাঁর গুণাবলী ও যুদ্ধক্ষেত্রে বীরকীর্তির বিবরণ দিত। যখন রাজকন্যা ঠিক করতেন স্বামী হিসাবে তিনি কোন রাজপুত্রকে চান তখন তাঁর গলায় বরমাল্য পরিয়ে সে কথা বোঝাতেন। তারপর সে অনুষ্ঠান বিবাহোৎসবে পরিণত হত। রাজা দ্রুপদ ছিলেন বিরাট রাজা, পাঞ্চালদের রাজা। দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর রূপ গুণের খ্যাতি বহুদূরে ছড়িয়েছিল। সেই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হতে চলেছিল।

স্বয়ম্বরের সময়ে সর্বদা অস্ত্রচালনায় পারদর্শিতার ব্যাপার বা ওই ধরনের কিছু একটা থাকত। এই ক্ষেত্রে আকাশে অনেক উঁচুতে মৎস্যাকৃতি একটি লক্ষ্যবস্তু স্থাপিত হয়েছিল, মৎস্যের নীচে কেন্দ্রস্থলে ছিদ্রসহ একটি চক্র অবিরাম ঘুরছিল, তার নীচে মাটিতে ছিল জলসহ একটি পাত্র। পাণিপ্রার্থীদের বলা হয়েছিল জলপাত্রে মৎস্যের প্রতিবিম্ব দেখে চক্রের মধ্যস্থ ছিদ্র দিয়ে শরচালনা করে মৎস্যের চক্ষু বিদ্ধ করতে হবে। যিনি তাতে সফল হবেন তাঁর সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দেওয়া হবে। এদিকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজা ও রাজপুত্ররা সমবেত হয়েছেন, রাজকন্যাকে পেতে সকলেই উৎসুক। পরের পর তাঁরা তাঁদের নৈপুণ্য দেখানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউই লক্ষ্যভেদ করতে পারলেন না।

আপনারা জানেন ভারতে চারটি বর্ণ আছে: সর্বোচ্চ হল বংশানুক্রমে পুরোহিত, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ; তারপর ক্ষত্রিয়, রাজা ও যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত; তারপর বৈশ্য,

অর্থাৎ বণিক ও ব্যবসায়ীরা ; তারপর শূদ্র, অর্থাৎ চাকররা। এই রাজকন্যা অবশ্যই ক্ষত্রিয় ছিলেন, অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ণের।

সমস্ত রাজা ও রাজপুত্ররা লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হওয়ার পর দ্রুপদ রাজার পুত্র রাজসভায় দাঁড়িয়ে বললেন: "রাজার বর্ণ ক্ষত্রিয়রা ব্যর্থ হয়েছেন, এখন অপরাপর বর্ণের লোকেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন। কোনও ব্রাহ্মণ বা এমনকি শূদ্রও আসতে পারেন, যিনিই লক্ষ্যভেদ করবেন তিনিই দ্রৌপদীকে বিবাহ করবেন।"

ব্রাহ্মণদের মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব উপবিষ্ট ছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতা অর্জুন ছিলেন ধনুর্বিদ্যায় পারঙ্গম। তিনি উঠে এগিয়ে গেলেন। বর্ণ হিসাবে ব্রাহ্মণেরা ছিলেন অতি শান্ত, খানিকটা যেন ভীরু প্রকৃতির। শাস্ত্র অনুযায়ী তাঁরা যুদ্ধাস্ত্র স্পর্শ করতেন না, তরবারি ধারণ করতেন না, কোনও বিপদজ্জনক কাজে যেতেন না। ধ্যান অধ্যয়ন ও অন্তর্লোকের নিয়ন্ত্রণ নিয়েই ছিল তাদের জীবন। কাজেই বুঝে দেখুন তাঁরা কি রকম শান্ত ও শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। ওই লোকটিকে উঠতে দেখে ব্রাহ্মণেরা ভাবলেন এর ফলে ক্ষত্রিয়রা তাঁদের উপর ক্রুদ্ধ হবেন ও তাঁদের সকলকে হত্যা করবেন। কাজেই ওঁকে তাঁরা প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু অর্জুন তাঁদের কথা শুনলেন না, কারণ তিনি সৈনিক। তিনি ধনু তুলে নিলেন, অনায়াসে ছিলা পরালেন, চক্রের ভিতর দিয়ে শর চালিয়ে মৎস্যের চক্ষু বিদ্ধ করলেন।

তারপর সে কি উল্লাস! রাজকন্যা দ্রৌপদী অর্জুনের কাছে গিয়ে সুন্দর ফুল-মালাটি তাঁর মাথা গলিয়ে ফেলে দিলেন। কিন্তু রাজাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর কোলাহল শুরু হল, রাজা ও রাজপুত্রদের এমন বিশাল সমাবেশের মধ্যে থেকে শেষে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সুন্দরী ক্ষত্রিয়া রাজকুমারীকে জয় করে নেবে এ তাঁরা সহ্য করতে পারলেন না। কাজেই তাঁরা চাইলেন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে সবলে দ্রৌপদীকে ছিনিয়ে নিতে। যোদ্ধাদের সঙ্গে ভাইদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হল, কিন্তু তাঁরা অপরাজিত রইলেন ও বধূকে নিয়ে বিজয়োল্লাসে প্রস্থান করলেন।

এবার পঞ্চভ্রাতা রাজকন্যাকে নিয়ে ঘরে কুন্তীর কাছে ফিরে গেলেন। ব্রাহ্মণদের ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করতে হত। পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণদের মত থাকতেন। কাজেই তাঁরা বাইরে যেতেন, ভিক্ষা করে যা পেতেন মাকে এনে দিতেন, মা তাঁদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। এখন রাজকন্যাকে নিয়ে পাঁচভাই মায়ের কুটিরে গেলেন। রঙ্গ করে চেঁচিয়ে মাকে বললেন, "মা, আজ আমরা অতি চমৎকার ভিক্ষা এনেছি।" মা উত্তর দিলেন, "বাছারা, সবাই মিলে ভোগ কর।" তারপর রাজকন্যাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, "হায়, কি বললাম! এ যে দেখি কন্যা!" মাতৃবাক্য একবার উচ্চারিত হলে চূড়ান্ত। কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যায় না। মাতৃবাক্য পূরণ করতেই হবে। তিনি কখনও মিথ্যা বলেন নি, তাঁর কথাকে মিথ্যা হতে দেওয়া যাবে না। কাজেই দ্রৌপদী পাঁচ ভাইয়েরই মিলিত স্ত্রী হলেন।

আপনারা তো জানেন প্রত্যেক সমাজেই বিকাশের বিভিন্ন স্তর থাকে। এই মহাকাব্যের পিছন থেকে প্রাচীন ঐতিহাসিক কালের এক চমৎকার ঝলক মেলে

পাঁচভাইয়ের একই নারীকে বিবাহের কথাটা কাব্যের রচয়িতা উল্লেখ করলেন, কিন্তু চেষ্টা করলেন দোষ ঢাকতে, এই রকম একটা কাজের একটা অছিলা ও কারণ বের করতে। তা হল মাতৃ-আজ্ঞা, মা এরকম আশ্চর্য বিবাহ অনুমোদন করলেন, ইত্যাদি। আপনারা জানেন প্রত্যেক জাতির ক্ষেত্রেই সমাজের একটা বিশেষ স্তর ছিল যা বহুপতিত্ব অনুমোদন করত—এক পরিবারের সব ভাই একত্রে এক স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারতেন। এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা স্পষ্টতই অতীতের বহুপতিত্বের স্তরের একটা ঝলক।

ইতিমধ্যে রাজকন্যার ভাই অবাক হয়ে ভাবছিলেন "এ লোকগুলি কারা? এ লোকটি কে যাকে আমার ভগ্নী বিবাহ করতে যাচ্ছে? এদের না আছে রথ, না আছে অশ্ব বা অপর কিছু। পদব্রজেই চলল যে!" দূরে দূরে থেকে তিনি ওঁদের অনুসরণ করলেন। রাত্রে তিনি আড়াল থেকে ওঁদের কথাবার্তা শুনতে পেলেন ও স্থির বুঝলেন যে ওঁরা আসলে ক্ষত্রিয়। তারপর রাজা দ্রুপদ ওঁদের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারলেন ও সবিশেষ উল্লসিত হলেন।

যদিও গোড়ায় খুব আপত্তি উঠল, ব্যাস সিদ্ধান্ত দিলেন যে এই রাজপুত্রদের পক্ষে এইরকম বিবাহ অনুমোদনীয়, বিবাহ অনুমোদিত হল। কাজেই রাজা দ্রুপদকে এই বহুপতিত্বমূলক বিবাহে সম্মতি দিতে হল এবং রাজকন্যাকে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হল।

তারপর থেকে পাণ্ডবরা শান্তি ও সমৃদ্ধিতে বাস করতে লাগলেন ও দিনে দিনে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। যদিও দুর্যোধন ও তাঁর দলবল পাণ্ডবদের ধ্বংস করার জন্য ক্রমাগত নতুন নতুন ফন্দি আঁটতে থাকলেন, তবু বয়োবৃদ্ধদের বিজ্ঞ পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে রাজী হলেন। প্রজাপুঞ্জের আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে তিনি পাণ্ডবদের গৃহে ফিরে আসতে আমন্ত্রণ জানালেন ও অর্ধেক রাজত্ব ছেড়ে দিলেন। তখন পঞ্চভ্রাতা নিজেদের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ নামে এক চমৎকার নগর নির্মাণ করলেন। ক্রমে তাঁরা তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করলেন এবং সকল লোককে তাঁদের কাছে রাজস্ব দিতে স্বীকার করালেন। জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তখন নিজেকে প্রাচীন ভারতের সকল রাজার উপর সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করার জন্য রাজসূয় যজ্ঞ করার সিদ্ধান্ত করলেন। রাজসূয় যজ্ঞে সকল বিজিত রাজাদের রাজস্ব নিয়ে উপস্থিত হতে হত, আনুগত্যের শপথ নিতে হত এবং ব্যক্তিগত সেবা দিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানে সাহায্য করতে হত। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের আত্মীয় ছিলেন, আর বন্ধুও হয়ে উঠেছিলেন। তিনিও যজ্ঞে সম্মতি জানালেন। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের একটা বাধা ছিল। জরাসন্ধ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি স্থির করেছিলেন যে একশত রাজাকে আহুতি দিয়ে একটা যজ্ঞ করবেন, আর সেই উদ্দেশ্যে ছিয়াশি জন রাজাকে বন্দী করে রেখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরামর্শ দিলেন জরাসন্ধকে আক্রমণ করতে। সেই অনুযায়ী তিনি, ভীম ও অর্জুন জরাসন্ধকে দ্বন্দ্বে আহ্বান জানালেন। জরাসন্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজী হলেন। চোদ্দ দিন ধরে অবিরাম মল্লযুদ্ধের পর ভীম শেষ পর্যন্ত তাঁকে পরাস্ত করলেন। বন্দী রাজাদের মুক্ত করা হল।

তারপর কনিষ্ঠ চার ভ্রাতা সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিজয় অভিযানে বের হলেন, এক এক জন এক এক দিকে গেলেন ও সমস্ত রাজাকে যুধিষ্ঠিরের অধীনে আনলেন। ফিরে এসে সংগৃহীত বিপুল সম্পদ তাঁরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাদমূলে অর্পণ করলেন যাতে তিনি বিরাট যজ্ঞের ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন।

কাজেই এই রাজসূয় যজ্ঞে সকল মুক্ত রাজারা এবং ভ্রাতৃগণ কর্তৃক বিজিত রাজারা উপস্থিত হলেন ও যুধিষ্ঠিরকে অর্ঘ্য দিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদেরও আসতে ও যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানান হল। যজ্ঞান্তে যুধিষ্ঠিরকে সম্রাট হিসাবে অভিষিক্ত করা হল ও রাজ-চক্রবর্তী বলে ঘোষণা করা হল। এই হল ভবিষ্যত দ্বন্দ্বের বীজবপন। দুর্যোধন যজ্ঞ থেকে ফিরলেন যুধিষ্ঠিরের উপর ভয়ঙ্কর ঈর্ষা নিয়ে। পাণ্ডবদের সার্বভৌমত্ব এবং বিপুল আড়ম্বর ও সম্পদ তাঁর সহ্যের অতীত হয়ে গেল। তখন তিনি ছলে তাঁদের পতন ঘটানোর ফন্দি আঁটতে লাগলেন, কারণ তিনি জানতেন বলে তাঁদের জয় করা তাঁর সাধ্যাতীত। রাজা যুধিষ্ঠির জুয়া খেলতে ভালবাসতেন। এক অশুভ মুহূর্তে তাঁকে শকুনির সঙ্গে পাশা খেলার দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হতে আহ্বান জানান হল। শকুনি ছিলেন কৌশলী জুয়াড়ি এবং দুর্যোধনের সমস্ত কুকর্মের পরামর্শ দাতা। প্রাচীন ভারতে সামরিক বর্ণের কোনও লোককে যদি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করা হত তাহলে নিজের সম্মান রক্ষার জন্য তাঁকে সে আহ্বানে সাড়া দিতেই হত, তা সে যত মূল্যই দিতে হোক না কেন। পাশা খেলায় আহ্বান করলে মানের দায়ে খেলতে হত, খেলতে অস্বীকার করাটা ছিল সম্মান হানিকর। মহাকাব্যে বলা হয় রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন সর্বগুণের অবতার। এমনকি এই রাজর্ষিকেও প্রতিদ্বন্দ্ব গ্রহণ করতে হল। শকুনি ও তাঁর দলবল কপট পাশা তৈরি করিয়েছিলেন। কাজেই যুধিষ্ঠির দানের পর দান হারতে লাগলেন। হারের পর হারে উত্তেজিত হয়ে তিনি এই দুর্ভাগ্যজনক খেলা চালিয়ে গেলেন। যা কিছু ছিল সব বাজি রাখলেন, সব হারলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সকল সম্পত্তি, রাজ্য ও আর সবকিছু খোয়ালেন। চূড়ান্ত পর্যায় এল যখন আরও প্রতিদ্বন্দ্বে আহূত হয়ে তিনি নিজেকে, ভাইদের ও শেষ পর্যন্ত সুন্দরী দ্রৌপদীকে পর্যন্ত বাজি রাখলেন ও হেরে গেলেন। তখন তাঁরা একেবারে কৌরবদের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে গেলেন। কৌরবরা তাঁদের নানাভাবে অপমান করতে লাগলেন ও দ্রৌপদীর সঙ্গে একেবারে অমানুষিক ব্যবহার করলেন। শেষ পর্যন্ত অন্ধ রাজার হস্তক্ষেপে তাঁরা স্বাধীনতা ফিরে পেলেন এবং তাঁদের ফিরে যেতে ও রাজ্যশাসন করতে বলা হল। বিপদ বুঝে দুর্যোধন তাঁর পিতাকে রাজী করলেন আর এক দান খেলতে দিতে। এই দানে যে পক্ষের হার হবে তাঁরা বারো বছরের জন্য বনে যাবেন ও এক বছর অজ্ঞাতবাস করবেন। কিন্তু অজ্ঞাতবাসের সময়ে কেউ যদি তাঁদের চিনে ফেলে তা হলে আবার বারো বছর নির্বাসনে থাকতে হবে, তবেই কেবল রাজ্য ফিরে পাবেন। এই শেষ খেলাতেও যুধিষ্ঠির হারলেন। দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবকে গৃহহীন নির্বাসনে বনে চলে যেতে হল। বারো বছর তাঁরা পাহাড়ে জঙ্গলে কাটালেন। সেখানে তাঁরা সদ্গুণ, শৌর্যের পরিচায়ক বহু কীর্তি রাখলেন। মাঝে মাঝে তাঁরা দীর্ঘস্থায়ী তীর্থযাত্রায় যেতেন, বহু পুণ্যস্থান পরিদর্শন করতেন। কাব্যের এই অংশ

অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। বহুবিধ ঘটনা, গল্প ও পুরাকাহিনীতে গ্রন্থের এই অংশ ভর্তি। এতে প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় ও দার্শনিক নানাপ্রকার সুন্দর ও সুমহান উপাখ্যান আছে। নির্বাসিত পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে মুনিঋষিরা বনে আসতেন, নির্বাসিত জীবনের দুঃখ ভার লাঘব করার জন্য প্রাচীন ভারতের বহু চিত্তাকর্ষক কাহিনী শোনাতেন। আপনাদের কাছে তার একটি মাত্র বিবরণ দেব।

অশ্বপতি বলে এক রাজা ছিলেন। রাজার এক কন্যা ছিলেন। তিনি এত ভাল ও সুন্দরী ছিলেন যে তাঁকে হিন্দুদের অতি পবিত্র প্রার্থনার নামে নাম দেওয়া হল সাবিত্রী। সাবিত্রী যখন বয়োপ্রাপ্ত হলেন তখন তাঁর পিতা তাঁকে স্বামী পছন্দ করতে বললেন। দেখুন, এই সব প্রাচীন ভারতীয় রাজকন্যারা খুব স্বাধীন ছিলেন, তাঁরা নিজেই তাঁদের রাজকুলোদ্ভব পাণিপ্রার্থী বেছে নিতেন।

সাবিত্রী রাজী হলেন। পিতা প্রহরীদের ও যে সব বয়োবৃদ্ধ সভাসদদের উপর তাঁর দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে নিয়ে স্বর্ণরথে করে সাবিত্রী দূর দূরান্তে পরিভ্রমণ করলেন। মাঝে মাঝে বিভিন্ন রাজসভায় থামলেন, বিভিন্ন রাজপুত্রকে দেখলেন। কিন্তু একজনও সাবিত্রীর চিত্ত জয় করতে পারলেন না। তারপর তাঁরা এক পবিত্র আশ্রমে পৌছলেন। সে আশ্রমটি ছিল একটি অভয়ারণ্য, যেখানে প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ ছিল। জন্তুরা সেখানে মানুষকে ভয় পেত না, এমন কি হ্রদের মাছ পর্যন্ত মানুষের হাত থেকে খাবার খেত। সেখানে হাজার হাজার বছরের মধ্যে কেউ কোনও প্রাণী হত্যা করেনি। ঋষিরা ও বৃদ্ধরা সেখানে হরিণ ও পাখিদের সঙ্গে বাস করতে যেতেন। সেখানে এমন কি অপরাধীরা পর্যন্ত নিরাপদ ছিল। কারও যখন জীবনে বৈরাগ্য আসত সে বনে যেত, মুনিঋষিদের সাহচর্যে ধর্মালোচনা ও ধ্যান করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিত।

এদিকে দ্যুমৎসেন বলে একজন রাজা ছিলেন। তিনি শত্রুদের দ্বারা পরাস্ত ও রাজ্যচ্যুত হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়সও হয়েছিল ও দৃষ্টিশক্তিও চলে গিয়েছিল। বেচারা বৃদ্ধ, অন্ধ রাজা রানী ও পুত্রকে নিয়ে বনে আশ্রয় নিয়েছিলেন ও কঠোর তপস্যায় দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম ছিল সত্যবান।

সমস্ত রাজসভা দেখে শুনে সাবিত্রী শেষ পর্যন্ত সেই আশ্রমে অর্থাৎ পবিত্র স্থানে উপস্থিত হলেন। সেকালে মুনিঋষিদের প্রতি এত সম্মান ও শ্রদ্ধা করা হত যে এমন কি রাজাধিরাজও তাঁদের প্রণাম না করে আশ্রম পার হয়ে যেতেন না। ফলমূলাহারী, চিরবাসপরিহিত, বনবাসী কোনও ঋষির বংশধরত্ব দাবী করতে পারলে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটেরও আনন্দের অবধি থাকত না। আমরা সব ঋষিদের সন্তানসন্ততি। এ শ্রদ্ধা ধর্মের প্রতি। কাজেই আশ্রম পার হওয়ার সময় এমন কি রাজারাও ভিতরে ঢুকে ঋষিদের প্রণাম করতে পারলে সম্মানিত বোধ করতেন। অশ্বারোহণে এলে আশ্রমের নিকটে এসে তাঁরা অবতরণ করতেন ও পদব্রজে আশ্রমে যেতেন। রথে যদি আসতেন তবে প্রবেশ করার সময়ে রথ ও অস্ত্রশস্ত্র বাইরে রেখে যেতেন। ধার্মিক লোকদের মত শান্ত ও নম্রভাবে না এলে কোনও যোদ্ধার প্রবেশাধিকার থাকত না।

সাবিত্রী এই আশ্রমে এসে তপস্বীর পুত্র সত্যবানকে দেখতে পেলেন, এবার তাঁর

চিত্ত বিজিত হল। তিনি রাজপ্রাসাদ ও রাজসভার সকল রাজপুত্রদের এড়িয়েছিলেন, কিন্তু রাজা দ্যুমৎসেনের এই অরণ্য-আশ্রয়ে তাঁর পুত্র সত্যবান সাবিত্রীর মনোহরণ করলেন।

সাবিত্রী যখন পিতৃগৃহে ফিরলেন তখন পিতা বললেন, "সাবিত্রি, আদরিণী কন্যা আমার, বল এমন কাউকে দেখেছ যাকে তুমি বিবাহ করতে চাও?" সলজ্জ সাবিত্রী মৃদুস্বরে বললেন, "হাঁ, পিতা।" "যুবরাজের নাম কি?" "তিনি কোনও যুবরাজ নন, স্বতরাজ্য রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র—পিতৃধন বিহীন রাজপুত্র, ব্রহ্মচর্য পালন করেন, অরণ্যে সন্ন্যাসী জীবন যাপন করেন, কুটিরবাসী বৃদ্ধ পিতামাতাকে সাহায্য করেন ও ফলমূল আহরণ করে খাওয়ান।

এই কথা শুনে পিতা সেখানে উপস্থিত নারদ ঋষির সঙ্গে পরামর্শ করলেন। নারদ বললেন এ পছন্দ নিতান্ত অমঙ্গলজনক! রাজা তাঁকে ভেঙে বলতে বললেন। তখন নারদ বললেন, "এখন থেকে বারো মাসের মধ্যে যুবকটির মৃত্যু হবে।" ভয়ে চমকে উঠে রাজা বললেন, "সাবিত্রি, বারো মাসের মধ্যে এ যুবকের মৃত্যু হবে, তুমি বিধবা হবে; একবার ভেবে দেখ! এ পছন্দ থেকে বিরত হও, বৎসে! এই ক্ষণজীবী, মৃত্যু নিশ্চিত পাত্রের সঙ্গে তোমার বিবাহ হতেই পারে না।" "তা হোক, পিতা! আর এক জনকে বিবাহ করে আমার মনের সতীত্ব বিসর্জন দিতে আমায় বলবেন না, কারণ এই সৎ ও সাহসী সত্যবানকেই কেবল আমি ভালবেসেছি ও মনে মনে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করেছি। কুমারী একবারই মাত্র পছন্দ করে এবং কখনও সত্যভ্রষ্ট হয় না।" রাজা যখন দেখলেন সাবিত্রী মনেপ্রাণে দৃঢ়সঙ্কল্প তখন তিনি রাজী হলেন। সাবিত্রী রাজপুত্র সত্যবানকে বিবাহ করলেন এবং বাঞ্ছিত স্বামীর সঙ্গে বাস করতে ও শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করতে পিতার প্রাসাদ ছেড়ে নীরবে বনে চলে গেলেন। সাবিত্রী সত্যবানের মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানলেও সত্যবানের কাছে সে কথা গোপন রেখেছিলেন। প্রতিদিন সত্যবান বনের গভীরে গিয়ে ফুল ফল আহরণ করতেন, জ্বালানি সংগ্রহ করতেন, তারপর কুটিরে ফিরতেন। সাবিত্রী রান্না করতেন ও শ্বশুর-শাশুড়ীকে সাহায্য করতেন। এমনি করেই তাঁদের দিন কাটছিল, এমন সময়ে শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটি ঘনিয়ে এল, বাকি রইল মাত্র তিনটি ছোট্ট দিন। সাবিত্রী তিনরাত্রের তপস্যা ও পবিত্র উপবাসের কঠোর ব্রত নিলেন ও দিবারাত্র সতর্ক প্রহরায় রইলেন। ব্যাকুল প্রার্থনা ও অদৃশ্য অশ্রুপাতে সাবিত্রী দুঃখময় ও বিনিদ্র রজনীগুলি অতিবাহিত করলেন, শেষ পর্যন্ত সেই ভয়ঙ্কর দিনটির শুরু হল। সেদিন আর সাবিত্রী সত্যবানকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল থাকতে দিতে রাজী নন। স্বামী ফলমূল, জ্বালানি আহরণের সময়ে তাঁর সঙ্গিনী হওয়ার জন্য সাবিত্রী শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুমতি চাইলেন ও অনুমতি নিয়ে সঙ্গে গেলেন। হঠাৎ জড়িত কণ্ঠে সত্যবান স্ত্রীকে বললেন তাঁর জ্ঞান হারাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, "প্রিয়া সাবিত্রি, আমার মাথা ঘুরছে, চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে নিদ্রা আমার অধিকার করছে; তোমার পাশে ক্ষণতরে আমায় বিশ্রাম করতে দাও।" ভয়ে কম্পমান সাবিত্রী উত্তর দিলেন, "প্রিয়তম স্বামি, এস, আমার কোলে

মাথা দাও।" সত্যবান জ্বরতপ্ত মাথাটি সাবিত্রীর কোলে রাখলেন আর স্বল্পক্ষণের মধ্যেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। স্বামীকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে অশ্রুমতী সাবিত্রী সেই নির্জন বনে বসে রইলেন যতক্ষণ না যমরাজের দূতরা সত্যবানের আত্মাকে নিয়ে যেতে এল। স্বামীর মৃতদেহ কোলে সাবিত্রী যেখানে বসেছিলেন দূতরা তার কাছেও পৌছতে পারল না। তাঁকে ঘিরে আগুনের এক গণ্ডি জ্বলছিল, কোন দূত তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারল না। সেখান থেকে পালিয়ে তারা সব মৃত্যুর দেবতা যমরাজের কাছে ফিরে গেল ও কেন ওই লোকটির আত্মা আনতে পারল না তা জানাল।

তারপর এলেন মৃত্যুর দেবতা ও মৃতদের বিচারক যম। তিনি ছিলেন প্রথম মৃত মানব—পৃথিবীতে যে লোকের প্রথম মৃত্যু হয়েছিল—তারপর সমস্ত মৃতদের অধিষ্ঠাতা দেবতা হয়েছিলেন। লোক মরলে তিনি বিচার করেন সে লোকের শাস্তি প্রাপ্য না পুরস্কার প্রাপ্য। কাজেই তিনি নিজেই এলেন। তিনি অবশ্য যাদুগণ্ডি পার হতে পারতেন, কারণ তিনি দেবতা। সাবিত্রীর কাছে এসে বললেন, "কন্যা, মৃতদেহ ছেড়ে দাও, জেনো মৃত্যুই মানুষের নিয়তি, আমিই প্রথম মর যার মৃত্যু হয়েছে। তারপর থেকে সকলকেই মরতে হয়। মৃত্যুই মানুষের অদৃষ্ট।" এ কথা শুনে সাবিত্রী উঠে গেলেন, যম আত্মাকে টেনে নিলেন। যুবকের আত্মা অধিকার করে যম আপন পথে রওনা দিলেন। বেশি দূর যাওয়ার আগেই তিনি পিছনের শুষ্কপত্রের উপর পদধ্বনি শুনতে পেলেন। ফিরে চেয়ে বললেন, "কন্যা সাবিত্রি, আমায় অনুসরণ করছ কেন? এই তো সমস্ত মরের নিয়তি। সাবিত্রী উত্তর দিলেন, "পিতা, আমি আপনাকে অনুসরণ করছিনে। কিন্তু নারীরও নিয়তি হল প্রেম যেখানে নিয়ে যায় সেখানে যাওয়া, শাশ্বত বিধান প্রেমময় স্বামী ও বিশ্বস্ত স্ত্রীকে পৃথক করে না। তখন মৃত্যুর দেবতা বললেন, "স্বামীর জীবন ছাড়া যে কোন বর চাও।" "হে মৃত্যুর দেবতা, আপনি যদি প্রীত হয়ে বর দেন তবে আমি চাই আমার শ্বশুরের অন্ধত্ব নিরাময় হোক ও তিনি সুখী হন।" "কর্তব্যপরায়ণা কন্যা, তোমার পুণ্য ইচ্ছা পূর্ণ হোক।" তারপর সত্যবানের আত্মা নিয়ে যমরাজ আবার যাত্রা শুরু করলেন। আবার পিছন থেকে পদধ্বনি শোনা গেল। তিনি ফিরে চাইলেন। "কন্যা সাবিত্রি, এখনও আমায় অনুসরণ করছ?" "হাঁ, পিতা। না করে পারছি না। সব সময়েই চেষ্টা করছি ফিরে যেতে, কিন্তু আমার মন স্বামীর পিছন পিছন যাচ্ছে, দেহ অনুসরণ করছে। আত্মা ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছে, কারণ ওই আত্মার মধ্যে আমারও আত্মা আছে, আত্মা যখন আপনি নিয়ে গেলেন দেহ তখন তাকে অনুসরণ করে, তাই নয় কি?" "সুন্দরী সাবিত্রি, তোমার কথায় আমি প্রীত হয়েছি। আমার কাছে আর একটি বর চাও, কিন্তু তোমার স্বামীর জীবন হলে হবে না।" "পিতা, আপনি যদি আর একটি প্রার্থনা মঞ্জুর করেন তো আমার শ্বশুর যেন তাঁর হৃত রাজ্য ও সম্পদ ফিরে পান।" যম উত্তর দিলেন, "ভক্তিমতী কন্যা, এই বর আমি দিলাম। কিন্তু এবার গৃহে ফিরে যাও। জীবিত প্রাণী যমরাজের সঙ্গে যেতে পারে না।" তারপর যম নিজের পথে চললেন। বিনম্রা ও বিশ্বস্তা সাবিত্রী কিন্তু

তখনও তাঁর মৃত স্বামীকে অনুসরণ করে চললেন। যম আবার পিছন ফিরলেন, "সুচরিতা সাবিত্রি, আশাহীন দুঃখে আমায় অনুসরণ করো না।" "আমার প্রিয় পতিকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছেন সেখানে অনুসরণ না করে আমি পারি না।" "সাবিত্রি, তাহলে ধর তোমার স্বামী পাপী ছিলেন ও তাঁকে নরকে যেতে হবে। তাহলেও কি তুমি তোমার প্রেমাস্পদকে অনুসরণ করবে?" প্রেমময়ী স্ত্রী বললেন, "জীবনে হোক আর মরণে হোক, স্বর্গে হোক আর নরকে হোক তিনি যেখানে যাবেন সানন্দে আমি অনুসরণ করব।" "বৎসে, তোমার কথাগুলি আনন্দদায়ক, তোমার উপর আমি খুশি হলাম, আর একটি বর চাও, কিন্তু মৃত আর জীবিত হয় না।" "আপনি যখন আর একটি বর দিতে রাজী তাহলে আমার শ্বশুরের রাজবংশ যেন ধ্বংস না হয়, সত্যবানের সন্তানরা যেন তাঁর রাজত্বের উত্তরাধিকারী হয়।" তখন যমরাজ হেসে বললেন, "কন্যা আমার, তোমার আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হবে। এই নাও তোমার স্বামীর আত্মা, সে আবার প্রাণ পাবে, পিতা হওয়ার জন্য জীবিত থাকবে, তোমাদের সন্তানরা যথাকালে রাজত্ব করবে। গৃহে ফিরে যাও। প্রেম মৃত্যুকে জয় করেছে। নারী কখনও তোমার মত ভালবাসেনি, আর এমন কি আমি, মৃত্যুর দেবতা পর্যন্ত যে প্রকৃত প্রেমের অটল ক্ষমতার বিরুদ্ধে শক্তিহীন তুমিই তার প্রমাণ।"

এই হল সাবিত্রীর গল্প। মৃত্যু তাঁর প্রেমকে পরাস্ত করতে পারেনি, বিপুল ভালবাসা দিয়ে স্বামীর আত্মাকে তিনি যমের কাছ থেকে পর্যন্ত ছিনিয়ে এনেছিলেন। ভারতের প্রতিটি মেয়ে তাই সাবিত্রীর মত হতে চায়।

মহাভারত এমন শত শত সুন্দর কাহিনীতে ভর্তি। আমি শুরুতেই আপনাদের বলেছিলাম যে মহাভারত পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম গ্রন্থ, অষ্টাদশ পর্ব বা খণ্ডে বিভক্ত প্রায় একলক্ষ শ্লোক এতে আছে।

মূল গল্পে ফিরে আসা যাক। পাণ্ডবভ্রাতাদের আমরা নির্বাসনে ছেড়ে এসেছিলাম। এমন কি সেখানেও দুর্যোধনের দুষ্ট চক্রান্তের হাত থেকে তাঁরা নিস্তার পাননি, কিন্তু সেসব ব্যর্থ হয়েছিল।

তাঁদের বনবাসের একটি গল্প এখানে শোনাই। একদিন ভাইয়েরা বনে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন। যুধিষ্ঠির ভাই নকুলকে জল আনতে আদেশ করলেন। তিনি তাড়াতাড়ি যেখানে জল আছে সেদিকে রওনা দিলেন ও এক স্ফটিকস্বচ্ছ হ্রদের তীরে পৌঁছলেন। যেই জলপান করতে যাবেন অমনি একটি কণ্ঠস্বর বলল, "বৎস, থাম। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও, তারপর জল পান কর।" কিন্তু তৃষ্ণায় একান্ত কাতর নকুল সে কথা অগ্রাহ্য করে জল পান করলেন ও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। নকুল আসছেন না দেখে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর ভাই সহদেবকে আদেশ করলেন নকুলের সন্ধান করতে ও জলসহ তাঁকে নিয়ে আসতে। সহদেব তখন হ্রদের ধারে গিয়ে নকুলকে মৃত দেখলেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে মর্মান্তিক ক্লিষ্ট ও অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত নকুল জলের দিকে গেলেন ও সেই একই কথা শুনতে পেলেন, "বৎস, আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও, তারপর জলপান কর।" তিনিও সে কথা অগ্রাহ্য করলেন এবং তৃষ্ণা নিবারণ করেই মরণের কোলে ঢলে পড়লেন। পরে অর্জুন ও ভীমকে পরপর একই উদ্দেশে

পাঠান হল, কিন্তু তাঁদেরও কেউ ফিরলেন না, হ্রদের জল পান করে তাঁরাও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তখন ভ্রাতাদের সন্ধানে যুধিষ্ঠির গেলেন। দৃশ্য দেখে তিনি শোকে অভিভূত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। হঠাৎ সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, "বৎস, দুঃসাহস করনা। আমি একজন যক্ষ, বক রূপে ক্ষুদ্র মৎস্যে জীবন ধারণ করে এই হ্রদে বাস করি। আমিই তোমার অনুজদের লোকান্তরিত আত্মার প্রভু শমনের সদনে পাঠিয়েছি। হে রাজপুত্র, আমার প্রশ্নের যদি উত্তর না দাও তবে তুমি পঞ্চম শবে পরিণত হবে। হে কৌন্তেয়, প্রথমে আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে তুমি যথেচ্ছ জল পান কর ও নিয়ে যাও।" যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, "আমার বুদ্ধিমত আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দেব। জিজ্ঞাসা করুন।" যক্ষ তখন তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন, যুধিষ্ঠির সবকটির সন্তোষজনক জবাব দিলেন। প্রশ্নাবলীর মধ্যে একটি ছিল "পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কি ?" "প্রতি মুহূর্তে আমরা অপরাপর প্রাণীকে মৃত্যুকবলিত হতে দেখি, কিন্তু যারা পড়ে থাকে তারা মনে করে তারা কখনও মরবে না। এটাই সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার। এটাই সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কেউ মনে করে না যে সে মারা যাবে!" অন্য একটি প্রশ্ন ছিল "ধর্মের রহস্যভেদের পথ কি ?" যুধিষ্ঠির জবাব দিয়েছিলেন, "বিতর্কে কিছুর মীমাংসা হয় না ; মতবাদ বহু, ধর্মগ্রন্থ বহুবিধ, একাংশ অপরাংশকে খণ্ডন করে। দুজন এমন ঋষি নেই যাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য নেই। ধর্মের রহস্য গূঢ়, যেন অন্ধকার গুহা। কাজেই মহাজন যে পথে গিয়েছেন সেই পন্থাই অনুসরণ করা কর্তব্য।" তখন যক্ষ বললেন "আমি সন্তুষ্ট, আমি ধর্ম, বকরূপী ন্যায়ের দেবতা। তোমাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলাম। এখন দেখ, তোমার ভ্রাতাদের কেউ মৃত নয়। এসবই আমার যাদু। অহিংসা যেহেতু তোমার কাছে লাভ ও আনন্দ উভয় অপেক্ষা শ্রেয় তাই তোমার সকল অনুজ জীবিত হোক, হে ভারতর্ষভ।" যক্ষের এই কথায় পাণ্ডবগণ জাগরিত হলেন।

এখানে যুধিষ্ঠিরের স্বভাবের একটা আভাস পাওয়া গেল। আমরা তাঁর উত্তরগুলি থেকে দেখলাম তিনি রাজার চেয়ে দার্শনিক বেশি, যোগী বেশি।

এবার তাঁদের বনবাসের ত্রয়োদশ বর্ষ সন্নিকট হচ্ছিল, তাই যক্ষ তাঁদের উপদেশ দিলেন বিরাটের রাজ্যে যেতে এবং সেখানে যে ছদ্মবেশ সব চেয়ে ভাল মনে হয় তাই ধারণ করতে।

অতএব দ্বাদশ বৎসর বনবাস কাল শেষ হওয়ার পর অজ্ঞাতবাসের বৎসরটি কাটানর জন্য তাঁরা বিভিন্ন ছদ্মবেশে বিরাটের রাজ্যে গেলেন ও রাজবাড়িতে বিভিন্ন রকম পরিচর্যার কাজ নিলেন। পাশায় দক্ষ হিসাবে যুধিষ্ঠির হলেন রাজার ব্রাহ্মণ সভাসদ। ভীম সূপকার হলেন। নপুংসকবেশী অর্জুন রাজকন্যা উত্তরার নৃত্য-গীতের শিক্ষক হলেন ও রাজ-অন্তঃপুরে রইলেন। নকুল রাজার অশ্বপাল হলেন। সহদেব পেলেন গরুদের ভার। দ্রৌপদীও পরিচারিকা হিসাবে রানীর অন্তঃপুরে স্থান পেলেন। এইভাবে আত্মপরিচয় গোপন করে পাণ্ডবেরা নিরাপদে এক বছর

কাটালেন, তাঁদের বের করার জন্য দুর্যোধনের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। দুর্যোধন যখন খোঁজ পেলেন তখন বছর পার হয়ে গিয়েছে।

তারপর যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দূত পাঠালেন ও দাবি করলেন যে তাঁদের অংশ হিসাবে অর্ধেক রাজত্ব তাঁদের প্রত্যর্পণ করা হোক। কিন্তু দুর্যোধন জ্ঞাতিদের ঘৃণা করতেন, তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণে তিনি সম্মত হলেন না। তাঁরা একটিমাত্র প্রদেশ, এমনকি পাঁচটি মাত্র গ্রাম নিতেও রাজী ছিলেন। কিন্তু জেদী দুর্যোধন ঘোষণা করলেন বিনা যুদ্ধে তিনি সূচ্যগ্র মেদিনীও ছাড়বেন না। ধৃতরাষ্ট্র বারংবার শান্তির জন্য বললেন, কিন্তু সবই বৃথা হল। আসন্ন যুদ্ধ ও জ্ঞাতিহত্যা এড়ানর জন্য কৃষ্ণও গিয়ে চেষ্টা করলেন, চেষ্টা করলেন রাজসভার বিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধরা; কিন্তু শান্তি-পূর্ণভাবে রাজ্যবিভাগের সমস্ত আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হল। কাজেই শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষেই যুদ্ধের প্রস্তুতি হল, সমস্ত যোদ্ধাজাতি তাতে অংশ নিলেন।

প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়দের রীতিনীতি এখানে লক্ষ্য করা যায়। দুর্যোধন এক পক্ষ নিলেন, অপর পক্ষে যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠিরের পক্ষ থেকে সমস্ত প্রতিবেশী রাজাদের কাছে মৈত্রী প্রার্থনা করে অবিলম্বে দূত পাঠান হল, কারণ সম্মানিত ব্যক্তিরা প্রথম যার কাছ থেকে অনুরোধ পাবেন তাই মঞ্জুর করবেন। কাজেই অনুরোধের অগ্রাধিকার অনুযায়ী পাণ্ডব বা কৌরবদের পক্ষে যোগ দেবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যোদ্ধারা এসে পড়লেন। এমন হল এক ভাই এ পক্ষে ও অন্য ভাই ও পক্ষে রইলেন, অথবা পিতা একপক্ষে পুত্র অন্যপক্ষে গেলেন। সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক হল তখনকার যুদ্ধের নিয়ম-কানুন; দিনের মত যুদ্ধ শেষ হয়ে সন্ধ্যা নামলেই যুধ্যমান দুপক্ষ বন্ধু হয়ে যেতেন, এমনকি পরস্পরের শিবিরেও আসতেন। সকাল হলে আবার পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতেন। এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যটি হিন্দুরা মুসলমান আক্রমণের সময় পর্যন্ত চালু রেখেছিলেন। আরও ছিল: অশ্বারোহী পদাতিকের উপর আঘাত করবেন না; অস্ত্রে বিষ মাখান যাবে না; অসম যুদ্ধে বা অসদুপায়ে শত্রুকে পরাস্ত করা যাবে না; অন্যের উপরে কোনও অন্যায় সুযোগ নেওয়া যাবে না; ইত্যাদি। এই সমস্ত রীতিনীতি কেউ লঙ্ঘন করলে তাকে অপমানিত ও একঘরে হতে হত। ক্ষত্রিয়রা এইভাবেই শিক্ষিত ছিলেন। মধ্য এশিয়া থেকে যখন বৈদেশিক আক্রমণ এসেছিল হিন্দুরা আক্রমণকারীদের সঙ্গেও এই একই ব্যবহার করেছিলেন। আক্রমণকারীদের তাঁরা পরাস্ত করেছিলেন এবং বহু ক্ষেত্রে তাঁদের উপহারাদি সহ স্বদেশে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধের নিয়ম-কানুনের মধ্যে ছিল যে, তাঁরা কারও দেশ বেদখল করবেন না, কেউ পরাস্ত হলে তাঁকে যথা-বিহিত সম্মান দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে। মুসলমান বিজেতারা হিন্দু রাজাদের সঙ্গে অন্যরকম ব্যবহার করতেন; একবার ধরতে পারলে নির্মমভাবে হত্যা করতেন।

মনে রাখবেন সেকালে, অর্থাৎ আমাদের কাহিনীর সময়ে, কাব্যে বলা আছে যে অস্ত্রবিজ্ঞান তখন কেবল ধনুর্বাণের ব্যবহার মাত্রই ছিল না, সে ছিল যাদুকরী ধনুর্বিদ্যা, যাতে মন্ত্র, ধ্যান প্রভৃতি বিশিষ্ট ভূমিকা নিত। একজন লোক লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারতেন, ইচ্ছামত তাদের ভস্ম করে ফেলতে পারতেন। একটিমাত্র শর

নিক্ষেপ করলে সহস্র সহস্র শরবৃষ্টি ও বজ্রপাত হত ; যে কোনও কিছুকে ভস্ম করা যেত, ইত্যাদি ; আর এ সবই ছিল দৈব যাদু। রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই কাব্যেই একটা ব্যাপার বেশ কৌতূহলোদ্দীপক. এই মন্ত্রপূত শর ও এমনি সব কাণ্ডকারখানার পাশাপাশি ইতিমধ্যে কামানও ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে। কামান একটা অতি প্রাচীন জিনিস ; চীনা ও হিন্দুদের দ্বারা ব্যবহৃত হত। নগরপ্রাচীর ফাঁকা লোহার নলে তৈরি শত শত অদ্ভুত অস্ত্রে সজ্জিত থাকত, সেগুলির মধ্যে বারুদ ও গোলক ভর্তি করে শত শত লোককে মারা যেত। লোকের বিশ্বাস ছিল যে যাদুবলে চীনারা ফাঁকা লোহার নলের মধ্যে শয়তানকে ঢুকিয়েছে, যখন নলে সামান্য আগুন দেওয়া হয় শয়তান ভয়ঙ্কর আওয়াজ করে বেরিয়ে আসে ও বহু লোককে মেরে ফেলে।

অতএব, প্রাচীনকালে লোকে মন্ত্রপূত তীর দিয়ে যুদ্ধ করতেন। একজন লোক লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারতেন। তাঁদের নিজস্ব সামরিক সংস্থাপনা ও কৌশল ছিল। পদাতিক সৈন্য ছিল, তাদের নাম ছিল পাদ ; তারপর অশ্বারোহী, অর্থাৎ তুরগ ; আরও দুটি বিভাগ থাকত যা আধুনিকরা হারিয়েছেন ও ছেড়ে দিয়েছেন —হস্তী বাহিনী থাকত, মাহুত চালিত শত শত হস্তী—বিভিন্ন উপ-বাহিনীতে বিভক্ত বিরাট বিরাট লোহার পাতের বর্মে সুরক্ষিত, এই সব হস্তী বহু শত্রুকে একসঙ্গে ভূপাতিত করত—তারপর অবশ্য রথও ছিল (প্রাচীন রথের ছবি আপনারা দেখে থাকবেন, সব দেশেই ব্যবহৃত হত)। প্রাচীনকালের সৈন্যবাহিনীর এই ছিল চারটি বিভাগ।

এদিকে দুই দলই কৃষ্ণের সঙ্গে মৈত্রীর জন্য সমান উৎসুক ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ এই যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিতে ও নিজে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করলেন। তিনি অর্জুনের সারথি এবং পাণ্ডবদের বন্ধু ও পরামর্শদাতা হতে চাইলেন, আর দুর্যোধনকে নিজের পরাক্রান্ত সৈন্যবাহিনী দিলেন।

তারপর কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তরে মহাযুদ্ধ শুরু হল। সে যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধনের অনুজরা এবং উভয়পক্ষের বহু জ্ঞাতি ও সহস্র সহস্র অপরাপর বীর প্রাণ হারালেন। আঠার দিন ধরে যুদ্ধ চলল। বস্তুত আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যে সামান্য কয়েকজনই অবশিষ্ট রইল। দুর্যোধনের মৃত্যুতে পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধের নিষ্পত্তি হল। তারপর চলল রানী গান্ধারী ও বিধবা নারীদের বিলাপ, জ্বলল মৃত যোদ্ধাদের চিতাগ্নি।

যুদ্ধের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল অপূর্ব ও অমর কাব্য গীতা, স্বর্গীয় সঙ্গীত। গীতা ভারতের জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ ও মহত্তম শিক্ষা। এতে আছে কুরুক্ষেত্রের মহারণ শুরু হওয়ার পূর্বমুহূর্তে অর্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণের সংলাপ। আপনাদের মধ্যে যাঁরা এটি পড়েননি তাঁদের আমি পড়তে পরামর্শ দেব। আপনারা যদি জানতেন এ গ্রন্থ আপনাদের দেশকে পর্যন্ত কতখানি প্রভাবিত করেছে ! এমার্সনের প্রেরণার উৎস যদি জানতে চান তো সে এই গীতা। তিনি কার্লাইলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, কার্লাইল তাঁকে একখানি গীতা উপহার দিয়েছিলেন। আর সেই ছোট্ট বইটিই কনকর্ড (সমন্বয়) আন্দোলনের জন্য দায়ী। আমেরিকার সমস্ত উদার আন্দোলন কোনও না কোনও উপায়ে কনকর্ড দলের কাছে ঋণী।

গীতার মূল চরিত্র কৃষ্ণ। আপনারা যেমন মানুষরূপে অবতীর্ণ ঈশ্বর বলে নাজারেথের যীশুকে ভজনা করেন, হিন্দুরা তেমনি ভগবানের বহু অবতারকে পূজা করেন। তাঁরা কেবল এক-দুজন নয়, অনেককে বিশ্বাস করেন, মনে করেন ধর্মরক্ষা ও দুষ্কৃতি বিনাশের জন্য এঁরা যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একজন করে অবতার আছেন, কৃষ্ণ তাঁদেরই একজন। ভারতে যে কোনও অবতারের তুলনায় কৃষ্ণের ভক্তের সংখ্যাই বোধহয় সবচেয়ে বেশি। তাঁর ভক্তরা মনে করেন যে অবতারদের মধ্যে কৃষ্ণই সবচেয়ে নিখুঁত। কেন? তাঁরা বলেন, কারণ, বুদ্ধ ও অন্যান্য অবতারদের দেখুন, "তাঁরা কেবল সন্ন্যাসী ছিলেন, বিবাহিত লোকদের প্রতি তাঁদের কোনও সহানুভূতি ছিল না। থাকবেই বা কি করে? কিন্তু কৃষ্ণকে দেখুন: তিনি পুত্র হিসাবে, রাজা হিসাবে, পিতা হিসাবেও মহান, যেসব চমৎকার শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন সারা জীবন ধরে নিজে সেইরকম আচরণ করে গিয়েছেন।" "মহত্তম কর্মের মধ্যে যিনি মধুরতম শান্তি পান ও মহত্তম প্রশান্তিতে যিনি সর্বাধিক কর্ম করেন, তিনিই জীবনের রহস্য ভেদ করেছেন।" কৃষ্ণ দেখিয়েছেন তা কী করে করতে হয়—নিরাসক্ত থেকে। সব কর, কিন্তু কিছুর সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেল না। তুমি আত্মা, তুমি পবিত্র, তুমি সর্বদা স্বাধীন; তুমি মূর্তিমান সাক্ষী। আমাদের দুঃখ কর্ম থেকে আসে না, আসে আসক্তি থেকে। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক অর্থ: কৃষ্ণ বলেন, অর্থ থাকা, অর্থ উপার্জন করা মহৎ ব্যাপার; অর্থবান হতে খুব চেষ্টা কর, কিন্তু অর্থে আসক্ত হয়ো না। সন্তান, স্ত্রী, স্বামী, আত্মীয়স্বজন, যশ সব সম্পর্কেই ওই একই কথা। তাদের বর্জন করার প্রয়োজন নেই; কেবল আসক্ত হয়ো না। আসক্তি কেবল একটিই, আর তা হল ঈশ্বরে আসক্তি, আর কারও প্রতি নয়। তাদের জন্য কর্ম কর, তাদের ভালবাস, তাদের উপকার কর, তাদের জন্য প্রয়োজন হলে শত জীবন বলি দাও, কিন্তু কিছুতেই আসক্ত হয়ো না। তার নিজের জীবন ছিল এর এক নিখুঁত দৃষ্টান্ত।

মনে রাখবেন যে গ্রন্থে কৃষ্ণের জীবন-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা কয়েক হাজার বছর পুরানো। আর তাঁর জীবনের কিছু কিছু অংশের সঙ্গে নাজারেথের যীশুর জীবনের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কৃষ্ণের রাজকুলে জন্ম। কংস নামে একজন অত্যাচারী রাজা ছিলেন। দৈববাণী হয়েছিল যে অমুক পরিবারে যে সন্তান জন্মাবে সেই রাজা হবে। তাইতে কংস সমস্ত শিশু-পুত্রদের হত্যার আদেশ দিলেন। কৃষ্ণের পিতামাতাকে কংস কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। সেখানেই শিশুর জন্ম হল। কারাগারের মধ্যে হঠাৎ আলোর ছটা দেখা গেল। শিশু বলল, "আমি জগতের আলো, পৃথিবীর কল্যাণার্থে জাত।" কৃষ্ণকে আবার গরুদের সঙ্গে দেখতে পারেন, এটা প্রতীকধর্মী,—"গোপালশ্রেষ্ঠ" বলে তাঁকে অভিহিত করা হয়। মুনিঋষিরাও বলেন যে স্বয়ং ভগবান জন্মগ্রহণ করেছেন, তারা অর্ঘ্যও দিতে যান। কাহিনীর অপরাপর অংশে অবশ্য সাদৃশ্য আর দেখা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ অত্যাচারী কংসকে পরাস্ত করলেন; কিন্তু নিজে সিংহাসন দখল করা বা গ্রহণ করার কথা তিনি ভাবলেন না। এর সঙ্গে তাঁর কোনও সম্বন্ধ ছিল না। তিনি তাঁর কর্তব্য করেছেন, আর তাতেই ইতি।

মহাবীর ও পরম শ্রদ্ধেয় পিতামহ ভীষ্ম কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আঠার দিনের মধ্যে দশ দিন যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধান্তেও তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ান অবস্থাতেই যুধিষ্ঠিরকে নানা বিষয়ে বহু উপদেশ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিল রাজার কর্তব্য, চার বর্ণের কর্তব্য, জীবনের চার পর্যায়, বিবাহের বিধি-বিধান, উপহার প্রদান ইত্যাদি। এই উপদেশের ভিত্তি ছিল প্রাচীন মুনি-ঋষিদের শিক্ষা। তিনি সাংখ্যদর্শন ও যোগ-দর্শনের ব্যাখ্যা করেছিলেন, সাধু-সন্ত, দেবতা ও রাজাদের সম্পর্কে নানাবিধ কাহিনী ও ঐতিহ্যের বিবরণ দিয়েছিলেন। এইসব শিক্ষা সমগ্র গ্রন্থের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জুড়ে আছে এবং হিন্দু বিধি-বিধান ও নৈতিক সংহিতার এ এক অমূল্যভাণ্ডার। ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির রাজা হিসাবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয় এবং নমস্য ও জ্ঞাতিদের এই নিধন তাঁর মনের উপর গুরুভার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন ব্যাসের পরামর্শে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন।

যুদ্ধের পর পনের বৎসর ধৃতরাষ্ট্র শান্তিতে ও সসম্মানে বসবাস করলেন। যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা ধৃতরাষ্ট্রকে মান্য করে চলতেন। তারপর বয়োবৃদ্ধ সম্রাট যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে রেখে বনগমন করলেন। সঙ্গে রইলেন তাঁর ভক্তিমতী স্ত্রী ও পাণ্ডব-ভ্রাতাদের মা কুন্তী। জীবনের শেষ দিন কটি তপস্যায় অতিবাহিত করার জন্য তাঁরা চলে গেলেন।

যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর ছত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হল। তারপর সংবাদ এল কৃষ্ণ মরদেহ পরিত্যাগ করেছেন। ঋষি কৃষ্ণ, তাঁর বন্ধু, ভবিষ্যদ্বক্তা ও উপদেষ্টা কৃষ্ণ পরলোকে গমন করেছেন। অর্জুন দ্বারকায় ছুটে গেলেন। ফিরে এসে জানালেন সত্যিই কৃষ্ণ ও সকল যাদব লোকান্তরিত হয়েছেন। তখন শোকাভিভূত রাজা ও অন্য ভ্রাতৃগণ ঘোষণা করলেন যে এবার তাঁদেরও যাওয়ার সময় এসেছে। কাজেই তাঁরা রাজ্যভার পরিত্যাগ করলেন, অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে সমাসীন করে মহাপ্রস্থানের পথে হিমালয়ের দিকে রওনা দিলেন। এ ছিল সন্ন্যাসের এক বিশেষ রূপ। বৃদ্ধ রাজাদের সন্ন্যাস গ্রহণের রীতি চালু ছিল। প্রাচীন ভারতে মানুষ অত্যন্ত বৃদ্ধ হলে সবকিছু পরিত্যাগ করত। রাজারাও তাই করতেন। যখন মানুষ আর বাঁচতে চাইত না তখন সে হিমালয়ের দিকে রওনা দিত, অন্নজল পরিত্যাগ করে হাঁটতে থাকত যতক্ষণ না তার দেহ একেবারে অশক্ত হয়ে যেত। ক্রমাগত ভগবানের ধ্যান করতে করতে সে চলত, যতক্ষণ শরীরপাত না হত।

তখন দেবতারা ও মুনি-ঋষিরা এলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে বললেন যে তিনি চলতে শুরু করুন ও স্বর্গে পৌঁছান। স্বর্গে যেতে হলে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর পার হতে হয়। হিমালয়ের পরপারে মেরুপর্বত। মেরুপর্বতের শিখরে স্বর্গ। কেউ সশরীরে সেখানে যেতে পারে নি। সেখানে দেবতাদের নিবাস। দেবতারা সেখানে যাবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে নির্দেশ দিলেন।

পঞ্চভ্রাতা ও পত্নী বল্কল বসন পরিধান করে যাত্রা শুরু করলেন। পথে একটি কুকুর তাঁদের সঙ্গী হল। চলেছেন তো চলেছেনই, ক্লান্ত পা টেনে টেনে উত্তরমুখে চলেছেন, যেখানে হিমালয় তার মহাশৃঙ্গরাজি ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। হঠাৎ দেখতে পেলেন

সম্মুখে বিশাল মেরুপর্বত। নীরবে তাঁরা তুষার অতিক্রম করতে লাগলেন, হঠাৎ রানী পড়ে গেলেন, আর উঠলেন না। অগ্রগামী যুধিষ্ঠিরকে ভ্রাতা ভীম বললেন, "দেখুন রাজা, রানী পড়ে গেলেন।" রাজা চোখের জল ফেললেন, কিন্তু ফিরে চাইলেন না। তিনি বললেন, "আমরা কৃষ্ণের কাছে যাচ্ছি, ফিরে চাওয়ার সময় নেই, এগিয়ে চল।" কিছুক্ষণ পরে ভীম আবার বললেন, "দেখুন, ভাই সহদেব পড়ে গেল।" রাজা চোখের জল ফেললেন, কিন্তু থামলেন না। বললেন, "এগিয়ে চল।"

সেই ঠাণ্ডায় ও তুষারে ভাইয়েরা একের পর এক পড়ে রইলেন, কিন্তু নিঃসঙ্গ যুধিষ্ঠির অটলভাবে অগ্রসর হলেন। পিছন ফিরে তিনি দেখলেন বিশ্বস্ত কুকুরটি তখনও সঙ্গে সঙ্গে আসছে। কাজেই কুকুর ও রাজা চললেন তুষার ও বরফের উপর দিয়ে, পর্বত ও উপত্যকা পার হয়ে, উঁচু থেকে আরও উঁচুতে। শেষ পর্যন্ত মেরু পর্বতে পৌঁছালেন। সেখান থেকে স্বর্গের ঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল, ধার্মিক রাজার উপর দেবতারা স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। দেবতাদের রথ নেমে এল। ইন্দ্র অনুরোধ করলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ, রথে ওঠো; নরদেহ পরিবর্তন না করেই তোমায় স্বর্গে আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।" কিন্তু না, তাঁর অনুরক্ত ভ্রাতৃগণ ও রানী ছাড়া তো তিনি যাবেন না। ইন্দ্র বুঝিয়ে বললেন যে তাঁরা আগেই পৌঁছে গিয়েছেন।

তখন যুধিষ্ঠির চতুর্দিকে চেয়ে কুকুরটিকে বললেন, "বৎস, রথে ওঠ।" ইন্দ্রদেব তো হতভম্ব। চিৎকার করে উঠলেন, "সেকি! কুকুর? কুকুরকে তুমি ছেড়ে দাও। কুকুর কখনও স্বর্গে যায় না! মহারাজ, তুমি ভেবেছ কি? পাগল হয়েছ নাকি? মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে পুণ্যাত্মা তুমি, কেবল তুমিই সশরীরে স্বর্গে যেতে পার।" "কিন্তু তুষার ও বরফের ভিতর দিয়ে ওই ছিল আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গী। যখন আমার সমস্ত ভাই মারা গেলেন, রানী মারা গেলেন, কেবল ওই আমাকে ছেড়ে যায় নি। এখন আমি কী করে ওকে ছেড়ে যাব?" "স্বর্গে কুকুর সহ মানুষের কোনও জায়গা নেই। ওকে ফেলে যেতে হবে। এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই।" রাজা উত্তর দিলেন, "কুকুর ছাড়া আমি স্বর্গে যাচ্ছি না। আমার যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ শরণাগতকে আমি ছাড়ব না। ন্যায় থেকে আমি বিচ্যুত হব না, এমনকি স্বর্গসুখের জন্যও। কিংবা দেবতার অনুরোধেও নয়।"

ইন্দ্র বললেন, "তাহলে এ কুকুর কেবল একটি শর্তেই স্বর্গে যেতে পারে। তুমি ছিলে নরজগতে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ, কিন্তু ও ছিল কুকুর, অপর প্রাণী হত্যা করেছে, খেয়েছে। ও পাপাচারী, শিকারী ও অপর প্রাণী হত্যাকারী। তুমি ওর সঙ্গে স্বর্গবাস বদলে নিতে পার।" রাজা বললেন, "রাজি আছি। কুকুরই স্বর্গে যাক।"

সঙ্গে সঙ্গে পট পরিবর্তন হল। যুধিষ্ঠিরের মহৎ বাক্য শুনে কুকুর ধর্ম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন। কুকুরটি আসলে মৃত্যু ও ন্যায়ের দেবতা যম ছাড়া আর কেউ নন। ধর্ম বললেন, "শোন রাজা, কোন মানুষ তোমার মত এমন নিঃস্বার্থ হতে পারেনি, একটা ছোট্ট কুকুরের জন্য তুমি স্বর্গ ছাড়তে প্রস্তুত, তার জন্য সকল সুখ বিসর্জন দিতে, এমনকি নরকে পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত! হে রাজাধিরাজ, তুমি অতি সৎকুলোদ্ভব। হে

ভারত, তোমার সর্বজীবে দয়ার এ এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই অনন্ত সুখলোক তোমারই! হে রাজন, তুমি তা জয় করেছ, তোমার লক্ষ্য স্বর্গীয় ও সুউচ্চ।"

তারপর ইন্দ্র, ধর্ম ও অপরাপর দেবগণ সহ যুধিষ্ঠির এক স্বর্গীয় রথে চড়ে স্বর্গের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। সামান্য কিছু পরীক্ষার পর তিনি স্বর্গীয় গঙ্গায় স্নান করলেন ও দিব্যদেহ ধারণ করলেন। তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, এতক্ষণে তাঁরাও অমরত্বলাভ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সর্বসুখ লাভ হল।

এইভাবে পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয়কে এক অপূর্ব কবিতায় বিধৃত করে মহাভারতের কাহিনী শেষ হল।

মহাভারতের কথা বলতে গিয়ে, ব্যাসের প্রতিভা ও প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্রিত পরাক্রান্ত বীরদের গৌরবোজ্জ্বল ও মহিমময় চরিত্রের অন্তহীন সমাবেশ আপনাদের কাছে উপস্থিত করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ধর্মভীরু কিন্তু দুর্বল, অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মনে ন্যায়পরায়ণতা ও পিতৃস্নেহের মধ্যে আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব; পিতামহ ভীষ্মের মহিমময় চরিত্র; রাজা যুধিষ্ঠিরের মহৎ ও ধর্মপ্রাণ স্বভাব, অপর চারভাই যেমন শৌর্যে, তেমনি ভক্তি ও আনুগত্যে মহৎ; কৃষ্ণের অতুলনীয় চরিত্র—মানবিক প্রজ্ঞায় অনতিক্রান্ত; আর নারী চরিত্রগুলিও কম সমুজ্জ্বল নয়—রাজকীয় মহিষী গান্ধারী, স্নেহময়ী মাতা কুন্তী, চির-বিশ্বস্তা ও সর্বংসহা দ্রৌপদী—এই সব চরিত্র এবং এই মহাকাব্যের ও রামায়ণের আরও শত শত চরিত্র বিগত কয়েক সহস্র বৎসর ধরে সমগ্র হিন্দু বিশ্বের সযত্ন লালিত ঐতিহ্য হয়ে আছে, তাঁদের চিন্তার এবং নৈতিক ও নীতি-শাস্ত্রগত ভাবধারার ভিত্তি রচনা করছে। বস্তুত রামায়ণ ও মহাভারত হল প্রাচীন আর্য জীবনধারা ও প্রজ্ঞার দুই বিশ্বকোষ, এরা সভ্যতার এমন এক আদর্শ তুলে ধরেছে আজও যা মানবজাতির কাছে কাম্য।

চিঠিপত্র

(মাদ্রাজী শিষ্যবৃন্দকে লেখা।)

কেয়ার অব জর্জ ডাবলিউ হেল
৫৪১ ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, শিকাগো
জানুয়ারি ২৪, ১৮৯৪

প্রিয় বন্ধুসব,

তোমাদের চিঠি পেয়েছি। আমার সম্বন্ধে তোমরা এতো খবর পেয়ে গেছ জেনে অবাক হলাম। 'ইন্‌টিরিয়র' পত্রিকার যে সমালোচনার কথা উল্লেখ করেছ সমস্ত আমেরিকাবাসীর মনোভাব তা কিন্তু নয়। এই পত্রিকাটির কোন খ্যাতিই প্রায় নেই। লোকে বলে যে এটি অত্যন্ত গোঁড়া ও আচারনিষ্ঠ প্রেসবিটারিয়ান সম্প্রদায় পরিচালিত কাগজ। এ সম্প্রদায়ের সবাই যে অভদ্র তা কিন্তু নয়। আমেরিকান জনসাধারণ ও অনেক যাজক আমার প্রতি খুব অতিথিপরায়ণ। সমস্ত সমাজ যাকে একজন সিংহ-বিক্রম পুরুষ মনে করে মাথায় তুলছে এই পত্রিকাটি তাকে আক্রমণ করে একটু নাম করতে চেয়েছিল। এ কৌশলটা সকলেই জানে, তাই কেউ কিছু মনে করে না। ভারতবর্ষের মিশনারিরা অবশ্য এইটিকেই মূলধন করে তাদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তারা যদি তা করে তো তাদের বলে দিও "দেখো হে ইহুদি, তোমাদেরও বিচারের দিন নেমে এসেছে।" তাদের প্রাচীন প্রাসাদের ভিত্তি পর্যন্ত নড়ছে, এবং তাদের হিস্টিরিয়াগ্রস্ত চিৎকার সত্ত্বেও তা ভেঙে পড়তে বাধ্য। ওদের জন্য আমার করুণা হয়—এ দেশে প্রাচ্য ধর্মের অন্তঃপ্রবাহ শুরু হওয়ায় তাদের ভারতবর্ষে বেশ জাঁকিয়ে করে খাওয়ার সংস্থান খর্ব না হয়ে যায়। ওদের প্রধান পাণ্ডাদের একজনও কিন্তু আমার বিরুদ্ধে নয়। যাই হোক জলে যখন নেমেছি, তখন আমাকে পুরোদস্তুর নাইতেই হবে।

আমাদের ধর্মের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি এখানে পাঠ করেছিলাম এখানকার খবরের কাগজ থেকে তা আমি কেটে নিয়ে তোমাদের পাঠালাম। আমার অধিকাংশ বক্তৃতাই প্রত্যুৎপন্ন। ভাবছি এদেশ থেকে যাবার আগে সব বক্তৃতাগুলো নিয়ে একটা বই করব। ভারতবর্ষ থেকে কোন সাহায্য প্রয়োজন হবে না, এখানেই যথেষ্ট পাচ্ছি। তোমাদের হাতে যা টাকা আছে তা দিয়ে আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাটি ছাপিয়ে প্রকাশ কর, আর তা দেশের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার কর। এতে আমরা সমগ্র জাতির গোচরে থাকব। আমাদের যে একটা কেন্দ্রীয় কলেজ স্থাপন করে সেখান থেকে ভারতবর্ষের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার পরিকল্পনা ছিল সেটা যেন আবার ভুলে যেও না। শক্তভাবে কাজ করে যাও।…

আমেরিকান মহিলাদের মহানুভবতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। ঈশ্বর ওদের আশীর্বাদ করুন। এদেশে মেয়েরাই প্রতিটি আন্দোলন বা জাগরণের প্রাণ, জাতীয় কৃষ্টির প্রতিনিধি ওরাই, আর ছেলেরা এতো ব্যস্ত যে শিক্ষাভ্যাসের কোন অবকাশই তাদের নেই।

কিডির চিঠি পেয়েছি। জাতিপ্রথা থাকা বা না থাকার প্রশ্নে আমার কিছু করার নেই। আমি চাই ভারতবর্ষের ভেতরে ও বাইরে মানুষ যে মহান ধ্যানধারণা গড়ে তুলেছে তা হীনতম ও দরিদ্রতম সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে, যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের কথা ভাবতে পারে। জাতিপ্রথা থাকা উচিত কিনা, মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়া উচিত কিনা, সে সব নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। জীবন, উন্নয়ন ও কল্যাণ-নির্ভর করে একমাত্র চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতার ওপর। আর তা যেখানে নেই সেখানে মানুষ, জাতি, কুল সব কিছুরই পতন অনিবার্য।

জাতিপ্রথা থাক বা না থাক, ধর্মবিশ্বাস থাক বা না থাক, যে ব্যক্তি বা শ্রেণী বা বর্ণ বা জাতি বা প্রতিষ্ঠান স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম-শক্তিকে বাধা দেয়—এমন কি এই শক্তি যদি কারুর ক্ষতিও না করে তাও—তা খুবই অনিষ্টকর ও তার পতন হবেই।

আমার জীবনে একমাত্র বাসনা, এমন একটা কল-কৌশল চালু করা যাতে প্রত্যে-কের ঘরে সমস্ত মহান চিন্তা-ভাবনা পৌঁছে দেওয়া যায়; আর তারপর সমস্ত নরনারী নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য স্থির করে নেবে। তারা জানুক যে আমাদের পূর্বপুরুষরা এবং অন্য সব জাতি মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী সম্পর্কে কী ভাবনা চিন্তা করেছেন। তারা বিশেষ করে দেখুক যে অন্যেরা কি করছে, তারপর তারা সিদ্ধান্ত নিক। আমাদের কাজ শুধু রাসায়নিক উপাদানগুলোকে একত্র করা, আর দানাবাঁধার ব্যাপারটা প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই হবে। শক্তভাবে কাজ করে যাও, স্থিরচিত্ত থাকো, আর ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো। কাজে লেগে পড়, বিলম্বেই হোক বা অবিলম্বে আমি আসছি। আদর্শ-বাণীটি সব সময় মনে রাখবে—"ধর্মে আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতি সাধন।"

মনে রেখো যে আমাদের সমগ্র জাতিই কুটীরবাসী। কিন্তু হায়! কেউই এদের জন্য কিছু করেনি। আমাদের আধুনিক সংস্কারকরা বিধবা বিবাহ নিয়ে খুব ব্যস্ত। প্রতিটি সংস্কারের কাজে আমার অবশ্যই সমর্থন আছে, কিন্তু একটা জাতির ভাগ্য বিধবাদের স্বামীর সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে জনগণের অবস্থার ওপর। এদের তোমরা জাগাতে পারো? এদের সহজাত আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে নষ্ট না করে তোমরা এদের হৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফিরিয়ে দিতে পারো? সাম্য, স্বাধীনতা, কর্ম ও উৎসাহে পাশ্চাত্যের চেয়েও পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন হয়ে তোমরা পারো কি ধর্মীয় কৃষ্টি ও প্রবৃত্তির দিক থেকে মজ্জায় মজ্জায় হিন্দু হয়ে থাকতে? তা-ই করতে হবে, এবং আমরা তা করবই। তা-ই করবার জন্য তোমরা জন্মেছ। আত্মবিশ্বাস রাখো, গভীর বিশ্বাসই মহৎ কর্মের মূল। শুধু এগিয়ে যাও! মৃত্যু পর্যন্ত দরিদ্র, পদদলিতের প্রতি সমবেদনা—এইটিই আমাদের মূলমন্ত্র।

এগিয়ে যাও, বীর বালকের দল!

তোমাদের স্নেহাশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ: এ চিঠি প্রকাশ করো না। অবশ্য একটি কেন্দ্রীয় কলেজ স্থাপন করে জনসাধারণের উন্নতির কথা প্রচার করায় এবং এই কলেজে শিক্ষিত প্রচারকদের দিয়ে দরিদ্রদের ঘরে ঘরে শিক্ষা ও ধর্ম পৌঁছে দেওয়ায় কোন ক্ষতি নেই। সকলকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করো।

আমি তোমাদের কাছে শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ ও উচ্চমানের সংবাদপত্রগুলো থেকে কিছু কিছু অংশ কেটে নিয়ে পাঠাচ্ছি। ডঃ টমাসের লেখাটি খুবই মূল্যবান, কারণ লেখক সর্বপ্রধান না হলেও আমেরিকার একজন অন্যতম প্রধান ধর্মযাজক। 'ইনটিরিয়র' পত্রিকাটি তার সমস্ত অন্ধ গোঁড়ামি ও খ্যাতিলিপ্সা সত্ত্বেও এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছে যে আমিই ছিলাম জনপ্রিয়। আমি এ কাগজটা থেকেও কয়েকটি ছত্র কেটে পাঠাচ্ছি।

বি

[২]

নিউ ইয়র্ক
এপ্রিল ৯, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তোমার শেষ চিঠি দিন কয়েক আগে পেয়েছি। বোঝই তো যে আমাকে এখানে এতো ব্যস্ত থাকতে হয় ও প্রতিদিন এতো বেশী চিঠি লিখতে হয় যে খুব ঘন ঘন তোমরা আমার চিঠি আশা করতে পার না। তবুও আমি এখানে কি হচ্ছে তা তোমাদের জানিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করি। ধর্মমহাসভা সম্পর্কিত বইপত্র তোমায় পাঠানোর জন্য আমি শিকাগোয় লিখব। কিন্তু ইতিমধ্যে তুমি আমার ছোট দুটো বক্তৃতা পেয়ে থাকবে।

সচিব সাহেব আমাকে অতি অবশ্য ভারতবর্ষে ফিরে যাবার জন্য লিখেছেন। কারণ, আমার কর্মক্ষেত্র সেখানেই। তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু, ভাইসব, আমাদের এমন একটা মশাল জ্বালাতে হবে যাতে সারা ভারতবর্ষ আলোকিত হয়। সুতরাং তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই, ঈশ্বরের কৃপায় সবই হবে। আমেরিকার অনেকগুলো বড় বড় শহরে আমি বক্তৃতা দিয়েছি, এবং এখানকার এই বীভৎস খরচ মিটিয়েও বাড়ী ফেরার মতো যথেষ্ট পয়সা আমার হাতে আছে। এখানে আমার অনেকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়ে গেছে; এদের মধ্যে কেউ কেউ যথেষ্ট প্রভাবশালী। গোঁড়া যাজকরা অবশ্য আমার বিরুদ্ধে। আমার সঙ্গে এঁটে ওঠা খুব সহজ নয় বুঝে ওঁরা আমাকে সর্বভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করেন; গালমন্দ ও নিন্দাবাদ করেন। আর, মজুমদার ওঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তিনি নিশ্চয়ই হিংসায় পাগল হয়ে গেছেন। তিনি ওঁদের বলেছেন যে আমি একটি জোচ্চর ও বদমাস। আবার কলকাতায় গিয়ে তিনি বলছেন যে আমি আমেরিকায় অত্যন্ত পাপাচারী,

দুশ্চরিত্র জীবন যাপন করছি। ঈশ্বর তাঁকে আশীর্বাদ করুন। ভাইসব, বিনা বাধায় কোন ভালো কাজই করা যায় না। কেবল যারা শেষ পর্যন্ত লেগে থাকে তারাই সফল হয়।...আমার মনে হয় যখন এক বর্ণ, এক বেদ, শান্তি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হবে তখনই সত্যযুগ (স্বর্ণযুগ) আসবে। সত্যযুগের ধারণা হল ভারতবর্ষে নবজীবন সঞ্চার করার পথ। এতে বিশ্বাস রাখো। যদি পারো তো একটা কাজ তোমাদের করতে হবে। রামনাদ বা তাঁর মতো বড় একজন কারুর সভাপতিত্বে মাদ্রাজে একটা বড় সভা করে এই মর্মে একটা প্রস্তাব করিয়ে নিতে পারবে কি যে আমি এখানে যেভাবে হিন্দুধর্মকে উপস্থিত করেছি তোমরা তাতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট? আর ঐ প্রস্তাব পাঠিয়ে দিতে পারবে কি 'শিকাগো হেরাল্ড' 'ইন্টার ওশন্', 'নিউ ইয়র্ক সান্' ও 'ডেট্রয়েট'-এর (মিশিগান) 'কমার্শিয়াল এডভার্টাইজার'-পত্রিকা-গুলোতে। শিকাগো ইলিনয় রাষ্ট্রে। 'নিউ ইয়র্ক সান্'-এর বিস্তারিত বিশেষ কিছু দরকার হবে না। ডেট্রয়েট হল মিশিগান রাষ্ট্রে। প্রস্তাবের নকল ধর্মমহাসভার সভাপতি ডঃ বারোজকে শিকাগোয় পাঠিও। আমি তাঁর ঠিকানাটা ভুলে গেছি, তবে রাস্তাটার নাম হল ইণ্ডিয়ানা এভিনিউ। শ্রীমতী জে. জে. ব্যাগলির নামে এক কপি পাঠিও। তাঁর ঠিকানা ওয়াশিংটন এভিনিউ, ডেট্রয়েট।

এই সভাটা যত বড় করা সম্ভব তার জন্য চেষ্টা করো। সব মাতব্বরকে ধরার চেষ্টা করবে—নিজের দেশ ও ধর্মের জন্য তাদেরকে এই সভায় যোগ দিতেই হবে। চেষ্টা করো এই সভা ও তার উদ্দেশ্যের সমর্থনে মহীশূরের মহারাজ ও দেওয়ানের কাছ থেকে এবং খেতড়ির মহারাজের কাছ থেকে চিঠি জোগাড় করতে। মোট-কথা, এই সভাটা যত বড় ও যত সরগরম করা যায় সাধ্যমত তার চেষ্টা করো।

প্রস্তাবটা যেন এই ধরনের হয় যে মাদ্রাজের হিন্দু সমাজ, যাঁরা আমাকে পাঠিয়েছেন, আমার এখানকার কাজে সন্তোষ প্রকাশ করছেন ইত্যাদি।

চেষ্টা করে দ্যাখো এটা সম্ভব কিনা। এটা এমন কিছু বড় কাজ নয়। যতদূর পারো সমস্ত জায়গা থেকে সম্মতিসূচক চিঠি জোগাড় কর, সেগুলো ছাপাও, আর যত তাড়াতাড়ি পারো সে গুলোর নকল আমেরিকার সংবাদপত্রগুলোতে পাঠাও। ভাই সব, তাতে অনেক কাজ হবে। বি-এস-র লোকজনেরা এখানে খুব আজেবাজে কথা বলছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। ওঠো বাছারা, কাজে লেগে পড়! তা যদি তোমরা করতে পারো তাহলে আমি নিশ্চিত যে ভবিষ্যতে আমরা অনেক কিছু করতে পারব। জয় সনাতন হিন্দু ধর্মের! সমস্ত মিথ্যাবাদী ও বদমাসদের পতন হোক! ওঠো, ওঠো বাছারা, জয় আমাদের সুনিশ্চিত!

যতদিন না আমি ফিরে আসছি ততদিন আমার চিঠিপত্রের যে অংশগুলো প্রকাশ করা যায় সে অংশগুলো শুধু আমাদের বন্ধুবান্ধবের কাছে প্রকাশ করা যেতে পারে। একবার কাজে নেমে পড়তে পারলে, আমাদের খুব কদর বেড়ে যাবে। আমি কিন্তু কাজ না করে কোন কথা বলতে চাই না। আমি জানি না, তবে আমার মনে হয় যে জি. সি. ঘোষ ও শ্রীমিত্র আমার স্বর্গত গুরুদেবের অনুরক্তদের উদ্বুদ্ধ করে

কলকাতায় এই ধরনের একটা সমাবেশ করাতে পারেন। তাঁরা যদি পারেন তো ভালই হয়। তাঁরা কলকাতায় অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন কিনা কথা বলে দেখো। কলকাতায় হাজার হাজার লোক আছেন যাঁরা আমাদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। যাই হোক, তাঁদের চেয়ে তোমাদের ওপরই আমি বেশী আস্থা রাখি।

আর কিছু লেখার নেই।

আমাদের সব বন্ধুবান্ধবদের আমার প্রীতি-সম্ভাষণ জানিও। তাদের জন্য আমি সর্বদাই প্রার্থনা করি।

তোমাদের আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

[৩]

ইউ. এস. এ.
মে ২০, ১৮৯৪

প্রিয় শরৎ (সারদানন্দ),

তোমার চিঠি পেলাম ও শশী (রামকৃষ্ণানন্দ) ভালো আছে জেনে খুশী হলাম। তোমাকে একটা অদ্ভুত কথা বলছি। যখনই তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে তখনই যেন সে নিজে অথবা তোমাদের মধ্যে যে কেউ মনের মধ্যে তার চেহারা ভাববে, আর মনে মনে বলবে ও গভীরভাবে চিন্তা করবে যে সে সুস্থ হয়ে গেছে। তাহলে সে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। তাকে না জানিয়েও তোমরা এই কাজ করতে পারো, এমন কি হাজার হাজার মাইল ব্যবধানে থেকেও। এ কথাটা মনে রেখো তাহলে আর অসুস্থ হবে না। ইতিমধ্যে টাকা পেয়ে থাকবে। তোমরা সবাই চাইলে আমি মঠের জন্যে যে টাকা পাঠিয়েছি তার থেকে গোপালকে তিনশ টাকা দিতে পারো। এখন আর আমার পাঠাবার মতো টাকা নেই। মাদ্রাজের দিকে এখন আমাকে নজর দিতে হবে।

সান্যাল তার মেয়েদের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে এতো বিপন্ন হয়ে পড়েছে কেন আমি বুঝি না। মোটের ওপর যে নোংরা সংসার (জগৎ) থেকে সে নিজে পালাতে চায় সেখানে সে তার মেয়েদের ঠেলে দিতে চায়! এ বিষয়ে আমার অভিমত মাত্র একটিই —নিন্দা! যে কোন ছেলে বা মেয়েরই হোক, বিয়ের নামেই আমার ঘেন্না করে। নিবোধ কোথাকার! তুমি কি বলতে চাও যে কাউকে দাসত্ব-বন্ধনে ফেলার জন্যে আমি সাহায্য করব। আমার ভাই মহিন যদি বিয়ে করে তো তাকে দূর করে দেব। সে বিষয়ে আমি খুব নিশ্চিত…।

প্রীত্যন্তে
তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৪]

শিকাগো
২৮ মে, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এর আগে তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারিনি, কারণ হরদম নিউ ইয়র্ক আর বস্টনের মধ্যে ঘুরছিলাম। আর নরসিংহর চিঠির জন্যও অপেক্ষা করছিলাম। জানি না কবে ভারতবর্ষে ফিরব। যিনি আমাকে পেছন থেকে চালাচ্ছেন সব কিছু তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। আমাকে ছাড়াই কাজ করার চেষ্টা কর। মনে করো আমি কোনদিনই ছিলাম না। কোন লোকের জন্যে বা কোন জিনিসের জন্যে অপেক্ষা করো না। যা পারো করে যাও। কারুর ওপর কোন আশা রেখো না। নিজের সম্বন্ধে কিছু লেখার আগে নরসিংহ সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলব। সে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে…। শেষের দিকে অবশ্য সে আমার কাছে সাহায্যের জন্যে লিখেছিল। আমার ক্ষমতা মতো আমি তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করব। তুমি ইতিমধ্যে তার লোকজনদের বলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে যেন টাকা পাঠায়, যাতে সে ফিরে যেতে পারে…। সে খুব দুরবস্থায় আছে। তাকে যাতে উপোস না করতে হয় সেটা আমি অবশ্যই দেখব।

বক্তৃতা আমি এখানে অনেক দিয়েছি…। খরচ এখানে সাংঘাতিক। যদিও আমি প্রায় সব সময়ই বড় বড় ভদ্র পরিবারের আতিথ্যেই থাকছি, তাও যেন টাকা উড়ে যাচ্ছে।

এই গ্রীষ্মেই চলে যাব কিনা জানি না। সম্ভবত পারব না। ইতিমধ্যে সংগঠিত হয়ে চেষ্টা করো যাতে আমাদের পরিকল্পনাটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আমি বিশ্বাস করি যে তোমরা সব কিছু করতে পারো। জেনে রাখো যে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন। সুতরাং এগিয়ে যাও, নির্ভীক।

স্বদেশে আমার যথেষ্ট সমাদর হয়েছে। সমাদর হোক আর নাই হোক, ঘুমিয়ে থেকো না, অলস হয়ে পড়ো না। মনে রেখো যে আমাদের পরিকল্পনার এক কণাও কার্যকর করা হয়নি।

শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে কাজ কর। তাদের একজোট কর, সংঘবদ্ধ কর। শুধুমাত্র মহৎ ত্যাগের দ্বারাই মহৎ কাজ করা যায়। কোন আত্মপরতা নয়, নাম নয়, যশ নয়, তা আমারই হোক বা তোমাদেরই হোক, এমন কি আমার গুরুর ক্ষেত্রেও নয়। হে আমার নির্ভীক, মহান, সুশীল বালকের দল, তোমরা তাড়াতাড়ি আমাদের অভিপ্রায় ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে লেগে যাও, জোয়ালে কাঁধ লাগাও। মনে রেখো, "ঘাসকে একত্রিত করে দড়ি বানালে তা দিয়ে পাগলা হাতিকেও বাঁধা যায়।" তোমাদের সকলের ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে। তাঁর শক্তি তোমাদের সকলের মধ্যে আসুক—আমার বিশ্বাস সে শক্তি তোমাদের মধ্যে আছেই। বেদ বলছেন, "জাগো, যতক্ষণ না লক্ষ্যে পৌঁছচ্ছ থেমো না।" জাগো, জাগো, দীর্ঘ রাত্রি কেটে

যাচ্ছে, দিনের আলো এগিয়ে আসছে। ঢেউ জেগেছে, কোন কিছুই তার গতি-রোধকে রোধ করতে পারবে না। বৎস, মনোবল, প্রেম, বিশ্বাস ও আস্থা চাই, ভয় নয়। সবচেয়ে বড় পাপ হোল ভয়।

সবাইকে আমার আশীর্বাদ জানাই। মাদ্রাজের যেসব মহানুভব ব্যক্তি আমাদের উদ্দেশ্যকে সমর্থন জানিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাবে আমার অপরিসীম ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। কিন্তু যেন কাজে কোনরকম শিথিল মনোভাব না দেখান, সেটাই আমার আবেদন। আমাদের ভাবধারা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দাও। গর্ববোধ করো না। কোন রকম গোঁড়ামির ব্যাপারে জোর করো না, কোন কিছুর বিরোধিতা করো না। আমাদের কাজ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থকে একত্রিত করে দেওয়া। কখন, কী ভাবে সব দানা বাঁধতে শুরু করবে তা ঈশ্বর জানেন। সবচেয়ে বড় কথা, আমার বা তোমাদের সাফল্যে গর্বিত হয়ো না। বড় বড় কাজ সম্পন্ন করতে এখনও বাকি। যা সম্পন্ন হতে বাকি তার তুলনায় এই সামান্য সাফল্য কতটুকু? বিশ্বাস, বিশ্বাস রাখো, রায় এসে গেছে, ঈশ্বরের আদেশ জারি হয়ে গেছে—ভারতবর্ষ জাগবেই, জনসাধারণকে ও গরীব মানুষদের সুখী করতে হবে। তোমরা যে ঈশ্বরের নির্বাচিত যন্ত্র সে কথা ভেবে আনন্দ কর। আধ্যাত্মিকতার জোয়ার জেগেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই অপ্রতিরোধ্য, অনন্ত, সর্বগ্রাসী জোয়ার দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সকলে সামনে এগিয়ে যাক, সকলের শুভেচ্ছা এই শক্তির সঙ্গে যুক্ত হোক, সমস্ত হাত এর পথ সুগম করে দিক; জয় ঈশ্বরের জয়!…

আমার কোন সাহায্য দরকার নেই। কিছু তহবিল সংগ্রহের চেষ্টা কর। গোটা কয়েক ম্যাজিক লণ্ঠন, ম্যাপ, গ্লোব ও কিছু রাসায়নিক পদার্থ কিনে নাও। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় গরীব ও অনুন্নত, এমন কি পারিয়াদের সমবেত করো। তাদের কাছে বক্তৃতা দাও। প্রথমে ধর্মের কথা বলো। তারপর ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য জিনিস-পত্রের সাহায্যে সাধারণ মানুষের ভাষায় তাদেরকে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষা দাও। একদল তেজস্বী যুবককে ট্রেনিং দিয়ে তৈরী করো। নিজেদের উদ্দীপনা তাদের ভেতর সঞ্চারিত করো, আর ক্রমে ক্রমে সংগঠন বাড়িয়ে যাও। সংগঠনের পরিধি যেন ক্রমেই বাড়তে থাকে। যথাসাধ্য করে যাও, যখন নদীতে জল থাকবে না তখন পার হবে বলে বসে থেকো না। সাময়িক পত্র-পত্রিকা বের করা নিঃসন্দেহে ভালো; কিন্তু বৎস, যত সামান্যই হোক প্রকৃত কাজ সব সময়েই শুধু লেখা বা কথার চেয়ে অনেক ভালো। ভট্টাচার্যের বাড়ীতে একটা সভা ডাকো। কিছু টাকা জোগাড় করে আমি যে জিনিসগুলোর কথা বলেছি সেগুলো কিনে ফেল, একটা কুঁড়েঘর ভাড়া নাও এবং কাজে লেগে পড়ো। এইটেই মুখ্য, পত্র-পত্রিকা গৌণ। ছোটভাবে কাজ আরম্ভ করতে ভীত হয়ো না, বড় সবকিছু পরেই হয়। সাহস সঞ্চয় করো। সহকর্মীদের নেতৃত্ব দেবার চেষ্টা করো না, তাদের উন্নতি বিধানের চেষ্টা কর। নেতৃত্ব দেবার স্থূল উন্মাদনার ফলে জীবন সমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবে গেছে। এ বিষয়ে বিশেষভাবে নজর রেখো; অর্থাৎ মৃত্যু এলেও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাবার জন্যে তৈরী থেকো। আমার যা কিছু বলার ছিল

সব লিখতে পারলাম না ; কিন্তু, হে বীর বালকের দল, ঈশ্বর তোমাদের সমস্ত বোধ-শক্তি যুগিয়ে দেবেন। বৎস, তোমরা লেগে থাকো ! ঈশ্বরের জয় !

তোমাদের স্নেহের
বিবেকানন্দ

[৫]

ইউ. এস. এ.
জুলাই ১১, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তুমি আমাকে ৫৪১ ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, শিকাগো—এই ঠিকানা ছাড়া অন্য কোথাও চিঠি দিও না। তোমার শেষ চিঠি সারা দেশ ঘুরে আমার হাতে এসেছে, এবং তাও আমি বেশ পরিচিত বলেই সম্ভব হয়েছে। ডঃ ব্যারোজকে আমার প্রতি তাঁর সদয় ব্যবহারের জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে একখানা চিঠি দিও, আর তোমাদের সভার কিছু প্রস্তাব তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিও। এই প্রস্তাবগুলো যাতে আমেরিকার কিছু সংবাদপত্রে তিনি প্রকাশ করেন সে জন্য অনুরোধ জানিও। কারণ, তাতেই আমি কারুর প্রতিনিধি নই বলে মিশনারিরা যে মিথ্যা অভিযোগ চালাচ্ছে তার উপযুক্ত প্রতিবাদ করা হবে। বৎস, শেখো, কীভাবে কাজ করতে হয়। বড় কাজ এখনও তোমাদের করতে বাকি আছে ! গত বছর আমি শুধু বীজ বুনেছি, এ বছর আমি ফসল তুলতে চাই। ইতিমধ্যে, ভারতবর্ষে যতখানি সম্ভব উৎসাহ জীইয়ে রাখো। কিডিকে নিজের মতো চলতে দাও। সে ঠিক যথাসময়ে এসে যাবে। তার দায়িত্ব আমি নিয়েছি। নিজস্ব মত পোষণের অধিকার তার আছে। পত্রিকায় তাকে দিয়ে লেখাও ; তাহলেই তার মেজাজ ভালো থাকবে। তাকে আমার আশীর্বাদ জানাই।

পত্রিকাটা শুরু করো। আমি মাঝে মাঝে তোমার কাছে লেখা পাঠাবো। বস্টনের হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জে. এইচ. রাইটকে প্রস্তাবের নকল পাঠাবে। তাঁকে একখানা চিঠি দিয়ে ধন্যবাদ জানাবে,—তিনিই প্রথম আমার বন্ধু হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন—সংবাদপত্রে এই প্রস্তাব ছাপানোর জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানাবে, তাতে মিশনারিরা মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

ডেট্রয়েটে বক্তৃতা দিয়ে আমি ন'শ ডলার অর্থাৎ সাতাশ শ' টাকা পেয়েছিলাম ! অন্যান্য প্রত্যেকটি বক্তৃতায় আমি ঘণ্টায় আড়াই হাজার ডলার অর্থাৎ সাড়ে সাত হাজার টাকা পেয়েছি, কিন্তু আমার হাতে এসেছে মাত্র দুশো ডলার ! একটা জোচ্চোর লেকচার ব্যুরো আমাকে ঠকিয়েছে। আমি তাদের ত্যাগ করেছি। এখানে আমি অনেক টাকা খরচ করেছি ; অবশিষ্ট আছে মাত্র তিন হাজার ডলার।

আগামী বছর আমাকে অনেক কিছু ছেপে প্রকাশ করতে হবে। নিয়মিত কাজ করছি।...কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তিতেই সব কিছু হবে।...তোমাদের একটা সমিতি গঠন করতে হবে ; এই সমিতি নিয়মিত বৈঠক করবে। যত ঘন ঘন সম্ভব তুমি

এই সমিতি সম্পর্কে আমার কাছে লিখবে। বস্তুত যতখানি সম্ভব তুমি উদ্দীপনা জাগাও। শুধু মাত্র মিথ্যাচরণ বা প্রতারণা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। কাজে লেগে যাও, বৎসগণ, তেজ আপনি উদ্ভূত হবে। সংগঠিত হয়ে কাজ করার মানসিক শক্তি আমাদের চরিত্রে একদম নেই, কিন্তু এই শক্তি সঞ্চারিত করতে হবে। বড় রহস্যটা হচ্ছে ঈর্ষার অভাব। সর্বদাই সহকর্মীদের অভিমত মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত থেকো, সর্বদাই সৌহার্দ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করো। সমস্ত রহস্য এইটাই। সাহসের সঙ্গে লড়ে যাও। জীবন সংক্ষিপ্ত! একটা মহৎ কারণের জন্যে সেটা দিয়ে দাও। নরসিংহ সম্বন্ধে তুমি কিছু লেখ না কেন? সে প্রায় না খেয়ে আছে। আমি তাকে কিছু দিয়েছিলাম। তারপর সে অন্য কোথায় চলে গেছে, কোথায় আমি জানি না, আমার কাছে লেখেও না। অক্ষয় ছেলেটি খুব ভাল, আমার তাকে বেশ পছন্দ। থিয়োসফিস্টদের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই। তোমাকে আমি যা লিখি তাদের কাছে গিয়ে বলো না।...তুমি কি জানো যে থিয়োসফিস্টরাই আমাদের পথিকৃৎ? জজ এখন একজন হিন্দু, আর কর্নেল একজন বৌদ্ধ। আর, জজ এখানে সবচেয়ে যোগ্য লোক। হিন্দু থিয়োসফিস্টদের বলো তারা যেন জজকে সমর্থন করে। এমন কি, তুমি যদি জজকে সহধর্মী হিসাবে ও আমেরিকানদের সামনে হিন্দুধর্মকে তুলে ধরার জন্য সে যে পরিশ্রম করেছে সেজন্য ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দাও, তাহলে সে মনে যথেষ্ট বল পাবে। আমরা কোন সম্প্রদায়েই যোগ দেবো না, কিন্তু আমাদেরকে প্রত্যেকের প্রতি দরদী হয়ে একসঙ্গে কাজ করতে হবে...। কাজ, কাজ করে যাও—ভালবাসা দিয়ে সবাইকে জয় করো!...

নিজেদেরকে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা কর। মনে রেখো, গতি ও উন্নতিই হচ্ছে জীবনের একমাত্র লক্ষণ। গৃহীত প্রস্তাবগুলো অতি অবশ্যই ডঃ জে. এইচ. ব্যারোজ ...ডঃ পল ক্যারাস...সেনেটর পামার,...মিসেস ব্যাগ্‌লি...প্রভৃতির কাছে পাঠাবে; আর এ সবই যেন বিধিমতো পাঠানো হয়।...আমি এসব লিখছি কারণ আমার মনে হয় বিদেশীদের কর্মপ্রণালী তোমরা জানো না।...দৃঢ়ভাবে লেগে থাকো। এ পর্যন্ত আমরা অদ্ভুত ভালো কাজ করেছি! এগিয়ে যাও, হে বীরের দল, জয় আমাদের হবেই! সংগঠিত হও, সমিতি স্থাপন কর, কাজ করো, সেইটিই একমাত্র পথ।

বছরের এই সময়টায় এখানে খুব একটা বক্তৃতা দেবার সুযোগ নেই, সুতরাং আমি এখন লেখায় মন দেবো, সব সময়ই আমি শক্তভাবে কাজে লেগে থাকবো, আর তারপর শীত এলে লোকেরা যখন বাড়ি ফিরবে তখন আবার বক্তৃতা শুরু করব আর সেই সঙ্গে সমিতি গঠন করব।

সবাইকে আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাই। যদিও আমি ঘনঘন চিঠি দিই না, কাউকেই আমি কখনও ভুলি না। তাছাড়া, আমি এখন সর্বদাই ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর চিঠিপত্র সবই এক জায়গা থেকে আর একজায়গায় ঠিকানা বদলে বদলে পাঠাতে হচ্ছে।

খুব কাজ করো। পবিত্র হও, শুদ্ধ হও, উদ্দীপনা আপনিই আসবে।

তোমাদের স্নেহের
বিবেকানন্দ

[৬]

(ইসাবেল ম্যাকিণ্ডলিকে লেখা)

আনিসকুয়ান
২০ অগস্ট, ১৮৯৪

প্রিয় বোন,

তোমার সহৃদয় পত্রখানা যথাসময়ে আনিসকুয়ানে আমার কাছে পৌঁছেছে। পুনর্বার আমি ব্যাগলিদের বাড়িতে রয়েছি। তারা যথারীতি সহৃদয়। অধ্যাপক রাইট এখানে ছিলেন না। তিনি এখানে এসেছিলেন গতকাল, সময়টা তার সঙ্গে বেশ কাটল। ইভানস্টনে যে মিঃ ব্র্যাডলির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল তিনি এসেছিলেন। তার বোনের কাছে আমাকে কয়েকদিন ধরে সিটিং দিতে হল, আমার ছবি আঁকলেন তিনি। বেশ মজা করে নৌকো চালিয়েছি, এক সন্ধ্যায় নৌকো গেল উল্টে, কাপড় জামা সমেত ভিজে নেয়ে উঠতে হয়েছিল।

গ্রীণএকারে চমৎকার কাটিয়েছি। ওখানকার ওঁরা এত ভালো এত অকপট! বোধ করি এতদিনে ফ্যানি হার্টলি এবং মিসেস মিলস বাড়ি ফিরে গেছে।

আমি মনে করছি এখান থেকে যাব নিউ ইয়র্কে। অথবা বোস্টনেও যেতে পারি মিসেস বুলের কাছে। তুমি সম্ভবত এদেশের বিখ্যাত বেহালা-শিল্পী মিঃ ওলি বুলের নাম শুনেছ। তাঁরই বিধবা পত্নীর কথা বলছি। মহিলা অত্যন্ত আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন। তিনি বাস করেন কেমব্রিজে; সেখানে তাঁর মনোরম বৈঠকখানায় যে কাঠের কাজ আছে তার সবটাই ভারত থেকে আনা। তিনি চান আমি যখন ইচ্ছা সেখানে গিয়ে তার পারলার কে লেকচারের জন্য ব্যবহার করি। বোস্টন অবশ্য সব রকম কাজেরই বৃহৎ ক্ষেত্র; কিন্তু বোস্টনের লোকেরা কোনো ব্যাপার ধরে যেমন তাড়াতাড়ি ছেড়েও দেয় তেমনি দ্রুত; নিউ ইয়র্কের লোকেরা কিন্তু মন্থর, তবে কোনো কিছু ধরলে তারা তাতে দাঁত কামড়ে লেগে থাকে।

এই সারা সময়টা আমার স্বাস্থ্য বেশ ভালোই ছিল, আশা করি ভবিষ্যতেও ভালো থাকবে। খুব টহল দিয়ে বেড়ানো সত্ত্বেও রিজার্ভ থেকে সংগ্রহ করতে হয়নি। আমি অবশ্য টাকা করার সব নকসা বাতিল করেছি; এক মুঠো খাবার, একটি মাথা গুজবার জায়গা, আর কাজ করে যাওয়া—এতেই আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট।

আশা করি গ্রীষ্মাবকাশ ভালো ভাবে উপভোগ করছ। মিস হাওয়ে ও মিঃ ফ্রাঙ্ক হাওয়েকে আমার সম্মান ও প্রীতি জানিয়ো।

কয়েকদিন গাছের তলায় বাস করে ঘুমিয়ে এবং তত্ত্ব প্রচার করে কী রকম স্বর্গীয় পরিবেশে ফিরে গিয়েছিলাম তা বোধ হয় আগেকার চিঠিতে তোমাকে জানাইনি।

পরের শীতকালটা খুব সম্ভব নিউ ইয়র্ককেই আমার কাজের কেন্দ্র করব; ব্যাপারটা ঠিক হয়ে গেলেই তোমাকে চিঠি দেব। এদেশে আর থাকবার ব্যাপারে আমি এখনো মনস্থির করিনি। ওরকম বিষয় আমি কখনো স্থির করতে পারি না।

সময়ের অপেক্ষা করতে হয়। প্রভু তোমাদের সকলের চির কল্যাণ করুন। এই আমার সতত প্রার্থনা।

তোমার চির স্নেহবদ্ধ ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

[৭]

ইউ. এস. এ.
৩১ অগস্ট, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এই মাত্র দেখলাম আমার সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে "বোস্টন ট্রান্সক্রিপ্ট"-এ—মাদ্রাজ থেকে দেওয়া সার্কুলার বিষয়ে। আমার কাছে এখনো কিছু পৌঁছোয়নি। যদি পাঠিয়ে থাক শীঘ্রই তা পৌঁছুবে। এ পর্যন্ত খুব ভালো কাজ করেছ বাছা। কোনো কোনো দুর্বল মুহূর্তে আমি যা সব লিখে বসি তাতে মনে কিছু কোরো না। স্বগৃহ থেকে ১৫০০০ মাইল দূরবর্তী দেশে একাকী গোঁড়া ও অনিষ্টকর খ্রীষ্টানদের সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপে সংগ্রাম করতে করতে মানুষ কখনো কখনো নার্ভাস হয়ে পড়তে পারে বৈকি। এইসব বিষয় বিবেচনা করে অবিচলভাবে কাজ করে যাও বৎস।

ভট্টাচার্যর কাছে বোধহয় শুনেছ, জি. জি.-র কাছ থেকে আমি একখানা সুন্দর পত্র পেয়েছি। ঠিকানাটা তার এমন টানা অক্ষরে লেখা ছিল যে আদৌ বুঝতে পারিনি। কাজে কাজেই সরাসরি তাকে জবাব পাঠাতে পারিনি। কিন্তু সে যা যা চেয়েছিল সবই করে দিয়েছি। আমার ফটো পাঠিয়েছি এবং মহীশূরের রাজাকে পত্র লিখে দিয়েছি। এখন খেতড়ির রাজাকে একটি ফোনোগ্রাফ পাঠালাম।...

আমার সম্বন্ধে কিছু থাকলে সেইসব ভারতীয় সংবাদপত্র এখানে পাঠিয়ে দিয়ো। কাগজগুলো থেকেই ওসব আমি পড়তে চাই—জানলে? মিঃ চারু চন্দ্র সম্বন্ধে সব কথা লিখে আমাকে জানাবে। তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহার করেছেন; তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ো। কিন্তু (তোমাকে গোপনে বলছি) তাঁকে আমি একদম স্মরণ করতে পারছি না। বিস্তারিত বিবরণ জানাতে পার কি?

এখানে থিয়সফিস্টরা আমাকে এখন খুব পছন্দ করছে, কিন্তু তারা সংখ্যায় মোট ৬৫০ জন! ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্টিস্টরাও আছে। সবাই আমাকে পছন্দ করছে। এদের সংখ্যা প্রায় দশ লাখ। উভয় দলের সঙ্গেই আমি কাজ করি, কিন্তু দলেই যোগ দিই না; প্রভুর অনুগ্রহে একদিন ওদের সবাইকে সত্যের ছাঁচে গড়ে তুলব; বর্তমানে এরা অর্ধ-উপলব্ধ সত্য আউড়ে চলেছে। এই পত্র তোমার কাছে যখন পৌঁছুবে সে সময়ের মধ্যেই নরসিংহ টাকাকড়ি ইত্যাদি পেয়ে যাবে।

Cat-এর কাছ থেকে একখানা পত্র পেলাম, কিন্তু তার সব প্রশ্নের জবাব দিতে হলে তো একখানা বইয়ের দরকার লাগবে। অতএব তোমার মারফৎ তাকে আমার আশীর্বাদ জানাচ্ছি; তুমি তাকে একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়ো যে আমরা আমাদের মতপার্থক্য মেনে নিচ্ছি—যে, বিপরীত মতামতের সামঞ্জস্য-ক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছি। কাজে কাজেই সে কিসে বিশ্বাস করে তাতে কিছু যায় আসে না; তাকে কাজ করতে হবে। আমার ভালোবাসা জানাবে বালাজিকে, জি. জি.-কে, কিডিকে, ডাক্তারকে, সব বন্ধুবান্ধবদের এবং সকল মহৎ দেশপ্রেমিকদের যারা আপন দেশের স্বার্থে নিজেদের মতপার্থক্য ভুলে যাবার মত সাহস ও মহত্ত্ব দেখাতে পেরেছেন।

একখানা ম্যাগাজিন বা জার্নাল অথবা মুখপত্র প্রকাশ করে তুমি তার সেক্রেটারি হও। ম্যাগাজিন বার করা এবং কাজ সুরু করার খরচ কত লাগে তার একটা হিসাব কর,—যত কম খরচে সম্ভব সেই মত হিসাব—অতঃপর সোসাইটির নাম ও ঠিকানা জানিয়ে আমাকে পত্র দাও, আমি নিজে তো তার জন্য টাকা পাঠাব বটেই, আমেরিকাতে অন্য লোকজনও যোগাড় করে দেব যারা দরাজ হাতে বার্ষিক চাঁদা দেবে। কলকাতার লোকদেরও ওরকম করতে বল। আমাকে ধর্মপালের ঠিকানাটি দিও। লোকটি বেশ সজ্জন এবং মহৎ। সে আমাদের সঙ্গে খুব চমৎকারভাবে কাজ করবে। এবার একটি সমিতি গঠন করে ফেল। সমগ্র আন্দোলনের ভার তোমাকেই নিতে হবে, নেতারূপে নয়, সেবকরূপে। জানো কি, নেতৃত্বের সামান্যতম প্রকাশের ফলে ঈর্ষা জাগ্রত হয় এবং তাতে সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়?

সব কিছু মেনে নিয়ো। শুধু দেখো আমার বন্ধুবান্ধব সব যেন একত্র থাকে। বুঝতে পারছ? আর ধীরে ধীরে কাজ করে করে উন্নত হও। জি. জি. এবং অন্যান্যদের তো এখনই টাকা রোজগারের দায় নেই; তারা যেমন করছে তেমনই করতে থাকুক—আইডিয়া প্রচার করুক। জি. জি. মহীশূরে বেশ ভালোই করছে। ঐ ভাবেই চলতে হবে। সময়ে মহীশূর একটি শক্ত ঘাঁটি হবে।

আমি স্মৃতিকথার বই লিখব এবার। পরবর্তী শীতকালে সারা দেশ ঘুরে এখানে সোসাইটি সংগঠন করব। এ একটি সুন্দর কাজের ক্ষেত্র, এখানে যে কাজ করা হবে তার ফলে ইংল্যাণ্ডেও জমি প্রস্তুত হবে। এ পর্যন্ত তুমি চমৎকার কাজ করেছ বৎস—তোমাকে সর্বপ্রকারে শক্তি যোগানো হবে।

আমার কাছে এখন ৯০০০ টাকা আছে, সংগঠনের কাজে তোমাকে তার কিছু অংশ পাঠাব। আরো বহু লোক পাব যারা মাদ্রাজে তোমাকে মাসে মাসে, ছয় মাস অন্তর এবং বাৎসরিক হিসাবে টাকা পাঠাবে। তুমি এখন একটি সোসাইটি গড়, কাগজ বার কর এবং সব চালাবার একটি অ্যাপারেটাস তৈরী কর। ব্যাপারটা যেন অল্প কয়েকজনের মধ্যেই গোপন থাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মহীশূর ও অন্যত্র থেকে টাকা তোলার চেষ্টা কর—মাদ্রাজে একটি মন্দির নির্মাণের জন্য, যেখানে থাকবে একটি লাইব্রেরি, অফিস ঘর, সন্ন্যাসী প্রচারকদের বাস করবার জায়গা এবং বৈরাগী এলে তাদের আশ্রয়স্থান। এইভাবেই আমাদের এগুতে হবে একটু একটু করে। এই

স্থানটি আমার কাজের খুব বৃহৎ ক্ষেত্র। এখানে যে কাজ হবে তার দ্বারা ইংল্যাণ্ডে কাজের ক্ষেত্রও প্রস্তুত হবে।…

তুমি জান আমার পক্ষে সব থেকে বড় অসুবিধা হল টাকা রাখা, এমন কি টাকা স্পর্শ করা। কাজটা অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং হীন। অতএব এমন একটি সংস্থা গড়তে হবে যার কাজ হবে এই সব টাকাকড়ি এবং অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয়ের ভার নেওয়া। এখানে আমার কিছু বন্ধু-বান্ধব আছেন যারা আমার টাকাকড়ির বিষয় দেখাশুনা করেন। বুঝতে পারছ? টাকাকড়ি-সংক্রান্ত বিশ্রী ব্যাপারটা থেকে অব্যাহতি পেলে আমার পক্ষে সে একটি স্বস্তির কারণ হবে। অতএব যত তাড়াতাড়ি তোমাদের সংগঠন গড়তে পারবে, যত তাড়াতাড়ি তুমি নিজে সম্পাদক ও খাজাঞ্চি হয়ে আমার এখানকার বন্ধু-বান্ধব ও সমর্থকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে নিতে পারবে ততই তোমার এবং আমার পক্ষে ভালো হবে। কাজটা তাড়াতাড়ি করে আমাকে চিঠি দাও। সোসাইটির নামে যেন গোষ্ঠীগন্ধ না থাকে। …মঠে আমার গুরুভাইদেরও বোলো একইভাবে সংগঠন তৈরী করতে।…তোমার ভাগ্যে মস্ত বড় কিছু অপেক্ষা করছে আলাসিঙ্গা। যদি উচিত মনে কর তবে সোসাইটির কর্মকর্তা হিসাবে কিছু হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তির নাম করতে পার, তবে আসল কাজটা করবে তুমিই। তাদের নাম খুব কাজের হবে। তোমার কাজের চাপ যদি খুবই কঠিন হয়, যদি তার ফলে তোমার কোনো ফুরসুৎ না থাকে, তবে বিজনেস অংশটা জি. জি.-কে দেখতে বল; আশা করছি ক্রমে ক্রমে তোমাকে কলেজের কাজ থেকে মুক্ত করে দিতে পারব, যাতে পরিবারের লোকজনসহ উপবাসে না থেকেও এই কাজে তোমার সবটা নিয়োজিত করতে পার। সুতরাং কাজ কর বৎসগণ, কাজ করে যাও! কাজের অসমান কঠিন অংশটি মসৃণ এবং ডৌল হয়েছে; এখন তা প্রতি বছরই আরো ভালোভাবে চলবে। আমার ভারতে আসা পর্যন্ত যদি কাজ চালু রাখতে পার তাহলে দেখবে তা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এতখানি কাজ করতে পেরেছ, সেই সুখাদে আনন্দ করতে পার। যখন বিষণ্ন বোধ করবে তখনই ভেবো গত একবছরে কতখানি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কী ভাবে একেবারে শূন্য থেকে সুরু করে এরই মধ্যে আমরা সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিয়েছি। শুধুমাত্র ভারত নয়, বাইরের সমগ্র জগৎ আমাদের কাছ থেকে বহু বৃহৎ কিছু আশা করছে। মিশনারিরা, কিংবা খ—অথবা মূর্খ আমলারা—কেউ সত্য, প্রেম ও নিষ্ঠাকে প্রতিহত করতে পারবে না। তুমি নিষ্ঠাবান আছ তো? মৃত্যু পর্যন্ত স্বার্থলেশশূন্য তো? চির প্রেমবদ্ধ তো? তাহলে ভয় কোরো না, মৃত্যুকেও না। এগিয়ে চল বৎসগণ! সারা পৃথিবীর আলোক প্রয়োজন। আশায় তাকিয়ে আছে জগৎ! সেই আলো একমাত্র ভারতেরই আছে—সে কোনো ম্যাজিকে নয়, মিথ্যা আচার-অনুষ্ঠানে নয়, হাতুড়েপনাতে নয় বা ভণ্ডামিতে নয়—সে আলো রয়েছে প্রকৃত ধর্মের মর্মবাণীর—সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যের-গৌরব গরিমা শিক্ষণের মধ্যে। সেই কারণেই প্রভু হাজারো উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও এই জাতিকে আজও পর্যন্ত রক্ষা করে রেখেছেন। এখন সময় এসেছে। বিশ্বাস রেখো, বৎসগণ, মহৎ কার্য সম্পাদনের জন্যই তোমরা

জন্মলাভ করেছ! কুত্তার ঘেউ ঘেউ যেন তোমাদের ভীত না করে—যেন আকাশের বজ্রপাতেও তোমরা ভয় না পাও—উঠে দাঁড়াও, কাজ কর!

তোমাদের চির স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[৮]

২২৮ ওয়েস্ট, ৩৯ নং স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬

স্নেহাশীর্বাদভাজনেষু,

ভারত থেকে যে সন্ন্যাসী আসছেন, তিনি তোমাকে অনুবাদের কাজে এবং অন্য কাজেও নিশ্চয় সাহায্য করবেন। তারপর আমি এলে পরে তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আজ আরেকজন সন্ন্যাসীকে পাওয়া গেল। এবার যাকে পাওয়া গেছে তিনি একজন খাঁটি আমেরিকান, এদেশে ধর্মীয় শিক্ষক হিসাবে তাঁর কিছু খ্যাতিও আছে। তিনি ছিলেন ডাঃ স্ট্রীট, এখন হয়েছেন যোগানন্দ, কারণ তাঁর সব ঝোঁক যোগ-এর দিকে।

আমি এখান থেকে "ব্রহ্মবাদিন্"-এ নিয়মিত রিপোর্ট পাঠিয়ে যাচ্ছি। শীঘ্রই সে সব প্রকাশিত হবে। ভারতে কিছু পৌঁছুতে কত দীর্ঘ সময় যে লাগে! আমেরিকায় সবকিছু সুন্দরভাবে গড়ে উঠছে। গোড়া থেকেই কোনো ফাঁকি ছিল না বলে আমেরিকান সমাজের সেরা লোকদের মনোযোগ বেদান্তের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছে। ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্ন হার্ড এখানে "ইৎসিয়েল" অভিনয় করছেন। কতকটা ফরাসী ধাঁচে উপস্থাপিত বুদ্ধজীবনী। এতে ইৎসিয়েল নামে এক গণিকা বোধিদ্রুম মূলে বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট; আর বুদ্ধ এই জগতের অসারতা বোঝাচ্ছেন তাকে, সে কিন্তু সারাক্ষণ বুদ্ধের কোলেই বসে আছে। যাহোক, শেষ রক্ষাই রক্ষা—গণিকা বিফলকাম হল। মাদাম বার্ন হার্ড গণিকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। আমি বুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারটা দেখতে গিয়েছিলাম—শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে আমাকে লক্ষ্য করে মাদাম আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন। এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন আমার পরিচিত এক সম্ভ্রান্ত পরিবার। সাক্ষাতের সময় মাদাম ছাড়াও ছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী এম. মোরেল এবং শ্রেষ্ঠ ইলেকট্রিসিয়ান টেসলা। মাদাম একজন বিদুষী মহিলা, তিনি অধিবিদ্যার প্রচুর চর্চা করে নিয়েছেন। এম. মোরেল আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন, কিন্তু টেসলা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন বৈদান্তিক প্রাণ ও আকাশ এবং কল্পের তত্ত্ব শুনে। তাঁর মতে এই তত্ত্বগুলিই আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গ্রহণীয়। আকাশ ও প্রাণের উদ্ভব আবার মহাজাগতিক মহৎ থেকে, সার্বজনীন মন, ব্রহ্মা বা ঈশ্বর হতে। মিঃ টেসলার ধারণা গাণিতিক নিয়মে এ কথা প্রমাণ করা যায় যে শক্তি

এবং বস্তু সুপ্ত তেজে পরিণত হতে পারে। আগামী সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমাকে এই নতুন গাণিতিক প্রমাণ দেখতে হবে।

সেক্ষেত্রে বৈদান্তিক সৃষ্টিবিজ্ঞান দৃঢ়তম বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি এক্ষণে বেদান্তের সৃষ্টিবিজ্ঞান এবং পরলোকতত্ত্ব নিয়ে খুব কাজ করছি। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে এই তত্ত্বগুলির সম্পূর্ণ ঐক্য দেখতে পাচ্ছি। দুইটির মধ্যে একটির পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে অপরটিরও পাওয়া যাবে। এই বিষয়ে পরে প্রশ্নোত্তরের আকারে একখানা বই লিখতে মনস্থ করেছি।*

প্রথম অধ্যায়টি হবে সৃষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ে—তাতে বৈদান্তিক তত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য দেখানো হবে।
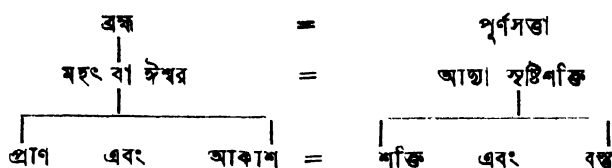
পরলোকতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হবে শুধু অদ্বৈতবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। দ্বৈতবাদীর মতে মৃত্যুর পরে আত্মা প্রথমে আদিত্যলোকে, পরে চন্দ্রলোকে এবং সেখান থেকে বিদ্যুৎলোকে যান। সেখান থেকে পুরুষ সমভিব্যাহারে যান ব্রহ্মলোকে। (অদ্বৈতবাদী বলেন, তারপর তিনি নির্বাণ লাভ করেন।)

অদ্বৈতবাদীর মতে আত্মার কোনো আসা-যাওয়া নেই, আর এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নানা লোক বা স্তর সেগুলি আকাশ ও প্রাণের প্রকাশভেদ মাত্র। অর্থাৎ সর্বনিম্ন বা সব থেকে ঘনীভূত স্তর হল আদিত্যলোক—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, যার মধ্যে প্রাণের আবির্ভাব জড়-শক্তিরূপে এবং আকাশের প্রকাশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপে। পরবর্তী স্তরকে বলা হয় চন্দ্রলোক, আদিত্যলোককে যা বেষ্টন করে রয়েছে। তা আমাদের এই চন্দ্র নয়, তা হল দেবগণের আবাসভূমি; অর্থাৎ প্রাণ এখানে মনঃশক্তিরূপে এবং আকাশ তন্মাত্রা বা সূক্ষ্মভূতরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। তার সীমা ছাড়িয়ে বিদ্যুৎলোক, অর্থাৎ সে এমন একটি অবস্থা যেখানে প্রাণ আকাশের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন, তখন বলা কঠিন বিদ্যুৎ শক্তি অথবা শক্তি। তারপর ব্রহ্মলোক যেখানে প্রাণও নেই আকাশও নেই; সেখানে উভয়েই সম্মিলিত মূল-মন অথবা আদ্যাশক্তিতে। এখানে প্রাণ বা আকাশ না থাকায় ব্যষ্টি জীব সমগ্র চরাচরকে সমষ্টিরূপে অথবা মহৎ বা মনের যোগফলরূপে কল্পনা করে। তাকেই বোধ হয় পুরুষ বলে, ইনি বিমূর্ত সর্বজনীন আত্মাস্বরূপ, কিন্তু তবু অন্যনিরপেক্ষ পূর্ণ সত্তা নন, কারণ তখনো রয়েছে বহুত্ব। এখান থেকেই জীব অবশেষে সেই একত্ব লাভ করে, তা-ই সমাপ্তি। অদ্বৈত মতে এই সবগুলিই দৃশ্যস্তর, একের পর এক যা জীব সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে, জীব-এর যাওয়া বা আসা কিছু নেই, এবং বর্তমান দৃশ্যপটও একইরূপে প্রতিভাত হয়েছে। সৃষ্টি ও

* বিবেকানন্দ এই রকম কোনো গ্রন্থ শেষ পর্যন্ত না লিখলেও আইডিয়াটি তাঁর মাথায় ছিল।

নিলয় এই একই নিয়মে আবর্তিত হয়—একটির অর্থ পশ্চাৎ নিক্রমণ অপরটির অর্থ অভ্যুদয়।

প্রতিটি ব্যষ্টি জীব যেহেতু তার আপন জগতকেই দেখতে পায় সেই কারণে সে জগত সৃষ্টি হয় তার বন্ধনদশার সঙ্গে. ব্যষ্টি জীব মুক্ত হলেই এই জগৎও আর থাকে না— অবশ্য অন্যান্য যারা বন্ধনে জড়িত তাদের কাছে এর অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। তারপর, নাম এবং আকৃতিই চরাচরের উপাদান। সমুদ্রের একটি তরঙ্গকে ততক্ষণই তরঙ্গ বলা হয় যতক্ষণ তা নাম ও আকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। তরঙ্গ যদি মিলিয়ে যায় তবে সে তো সমুদ্রই, আর তরঙ্গরূপ নাম ও আকৃতি চিরতরে বিলীন। অতএব যে জল নাম ও আকৃতির দ্বারা তরঙ্গকে রূপ দিয়েছিল সেই জল ছাড়া তরঙ্গের নাম ও আকৃতির কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, অথচ শুধু এই নাম ও আকৃতিকেও তরঙ্গ বলা চলে না। তরঙ্গ জলে পরিণত হলেই নাম ও আকৃতি বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য তরঙ্গের সঙ্গে অন্যান্য নাম ও আকৃতি সম্পর্কিত থাকে। এই নাম-ও-আকৃতিকেই বলে মায়া, আর জল হল ব্রহ্ম। তরঙ্গটা সর্বসময়েই জল ছাড়া অন্য কিছু নয়, অথচ তরঙ্গরূপে তার নাম ও আকৃতি ছিল। আবার এই নাম ও আকৃতি তরঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক মুহূর্তের তরেও টিকে থাকতে পারে না, যদিও জল স্বরূপে সেই তরঙ্গটি চিরকাল এই নাম ও আকৃতি থেকে পৃথক হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু যেহেতু নাম ও আকৃতিকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না, সেই কারণে তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তথাপি তারা নেহাৎ শূন্য নয়। একেই বলে মায়া।

এই সকল ভাবের বিস্তার সাধন করতে চাই সাবধানে, কিন্তু একবার চোখ বুলোলেই বুঝে নিতে পারবে যে আমি ঠিক পথ ধরেছি। মন, চিত্ত ও বুদ্ধি প্রভৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ভালো করে বিশ্লেষণ করতে হলে আরো ভালো করে শারীর বিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে, অনুশীলন করতে হবে উচ্চতর ও নিম্নতর কেন্দ্রসমূহের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে। তবে এ বিষয়ে আমি স্পষ্ট আলোকের সন্ধান পেয়েছি যা সমস্ত ছলনা থেকে মুক্ত। আমি শুষ্ক সুকঠিন যুক্তিকে প্রেমের মধুরতম রসে কোমল করে, ঐকান্তিক কর্মের সুগন্ধি করে এবং যোগের রন্ধনশালায় প্রস্তুত করে পরিবেশন করতে চাই, যাতে তা একটি শিশুও সহজে হজম করতে পারে।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৯]

ইউ. এস. এ.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

...আমার চিঠিগুলিতে বেশ কিছু কড়া কথা ব্যবহার করেছি, তার জন্য মনে কিছু কোরো না; তুমি তো জানই, মাঝে মাঝে আমি নার্ভাস হয়ে পড়ি। কাজটি

ভয়ানক কঠিন; আর যতই তা বাড়ছে ততই আরো কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমার একটি লম্বা বিশ্রামের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অথচ ইংল্যাণ্ডে আমার সামনে মস্ত বড় কাজ পড়ে রয়েছে।

বৎস, ধৈর্য ধরে থাক। কাজ এত বাড়বে যা তুমি ভাবতেও পার না।...সাফল্য লাভের পূর্বে প্রত্যেকটি কাজকেই শত বাধা-বিপত্তির ভেতর দিয়ে যেতে হয়। যাদের অধ্যবসায় আছে, আজ হোক কাল হোক, আলোর দর্শন তাদেরই ঘটে।

আমেরিকান সভ্যতার মর্মকেন্দ্রে নিউ ইয়র্ককে আমি এখন জাগিয়ে তুলতে পেরেছি, কিন্তু তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে।...আমার যা কিছু ছিল তার প্রায় সবটাই নিউ ইয়র্কের এই কাজে এবং ইংল্যাণ্ডে ব্যয় করতে হয়েছে। এখন সমস্ত কাজকর্মের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে তার গতি অব্যাহত থাকবে। গতকাল ছিল রবিবারের পাবলিক লেকচার, বিকেলবেলার সেই দীর্ঘ বক্তৃতার পর এখন তোমাকে চিঠিখানা লিখতে গিয়ে আমার শরীরের প্রত্যেকটি অস্থিতে বেদনা বোধ করছি। তারপর ভেবে দেখ—হিন্দু আইডিয়াগুলি ইংরিজিতে অনুবাদ করা, আর শুষ্ক দর্শন এবং জটিল পুরাণ ও অদ্ভুত চমৎকারী মনোবিজ্ঞানের মধ্যে থেকে এমন একটি ধর্মমত রচনা করা যা হবে একাধারে সহজ, সরল ও সাধারণের হৃদয়গ্রাহী, আবার মনীষিগণেরও উচ্চ চিন্তার উপযোগী—কাজটি কী কঠিন তা কেবল বুঝতে পারে তারাই যারা এই চেষ্টা করেছে। শুষ্ক, বিমূর্ত অদ্বৈতকে প্রতিদিনের জীবনে কাব্যময়, প্রাণবান করে তুলতে হবে। অসম্ভব রকম জটিল পৌরাণিক তত্ত্ব থেকে বার করতে হবে সুনির্দিষ্ট নীতিনির্দেশ। গোলকধাঁধার ন্যায় বিভ্রমপূর্ণ যোগশাস্ত্র থেকে বার করতে হবে সব থেকে বিজ্ঞানসম্মত ও ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব। এই সব কিছু এমনরূপে প্রকাশ করতে হবে যাতে একটি শিশুও সহজেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এই আমার জীবনের ব্রত। কতদূর সফল হব তা একমাত্র প্রভুই জানেন। "কর্মেই আমাদের অধিকার, তার ফলে নয়।" বৎস, এ বড় কঠিন কাজ, খুবই কঠিন! সম্যক উপলব্ধি এবং পূর্ণ নিবৃত্তির আদর্শ ধারণ-ক্ষম শিষ্যবৃন্দকে যতদিন না শিক্ষিত করে তোলা যাচ্ছে ততদিন এই কাম-কাঞ্চনের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে নিজেকে স্থির রেখে আপন আদর্শে অবিচল থাকা সত্যিই বড় কঠিন, বাবা। ঈশ্বরের অনুগ্রহে ইতিপূর্বেই অনেকটা কৃতকার্য হওয়া গেছে। আমাকে বুঝতে পারে না বলে মিশনারী এবং অন্যান্যদের আমি দোষ দিতে পারি না—কামিনী এবং কাঞ্চনের প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই, এমন কোনো লোক তাদের কখনো চোখেই পড়েনি। এ রকম একটা ব্যাপার যে সম্ভব হতে পারে প্রথমে তারা তা বিশ্বাসই করতে পারেনি; কি করেই বা পারবে? ব্রহ্মচর্য এবং পবিত্রতা সম্পর্কে ভারতীয়দের যে মতামত, ভেবো না—পশ্চিম দেশীয়দেরও সেই রকমই মতামত। তাদের কাছে ঐ দুটি শব্দের অর্থ হল সদ্‌গুণ এবং সাহস।...এখন আমার কাছে দলে দলে লোক আসছে। শত শত লোকের মনে এখন এই বিশ্বাস নিশ্চিত হয়েছে যে এমন পুরুষও আছে যারা সত্যিই কামপ্রবৃত্তিকে সংযত করতে পারে। এই সকল নীতিবোধ সম্পর্কে ভক্তি-শ্রদ্ধাও

বাড়ছে। যে লোক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারে তার কাছে সব কিছুই আসবে। চিরকাল ধরে তোমার জীবনে কল্যাণ-আশীর্বাদ আসুক! ভালোবাসা জানবে।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[১০]

বোস্টন
২৩ মার্চ, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

...আমার নতুন সন্ন্যাসীদের একজন বাস্তবিকই নারী।...অন্যান্যরা পুরুষ। ইংল্যাণ্ডে আরো কয়েকজন সন্ন্যাসী করব, তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব ভারতে। সেখানে হিন্দুদের চেয়ে 'শাদা' মুখের প্রভাব বেশী হবে। অধিকন্তু তারা কর্মঠ, আর হিন্দুরা "মৃত"। ভারতের একমাত্র আশা-ভরসাস্থল তার জনসাধারণ। উন্নত শ্রেণীর লোকেরা দেহে ও মনে মৃত।...

আমি সাফল্য লাভ করেছি আমার লোকায়ত পদ্ধতির দৌলতে—শিক্ষকের মহত্ত্ব তার ভাষার সারল্যে।

...আগামী মাসে ইংল্যাণ্ড যাচ্ছি। মনে হচ্ছে, অতিরিক্ত কাজ করেছি, এই দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের ফলে আমার স্নায়ুতন্ত্রীগুলি যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তোমার সহানুভূতি উদ্রেকের জন্য কথাগুলি লিখছি না, লিখছি এই কারণে যে আপাতত যেন আমার কাছে খুব বেশী কিছু আশা না কর। যত ভালো ভাবে পার কাজ করে যাও। আমি বর্তমানে মস্ত কিছু করতে পারব বলে আশা করি না। আমার বক্তৃতার শর্টহ্যাণ্ড লিপি থেকে প্রচুর পুস্তক সৃষ্টি হয়েছে, তাতে অবশ্য আমি খুশী। চারখানা বই তৈরী।...যাহোক, লোক-কল্যাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—তাতেই আমি সন্তুষ্ট; এরপর যখন কর্ম হতে অবসর নিয়ে গিরিগুহায় গিয়ে বসব তখন বিবেক আমার পরিষ্কার থাকবে।

তোমাদের সকলের প্রতি ভালোবাসা ও আশীর্বাদ।

বিবেকানন্দ

[১১]

ইউ. এস. এ.
মার্চ, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

...জোরসে কাজ চালিয়ে যাও; আমি যতটা পারি করব...প্রভু যদি চান তবে গেরুয়া পোশাকের সন্ন্যাসীতে এখানে এবং ইংল্যাণ্ডে ছেয়ে যাবে। বৎসগণ, কাজ করে যাও।

মনে রেখো, যতদিন তোমাদের গুরুর ওপর বিশ্বাস থাকবে ততদিন কোনো কিছুই তোমাদের পথের বাধা হয়ে উঠতে পারবে না। ভাষ্য তিনখানার অনুবাদ পাশ্চাত্য দেশীয়দের কাছে একটি মস্ত বড় ব্যাপার হয়ে উঠবে।

...অপেক্ষা কর বাবা, অপেক্ষা কর, আর কাজ করে যাও। ধৈর্য, শুধু ধৈর্য।... যথাসময়ে আবার আমি জনসমক্ষে অকস্মাৎ আবির্ভূত হব।... *

ভালোবাসা সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[১২]

নিউ ইয়র্ক
১৪ এপ্রিল, ১৮৯৬

প্রিয় ডাঃ নানজুণ্ডা রাও,

আজ সকালে আপনার চিঠিখানা পেলাম। আগামীকাল ইংল্যাণ্ড যাত্রা করছি, কয়েকটি মাত্র ছত্রে অন্তরের কথা জানাচ্ছি। আপনি ছেলেদের জন্য যে ম্যাগাজিনের প্রস্তাব করেছেন তার প্রতি আমার পরিপূর্ণ সমর্থন আছে, তার সাহায্যের জন্য আমি যথাসাধ্য করব। কাগজটিকে অবশ্য স্বাধীন মতাবলম্বী করতে হবে, "ব্রহ্মবাদিন্" যেমন চলে, আর বিষয়বস্তু এবং তার প্রকাশরীতিকে করতে হবে জনপ্রিয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় সংস্কৃত সাহিত্যে ইতস্তত ছড়ানো অতি চমৎকার গল্পের কথা, তার পুনর্লিখন করে জনপ্রিয় করতে পারলে একটা বিরাট আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে, এত বিরাট যে আপনি তা স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না। আপনার কাগজে এইটি এক বিশেষ বিষয়বস্তু হতে পারে, হওয়া উচিত। সময় পেলে আমি যত পারি গল্প লিখব। কাগজটিকে বিদগ্ধ করে তুলবার সকল চেষ্টা পরিহার করবেন —ও কাজের জন্য "ব্রহ্মবাদিন্" আছে—তাহলে, আমার বিশ্বাস এই জার্নাল সারা বিশ্বে আসন করে নেবে। যে ভাষা ব্যবহার করবেন তা যেন অতি সরল হয়, তাহলেই আপনি অবশ্য কৃতকার্য হবেন। প্রধান বিষয়বস্তু হবে গল্পের মাধ্যমে মূল নীতি শিক্ষা দেওয়া। ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপার আপনার নিজের হাতে রাখবেন। "অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।" ভারতে আমাদের যে জিনিসের অভাব সব থেকে বেশী তা হল সম্মিলিত হবার ক্ষমতা, তা হল সংগঠন, যার প্রথম শর্ত হল আজ্ঞানুবর্তিতা।

কলকাতায় একখানা বাংলা ম্যাগাজিন প্রকাশের ব্যাপারেও আমি সাহায্য করব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। শুধু প্রথম বৎসরটির জন্যই আমার বক্তৃতার বাবদে চার্জ দাবি করেছি। গত দুবছর আমার কাজের সঙ্গে দেনা-পাওনার কোনো সম্পর্ক ছিল না। এমতাবস্থায় আপনাকে কিংবা কলকাতায় বন্ধুদের পাঠাবার মতো কোনো টাকা-কড়ি আমার নেই। কিন্তু টাকাকড়ি দিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারে এমন

লোকজন আমি শীঘ্রই জোগাড় করব। সাহসের সঙ্গে এগিয়ে চলুন। একদিনেই কিংবা একবছরের মধ্যেই সাফল্য লাভের আশা করবেন না। সর্বোচ্চ আদর্শের প্রতিই অবিচল থাকবেন। দৃঢ় হোন। ঈর্ষা এবং স্বার্থপরতা পরিহার করুন। আজ্ঞানুবর্তী হোন, সত্য-আদর্শের প্রতি চির বিশ্বস্ত থাকুন; বিশ্বস্ত থাকুন মানব-সমাজের প্রতি ও নিজ দেশের প্রতি—তাহলেই আপনি সারা বিশ্বকে আলোড়িত করতে পারবেন। মনে রাখবেন, ব্যক্তিগত চরিত্র ও জীবন আচরণই ক্ষমতার উৎস—অন্য কিছুই নয়। এই চিঠিখানা রক্ষা করবেন, যখনই উদ্বেগ বা ঈর্ষা বোধ করবেন তখনই শেষ ছত্র কয়টি পড়বেন। ঈর্ষাই সমস্ত ক্রীতদাসের অভিশাপ। এইটি আমাদের সমগ্র জাতিরও সর্বনাশ। সর্বদা ঈর্ষা পরিহার করে চলবেন। আপনার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও সর্ব সাফল্য কামনা করি।

আপনাদের স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[১৩]

ইংল্যাণ্ড
১৪ জুলাই, ১৮৯৬

প্রিয় ডাক্তার নানজুণ্ডা রাও,

"প্রবুদ্ধ ভারত"-এর সংখ্যাগুলি পাওয়া গেছে এবং ক্লাসে ক্লাসে তা বিতরণও করা হয়েছে। এটি বেশ সন্তোষজনক কাজ। ভারতে এর বেশ ভালো বিক্রী হবে সন্দেহ নেই। আমেরিকাতেও আমি সম্ভবত কয়েকজন গ্রাহক সংগ্রহ করতে পারবো। আমেরিকায় এর বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করেছি, গুডইয়ার তা করেও ফেলেছে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে কাজ বেশ ধীরে এগুবে। এখানকার মস্ত সমস্যা হল—এখানকার সবাই-ই আপন আপন কাগজ বার করতে চায়; তাই অবশ্য হওয়া উচিত, কেননা কোনো বিদেশী খাঁটি ইংরিজি ইংরেজদের মতো তত ভালো লিখতে পারবে না, তার ওপর খাঁটি ইংরিজিতে লিখলে আইডিয়ার যা বিস্তার হবে হিন্দু-ইংরিজিতে তা হতে পারে না। তাছাড়া বিদেশী ভাষায় প্রবন্ধ লেখার চাইতে গল্প লেখা অনেক কঠিন। আমি এখানে আপনার জন্য গ্রাহক সংগ্রহের যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। কিন্তু বিদেশী সাহায্যের উপর আদৌ নির্ভর করবেন না। ব্যক্তির ন্যায় জাতিরও নিজেকে সাহায্য করতে হবে নিজেই। এইটিই প্রকৃত দেশপ্রেম। যদি কোনো জাতি তা না করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে তার এখনো সময় হয়নি, তাকে অপেক্ষা করতে হবে। নতুন আলো মাদ্রাজ হতেই সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়া চাই। আপনাদের কাজ করতে হবে সেই লক্ষ্য সামনে রেখে। একটি বিষয়ে আমি মন্তব্য করতে চাই। মলাট হয়েছে একেবারে চাযাড়ে, অতি কদর্য বিশ্রী। যদি সম্ভব হয় তবে মলাট বদলে দেবেন। মলাটটিকে করুন প্রতীকব্যঞ্জক এবং সরল—তাতে মানুষের মূর্তি আদৌ রাখবেন না। বটবৃক্ষ প্রবুদ্ধ হবার চিহ্ন নয় আদৌ, পাহাড়ও নয়, কিংবা তপস্বী বা

ইউরোপীয় দম্পতি দিয়েও সেই বক্তব্য বোঝানো যায় না। পদ্ম পুনরুজ্জীবনের প্রতীক।

চারুশিল্পে—বিশেষ করে চিত্রশিল্পে আমরা অত্যন্ত পেছিয়ে আছি। বনে বসন্ত জাগ্রত, বৃক্ষলতায় নব কিশলয় আর মুকুল দেখা দিয়েছে—এই ভাবের একটি কাননচিত্র অঙ্কন করুন দেখি। এরকম আরো শত শত ভাব রয়েছে, ধীরে ধীরে তা প্রকাশ করে তুলুন। রাজযোগ-এ আমি যে প্রতীকটি ব্যবহার করেছি তা দেখুন; বইখানা ছেপেছে লঙম্যান গ্রীন এণ্ড কোং। বোম্বাইতে পাবেন। নিউ ইয়র্কে রাজযোগ বিষয়ে আমি যে বক্তৃতা দিয়েছি তা-ই বইটির বিষয়বস্তু।

আগামী রবিবার যাচ্ছি সুইটজারল্যাণ্ড, শরৎকালে ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসব এবং আবার কাজ শুরু করব।…জানেন তো, আমার বিশ্রামের অত্যন্ত প্রয়োজন।

আশীর্বাদ সহ আপনাদের
বিবেকানন্দ

[১৪]

সুইটজারল্যাণ্ড
৬ অগস্ট, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

"ব্রহ্মবাদিন্" কী রকম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে আছে তা তোমার পত্রে অবগত হলাম। আমি লণ্ডনে ফিরে গিয়ে তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করব। কাগজটি চালিয়ে যাও এবং সুর নামিয়ো না। শীঘ্রই তোমাকে সাহায্য করতে পারব, যার ফলে তুমি ঐ শিক্ষকতার কাজের ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে পারবে। ভয় পেয়ো না। মস্ত বড় বড় কাজ হতে চলেছে, বাছা। সাহস অবলম্বন কর। "ব্রহ্মবাদিন্" একটি রত্ন, তাকে নষ্ট হতে দেওয়া চলবে না। অবশ্য এরকম একখানা কাগজকে টিকিয়ে রাখতে হলে ঘরোয়া সাহায্যই দরকার, আমরা নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা করব। আর মাসকয়েক লেগে থাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে ম্যাক্স মূলারের প্রবন্ধটি "নাইনটিনথ সেঞ্চুরি" পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। আমি পাওয়া মাত্র একখানা কপি তোমাকে পাঠিয়ে দেব। তিনি আমার কাছে চমৎকার করে পত্র লেখেন, রামকৃষ্ণের জীবন নিয়ে একখানা বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়নের উপাদান চান। কলকাতায় লিখে দিয়ো, তারা যেন যতটা সম্ভব উপাদান সংগ্রহ করে ম্যাক্স মূলারকে পাঠিয়ে দেয়।

আমেরিকার কাগজে প্রেরিত সংবাদ আমি পূর্বেই পেয়েছি। তা যেন ভারতে প্রকাশ করো না। সংবাদপত্রের প্রচার ঢের হয়েছে, আমার ওসবে বিরক্তি ধরে গেছে। আমরা আমাদের কাজ করে যাব, মূর্খেরা যত পারে চেঁচাক। সত্যকে কিছুতেই প্রতিহত করতে পারে না।

আমি এখন সুইটজারল্যাণ্ডে রয়েছি, সর্বদাই এখানে-ওখানে যাতায়াত করছি। লেখা বা পড়ার কোনো কাজ করতে পারছি না, করবও না। লণ্ডনে আমার এক মস্ত কাজ পড়ে আছে, আগামী মাস থেকে তা সুরু করতে হবে। শীতকালে ভারতে ফিরব; সেখানকার কাজকর্মকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে।

সকলকে আমার ভালোবাসা জানাবে। সাহসে বুক বেঁধে কাজ করে যাও, দম ছারিয়ো না, 'না' কখনো বোলো না। কাজ করে যাও, প্রভু পেছনে আছেন। তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন মহাশক্তি।

ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সহ
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,
ভয় করো না, টাকাকড়ি এবং অন্য সব কিছু আসবে শীঘ্রই।

[১৫]

সুইটজারল্যাণ্ড
৮ অগস্ট, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

কয়েকদিন পূর্বে তোমাকে যে পত্র দিয়েছিলাম তারপর "ব্রহ্মবাদিন্" সম্পর্কে একটি উপায় বার করতে পেরেছি; এখন তোমাকে তা জানানো যাচ্ছে। দু-এক বছরের জন্য আমি তোমাকে মাসে ১০০ টাকা করে দেব; অর্থাৎ বছরে পড়বে ৬০ কি ৭০ পাউণ্ড; এই হিসাবে মাস মাস ১০০ টাকাই পড়বে। এই অর্থ তোমাকে অন্য দায় থেকে মুক্ত করবে, এবং তার ফলে তুমি "ব্রহ্মবাদিন" নিয়েই লেগে থাকতে পারবে, তাতে কাজের অধিকতর সাফল্য নিশ্চিত হবে। মিঃ মণি আয়ার এবং আর কয়েকজন বন্ধু মিলে কিছু টাকা তুলে সাহায্য করতে পারেন—তাতে মুদ্রণ ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহ হতে পারে। গ্রাহকদের চাঁদা থেকে কত আয় হয়? সেই আয় দ্বারা কি লেখকদের টাকা দিয়ে ভালো ভালো প্রবন্ধ সংগ্রহ করা সম্ভব? "ব্রহ্মবাদিনে" যা কিছু লেখা হবে প্রত্যেকেই তা বুঝতে পারবে এমন কোনো কথা নেই, কিন্তু—হিন্দুদের কথা বলি—তারা তো দেশপ্রেম ও সৎকর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে চাঁদা দিয়ে গ্রাহক হতে পারে।

কয়েকটি জিনিস দরকার। প্রথমতঃ কঠোর নিষ্ঠা ও সততা অবলম্বন করতে হবে। তোমাদের কোনো একজনও বিপথগামী হবে—এমন ইঙ্গিতও আমি করছি না; কিন্তু টাকাকড়ি ব্যাপারে হিন্দুদের মধ্যে একটা অদ্ভুত অগোছালো ভাব আছে, হিসেবপত্র রাখা বিষয়ে তাদের নিয়মনিষ্ঠা এবং শৃঙ্খলা নেই।

দ্বিতীয়তঃ, কাজটির প্রতি পরিপূর্ণ ভক্তি-নিষ্ঠা; মনে রাখবে "ব্রহ্মবাদিন্"-এর সাফল্যের উপরই তোমাদের মোক্ষ নির্ভর করছে। এই কাগজখানা যেন তোমাদের

ইষ্ট দেবতা হয়ে ওঠে, তাহলেই দেখবে সাফল্য কি ভাবে আসে। আমি ভারত থেকে অভেদানন্দকে ডেকে পাঠিয়েছি। আশা করি, অপর স্বামীর ন্যায় তার ক্ষেত্রেও বিলম্ব ঘটবে না। আমার এই চিঠি পাবার পরে "ব্রহ্মবাদিন্"-সংক্রান্ত যাবতীয় আয়-ব্যয়ের একটি পরিষ্কার হিসাব আমার কাছে পাঠাবে, তা থেকে আমি বিচার-বিবেচনা করে দেখব কতটা কী করা যায়। মনে রেখো, পরিপূর্ণ পবিত্রতা, স্বার্থহীনতা এবং গুরুর প্রতি বশ্যতাই সকল সিদ্ধির মূল।...

একখানা ধর্মীয় পত্রিকার কাটতি বিদেশে খুব বেশী হওয়া সম্ভব নয়। হিন্দুদের মধ্যে যদি কিছুমাত্র ধর্মজ্ঞান এবং কৃতজ্ঞতাবোধ অবশিষ্ট থাকে তবে এই পত্রিকার পৃষ্ঠ-পোষকতা তাদেরই করতে হবে।

ভালো কথা, মিসেস অ্যানি বেস্যাণ্ট তাঁর বাড়িতে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ভক্তি বিষয়ে বক্তৃতা করার জন্য। এক রাত্রিতে আমি সেখানে লেকচার দিয়েছি। ওখানে কর্নেল ওলকটও ছিলেন। বক্তৃতা করলাম এইটি দেখাবার জন্য যে সকল গোষ্ঠীর প্রতিই আমার সহানুভূতি আছে।...আমাদের দেশবাসীদের মনে রাখা উচিত যে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমরাই শিক্ষক, বিদেশীয়রা নয়, কিন্তু পার্থিব ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।

ম্যাক্স মূলারের প্রবন্ধটি আমি পড়েছি, ভালো প্রবন্ধ; মনে রাখা দরকার, ছয় মাস পূর্বে তিনি যখন প্রবন্ধটি লেখেন তখন তার কাছে মজুমদারের পুস্তিকাখানা ছাড়া অন্য কোনো উপাদান ছিল না। এখন তিনি আমাকে একখানা সুন্দর পত্র লিখে জানিয়েছেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একখানা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করতে চান। আমি তাঁকে প্রচুর মালমসলা দিয়েছি, কিন্তু ভারত থেকে আরো বহু কিছু আসা দরকার।

কাজ করতে থাক! কাজে লেগে থাক! সাহসী হও! যে কোনো ব্যাপারে, সব ব্যাপারে অকুতোভয় হও!...এই সংসার কেবলই দুঃখময়, দেখছ না!

ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৩৬]

(ই. টি. স্টার্ডিকে লেখা)

লুকার্নে
২৩ অগস্ট, ১৮৯৬

স্নেহাশীর্বাদভাজনেষু,

আজ ভারতের একখানা চিঠি পেলাম; অভেদানন্দর লেখা; সে খুব সম্ভব ১১ অগস্ট বি. আই. এস. এন. জাহাজ "এস. এস. মোম্বাসা" যোগে যাত্রা করেছে। এর আগে আর কোনো স্টীমার সে পায় নি; পেলে আগেই রওয়ানা হত। খুব সম্ভব সে মোম্বাসায় জায়গা পেয়ে থাকবে। মোম্বাসা লণ্ডনে পৌঁছুবে ১৫ সেপ্টেম্বর নাগাদ। আপনি তো জানতে পেরেছেন, মিস মূলার আমার ডুয়েসেন সফরের তারিখ বদলে

১৯ সেপ্টেম্বর করেছেন। অভেদানন্দকে অভ্যর্থনা করার জন্য আমি তাই লণ্ডনে থাকতে পারব না। সে আবার আসছে কোনো শীতবস্ত্র না নিয়েই; আমার ধারণা ততদিনে ইংল্যাণ্ডে ঠাণ্ডা পড়তে সুরু করবে, তার অন্ততঃ কিছু অন্তর্বাস এবং একটি ওভারকোট দরকার হবে। ও সব ব্যাপার আমার চেয়ে আপনি অনেক ভালো জানেন। তাই মোম্বাসা কবে এসে পৌছায় সেদিকে দয়া করে একটু লক্ষ্য রাখবেন। আমি তার কাছ থেকে আর একখানা চিঠির আশা করছি।

খুব সর্দিতে কষ্ট পাচ্ছি। আশা করি ইতিমধ্যে রাজার কাছ থেকে মহিনের টাকাটা আপনার জিম্মায় এসে পৌছেছে। যদি এসে থাকে তবে আমার আগে দেওয়া টাকাটা আর ফেরৎ চাই না। সবটাই আপনি তাকে দিয়ে দেবেন।

গুডউইন এবং সারদানন্দর কাছ থেকে কয়েকখানা চিঠি পেয়েছি। তারা বেশ ভালোই কাজ করছে। মিসেস বুলের কাছ থেকেও চিঠি পেয়েছি; তিনি কেম্ব্রিজে কী একটি সোসাইটির পত্তন করছেন, আপনি এবং আমি তার সহযোগী সদস্য হতে পারব না বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এই ধরনের সভ্যপদ গ্রহণে আপনার এবং আমার অসম্মতির কথা জানিয়ে তাঁকে পত্র দিয়েছিলাম মনে আছে। একটি লাইনও এখন পর্যন্ত লিখতে পারিনি। পড়বার জন্যও এক মুহূর্ত সময় পাই না, সব সময়েই পাহাড়ে চড়ছি আর উপত্যকায় নামছি। আর কয়েকদিনের মধ্যে আবার আমাদের যাত্রা সুরু করতে হবে। মহিন ও ফক্সের সঙ্গে এর পর দেখা হলে তাদের আমার ভালোবাসা জানাবেন।

আমাদের সকল বন্ধুবান্ধবকে ভালোবাসা জানাই।

আপনাদের
বিবেকানন্দ

[১৭]

সুইটজারল্যাণ্ড
২৬ অগস্ট, ১৮৯৬

প্রিয় নানজুণ্ডা রাও,

এক্ষুনি তোমার চিঠি পেলাম। আমি চলছিই। আলপস পর্বতমালায় খুব পাহাড় চড়ছি আর হিমবাহ পাড়ি দিচ্ছি। এখন চলছি জার্মানীতে। অধ্যাপক ডুয়েসেন আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁর সঙ্গে কিয়েলে মিলিত হতে। সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডে ফিরব। সম্ভবত এই শীতকালে আমি ভারতে ফিরব।

"প্রবুদ্ধ ভারত"-এর ডিজাইনে অতিরিক্ত জমকালো সাজ ছাড়াও অন্য আপত্তির বিষয় হল অনাবশ্যক কতগুলি মানুষমূর্তির বাহুল্য। ডিজাইন হওয়া চাই সরল, প্রতীকমূলক এবং ঘনীভূত। লণ্ডনে বসে "প্রবুদ্ধ ভারত"-এর জন্য আমি একটি ডিজাইন করে দেবার চেষ্টা করব, তা তোমাকে পাঠিয়ে দেব।...

কাজ বেশ সুন্দর চলছে, এবং সে কথা বলতে আমি খুব আনন্দ বোধ করছি।... তোমাকে একটি উপদেশ অবশ্য দেব। ভারতে সমবেত সকল প্রয়াস একটি ক্রটির ভারে ডুবে যায়—আমরা এখনো ব্যবসায়গত শৃঙ্খলা শিখে উঠতে পারিনি। ব্যবসায় ব্যবসা ছাড়া আর কিছু নয়—সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থেই একথা সত্য—এখানে কোনো খাতির, বা হিন্দু প্রবাদে যেমন বলা হয়েছে "চক্ষুলজ্জা", ওসবের বালাই থাকা উচিত নয়। যার কাছে যার ভার থাকবে তার পরিষ্কার হিসাব রাখাই চাই—এক কাজের টাকা অন্য কাজে কিছুতেই ব্যবহার করা চলবে না—তার জন্য যদি না খেয়েও থাকতে হয় তবুও না। এই রকম শৃঙ্খলাকেই বলে ব্যবসায়িক নিষ্ঠা। তারপর চাই অটুট কর্মশক্তি। যা কিছু করবে তা-ই যেন তোমার সেই মুহূর্তের ধ্যান-জ্ঞান হয়। উপস্থিত এই কাগজই হোক তোমার ভগবান, তাহলেই তুমি কৃতকার্য হবে।

এই কাগজ নিয়ে সাফল্যলাভের পরে অনুরূপ পথে তামিল, তেলুগু, কানাড়ি প্রভৃতি দেশীয় ভাষায়ও কাগজ বার কর। জনসাধারণের কাছে আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দিতেই হবে। মাদ্রাজের লোকেরা সৎ, কর্মঠ এবং অন্যান্য গুণসম্পন্ন; কিন্তু মনে হচ্ছে শঙ্করাচার্যের জন্মভূমি নিবৃত্তির আদর্শ ভুলে গেছে।

আমার সন্তানদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে কাটলের মধ্যে, সংসারত্যাগী হতে হবে—তাহলেই তৈরী হবে দৃঢ় বনিয়াদ।

সাহস করে এগিয়ে চল। আপাতত ডিজাইন প্রভৃতি খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামিও না—"ঘোড়া জুটলে চাবুকও পাওয়া যাবে"। আমৃত্যু কাজ করে চল—আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, আমার অবর্তমানে আমার আত্মা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে চলবে। জীবন আসে যায়—অর্থসম্পদ, নামযশ, ভোগবিলাস ইত্যাদি ক্ষণস্থায়ী। পার্থিব কীটপতঙ্গের মতো মরার চেয়ে কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করা, সত্য প্রচার করতে করতে মৃত্যুবরণ করা অনেক অনেক ভালো। অগ্রসর হয়ে চলো!

অজস্র ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সহ

তোমাদের

বিবেকানন্দ

[১৮]

c/o মিস এইচ. মুলার

এয়ারলি লজ, রিজওয়ে গার্ডেন্স

উইম্বলডন, ইংল্যাণ্ড

২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

ম্যাক্স মুলারের লেখা রামকৃষ্ণ বিষয়ে যে প্রবন্ধটি আমি পাঠিয়েছিলাম তা নিশ্চয় পেয়েছ। আমাকে জানবার ছয়মাস আগে এটি লেখা, তাই প্রবন্ধে আমার উল্লেখ

মাত্র নেই ; সেজন্য দুঃখ কোরো না। তাছাড়া, মূল বিষয়ে যদি খাঁটি থাকেন তবে কাকে উল্লেখ করা হল আর কাকে হল না তা নিয়ে কে মাথা ঘামায়। জার্মানীতে অধ্যাপক ডুয়েসেনের সঙ্গে আমার সময়টা বেশ ভালো কাটল। তারপর আমরা দুজনে একসঙ্গে লণ্ডনে এসেছি, আমাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।

তার সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ শীঘ্রই পাঠাব। আমার প্রবন্ধের গোড়ায় ঐ বস্তাপচা "প্রিয় মহাশয়" কথাটা দয়া করে ব্যবহার কোরো না তো। রাজযোগ বইখানা কি দেখতে পেয়েছ? আগামী বছরের জন্য তোমাকে একটি ডিজাইন পাঠাতে চেষ্টা করব। রাশিয়ার জারের লেখা ভ্রমণকাহিনী সম্পর্কে 'ডেইলি নিউজ' যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে সেটি তোমায় পাঠিয়ে দেব। একটি প্যারাগ্রাফে ভারতকে বলা হয়েছে আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞতার দেশ ; তোমাদের কাগজে তা উদ্ধৃত করবে, পরে প্রবন্ধটি "ইণ্ডিয়ান মিরর" কাগজে পাঠিয়ে দিও।

জ্ঞান ও বক্তৃতামালা তুমি এবং "প্রবুদ্ধ ভারত"-এ ডাঃ নানজুণ্ডা রাও নিশ্চয়ই ছাপতে পার—শুধু দেখবে অধিকতর সরল বক্তৃতাগুলিই যেন ছাপা হয়। সব বক্তৃতা খুব ভালো করে পড়ে নিতে হবে, পুনরুক্তি এবং স্ববিরোধী অংশগুলি বাদ দিতে হবে। এখন লিখবার জন্য আমি আরো সময় পাব বলে মনে হয়। উদ্যম নিয়ে কাজ করে যাও।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

যে প্যাসেজটি উদ্ধৃত করতে হবে তা আমি দাগ দিয়ে দিয়েছি, বাকী অংশ কাগজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়।

যদি না আকারে বেশ বৃহৎ করতে পার তবে এখনই কাগজকে মাসিকে পরিণত করা ভালো মনে করি না। এখন যা চলছে তার আকার এবং বিষয়বস্তু দুই-ই খুব সামান্য। এখনো বিস্তর বিষয় অনালোচিত রয়ে গেছে, যথা—তুলসীদাস, কবীর, নানক এবং দক্ষিণ-ভারতের সাধুসন্তদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে লেখা। এ সব লিখতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা, খুব বিদগ্ধ রীতিতে, অযত্ন এবং এলোমেলো ভাবে লিখলে চলবে না। বস্তুত কাগজের আদর্শ হতে হবে, বেদান্ত প্রচার তো বটেই, তাছাড়াও একে পরিণত করে তুলতে হবে ভারতীয় বিদ্যাবত্তা ও গবেষণার একখানা মুখপত্ররূপে—তার মধ্যে ধর্ম-প্রাধান্য তো অবশ্যই থাকবে। শ্রেষ্ঠ লেখকদের কাছে যাবে, তাদের কাছ থেকে সযত্ন রচিত প্রবন্ধাবলী আদায় করবে। পূর্ণ উদ্যমে কাজ চালিয়ে যাও।

ভালোবাসা জানবে।

বিবেকানন্দ

[১৭]

১৪ গ্রে কোর্ট গার্ডেন্স
ওয়েস্ট মিনস্টার, লণ্ডন
১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তিন সপ্তাহ হল সুইটজারল্যাণ্ড থেকে ফিরেছি, কিন্তু এর পূর্বে তোমাকে চিঠি দিতে পারিনি। গত ডাকে কিয়েলের অধ্যাপক ডুয়েসেন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছি। ম্যাগাজিন সম্পর্কে স্টার্ডির পরিকল্পনা এখনো কার্যকর হয়নি। তুমি জানতে পেরেছ আমি সেণ্ট জর্জেস রোডের বাসস্থান ছেড়ে দিয়েছি। ৩৯ নং ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে আমাদের একটি লেকচার হল আছে। আগামী এক বছর ই.টি. স্টার্ডির ঠিকানায় চিঠি দিলেই আমি পাব। গ্রে কোর্ট গার্ডেনসে ঘর ভাড়া নেওয়া হয় নিজের এবং অন্য স্বামীর বাসস্থানের প্রয়োজনে শুধু তিন মাসের জন্য। লণ্ডনে কাজ চলছে ক্ষিপ্রগতিতে, ক্লাসও যত অগ্রসর হচ্ছে তাতে লোক ততই বাড়ছে। আদর্শের প্রতি ইংরেজদের ধীর আনুগত্য রয়েছে, কাজে কাজেই এখানকার কাজ বর্তমান হারেই বেড়ে চলবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য আমি যখনই চলে যাব তখনই এই সব কাঠামো ভেঙে পড়বে। তখন একটা কিছু ঘটবে। কাজ আপন হাতে তুলে নেবার জন্য শক্তিমান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে। কী ভালো তা প্রভুই জানেন। বেদান্ত এবং যোগতত্ত্ব প্রচার করবার মত বিশজন লোকের স্থান হতে পারে আমেরিকায়। কিন্তু এরকম প্রচারক কোথায় পাওয়া যাবে? তাদের নিয়ে আসবার টাকাই বা কোথায়? কিছুসংখ্যক শক্তিমান এবং খাঁটি লোক পাওয়া গেলে দশ বছরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক জয় করে নেওয়া যায়। কিন্তু কোথায় তারা? ওখানে তো আমরা সবাই গণ্ডমূর্খ হয়ে বসে আছি। সব স্বার্থপর কাপুরুষের দল, শুধু মুখে দেশপ্রেমের অসার বুলি, গোঁড়ামি আর ধর্ম-বোধের অহঙ্কার! মাদ্রাজীদের উদ্যম এবং দৃঢ়তা অনেক বেশী, কিন্তু বোকারা প্রত্যেকেই বিবাহিত! বিয়ে! বিয়ে! আর বিয়ে!...তাছাড়া, আজকাল কী ভাবেই বা আমাদের ছেলেদের বিয়ে হচ্ছে!... নিরাসক্ত সংসারী হবার সাধনা খুব ভালো কথা; কিন্তু মাদ্রাজে মাত্র সেইটুকুই চাই না—চাই না-বিয়ে।...

বৎস, আমি যা চাই তা হল লৌহদৃঢ় পেশী এবং ইস্পাত-কঠিন স্নায়ু, ভেতরে থাকবে একটি মন যা বজ্র নির্মাণের ধাতুতে তৈরী। চাই শক্তি, চাই মনুষ্যত্ব, চাই পৌরুষ; চাই ক্ষাত্রবীর্য+ব্রহ্মতেজ। আমাদের আশাবাদী সুন্দর সুন্দর ছেলেরা—তাদের আছে সব কিছু, শুধু যদি বিবাহ নামক এই পাশবিকতার বেদীতে তাদের লক্ষ লক্ষকে বলি না দেওয়া হত! হে ঈশ্বর, আমার বিলাপে কান দাও! মাদ্রাজ তখনই জেগে উঠবে যখন তার হৃদয় শোণিতরূপ অন্তত একশত শিক্ষিত তরুণ, বিশ্ব-সংসার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াবে, কোমর বেঁধে তৈরী হবে সত্যের সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্য, দেশ হতে দেশান্তরে অভিযান করে চলবে। ভারতের বাইরে একটি

আঘাত হানতে পারলে তা হবে ভেতরের লক্ষ আঘাতের সমান। যাহোক, প্রভুর ইচ্ছা হলে সব কিছুই আসবে।

আমি যে টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা দিতে চেয়েছেন মিস মূলার। তাঁকে তোমার নতুন প্রস্তাবের কথাও বলেছি। তা নিয়ে তিনি ভাবছেন। আমার মনে হয় ইতিমধ্যে তাঁকে কাজ দেওয়া বরং ভালো। তিনি "ব্রহ্মবাদিন্" এবং "প্রবুদ্ধ ভারত"-এর এজেন্ট হতে রাজী হয়েছেন। তুমি কি এ বিষয়ে তাঁকে লিখবে? তাঁর ঠিকানা: এয়ারলি লজ, রিজওয়ে গার্ডেনস, উইম্বল্ডন, ইংল্যাণ্ড। গত কয় সপ্তাহ আমি তাঁর বাড়িতেই বাস করছিলাম। কিন্তু আমার লণ্ডনে না থাকলে আবার লণ্ডনের কাজটা চলে না। সেই জন্যই আমি বাসস্থান বদল করেছি। তাতে মিস মূলার একটু মনঃক্ষুন্ন হয়েছেন বলে আমিও দুঃখিত। কোনো উপায়ান্তর নেই। তাঁর পুরো নাম মিস হেনরিয়েটা মূলার। ম্যাক্স মূলারের সঙ্গে খাতির জমছে। অক্সফোর্ডে আমি শীঘ্রই দুটি বক্তৃতা দেব।

বেদান্তদর্শন বিষয়ে একটি বড় লেখা নিয়ে এখন ব্যস্ত আছি। বেদান্তর তিন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বেদসমূহের যে যে অংশের সম্পর্ক আছে তা সংগ্রহ করছি। তুমি যদি এখন কাউকে যোগাড় করে দিতে পার যে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ এবং পুরাণ সকল থেকে প্রথমত অদ্বৈত, পরে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং তৎপরে দ্বৈতবাদাত্মক যত অধিক শ্লোক সংগ্রহ করে দিতে পারে তবে আমার খুব সাহায্য হয়। ঐগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে পৃথকরূপে সন্নিবেশিত করতে হবে, কোন শ্লোকটি কোন গ্রন্থের কোন অধ্যায় থেকে গৃহীত তাও স্পষ্ট করে লিখে দিতে হবে। বেদান্তদর্শনের অন্তত কিছু অংশ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করে না রেখে পাশ্চাত্য দেশ থেকে চলে যাওয়াটা খুবই দুঃখের বিষয় হবে।

তামিল অক্ষরে সমগ্র ১০৮ উপনিষদ-সম্বলিত একখানা গ্রন্থ মহীশূরে প্রকাশিত হয়েছিল; আমি তা দেখেছি অধ্যাপক ডুয়েসেনের গ্রন্থাগারে। দেবনাগরীতে কি তার কোনো পুনর্মুদ্রণ আছে? যদি থাকে আমাকে একখানা পাঠিয়ে দিয়ো। যদি তা না থাকে তবে তামিল সংস্করণটিই পাঠিয়ো; একটি কাগজে তামিল অক্ষর এবং যুক্তাক্ষর আর তার সঙ্গে সঙ্গে ওগুলির দেবনাগরী রূপও লিপিবদ্ধ করে দেবে, যাতে আমি তামিল অক্ষরগুলি বুঝতে পারি।

সেদিন লণ্ডনে মিঃ সত্যনাথনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল; তিনি জানালেন, মাদ্রাজের প্রধান অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকা "ম্যাড্রাস মেইল"-এ আমার রাজযোগ পুস্তকের একটি সহৃদয় সমালোচনা (রিভিয়ু) প্রকাশিত হয়েছে। শুনলাম, আমেরিকার প্রধান শরীরতত্ত্ববিদ আমার গবেষণা ও অনুমানসমূহ পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছেন। এদিকে আবার ইংল্যাণ্ডে কেউ কেউ আমার আইডিয়াগুলিকে উপহাস করেছে। উত্তম! আমার এইসব গবেষণা ও অনুমান নিঃসন্দেহে দুঃসাহসী; অনেক অংশই লোকের কাছে চিরকাল অবোধ্য থেকে যাবে; কিন্তু তাতে এমন সব ইঙ্গিত আছে যা নিয়ে আগে থাকতে চর্চা করলেই শরীরতত্ত্ববিদগণ ভালো করতেন। যাহোক,

যেটুকু ফল লাভ করা গেছে আমি তাতে বেশ সন্তুষ্ট। আমার নীতিবাক্য হল: "আমার বিষয়ে লোকে যদি কিছু খারাপ বলতে চায় তো বলুক; তবু কিছু বলুক।"

ইংল্যাণ্ডের লোকেরা অবশ্য ভদ্র, আমেরিকায় যে রকম বাজে কথা শুনেছি, এঁরা তেমন বলেন না কখনো। তোমরা ওখানে যেসব ইংরেজ মিশনারিদের দেখতে পাও তারা এখানকার বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী সংখ্যালঘুর প্রতিনিধি। তারা ইংল্যাণ্ডের ভদ্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। এখানকার ধর্মপ্রাণ ভদ্রলোকেরা সকলেই ইংলিশ চার্চের অন্তর্ভুক্ত। বিরুদ্ধবাদী সংখ্যালঘুদের কোনো প্রভাব ইংল্যাণ্ডে নেই, তাদের কোনো শিক্ষাদীক্ষাও নেই। তুমি মাঝে মাঝে যাদের সম্পর্কে আমাকে সতর্ক কর তাদের কথা এখানে শুনতেই পাই না। তারা এখানে অজ্ঞাত, এবং বাজে প্রলাপ বকতে তারা সাহস করে না। আশা করি রাম কে. নাইডু মাদ্রাজে পৌঁছে গেছে। আশা করি তোমার স্বাস্থ্য ভাল আছে।

বৎসগণ, সাহস অবলম্বন কর, অধ্যবসায়ী হও। আমাদের কাজ সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। মনমরা হয়ো না কখনো! কখনো বোলো না যথেষ্ট হয়েছে! ...পাশ্চাত্যে এসে নানা জাতির পরিচয় লাভ করা মাত্র চোখ খুলে যায়। এই উপায়েই আমি শক্তিমান কর্মী পেয়ে থাকি—কেবল অনর্থক বক বক করে নয়, পরন্তু ভারতে আমাদের কী আছে আর কী নেই তা তাদের স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়ে। দশ লক্ষ হিন্দু যদি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে আসত!

চির প্রেমবদ্ধ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[২১]

C/o ই. টি. স্টার্ডি
৩৯ ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট, লণ্ডন
২৮ অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

...এখনো নিশ্চিত করে বলতে পারছি না কোন মাসে আমি ভারতে পৌঁছুব। এ বিষয়ে পরে লিখে জানাব। গতকাল বান্ধবসমাজের এক সভায় প্রথম ভাষণ দিলেন নতুন স্বামী (স্বামী অভেদানন্দ)। ভালো বক্তৃতা, আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। তার মধ্যে সুবক্তা হবার সম্ভাবনা আছে, সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত।

...তোমরা এখনো—টি বার করোনি।...ভারতে ভালো কাটতি হতে হলে বই-এর দাম সস্তা হওয়া চাই। ছাপার হরফও বড় হওয়া দরকার, তাতে সাধারণ লোক সন্তুষ্ট হবে।...যদি চাও তবে—এর একখানা সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করতে পার। ইচ্ছে করেই তার উপর আমি কোনো কপিরাইট সংরক্ষিত রাখিনি। পূর্বেই—বইখানা না বের করার দরুন একটি ভালো সুযোগ হারিয়েছ; আমরা হিন্দুরা এমনই

বীর মন্থর যে, কাজ একটি সম্পাদন করতে করতে সুযোগ যায় চলে, আর তাই আমাদের লোকসান হয়। তোমার—বইখানা বের হল এক বছর কথাবার্তা চলবার পর। তুমি কি মনে কর যে, পশ্চিম দেশীয় লোকেরা এর জন্য শেষবিচারের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? এই দেরীর জন্য তোমার বই বিক্রী অন্তত তিন-চতুর্থাংশ নষ্ট হয়েছে।...সেই হরমোহন একটি মূর্খ, সে তোমার চেয়েও মন্থর এবং তার মুদ্রণ নারকীয়। ওরকম করে বই প্রকাশ করে কোনো লাভ নেই; ওরকম করলে শুধু লোক ঠকানো হয়, ওরকম করতে নেই। আমি সম্ভবত ভারতে ফিরব মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার, মিস মুলার এবং মিঃ গুডউইনকে সঙ্গে করে। মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও আলমোড়াতে বসতি করবেন, আর মিঃ গুডউইন হবেন সন্ন্যাসী। তিনি অবশ্য পরিভ্রমণ করবেন আমারই সঙ্গে। ইনিই সেই ব্যক্তি যার দৌলতে আমাদের যাবতীয় বইপত্র। তিনি আমার বক্তৃতাবলীর শর্টহাণ্ড নোট নিয়েছিলেন, আর তাই তো বইগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হল।...এইসব বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল সেই মুহূর্তের প্রেরণায়, কোনো প্রস্তুতি ছিল না, কাজে কাজেই সব ভালো করে সংশোধন ও সম্পাদনা করে নিতে হবে।...গুডউইনকে থাকতে হবে আমারই সঙ্গে।...তিনি নির্ভেজাল নিরামিষাশী।

ভালোবাসা সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

ডাঃ বারোজ সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র লিপি আজ "ইণ্ডিয়ান মিরর"-এ পাঠিয়েছি, তাঁকে কীভাবে স্বাগত করতে হবে তা বলে দিয়েছি। "ব্রহ্মবাদিন্"-এ তুমিও তাঁর সম্পর্কে অভ্যর্থনাসূচক কিছু ভালো কথা লিখো। এখানকার সবাই ভালোবাসা জানাচ্ছে।

বি

[২১]

(পত্রটি ১৮৯৬ সালের শেষভাগে ডাঃ বারোজের ভারতভ্রমণ উপলক্ষে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় লেখা)

লণ্ডন
২৮ অক্টোবর, ১৮৯৬

বিশ্বমেলার অঙ্গস্বরূপ কংগ্রেস অনুষ্ঠানের আপন বিরাট পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য মিঃ সি. বনি সহকারী নিযুক্ত করেছিলেন ডাঃ বারোজকে, আর তাতে দক্ষতম ব্যক্তির হাতেই কার্যভার অর্পিত হয়েছিল; আর সেই ডাঃ বারোজের পরিচালনায় সেই কংগ্রেসসমূহের অন্যতম একটি যে অনন্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল সে তো আজ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

ডাঃ বারোজের বিরাট সাহসিকতা, অক্লান্ত উদ্যম, অবিচল ধৈর্য এবং অফুরন্ত ভদ্রতার দৌলতেই এই মহাসভা অপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

বিস্ময়কর চিকাগো মহাসভাকে অবলম্বন করেই ভারত, ভারতবাসী এবং ভারতীয় চিন্তাধারা জগৎসমক্ষে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছিল; এই জাতীয় কল্যাণের জন্য সেই সভায় অন্য সকলের থেকে ডাঃ বারোজের কাছেই আমরা বেশী ঋণী।

তাছাড়া, তিনি আমাদের মধ্যে আসছেন ধর্মের নাম নিয়ে, মানবজাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্যের নাম নিয়ে; আমার বিশ্বাস নাজারেথের মহাপুরুষের প্রচারিত ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা অত্যন্ত উদার হবে এবং তাতে আমাদের মন উন্নত হবে। খ্রীষ্ট-ক্ষমতার যে পরিচয় তিনি ভারতকে দিতে চান তা পরমত-অসহিষ্ণু নয়, নয় প্রভুভাবাপন্ন, নিজে ছাড়া অন্য সব কিছুর প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ মনোবৃত্তিপ্রসূত নয় তা; পরন্তু সে ক্ষমতা হল ভ্রাতার আকর্ষণ ক্ষমতা, যে ভ্রাতা ভারতে কর্মরত নানা ধর্ম শক্তির প্রতিভূ ভ্রাতাদের সহকর্মীরূপে পরিগণিত হতে চায়। সর্বোপরি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, কৃতজ্ঞতা এবং অতিথিপরায়ণতাই ভারতীয় জীবনের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য; তাই আমার দেশবাসীর কাছে এই বিনীত অনুরোধ—তাঁরা এমন আচরণ করুন যে পৃথিবীর অপরদিক থেকে আগত এই বিদেশী আগন্তুক যেন বুঝতে পারেন—এই দুঃখ-যন্ত্রণা, দারিদ্র্য এবং অধঃপতনের ভেতরেও আমাদের হৃদয় উষ্ণ রয়েছে সেই অতীত যুগেরই ন্যায় যখন "ভারতের ঐশ্বর্যের" কথা ছিল নানা জাতির প্রবাদবাক্য, যখন ভারত পরিচিত ছিল "আর্য"ভূমি বলে।

[২২]

১৪ গ্রে কোট গার্ডেনস
ওয়েস্ট মিনস্টার, এস. ডব্লু.
১১ নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

খুব সম্ভবত আমি ১৬ ডিসেম্বর যাত্রা করব, দু-একদিন দেরীও হতে পারে। এখান থেকে যাব ইতালী, সেখানে কয়েকটি জায়গা দেখবার পর নেপলসে স্টীমার ধরব। আমার সঙ্গে যাবেন মিস মূলার, মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার এবং গুডউইন নামে এক তরুণ। সেভিয়ার দম্পতি আলমোড়াতে বসবাস করবেন। মিস মূলারও। মিঃ সেভিয়ার ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অফিসার ছিলেন পাঁচ বছর। অতএব ভারতকে তিনি অনেকখানিই জানেন। মিস মূলার ছিলেন থিয়সফিস্ট, অক্ষয়কে তিনি দত্তক নেন। গুডউইন একজন ইংরেজ, তার শর্টহ্যাণ্ড নোট-এর দৌলতেই পুস্তিকাসমূহ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

কলম্বো থেকে আমি প্রথমে মাদ্রাজ পৌঁছুব। অন্যান্যরা নিজ নিজ মত আলমোড়া

চলে যাবেন। ওখান থেকে আমি যাব সোজা কলকাতায়। রওয়ানা হবার সময় তোমাকে যথাযথ সংবাদ দেব।

তোমাদের স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

রাজযোগ প্রথম সংস্করণ সম্পূর্ণ বিক্রয় হয়ে গেছে, দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপানো হচ্ছে। ভারত ও আমেরিকাতেই কাটতি সব থেকে বেশী।

বি

[২৩]

৩৯ ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট
লণ্ডন, এস. ডব্লু.
২০ নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

১৬ ডিসেম্বর আমি ইংল্যাণ্ড ছেড়ে যাচ্ছি ইতালীতে; নেপলসে নর্থ জার্মান লয়েড এস. এস. প্রিনৎস রিজেন্ট লুইটপোল্ড জাহাজ ধরব। জাহাজ কলম্বোয় পৌঁছুবে আগামী ১৪ জানুয়ারি।

সিংহলের এদিক ওদিক একটু দেখবার ইচ্ছে আছে, তারপর যাব মাদ্রাজ। আমার সঙ্গে তিনজন ইংরেজ বন্ধু থাকবেন—ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার এবং মিঃ গুডউইন। মিঃ সেভিয়ার এবং তাঁর স্ত্রী হিমালয়ের আলমোড়ায় একটি কেন্দ্র স্থাপন করবেন, আমি তাকেই আমার হিমালয়ের কেন্দ্রে পরিণত করার ইচ্ছা রাখি, ওখানে আমার পশ্চিমী শিষ্যগণ ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরূপে বাসও করতে পারবেন। গুডউইন অবিবাহিত যুবক, সে আমার সঙ্গেই ভ্রমণ করবে এবং থাকবেও; সে একজন সন্ন্যাসীরই ন্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণর জন্মবার্ষিকী উৎসবের পূর্বেই আমি কলকাতায় পৌঁছুতে চাই।... উপস্থিত আমার কর্ম-পরিকল্পনা হল দুটি কেন্দ্র স্থাপন করা—একটি কলকাতায়, অন্যটি মাদ্রাজে; সেখানে তরুণ প্রচারকদের শিক্ষিত করে তোলা হবে। কলকাতায় কেন্দ্র স্থাপনের মত যথেষ্ট অর্থ আমার আছে; কলকাতাই শ্রীরামকৃষ্ণর জীবন ও কর্মস্থল, সেই হেতু সেখানে আমার প্রথম মনোযোগের দাবি। মাদ্রাজের কেন্দ্রটির জন্য অর্থ ভারতেই সংগ্রহ করতে পারব বলে আশা রাখি।

এই তিনটি কেন্দ্র নিয়ে আমরা কাজ আরম্ভ করব; পরে অগ্রসর হব বোম্বাই ও এলাহাবাদে। এই সকল কেন্দ্র থেকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভারতবর্ষে তো অভিযান করবই, শুধু তাই নয়—পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে আমরা পাঠাব প্রচারক-বাহিনী। সেই হবে আমাদের প্রথম কর্তব্য। মন লাগিয়ে কাজ কর। ৩৯ ভিক্টোরিয়া আগামী কিছুকালের জন্য লণ্ডনের সদর দপ্তর হবে, কাজটা ওখান থেকেই চালানো হবে। স্টার্ডির কাছে যে এক বাক্স "ব্রহ্মবাদিন্" ছিল তা আমি আগে জানতাম না। সে এখন গ্রাহক সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছে।

এতদিনে ইংরিজি ভাষায় একখানা ভারতীয় ম্যাগাজিনের ব্যবস্থা হল। দেশীয় ভাষায়ও কয়েকখানা সুরু করতে পারি। উইম্বল্ডনের মিস নোবল একজন খুব ভালো কর্মী। তিনিও মাদ্রাজের দুটি কাগজের ক্যানভাসিং করবেন। তিনি তোমাকে লিখে জানাবেন। এই সব ব্যাপার ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই বিকাশ লাভ করে। এই ধরনের কাগজ বাঁচিয়ে রাখে ক্ষুদ্র একদল সমর্থক। এখানকার এরা একসঙ্গে কত কাজ করবে !—এখানে তাদের বই কিনতে হয়, ইংল্যাণ্ডে কাজের জন্য টাকা সংগ্রহ করতে হয়, সংগ্রহ করতে হয় এখানকার কাগজের গ্রাহক, তারপর আবার ভারতীয় কাগজের গ্রাহক হওয়া। খুবই অতিরিক্ত কাজ। শিক্ষাদানের চেয়ে যেন ব্যবসা করাটাই বেশী। অতএব তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে, আমি অবশ্য বিশ্বাস করি এখানে কিছু গ্রাহক হবেই। তার ওপর আমি চলে গেলে এখানে লোকজনের জন্য কাজ তো চাই, নইলে সবই তো পণ্ড হয়ে যাবে। অতএব এখানে একখানা কাগজ চাই-ই, ক্রমে ক্রমে আমেরিকায়ও একখানা চাই। ভারতীয় কাগজকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ভারতীয়দেরই। সর্ব জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য একখানা কাগজ করতে হলে সকল জাতির লেখকদেরই সমবেত করা চাই। তার অর্থ প্রতি বছর কম করে এক লাখ টাকা।

তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আমার স্বার্থ আন্তর্জাতিক, কেবল ভারতীয় মাত্র নয়। আমার স্বাস্থ্য ভালো আছে ; অভেদানন্দরও।

অজস্র ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সহ

বিবেকানন্দ

[২৪]

(জনৈক আমেরিকান মহিলাকে লেখা)

লণ্ডন

১৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় মহাশয়া,

নীতির রাজ্যে ক্রমবিভাগ আছে, এই আইডিয়াটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বৈরাগ্য, অপ্রতিরোধ এবং অবিনাশ প্রভৃতির আদর্শে উপনীত হতে হবে কম সংসারিত্ব, কম প্রতিরোধ এবং কম বিনাশসাধনের মধ্য দিয়ে। আদর্শকে সামনে রেখে তার দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যান। প্রতিরোধ ব্যতীত, বিনাশকাজ ব্যতীত, বাসনা ব্যতীত কেউ এ সংসারে বাঁচতে পারে না। সমাজজীবনে অমন আদর্শ রূপায়িত করা যায় জগৎ এখনো সে অবস্থায় উপনীত হয় নি।

পৃথিবী তার সকল অশুভের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে, এই গতিই ধীরে ধীরে কিন্তু অনিবার্যরূপে আদর্শের উপযোগী করে তুলছে। বেশীর ভাগ লোককেই

এই মন্থর বিকাশের পথ ধরে চলতে হবে—বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যেই আদর্শ লাভ করতে হলে বিশেষ শক্তিমান পুরুষকে পরিবেশের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

কালোচিত কর্তব্য সাধনই শ্রেষ্ঠ পন্থা, শুধু কর্তব্যবোধে অনুষ্ঠিত হলে তাতে বন্ধন আসে না।

সঙ্গীত সর্বশ্রেষ্ঠ ললিতকলা, যাঁরা তা বোঝেন তাদের কাছে তা সর্বোচ্চ আরাধনা।

অজ্ঞানতা এবং অশুভ বিনাশ করার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আমাদের একথাই শিখতে হবে যে অশুভের বিনাশ হতে পারে শুভের বৃদ্ধি ও বিকাশ দ্বারা।

আপনাদের বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

[২৫]

("ভারতী" সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা ঘোষালকে লেখা)

ওঁ তৎ সৎ

রোজ ব্যাঙ্ক
বর্ধমান মহারাজার বাড়ি
দার্জিলিঙ
৬ এপ্রিল, ১৮৯৭

মাননীয়াসু,

আপনার প্রেরিত "ভারতী" পেয়ে অত্যন্ত বাধিত হলাম। আমি যে আদর্শে আমার সামান্য জীবন নিবেদন করেছি তা আপনার ন্যায় প্রতিভাময়ী মহিলাদেরও অনুমোদন লাভ করতে সমর্থ হয়েছে দেখে নিজেকে ভাগ্যবান বিবেচনা করছি

জীবনের এই সংগ্রামে নবচিন্তার প্রবক্তাকে উৎসাহিত করবার মত পুরুষ মানুষই খুব কম পাওয়া যায়। এরকম নারীর তো কথাই নেই—যারা আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে ওরকম লোককে উৎসাহ যোগাতে পারেন। অতএব ভারতের সকল পুরুষের সোচ্চার প্রশংসার চেয়ে একজন বিদুষী বাঙালীর অনুমোদন অনেক বেশী মূল্যবান।

ঈশ্বর করুন যেন আপনার ন্যায় বহু নারী এদেশে জন্মলাভ করেন এবং মাতৃভূমির উন্নতির জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেন!

"ভারতী"তে আমার সম্বন্ধে আপনি যে প্রবন্ধটি লিখেছেন সে বিষয়ে আমার কিছু বলবার আছে। তা এই: পশ্চিম দেশে যে ধর্মপ্রচার করা হয়েছে এবং পরে করা হবে সে ভারতের কল্যাণেরই জন্য। আমার বরাবরই বিশ্বাস যে, পশ্চিম দেশীয় জনগণ আমাদের সাহায্যে না এগিয়ে এলে আমরা উঠে দাঁড়াতে পারব না। এই দেশে গুণের কোনো আদর এখনো দেখা যায় না, অর্থবল কিছুমাত্র নেই, আর সব থেকে দুঃখের কথা ব্যবহারিক বুদ্ধির লেশমাত্র নেই।

বহু কিছুই করবার আছে, কিন্তু সঙ্গতির বড় অভাব এদেশে। আমাদের মেধা

আছে, বাহুবল নেই। আমাদের আছে বেদান্ত মতবাদ, কিন্তু তার ব্যবহারিক প্রয়োগের সামর্থ্য আমাদের নেই। আমাদের গ্রন্থসমূহে সার্বজনীন সাম্যের মতবাদ আছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমাদের বিশুদ্ধ ভেদ বৈষম্য। মহিমান্বিত নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম কর্তব্যের আদর্শ এই ভারতেই প্রচারিত হয়েছে; কিন্তু কার্যে আমরা অতি নিষ্ঠুর, অত্যন্ত হৃদয়হীন—নিজেদের মাংসপিণ্ড দেহ ছাড়া অন্য কিছু কথা ভাবতেই পারি না।

তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়েই কার্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। অন্য কোনো উপায় নেই। ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা প্রত্যেকেরই আছে; কিন্তু বীর তিনিই যিনি ভ্রম প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে অকুতোভয় থেকে এক হাতে চোখের জল মুছে অকম্পিত অন্য হাতে উদ্ধারের পথ দেখান। একদিকে রয়েছে জড়পিণ্ডবৎ রক্ষণশীল সমাজ; অন্যদিকে অধীর অস্থির অগ্নিবর্ষী সংস্কারক; কল্যাণের পথ রয়েছে এই দুইয়ের মাঝখানে। জাপানে শুনেছিলাম, ওদেশের মেয়েদের এই বিশ্বাস যে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসলে তাদের খেলার পুতুলের মধ্যেও জীবন সঞ্চার হয়। জাপানী মেয়েরা কখনো তাদের খেলার পুতুল ভেঙে ফেলে না। হে মহাভাগে, আমারও বিশ্বাস যদি কেউ এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদদলিত, চিরবুভুক্ষু, কলহপরায়ণ, পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে তবে ভারত আবার জেগে উঠবে। ভারত জাগবে তখনই যখন মহাপ্রাণ শত শত নারী ও পুরুষ জীবনের ভোগবিলাসের অভিলাষ ত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে কল্যাণ কামনা করবে কোটি কোটি ভারতবাসীর—যারা ক্রমেই অজ্ঞানতা ও নিঃস্বতার আবর্তে তলিয়ে যাচ্ছে। আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনেও আমি এই প্রত্যক্ষ করেছি যে, সৎ উদ্দেশ্য, অকপটতা এবং অনন্তপ্রেম বিশ্ব জয় করতে পারে। এই সকল গুণের অধিকারী হলে একটি মানুষই কোটি কোটি ভণ্ড পশুর দুরভিসন্ধি বিনষ্ট করে দিতে পারে।

পশ্চিম দেশে আমার আবার যাওয়াটা এখনো অনিশ্চিত; যদি যাই, জানবেন তাও ভারতেরই জন্য। এ দেশে মানুষের মনোবল কোথায়? কোথায় অর্থবল? পশ্চিম দেশে এমন অনেক নারী ও পুরুষ আছেন যাঁরা ভারতীয় পদ্ধতিতে এবং ভারতীয় ধর্ম মাধ্যমে নিকৃষ্ট চণ্ডালদেরও সেবা করে ভারতের কল্যাণ করতে প্রস্তুত। এ দেশে ওরকম কয়জন আছেন? আর অর্থবল! আমারই ব্যয় নির্বাহের জন্য কলকাতার লোকেরা আমাকে দিয়ে বক্তৃতা করালেন এবং তার জন্য টিকিট বিক্রয় করলেন!... এর জন্য আমি কাউকে দোষ দিই না, কারও নিন্দাও করি না। আমি শুধু একথা প্রমাণ করতে চাই যে, পশ্চিম দেশ থেকে লোকবল ও অর্থবল না এলে আমাদের কল্যাণ অসম্ভব।

চির কৃতজ্ঞ এবং সদাপ্রভুসন্নিধানে
ভবৎ-কল্যাণ-কামনাকারী
বিবেকানন্দ

[২৬]

আলমোড়া
২৯ মে, ১৮৯৭

প্রিয় ডাক্তার শশী (ভূষণ ঘোষ),

তোমার পত্র এবং দু বোতল ঔষধ যথাসময়ে পাওয়া গেছে। গতকাল সন্ধ্যা থেকে তোমার ঔষধ পরীক্ষা করতে লেগেছি। আশা করি, একটির অপেক্ষা দুটির মিশ্রণে ফল বেশী পাওয়া যাবে।

সকালে এবং সন্ধ্যায় ঘোড়ায় চেপে প্রচুর ব্যায়াম সুরু করেছি। তার ফলে বাস্তবিকই অনেকটা ভালো বোধ করছি। ব্যায়াম সুরু করে প্রথম সপ্তাহে শরীর এত ভালো বোধ করছিলাম যে, ছোটবেলায় কুস্তি অভ্যাসের ন্যায় এমন আর কখনো বোধ করিনি। আমার সত্যিই মনে হচ্ছিল যে শরীর থাকাটাই একটি আনন্দের বিষয়। শরীরের প্রত্যেকটি গতিতে শক্তির অনুভূত বোধ করেছি—পেশীর প্রতিটি ক্রিয়া আনন্দময় হয়ে উঠেছিল। সেই উৎফুল্ল ভাবটা কিছু হ্রাস পেয়েছে, তবু যথেষ্ট শক্তিশালী বোধ করছি। শক্তিপরীক্ষায় জি. জি. এবং নিরঞ্জন উভয়কেই আমি এক মুহূর্তে ধরাশায়ী করতে পারি। দার্জিলিঙে আমার সর্বদাই মনে হত আমি যেন আর সেই একই লোক নেই। এখানে মনে হয় আমার কোনো ব্যাধিই নেই; একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। জীবনে কোনোদিন বিছানায় শোয়া মাত্র আমার ঘুম আসত না। ঘণ্টা দুয়েক এপাশ-ওপাশ করতে হতই। শুধু মাদ্রাজ থেকে দার্জিলিঙ (প্রথম মাস) পর্যন্ত বালিশে মাথা রাখতে না রাখতে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। সেই সহজ নিদ্রার প্রবণতা দূর হয়ে গেছে, ফিরে এসেছে আমার এপাশ-ওপাশ করার অভ্যাস এবং সান্ধ্য আহারের পর দেহ উত্তপ্ত হবার ধাত। দুপুরের আহারের পর আদৌ কোনো তাপ বোধ করি না। এখানে একটি ফল-বাগিচা আছে, এখানে এসেই স্বাভাবিকের অতিরিক্ত ফল খাওয়া ধরেছিলাম। কিন্তু এখন ফল বলতে শুধু খুবানিই (অ্যাপ্রিকট) পাওয়া যায়। নৈনীতাল থেকে অন্যান্য ফল আনাবার চেষ্টা করছি। দিন অতিশয় গরম, তবু তৃষ্ণা বোধ নেই। মোটের ওপর শক্তি স্ফূর্তি এবং স্বাস্থ্য-প্রাচুর্য আবার ফিরে আসছে বলে বোধ করছি, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে অতিরিক্ত দুধ পথ্য করার ফলে আমার মেদবৃদ্ধি ঘটছে। যোগেন যা লিখছে তাতে কান দিয়ো না। যে নিজে সব সময় ত্রাসগ্রস্ত, অন্য সবাইকেও ওরকমই করতে চায়। লখনৌতে আমি একখানা বরফির ষোলো ভাগের এক ভাগ খেয়েছিলাম, যোগেনের ধারণা আলমোড়ায় এসে আমার শরীরের গোলমালের কারণ সেইটিই! কয়েকদিনের মধ্যে যোগেনের এখানে আসার সম্ভাবনা আছে। আমিই তার ভার নেব। ভালো কথা, আমার আবার ম্যালেরিয়ার ধাত খুব। আমি এসেছিলাম তরাই অঞ্চল হয়ে, হয়ত অনেকটা সেই কারণেই আলমোড়ায় প্রথম সপ্তাহে আমার অসুখ দেখা দিয়েছিল। সে যা-ই হোক, এখন আমি খুবই বলশালী বোধ করছি। আমি যখন মনোহর তুষারশৃঙ্গের সম্মুখে ধ্যানে বসে

উপনিষদ থেকে আবৃত্তি করি—"ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্‌"। সেই সময় তুমি যদি আমায় দেখতে পেতে ডাক্তার!

কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশনের সভাগুলির সাফল্যের সংবাদ শুনে খুব খুশী হলাম। মহৎ কার্যের যারা সহায়ক তাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ হোক।...

অজস্র ভালোবাসা জানবে।

ভগবদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

[২]

আলমোড়া
১ জুন, ১৮৯৭

প্রিয় মিঃ—,

তুমি বেদ সম্বন্ধে যে আপত্তিগুলি দেখিয়েছ তা যথাযথ বলে মেনে নেওয়া যেত যদি বেদ শব্দে কেবল সংহিতা বোঝাত। কিন্তু ভারতে সর্ববাদীসম্মত মতানুসারে সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ এই তিনটির সমষ্টিই বেদ। তিনটির মধ্যে প্রথম দুইটি মূলত কর্মকাণ্ড, তাই এই দুইটি প্রায় বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে; আমাদের সকল দার্শনিক এবং নানা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাগণ কেবল উপনিষদকেই গ্রহণ করে নিয়েছেন।

সংহিতাই বেদ, এই ধারণা অতি সাম্প্রতিক এবং এই মতের প্রথম প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দ। প্রাচীন হিন্দুসমাজের মধ্যে এই মত কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।

এই মত অবলম্বন করার কারণ এই যে স্বামী দয়ানন্দ ভেবেছিলেন সংহিতার নতুন ব্যাখ্যা করে তিনি একটি পূর্বাপর সঙ্গত মতবাদ সৃষ্টি করেন, কিন্তু গোল থেকে গেল; তফাৎ শুধু এই: অসামঞ্জস্যের গোলযোগ গিয়ে পড়ল ব্রাহ্মণের ওপর। আর তাঁর ব্যাখ্যাপ্রণালী ও প্রক্ষিপ্তবাদ সত্ত্বেও বহু গোলমাল আগের মতোই রয়ে গেল।

সংহিতাকে ভিত্তি করে যদি এক সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্ম স্থাপন করা যেতে পারে, তবে উপনিষদের ভিত্তিতে যে অতি সংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্ম স্থাপন করা সম্ভব তা হাজার বার বেশী সত্য। অধিকন্তু সেক্ষেত্রে সমগ্র জাতির পূর্বস্বীকৃত মতের বিরুদ্ধে যেতে হয় না। এই ক্ষেত্রে প্রাচীন সকল আচার্যই তোমার পক্ষে থাকবেন, আর নতুন পথে অগ্রসর হবার বিরাট অবকাশও তোমার থাকবে।

ইতিপূর্বেই গীতা নিঃসন্দেহে হিন্দুধর্মের বাইবেল হয়ে উঠেছে, তাই হওয়া সঙ্গতও বটে; কিন্তু কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব এমন কুজ্ঝটিকাবৃত হয়ে আছে যে, বর্তমানে সেই জীবন

থেকে প্রাণদায়ী উদ্দীপনা লাভ করা অসম্ভব। অধিকন্তু, বর্তমান যুগে প্রয়োজন নতুন চিন্তাপ্রণালী এবং নতুন জীবন আচরণ।

আশা করি এই পত্র উপরি উক্ত পথে চিন্তা করতে তোমাকে সাহায্য করবে।

আশীর্বাদ জানবে।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[২৮]

(স্বামীজীর একজন শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা)

আলমোড়া
৩ জুলাই, ১৮৯৭

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

যস্য বীর্যেণ কৃতিনো বয়ং চ ভুবনানি চ।
রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শর্বং স্বতন্ত্রমীশ্বরম্॥

"প্রভবতি ভগবান বিধি"—ইত্যাগমিনঃ অপ্রয়োগনিপুণাঃ প্রয়োগনিপুণাশ্চ পৌরুষং বহুমন্যমানাঃ। তয়োঃ পৌরুষাপৌরুষেয় প্রতিকারবলয়োঃ বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ কলহ ইতি মত্বা যতস্বায়ুষ্মন্ শরচ্চন্দ্র আক্রমিতুম্ জ্ঞানগিরিগুরোর্গরিষ্ঠং শিখরম্।

যদুক্তং "তত্ত্বনিকষগ্রাবা বিপদিতি" উচ্যেত তদাপি শতশঃ "তৎ ত্বমসি" তত্ত্বাধিকারে। ইদমেব তন্নিদানং বৈরাগ্যরুজঃ। ধন্যং কস্যাপি জীবনং তল্লক্ষণাক্রান্তস্য। অরোচিষ্ণু অপি নির্দিশামি পদং প্রাচীনং—"কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্" ইতি। সমারূঢ়ক্ষেপণীক্ষেপণশ্রমঃ বিশ্রাম্যতাং তন্নির্ভরঃ। পূর্বাহিতো বেগঃ পারং নেষ্যতি নাবম্। তদেবোক্তং,—"তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি"। "ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" ইত্যত্র ত্যাগেন বৈরাগ্যমেব লক্ষ্যতে। তদ্বৈরাগ্যং বস্তুশূন্যং বস্তুভূতং বা। প্রথমং যদি, ন তত্র যতেত কোঽপি কীটভক্ষিতমস্তিষ্কেন বিনা; যদ্যপরং তদেদং আপততি,—ত্যাগঃ মনসঃ সঙ্কোচনং অন্যস্মাৎ বস্তুনঃ, পিণ্ডীকরণঞ্চ ঈশ্বরে বা আত্মনি। সর্বেশ্বরস্তু ব্যক্তিবিশেষো ভবিতুং নার্হতি, সমষ্টিরিত্যেব গ্রহণীয়ম্। আত্মেতি বৈরাগ্যবতো জীবাত্মা ইতি নাপদ্যতে, পরন্তু সর্বগঃ সর্বান্তর্যামী সর্বস্যাত্মরূপেণাবস্থিতঃ সর্বেশ্বর এব লক্ষীকৃতঃ। স তু সমষ্টিরূপেণ সর্বেষাং প্রত্যক্ষঃ। এবং সতি জীবেশ্বরয়োঃ স্বরূপতঃ অভেদভাবাৎ তয়োঃ সেবা প্রেমরূপকর্মণোরভেদঃ। অয়মেব বিশেষঃ—জীবে জীববুদ্ধ্যা যা সেবা সমর্পিতা সা দয়া, ন প্রেম, যদাত্মবুদ্ধ্যা জীবঃ সেব্যতে, তৎ প্রেম। আত্মনা হি প্রেমাস্পদত্বং শ্রুতিস্মৃতি প্রত্যক্ষ প্রসিদ্ধত্বাৎ। তদ্‌যুক্তমেব যদবাদীৎ ভগবান্ চৈতন্যঃ,—প্রেম ঈশ্বরে, দয়া জীবে ইতি। দ্বৈতবাদিত্বাৎ তত্রভগবতঃ সিদ্ধান্তো জীবেশ্বরয়োর্ভেদবিজ্ঞাপকঃ সমীচীনঃ। অস্মাকন্তু অদ্বৈতপরাণাং জীববুদ্ধিবন্ধনায় ইতি। তদস্মাকং প্রেম এব শরণং, ন দয়া। জীবে প্রযুক্তঃ দয়াশব্দোঽপি সাহসিকঃ্মিত ইতি মন্যামহে। বয়ং ন দয়ামহে, অপি তু সেবামহে; নানুকম্পানুভূতিরস্মাকং অপি তু প্রেমানুভবঃ স্বানুভবঃ সর্বাস্মিন্।

সৈব সর্ববৈষম্যসাম্যকরী ভবব্যাধিনীরুজকরী প্রপঞ্চাবশুম্ভাব্যাত্রিতাপহরণকরী সর্ববস্তুস্বরূপপ্রকাশকরী মায়াধ্বান্তাবিধ্বংসকরী আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তস্বাত্মরূপ প্রকটনকরী প্রেমানুভূতবৈরাগ্যরূপা ভবতু তে শর্মণে শর্মন্।

ইত্যনুদিবসং প্রার্থয়তি
ত্বয়ি ধৃতচিরপ্রেমবন্ধঃ
বিবেকানন্দঃ

বাংলা অনুবাদ

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

যাঁর শক্তিতে আমরা এবং সমগ্র জগৎ কৃতার্থ সেই শিব-স্বরূপ স্বাধীন ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে সদা বন্দনা করি।

হে শরৎচন্দ্র তুমি দীর্ঘজীবী হও!

যে সকল শাস্ত্রকার কর্মে উত্তোগী নন তাঁরা বলেন সর্বশক্তিমান নিয়তিই অমোঘ; আর যাঁরা কর্মী তাঁরা পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। এই যে কেউ পুরুষকারকেই দুঃখ প্রতিকারের উপায় মনে করে সেই বলের উপর নির্ভর করেন, আবার কেউ কেউ বা দৈববলের উপর নির্ভর করেন, তাঁদের বিবাদ কেবল অজ্ঞানজনিত—এই কথা জেনে তুমি জ্ঞানরূপ গিরিবরের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণের চেষ্টা কর।

বলা হয়েছে বিপদই সত্যজ্ঞানের কষ্টিপাথর, "তত্ত্বমসি" জ্ঞান সম্বন্ধে এ কথা শতবার বলা যেতে পারে। এটিই বৈরাগ্য রোগের নিদান। এই রোগলক্ষণ যার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তিনিই ধন্য। তোমার অপছন্দ সত্ত্বেও আমি প্রাচীন প্রবাদটির পুনরুক্তি করছি: "কিছু সময় অপেক্ষা কর"। দাঁড় চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়েছ, এখন তার ওপর নির্ভর করে একটু বিশ্রাম কর। পূর্বের বেগই নৌকোকে অপর পারে নিয়ে যাবে। গীতায় বলা হয়েছে, "যোগে সিদ্ধ হলে আপন হৃদয়ে সময়মত তার উপলব্ধি ঘটে"; আর উপনিষদ বলেছেন, "আচার-অনুষ্ঠান বা ধনসম্পদ অথবা সন্তান দ্বারা অমরত্ব লাভ হয় না, নিবৃত্তি দ্বারা অল্পসংখ্যক লোকই তা লাভ করতে পারেন" (কৈবল্য ২)। এখানে নিবৃত্তি শব্দে বৈরাগ্য বোঝানো হয়েছে। বৈরাগ্য হয় দুই প্রকার, ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক। বৈরাগ্য যদি অভাবাত্মক হয় তবে কীটভক্ষিত মস্তিষ্ক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ তা লাভের জন্য সচেষ্ট হবে না। আর বৈরাগ্য যদি ভাবাত্মক হয় তবে নিবৃত্তির অর্থ দাঁড়ায়—অন্য বস্তুসমূহ হতে মনকে নির্লিপ্ত করে তা ঈশ্বরে বা আত্মায় নিবিষ্ট করা। যিনি সর্বেশ্বর তিনি কখনো ব্যক্তিবিশেষ হতে পারেন না। তিনি সমষ্টি। বৈরাগ্যবান ব্যক্তি আত্মা বলতে ব্যক্তির অহং রূপ বোঝেন না, তাঁর কাছে আত্মা সর্বব্যাপী, সর্বান্তর্যামী, সকলের আত্মারূপে অবস্থিত সর্বেশ্বর। তিনি সমষ্টিরূপে সকলের প্রত্যক্ষ। অতএব জীব এবং ঈশ্বর স্বরূপত যেহেতু অভিন্ন সেকারণে জীবসেবা এবং ঈশ্বরপ্রেম এক ও অভিন্ন। এক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্য আছে: জীবকে জীবজ্ঞানে যে সেবা করা হয় তা দয়া—প্রেম নয়। আত্মজ্ঞানে জীবকে সেবা করলে তা হয় প্রেম। আত্মা যে প্রেমাস্পদ তা শ্রুত, স্মৃত এবং প্রত্যক্ষ—সর্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারাই জানা যায়। ভগবান চৈতন্য যথার্থই বলেছিলেন,

"ঈশ্বরে প্রেম এবং জীবে দয়া"। ভগবান চৈতন্য ছিলেন দ্বৈতবাদী, অতএব জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ দেখিয়ে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা-ই সমীচীন। কিন্তু আমরা অদ্বৈতবাদী, আমাদের মতে ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে এই বিভেদের ধারণাই বন্ধনের কারণ। সুতরাং আমাদের মূল নীতি হল প্রেম, দয়া নয়। জীবের প্রতিও দয়া শব্দের প্রয়োগ আমার কাছে হঠকারী এবং দম্ভসূচক বলে মনে হয়। আমরা করুণা করি না, করি সেবা। আমাদের অনুভূতি দয়ার নয়, প্রেমের; আমাদের অনুভূতি সকলের মধ্যে আত্ম অনুভূতি।

হে শর্মন্ তোমার কল্যাণের জন্য অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হোক, যার মূল অনুভূতি প্রেম, যাতে সমস্ত বৈষম্যের সমতা সাধন করে, যার দ্বারা সংসারের ব্যাধি আরোগ্য হয়, এই প্রপঞ্চময় জগতে অবশ্যম্ভাবী ত্রিতাপের নাশ হয় যার দ্বারা, যাতে সমুদয় বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হয়, যার দ্বারা মায়ারূপ অন্ধকার বিনষ্ট হয়, যার দৌলতে আব্রহ্মস্তম্ব সমুদয় বস্তুকে আত্মস্বরূপ বলে বোধ হয়!

তোমাতে চির প্রেমবদ্ধ বিবেকানন্দের এইটিই সতত প্রার্থনা।

[২৭]

(মিস মেরী হালেকে লেখা)

আলমোড়া
৯ জুলাই, ১৮৯৪

প্রিয় বোন,

তোমার চিঠির মধ্যে একটি নৈরাশ্যের সুর পেয়ে খুব দুঃখিত হলাম। আমি তার কারণটিও বুঝি। তোমার হুঁশিয়ারির জন্য ধন্যবাদ, তোমার উদ্দেশ্য আমি ভালোই বুঝতে পারি। অজিত সিংহের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে যাবার ব্যবস্থা করেছিলাম, কিন্তু ডাক্তারদের অনুমতি না পাওয়ায় সেই ব্যবস্থা টিঁকল না। তার সঙ্গে হ্যারিয়েটের দেখা হয়েছে জানতে পারলে যারপরনাই খুশী হব। তোমাদের যে কোনো একজনের সঙ্গে দেখা হলে সে অত্যন্ত খুশী হবে।

আমেরিকার নানা কাগজের একরাশ কাটিংও পেয়েছি; আমেরিকান মেয়েদের সম্পর্কে আমার নানা উক্তিকে অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে দেখছি; আর একটি অদ্ভুত সংবাদও জানতে পারলাম—আমি নাকি জাতিচ্যুত হয়েছিলাম! যেন আমারও জাত খোয়াবার আছে, আমি তো সন্ন্যাসী!

শুধু যে জাত খোয়ানো হয়নি তাই নয়, আমার পশ্চিমে যাওয়ার দ্বারা, সমুদ্র-যাত্রার প্রতি যে বিরোধিতা ছিল তাও বহু পরিমাণে ভেঙেছে। আমাকে জাতিচ্যুত করা হলেও আমি এদেশের রাজাদের অন্তত অর্ধেকের এবং প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাসীর দলে হতাম। অপর পক্ষে, সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে আমি যেই বর্ণের

ছিলাম সেই বর্ণেরই এক বিশিষ্ট রাজা আমার সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন এবং তাতে উপস্থিত ছিলেন সেই বর্ণের বেশীর ভাগ হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তিবর্গ। পক্ষান্তরে সন্ন্যাসীরা হয়ত ভারতে অন্য কারও সঙ্গেই একত্রে আহার করবেন না, কারণ দেবতা হয়ে সাধারণ মানুষের পংক্তিতে বসে আহার করাটা তাদের মর্যাদাহানি করবে। তাঁরা বিবেচিত হন নারায়ণ বলে, অন্যান্যরা মামুলী মানুষমাত্র। আর মেরী জানো, কত শত রাজার বংশধরগণ এই পা ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়েছে, পুজো করেছে; সারা দেশে এঁদের পূজা যেভাবে অগ্রসর হয়েছে ভারতে এমনটি আর কারও হয়নি।

এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে আমি রাস্তায় পা দিলেই শান্তিরক্ষার জন্য পুলিসের প্রয়োজন হত! জাতিচ্যুতই বটে! তাতে অবশ্য মিশনারিদের বড় হতাশ হতে হয়েছে, কিন্তু এখানে তারা কে?—নিতান্ত তুচ্ছ ব্যক্তি। এখানে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই আমরা উদাসীন থেকে আনন্দিত। কোনো একটি বক্তৃতায় আমি মিশনারীদের সম্পর্কে, এই শ্রেণীর লোক সমাজের কোন স্তর হতে উদ্ভূত সেই সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলাম—অবশ্য ইংলিশ চার্চের ভদ্রমহোদয়গণ সম্পর্কে কোনো কথা বলিনি; প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছিলাম আমেরিকার অতি-চার্চ-ভক্ত কিছু মহিলার কথা, কুৎসা উদ্ভাবনের ক্ষমতা যাদের প্রচুর। আমেরিকায় আমার কাজকে নস্যাৎ করে দেবার উদ্দেশ্যেই মিশনারিরা আমার ঐ বক্তব্যকে সমগ্র আমেরিকান নারীসমাজের ওপর আক্রমণ বলে প্রচার করছে, তারা জানে তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে কিছু বলা হলে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ তাতে বরং খুশীই হবে। প্রিয় মেরী, যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, আমি "ইয়াঙ্কিদের" সম্পর্কে যাবতীয় খারাপ কথা বলেছি, তাহলেও কি আমাদের মায়েদের এবং বোনেদের সম্পর্কে সর্বপ্রকার কটূক্তির দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও তা সমান হয়? "ভারতের বিধর্মী" আমাদের সম্বন্ধে খ্রীষ্টান ইয়াঙ্কি নরনারী যে ঘৃণা পোষণ করে তা ধৌত করতে "বরুণ দেবতার জলেও" কুলোবে না; তাছাড়া, তাদের কী ক্ষতি করেছি আমরা? সমালোচনা শুনে ধৈর্যরক্ষা করতে শিখে তারপর যেন "ইয়াঙ্কিরা" অপরকে সমালোচনা করতে আসে। এটি একটি সুপরিচিত মনোবিজ্ঞানসম্মত সত্য যে, যারা অপরকে গালমন্দ করতে সদাই প্রস্তুত তারা অপরের কাছ থেকে সমালোচনার সামান্যতম স্পর্শ মাত্র সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া, আমি তাদের কী ধার ধারি? তোমাদের পরিবার, মিসেস বুল, লেগেটরা এবং আরো কয়েকজন দয়ালু ব্যক্তি ছাড়া আর কে আমার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছে? আমার আইডিয়া যাতে কার্যকর করতে পারি সেজন্য কে আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল? মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত যেতে হয় এমন কঠোর পরিশ্রমে আমাকে কাজ করতে হয়েছে, আমার কর্মশক্তির প্রায় সবটা ব্যয় করতে হয়েছে আমেরিকায়, যাতে করে আমেরিকানরা আর একটু বেশী উদার হতে এবং অধিকতর আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। ইংল্যাণ্ডে মাত্র ছয়মাস আমি কাজ করেছি। সেখানে একটিমাত্র নিদর্শন ছাড়া কুৎসার আভাস মাত্র ছিল না; ঐ একটি নিদর্শনও জনৈকা আমেরিকান মহিলার কীর্তি, আর যে কারণে আমার ইংরেজ বন্ধুরা দারুণ স্বস্তিলাভ করেছিলেন। সেখানে কোনো আক্রমণ তো আসে নি বটেই, পরন্তু

ইংলিশ চার্চের বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন; না চাইতেই সেখানে কাজের জন্য আমি প্রভূত সাহায্য পেয়েছি, এবং আমার নিশ্চিত বিশ্বাস—আরো অনেক সাহায্য পাব। আমার কাজ দেখাশোনা করার জন্য এবং কাজে সাহায্য সংগ্রহের জন্য সেখানে একটি সোসাইটি আছে; কাজে সাহায্যের জন্য চারজন সম্মানীয় ব্যক্তি সেখান থেকে আমার সঙ্গে ভারতে এসেছেন, আরো অনেকে আসতে প্রস্তুত ছিলেন; পরের বার আমি যখন যাব তখন শত শত ব্যক্তি প্রস্তুত থাকবেন।

প্রিয় মেরী বোন, আমার জন্য ভয় পেয়ো না।...এই পৃথিবী অতি বিশাল—"ইয়াঙ্কিরা" যতই না কেন রাগ করুক, তা সত্ত্বেও এই বিশাল পৃথিবীতে আমার জন্য একটু স্থান থাকবেই। সে যা হোক না কেন, আমি আমার কাজে সন্তুষ্ট আছি। আমি কখনো কিছু পরিকল্পনা করিনি। সব কিছু যেমন এসেছে তেমনই গ্রহণ করেছি। একটিমাত্র আইডিয়া আমার মস্তিষ্ক আলোড়িত করেছিল—ভারতীয় জনসাধারণকে উন্নত করে তোলার একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার আইডিয়া—এই কাজটি কিছু পরিমাণে সম্পাদন করতে কৃতকার্য হয়েছি। তোমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হত যদি দেখতে আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ ব্যাধি যন্ত্রণার মধ্যে কীভাবে কাজ করে চলেছে—পরিত্যক্ত কলেরা রোগীর মাদুরের বিছানার পাশে বসে তার সেবা করছে, উপবাসী চণ্ডালকে আহার করাচ্ছে—আর প্রভু সাহায্য পাঠিয়ে যাচ্ছেন আমাকে এবং তাদের সবাইকে। "মানুষ আর কিই বা?" প্রেমাস্পদ প্রভু রয়েছেন আমার সঙ্গে, যখন আমেরিকায়, ইংল্যাণ্ডে ছিলাম তিনি ছিলেন আমার সঙ্গে, ভারতে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অপরিচিত আমি যখন স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়া-আসা করেছি তখনও তিনিই আমার সঙ্গে ছিলেন। ওসব লোকজন কী বলল না বলল তাতে আমি কী গ্রাহ্য করি?—তারা শিশুমাত্র, শিশুর চেয়ে বেশী কিছু তারা জানে না। কী! আমি পরমাত্মার সন্ধান পেয়েছি, সমস্ত পার্থিব বস্তু যে অসার তা উপলব্ধি করেছি—আমি বালখিল্যদের আবোল তাবোলে আমার নির্দিষ্ট পথ থেকে বিচ্যুত হব! আমাকে দেখে কি সেইরকম মনে হয়?

নিজের সম্পর্কে আমাকে অনেক কথা বলতে হল, তোমাদের কাছে সে আমার একটি দায়িত্ব বিশেষ। আমি বুঝতে পারছি আমার কাজ শেষ হয়েছে। বেশী হলে আমার জীবনের আর তিন-চার বছর বাকী। আমার নিজের মুক্তির ইচ্ছাও হারিয়েছি। আমি কখনো সাংসারিক সুখভোগ যাচ্ঞা করিনি। শুধু দেখতে চাই আমার যন্ত্রটি বেশ দৃঢ় এবং সক্রিয় রয়েছে, তারপর যখন নিশ্চিত জানব যে লোক-কল্যাণ নিমিত্ত অন্তত ভারতে এমন একটি হাতল জুড়ে দিয়ে গেলাম যাকে কোনো শক্তিই দাবিয়ে দিতে পারবে না, তখন ভবিষ্যতের কোনো চিন্তা মনে না রেখে আমি ঘুমুব। আর এই প্রার্থনা করি, নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে একমাত্র ভগবান বিদ্যমান আছেন এবং যে একমাত্র ভগবানের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য আমি যেন বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি—আর বলি, আমার সর্বাধিক উপাস্য দেবতা হবেন আমার পাপী-নারায়ণ, আমার তাপী-নারায়ণ, আমার সর্বজাতির সর্বজীবের দরিদ্র-নারায়ণ।

"যিনি রয়েছে তোমার অন্তরে ও বাহিরে, যিনি সব হাতে কাজ করেন, প্রত্যেক পায়ে চলেন, তুমি যাঁর একাঙ্গ, উপাসনা কর তাঁরই, আর সব মূর্তি ভেঙে ফেল।

"যিনি একাধারে উচ্চ এবং নীচ, সাধু ও পাপী, দেব এবং কীট সর্বরূপী, সেই প্রত্যক্ষ, জ্ঞেয়, সত্য ও সর্বব্যাপীর আরাধনা কর, আর সব মূর্তি ভেঙে ফেল।

"যাঁতে পূর্বজন্ম নেই পরজন্ম নেই, যাঁর বিনাশ নেই, গমন নেই, আগমনও নেই, যাঁতে অবস্থিত থেকে আমরা সর্বদা একত্ব লাভ করেছি এবং ভবিষ্যতেও করব, তাঁকেই পূজা কর, আর সব মূর্তি ভেঙে ফেল।

"মূর্খ তোমরা! যে সকল জীবন্ত নারায়ণে এবং তাঁর অনন্ত প্রতিবিম্বে জগৎ পরিব্যাপ্ত তাঁকে ছেড়ে ছুটছ কাল্পনিক ছায়ার পেছনে! তাঁরই—সেই একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতারই পূজা কর আর সব মূর্তি ভেঙে ফেল।"

আমার সময় অল্প। আমার যা কিছু বলবার আছে তা মন খুলে বলে যেতে হবে। তাতে কার আঘাত লাগবে বা কে বিরক্ত হবে সে বিচার করলে চলবে না। অতএব মেরী বোন, আমার মুখ থেকে যে কথাই বের হোক না কেন তাতে ভীত হয়ো না; কারণ আমার পশ্চাতে যে শক্তি কাজ করছেন তিনি বিবেকানন্দ নন, তিনি স্বয়ং প্রভু —কিসে ভালো হবে তা তিনিই জানেন। আমি যদি জগৎকে খুশী করতে যাই তাতে বরং জগতের ক্ষতিই হবে। গরিষ্ঠ লোকসংখ্যার কথা ভুল, কারণ দেখাই যাচ্ছে, তাদেরই শাসনে পৃথিবীর অবস্থা কী শোচনীয়। প্রত্যেকটি নবচিন্তার ক্ষেত্রেই বিরোধিতা দেখা দেবেই—সভ্যতার পরিবেশে তা আসবে মৃদু ভদ্র উপহাসরূপে, আর বর্বর পরিবেশে তাই দেখা দেবে অশিষ্ট চীৎকার এবং কদর্য কুৎসা হিসাবে।

এইসব কেঁচোকেও একদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে, বালক-বালিকাদেরও পেতে হবে জ্ঞানালোক। আমেরিকানরা এখন নূতন সুরায় পানোন্মত্ত। সমৃদ্ধির শত শত তরঙ্গ আমার দেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। আমরা যে শিক্ষা লাভ করেছি নতুনেরা তা এখনো বুঝতে পারে না। এসব মিথ্যা দর্প। এই বিকট জগতটা মায়ামাত্র। এই মায়া মোহ ত্যাগ করে সুখী হও। কাম-কাঞ্চন চিন্তা পরিহার কর। অন্য কোনো বাঁধন নেই। বিবাহ যৌনসম্পর্ক টাকাকড়ি এই সবই মূর্তিমান পিশাচস্বরূপ। পার্থিব প্রেম দেহ-সম্ভূত। কাম-কাঞ্চন সম্বন্ধ পরিত্যাগ কর। এসবের বন্ধন ছিন্ন হলেই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি উন্মুক্ত হবে। তখন আত্মা ফিরে পাবে তার অনন্ত শক্তি। খুব ইচ্ছে ছিল হ্যারিয়েটকে দেখতে ইংল্যাণ্ডে যাই। আমার আর একটিমাত্র ইচ্ছা আছে—মরবার আগে যেন তোমাদের চার বোনকে একবার দেখতে পাই। আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হতেই হবে।

তোমাদের চিরস্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[৩০]

(মিসেস লেগেটকে লেখা)

আলমোড়া
২৮ জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয় মা',

আপনার দয়া-সুন্দর পত্রখানার জন্য অজস্র ধন্যবাদ। লণ্ডনে থেকে খেতড়ির রাজার আমন্ত্রণ যদি গ্রহণ করতে পারতাম তবে বড় ভালো হত। গত মরশুমে যে লণ্ডনে আমাকে বহু নৈশভোজে উপস্থিত থাকতে হয়েছে। কিন্তু এবারে তা বরাতে জুটছে না, রাজার সঙ্গে লণ্ডনে যাবার পথে খারাপ স্বাস্থ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আলবার্টা তাহলে নিজ দেশ আমেরিকায় আর একবার ফিরে গেছে। রোমে আমার জন্য সে যা করেছে সেই হেতু তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। হোলি কেমন আছে? তাদের আমার ভালোবাসা জানাবেন, নতুন খুকীকে—আমার সব থেকে ছোট বোনটিকে আমার স্নেহচুম্বন।

গত নয়মাস যাবৎ আমি হিমালয় অঞ্চলে বিশ্রাম নিচ্ছি। এবার আবার কাজে জুটবার জন্য সমতলে নেমে যাব।

ফ্রাঁস্কিনসেন্স, জো জো এবং ম্যাবেলকে আমার ভালোবাসা জানাবেন। আপনাকেও আমার অনন্ত ভালোবাসা জানাচ্ছি।

চির ভগবদাশ্রিত আপনাদের
বিবেকানন্দ

[৩১]

(মিস ম্যাকলয়েডকে লেখা),

মঠ, বেলুড়
১১ অগস্ট, ১৮৯৭

প্রিয় জো,

…দেখ, মা জননীর কাজের কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ এই কাজের বনিয়াদ সত্য, নিষ্ঠা এবং পবিত্রতা, আর আজ পর্যন্ত এই ভিত্তি অবিচল। এই কাজের নীতি-বাক্যই হল পরিপূর্ণ নিষ্ঠা।

অজস্র ভালোবাসা সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৩২]

মারী
১১ অক্টোবর, ১৮৯৭

প্রিয় জগমোহনলাল,

…আমি তিনজন সন্ন্যাসী পাঠাচ্ছি জয়পুরে; তুমি বোম্বাই যাত্রা করার পূর্বে কাউকে ভার দিয়ে যেয়ো এদের যেন দেখাশুনো করে। তাদের আহার এবং উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা কোরো। আমি আসা পর্যন্ত ওখানে এরা থাকবে। নিষ্পাপ তিন সন্ন্যাসী, কিন্তু শিক্ষিত নয়। ওরা আমার সামগ্রী, একজন আমার গুরুভাই। তারা চাইলে খেতড়িতে নিয়ে যেয়ো, আমি ওখানে শীঘ্রই আসব। এখন আমি চুপচাপ ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই বছর বেশী বক্তৃতাও দেব না। এসব গোলমাল হৈ চৈ ব্যাপারে আমার আর আস্থা নেই, ওতে কাজের কাজ কিছু হয় না। কলকাতায় আমার নিকেতনটি স্থাপনের জন্য নীরবে চেষ্টা নিতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই অর্থসংগ্রহের জন্য কোনো সোরগোল না তুলে নানা কেন্দ্র ঘুরে দেখতে চলেছি।

আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৩৩]

("রামকৃষ্ণ কথামৃত"-লেখক মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে লেখা)

দেরাদুন
২৪ নভেম্বর, ১৮৯৭

প্রিয় ম.,

তোমার দ্বিতীয় পুস্তিকার ("কথামৃতের" অংশ সংবলিত) জন্য অজস্র ধন্যবাদ। সত্যিই চমৎকার হয়েছে। কাজটি মৌলিক; এবং তুমি যেভাবে হাজির করেছ এরকম করে লেখকের মনগড়া সব কিছু বাদ দিয়ে কোনো মহাপুরুষের জীবনী এর আগে প্রকাশ করা হয় নি। ভাষাটিও প্রশংসার ঊর্ধ্বে—জীবন্ত, ঋজু এবং সর্বোপরি সহজ ও সরল।

পুস্তিকাসমূহ আমার কত যে ভালো লেগেছে তা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছি না। যখন তা পড়ি তখন সত্যই আত্মহারা হয়ে যাই। আশ্চর্য নয় কি? আমাদের শিক্ষক ও প্রভু কতখানি মৌলিক ছিলেন; আমাদেরও প্রত্যেককে মৌলিকত্ব অর্জন করতে হবে, নইলে কিছুই হবে না। এখন আমি বুঝতে পারছি কেন আমরা কেউ তাঁর জীবনীতে হাত দিইনি—এই মহৎ কাজটি তোমারই জন্য সংরক্ষিত ছিল। তিনি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে রয়েছেন।

অজস্র ভালোবাসা ও নমস্কার।

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

সক্রেটিসের সংলাপে সর্বত্র প্লেটোরই উপস্থিতি। তুমি সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন। অধিকন্তু, নাট্যাংশটি অতীব সুন্দর। এখানে এবং পাশ্চাত্যেও সকলেরই এটি ভালো লেগেছে।

বি

[৩৪]

(খেতড়ির মহারাজাকে লেখা)

আলমোড়া
১ জুন, ১৮৯৮

মহাশয়,

আপনার স্বাস্থ্য ভালো নেই শুনে খুবই দুঃখিত হলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই আপনি সম্পূর্ণ হয়ে উঠবেন তা নিশ্চিত।

আগামী শনিবার আমি কাশ্মীর যাত্রা করছি। রেসিডেন্টের কাছে আপনি যে পরিচয়-পত্র দিয়েছেন তা আমার কাছে আছে; আরো ভালো হয় যদি এই পরিচয়-পত্র দানের কথা জানিয়ে আপনি তাঁকে কয়েক ছত্র লিখে দেন।

কিসানগড়ের দেওয়ান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি ব্যাস-সূত্রের নিমবার্ক ভাষ্য এবং অন্যান্য ভাষ্য তার পণ্ডিতগণের মারফৎ আমাকে দেবেন; আপনি দয়া করে জগমোহনকে বলবেন সে যেন দেওয়ানকে এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে একখানা চিঠি দেয়।

অজস্র ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সহ
আপনাদের বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

বেচারী গুডউইন মারা গেছে। জগমোহন তাকে ভালো জানে। যদি পাওয়া যায় তবে আমার দুটি ব্যাঘ্রচর্ম চাই—মঠে পাঠাব দুজন ইউরোপীয় বন্ধুকে উপহার দেবার জন্য। পশ্চিম দেশীয়দের কাছে এই উপহার অত্যন্ত সন্তোষের।

[৩৫]

(খেতড়ির মহারাজাকে লেখা)

C/o ঋষিবর মুখার্জি
প্রধান বিচারপতি, কাশ্মীর
১৭ সেপ্টেম্বর, ৮৯৮

মহাশয়,

দুই সপ্তাহ এখানে আমি অত্যন্ত পীড়িত ছিলাম। এখন কিছুটা ভালো হচ্ছি। আমি খুব অর্থাভাবে আছি। আমাকে সাহায্য করার জন্য আমেরিকান বন্ধুরা

যথাসাধ্য করছেন; কিন্তু সব সময় তাদের কাছে সাহায্য ভিক্ষে করতে আমার লজ্জা হয়—বিশেষতঃ অসুখ-বিসুখ হলে এটা ওটা খরচ যেন লেগেই থাকে। সারা বিশ্বে একজন ব্যক্তির কাছে সাহায্য ভিক্ষে করতে আমার কোনো লজ্জা নেই—সেই ব্যক্তি আপনি। আপনি দেন বা প্রত্যাখ্যান করেন, আমার কাছে দুই-ই সমান। যদি সম্ভব হয় দয়া করে কিছু টাকা পাঠাবেন। আপনি কেমন আছেন? আমি অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি নীচে নেমে আসব।

জগমোহনের কাছে কুমার সাহেবের পূর্ণ আরোগ্যের খবর শুনে খুব আনন্দিত হলাম। আমার এদিকে ভালোই চলছে, আশা করি আপনারও।

চিরভগবদাশ্রিত আপনাদের
বিবেকানন্দ

[৩৬]

(খেতড়ির মহারাজাকে লেখা)

লাহোর
১৬ অক্টোবর, ১৮৯৮

মহাশয়,

আমার টেলিগ্রামের পরের চিঠিতে প্রার্থিত সংবাদ দেওয়া হয়েছে; তাই আপনার তারের জবাবে আমার স্বাস্থ্যের সংবাদ দিয়ে আবার আমি তার করিনি।

এ বছর কাশ্মীরে খুব ভুগলাম, এখন ভালো আছি; আজ সোজা কলকাতায় যাচ্ছি। গত প্রায় দশ বছর আমি বাংলাদেশে দুর্গাপূজা দেখিনি—সেখানে ওটি একটি বিরাট ব্যাপার। এ বছর পূজায় উপস্থিত থাকব আশা করি।

পশ্চিমী বন্ধুরা দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে জয়পুর দেখতে আসবেন। জগমোহন যদি ওখানে থাকে তাহলে দয়া করে তাকে বলবেন, সে যেন ওদের প্রতি একটু মনোযোগ দেয় এবং তাঁদের নগরী ঘুরিয়ে পুরাতন শিল্পসম্ভারসহ সব দেখিয়ে দেয়।

আমি আমার ভ্রাতা সারদানন্দর কাছে নির্দেশাবলী রেখে যাচ্ছি; বন্ধুরা জয়পুরে যাত্রা করবার আগে সে মুন্সীজীকে লিখে জানাবে।

কুমার সাহেব এবং আপনি নিজে কেমন আছেন? সদা সর্বদা আপনাদের কল্যাণ কামনা করি।

আপনার স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,
আমার ভবিষ্যৎ ঠিকানা: মঠ, বেলুড়, হাওড়া জিলা, বঙ্গদেশ।

[৩৭]

(খেতড়ির মহারাজাকে লেখা)

মঠ, বেলুড়
হাওড়া জিলা, বঙ্গদেশ
২৬ অক্টোবর, ১৮৯৮

মহদাশয়,

আপনার স্বাস্থ্যের কথা ভেবে খুবই উৎকণ্ঠায় আছি। ফেরবার পথে একবার দেখে আসবার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্বাস্থ্যে কুলালো না, তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম। এখন ভয় হচ্ছে আমার হৃদ্‌যন্ত্রে কিছু গোলমাল আছে।

কিন্তু আপনার স্বাস্থ্য বিষয়ে আমি সাবশেষ চিন্তিত। আপনি চাইলে, আপনাকে দেখবার জন্য আমি খেতড়ি চলে আসব। আপনার কল্যাণের জন্য দিবা-রাত্রি প্রার্থনা করছি। কিছু ঘটলেও সাহস হারাবেন না, আপনাকে রক্ষা করার জন্য "মা" আছেন। আপনার সব কথা জানিয়ে আমাকে চিঠি দেবেন।…কুমার সাহেব কেমন আছেন?

অজস্র ভালোবাসা এবং অনন্ত আশীর্বাদ সহ
চির ভগবদাশ্রিত আপনাদের
বিবেকানন্দ

[৩৮]

(খেতড়ির মহারাজাকে লেখা)

মঠ, বেলুড়
হাওড়া জিলা
নভেম্বর (?), ১৮৯৮

মহদাশয়,

আপনি এবং কুমার সাহেব সুস্বাস্থ্য ভোগ করছেন জেনে খুব আনন্দিত হলাম। এদিকে আমার হার্ট খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। হাওয়া বদলে কোনো ফল হবে মনে হয় না। গত ১৪ বছরে কোনো একটি স্থানে এক নাগাড়ে তিনমাসও ছিলাম কিনা তা মনে করতে পারছি না। অথচ এক জায়গায় যদি মাসকয়েক এক নাগাড়ে থাকতে পারি তাহলে উপকার হবে বলে আশা রাখি। ও নিয়ে অবশ্য খুব যে ভাবি তা নয়। আমার বোধ হয় আমার এই জীবনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ভালো ও মন্দের মধ্য দিয়ে, বেদনা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়েছে আমার জীবনতরী। একটি যে শিক্ষা আমি লাভ করেছি তা হল: জীবন যন্ত্রণাময়, জীবনে যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু নেই। কিসে ভাল হবে তা মা-ই জানেন। আমরা প্রত্যেকে কর্মের অধীন; তা স্বয়ংক্রিয়—তার আর ব্যতিক্রম নেই। জীবনের একটি

সামগ্রী অবশ্য আছে, যে কোনো মূল্যে তা গ্রহণীয়,—তা হল প্রেম। অনন্ত অসীম ভালোবাসা, আকাশের ন্যায় উদার, সমুদ্রের ন্যায় গভীর প্রেম—জীবনে এইটিই মহৎ লাভ। যার প্রেম আছে সেই ধন্য।

সদা ভগবদাশ্রিত আপনাদের
বিবেকানন্দ

[৩৯]

(খেতড়ির মহারাজাকে লেখা)

মঠ, বেলুড়
১৫ ডিসেম্বর, ১৮৯৮

মহদাশয়,

মিঃ ছুলিচাঁদের কাছে পাঁচ শতর অর্ডার সমেত আপনার সহৃদয় পত্র পেয়েছি। আমি এখন খানিকটা ভালো আছি। জানি না এই উন্নতি অব্যাহত থাকবে কিনা।

শুনছি, আপনি এই শীতকালে কলকাতায় আসবেন—সত্যি নাকি? নতুন ভাইসরয়কে সম্মান জানাতে রাজারা সবাই আসছেন। কাগজে দেখছি, শিকারের মহারাজা ইতিপূর্বেই এখানে এসে রয়েছেন।

আপনার এবং আপনাদের সকলের কল্যাণে সতত প্রার্থনা করছি।

ভগবদাশ্রিত আপনাদের
বিবেকানন্দ

[৪০]

(মিস যোসেফাইন ম্যাকলয়েডকে লেখা)

মঠ, বেলুড়
হাওড়া, বঙ্গদেশ
২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯

প্রিয় জো,

এতদিনে তুমি নিশ্চয় নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছ, এবং দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর নিশ্চয়ই নিজের কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েছ। এই যাত্রায় প্রতি পদক্ষেপে ভাগ্য তোমার অনুকূল ছিল,—সমুদ্রও ছিল শান্ত এবং শীতল, জাহাজেও অবাঞ্ছিত সঙ্গী প্রায় ছিল না। আমার ক্ষেত্রে অবশ্য উল্টোটাই ঘটছে। তোমার সঙ্গে যেতে পারলাম না বলে আমি প্রায় হতাশ হয়েছি। বৈদ্যনাথে হাওয়া বদলের ফলেও কোনো উপকার

হয়নি। সেখানে প্রায় মরেই যাচ্ছিলাম, আটটি দিন এবং আটটি রাত্রি আমাকে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে থাকতে হয়েছিল! কলকাতায় আমাকে প্রায় মৃত অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়; এখানে আবার বেঁচে উঠবার জন্য এখন চেষ্টা করে চলেছি।

এখন ডাঃ সরকার আমার চিকিৎসা করছেন।

আগের মতো এখন আর আমি ততটা নিরুত্তম নই। ভাগ্যের হাতে আত্ম-সমর্পণ করেছি। এ বছরটা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন মনে হচ্ছে। মার বাড়িতে যে যোগানন্দ বাস করত সে গতমাস থেকে খুব রোগে ভুগছে, প্রায় প্রতিদিনই মৃত্যুর দ্বারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। মা-ই জানেন সব। আমার আবার কাজের স্পৃহা জেগেছে; নিজে অবশ্য পারি না, ছেলেদের পাঠিয়ে দিচ্ছি সারা ভারতে আবার এক আলোড়ন সৃষ্টি করার জন্য। সর্বোপরি, তুমি তো জানো, সব থেকে বড় অসুবিধা হল অর্থাভাব। এখন তো তুমি আমেরিকায় জো, আমাদের এখানকার কাজের জন্য কিছু অর্থসংগ্রহের চেষ্টা কোরো।

মার্চ মাস নাগাদ আবার উঠে দাঁড়াতে পারব আশা করি, এপ্রিল মাসে ইউরোপ যাত্রা করব। আবার বলি, মা-ই জানেন ভালো।

সারা জীবন আমি দেহে ও মনে কষ্ট ভোগ করেছি, কিন্তু মা-র অনুগ্রহ রয়েছে অপরিসীম। আনন্দ এবং কল্যাণও যা পেয়েছি আমি তার উপযুক্ত নই। মা-র কাজ যাতে ব্যর্থ না হয় তার জন্য সংগ্রাম করছি, তিনি আমাকে সর্বদাই সংগ্রামরত দেখবেন, আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়বে রণক্ষেত্রেই।

তোমাকে জানাই আমার অফুরন্ত ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ।

চির সত্য আশ্রিত তোমাদের

বিবেকানন্দ

[৪১]

(খেতড়ির মহারাজাকে লেখা)

মঠ

আলমবাজার (?)

১৪ জুন, ১৮৯৯

প্রিয় বন্ধু,

আমি এখানে যেরকম আছি, আপনিও সেইরকম থাকুন—এই আমার কামনা। এই মুহূর্তে আপনার সব থেকে বেশী প্রয়োজন বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা।

কয়েক সপ্তাহ আগে আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু আপনার কোনো সংবাদ পাইনি। আশা করি এখন আপনার স্বাস্থ্য ভালো আছে। এই মাসের ২০ তারিখে আমি আবার ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করছি।

সমুদ্র-যাত্রার ফলে কিছু উপকার হবে বলেও আশা করি।

ধর্ম মহাসভার অধিবেশন মঞ্চে। দক্ষিণে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

ধর্মমহাসভায় পূর্ব ভারতীয় প্রতিনিধিরা

বাম থেকে : নরসিংহাচার্য, লক্ষ্মীনারায়ণ, বিবেকানন্দ, অনাগরিক ধর্মপাল ও বীরচাঁদ গান্ধী।

চিকাগো আর্ট ইনষ্টিট্যুট—ধর্ম মহাসভার অধিবেশন স্থল
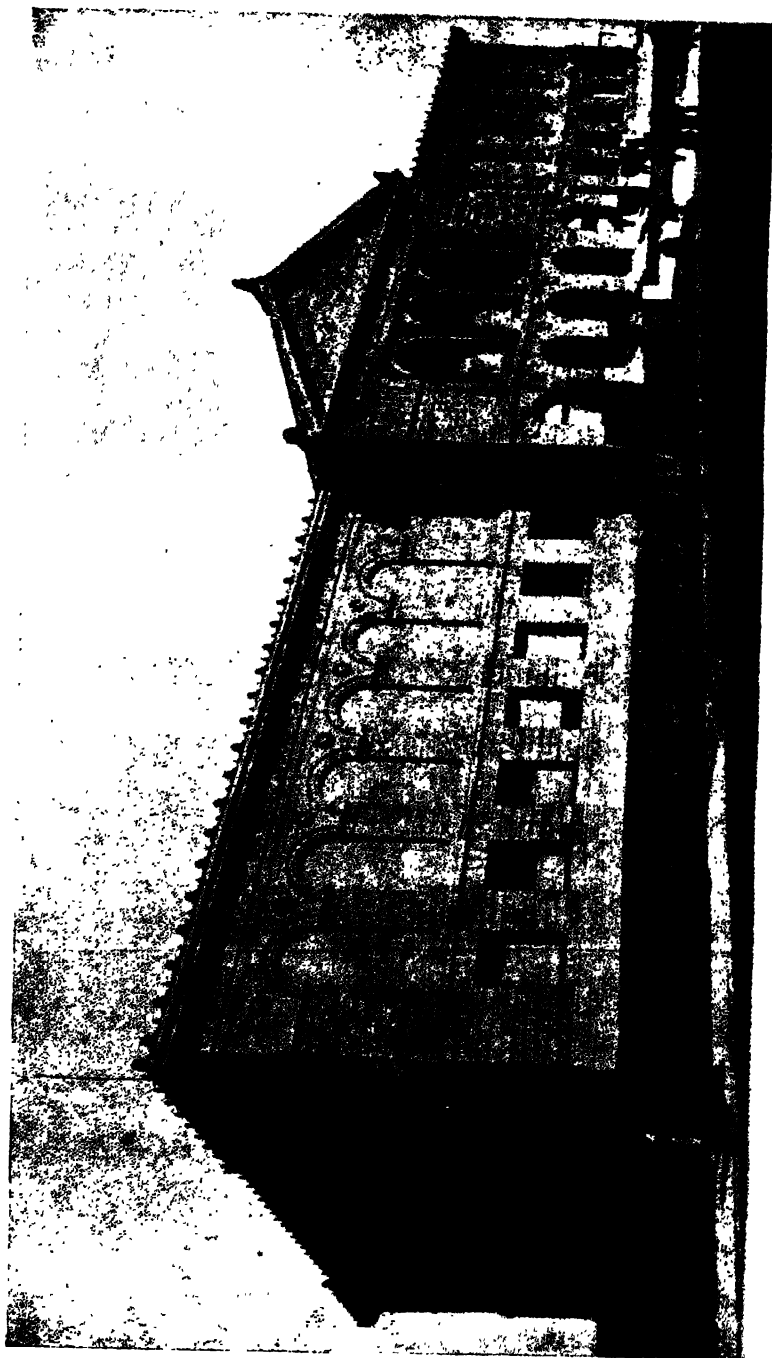
স্বামী বিবেকানন্দ ও নরসিংহাচার্য

সকল বিপদ-আপদ থেকে ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন! আপনার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ হোক!

ভগবদাশ্রিত আপনাদের
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,
জগমোহনকে ভালোবাসা ও বিদায় জানাচ্ছি।

[৪২]

রিজলি
২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯

প্রিয়—,

···সংগ্রাম ও মোহমুক্তির একটানা প্রবাহই জীবন।···জীবনের অন্তর্গূঢ় রহস্য ভোগে নয়, অভিজ্ঞতার মারফৎ শিক্ষার মধ্যে। কিন্তু হায়, যে মুহূর্তে আমরা সত্যি সত্যি শিখতে সুরু করি তখনই আমাদের অপসৃত হয়ে যেতে হয়। ভবিষ্যতে আর একটি অস্তিত্বের পক্ষে এ একটি শক্তিশালী যুক্তি বলে বোধ হয়।···প্রত্যেক স্থানে কাজে যদি একটা উদ্দাম ঝড় বয়ে যায় তাহলেই ভালো হয়। তার ফলে আবহাওয়া পরিষ্কার হতে পারে এবং আমরা সব জিনিসের প্রকৃতি বিষয়ে সত্য অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারি। তা সুরু হয়েছে নতুন, কিন্তু বনিয়াদ অত্যন্ত কঠিন।···

শুভেচ্ছা সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৪৩]

(মিসেস ওলি বুলকে লেখা)

"প্রবুদ্ধ ভারত" অফিস
অদ্বৈত আশ্রম
মায়াবতী (আলমোড়া হয়ে)
কুমায়ুন, হিমালয়
৬ জানুয়ারি, ১৯০১

প্রিয় মাতা,

আপনার মারফৎ ডাঃ বোস যে নামদির স্তোত্র পাঠিয়েছিলেন তার একটি অনুবাদ সঙ্গে সঙ্গে পাঠালাম। অনুবাদে যথাসাধ্য আক্ষরিক হতে চেষ্টা করেছি।

আশা করি, ইতিমধ্যে ডাঃ বোস তার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন।

মিসেস সেভিয়ার বেশ শক্ত মেয়ে, ক্ষতিটা বেশ শান্তভাবে এবং সাহসের সঙ্গে সহ্য করেছেন। এপ্রিল মাসে তিনি ইংল্যাণ্ডে যাবেন, আমিও তাঁর সঙ্গে যাচ্ছি।

এই গ্রীষ্মকালে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার ইংল্যাণ্ডে আসা উচিত। মিসেস সেভিয়ার যখন তার স্বামীর কাজে উপস্থিত থাকবার জন্য ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছেন, আমিও তার সঙ্গ নিচ্ছি।

এই জায়গাটি খুবই সুন্দর, আর এরা একে একেবারে নিখুঁত করেছে। কয়েক একর সম্বলিত বিরাট জায়গা। সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণও চমৎকার। আশা করি ভবিষ্যতেও মিসেস সেভিয়ার এই সব বজায় রাখতে পারবেন। তিনি অবশ্য তাই চান।

জো তার সর্বশেষ চিঠিতে জানিয়েছে সে মাদাম কালভের সঙ্গে যাচ্ছে—।

মারগট তার লোক-কাহিনীর কাজ ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখছে জেনে আনন্দিত হলাম। তার বইখানা এখানে খুবই সমাদৃত হয়েছে; কিন্তু মনে হচ্ছে প্রকাশকরা বিক্রীর ব্যাপারে তেমন সচেষ্ট নয়।

কলকাতায় পৌঁছানোর প্রথম দিনেই আবার হাঁপানি দেখা দিয়েছিল; যে দুই সপ্তাহ ছিলাম তার প্রতি রাত্রিতে তার প্রকোপে পড়েছি। হিমালয়ে এসে অবশ্য বেশ ভালো আছি।

এখানে খুব তুষারপাত হচ্ছে, পথে তুষার ঝড়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম; কিন্তু খুব ঠাণ্ডা নয়; পথে দুদিন তুষারে পড়ে আমার প্রভূত উপকার হয়েছে মনে হয়।

আজ তুষারের মধ্য দিয়ে প্রায় এক মাইল হেঁটে পাহাড়ে উঠেছি, মিসেস সেভিয়ারের জমি দেখতে দেখতে উঠলাম। চারদিকে তিনি চমৎকার রাস্তা তৈরী করিয়েছেন। তাঁর জমির সীমানার মধ্যে রয়েছে প্রচুর বাগান, মাঠ, ফলের বাগিচা এবং বন। বাসগৃহগুলি অত্যন্ত সাধাসিধা, অতি পরিচ্ছন্ন অথচ অতি মনোরম, সর্বোপরি তা কাজের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

আপনি কি শীঘ্র আমেরিকা যাচ্ছেন? না গেলে আগামী তিন মাসের মধ্যে লণ্ডনে আপনার সঙ্গে দেখা হবে আশা করি।

মিস ওলককে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন, এর পরে যখন মিস মুলারের সঙ্গে আপনার দেখা হবে তাকে আমার অফুরন্ত ভালোবাসা জানাবেন। স্টার্ডিকেও। কলকাতায় মায়ের সঙ্গে, আত্মীয় ভাই বোনের সঙ্গে এবং অন্যান্য সব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে।

আপনি আমার জ্ঞাতি বোনকে যে অর্থ পাঠিয়ে থাকেন সেটা দয়া করে আমার কাছে আমার নামে পাঠাবেন, চেক ভাঙিয়ে তাকে টাকাটা আমিই দেব। চলে আসবার সময় দেখেছি, মঠে সারদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এবং আর আর সবাই ভালো আছে।

এখানকার সবাই ভালোবাসা জানাচ্ছে।

আপনার চির স্নেহবদ্ধ সন্তান
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

কালী দুইটি বলি নিয়েছেন; আদর্শের কাজে শহীদ হয়েছেন দুইজন ইউরোপীয়ান। এখন তিনি স্বমহিমায় জেগে উঠবেন।

বি

আলবার্টা ও মিসেস ভোগানকে আমার ভালোবাসা।

চারদিকে ছয় ইঞ্চি পুরু হয়ে তুষার পড়েছে। সূর্য আপন মহিমায় ভাস্বর। মধ্যাহ্ন দিবসে আমরা বাইরে বসে পড়ছি। চারদিক ঘিরেই তুষার! তুষার সত্ত্বেও শীত এখানে অনুগ্র। বাতাস শুষ্ক এবং সুগন্ধ, আর জল সর্ব প্রশংসার অতীত।

বি

[৪৪]

মায়াবতী, হিমালয়
১৫ জানুয়ারি, ১৯০১

প্রিয় স্টার্ডি,

সারদানন্দর কাছ থেকে জানলাম, ইংল্যাণ্ডে কাজের জন্য যে টাঃ ১৫২৯-৫-৫ হাতে ছিল সেটা তুমি মঠে পাঠিয়ে দিয়েছ। আমি নিশ্চিত, টাকাটার সদ্ব্যবহার হবে।

প্রায় তিনমাস আগে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার গতায়ু হয়েছেন। এখানে এই পর্বতাঞ্চলে এঁরা একটি চমৎকার জায়গা তৈরী করেছেন। মিসেস সেভিয়ার জায়গাটি রাখবেন বলেহ মনস্থ করেছেন। আমি এখন তাঁর এখানেই এসেছি, সম্ভবত তাঁর সঙ্গেই ইংল্যাণ্ডে আসব।

প্যারিস থেকে তোমাকে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম। বোধ হয় তা তুমি পাওনি।

মিসেস স্টার্ডির মৃত্যু সংবাদে মর্মাহত হলাম। সুমাতা এবং সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন তিনি। পুরুষ মানুষের জীবনে সচরাচর এমন নারীরত্নের দেখা মেলে না।

এই জীবনটা ঘাত অভিঘাতে ভরা। তবু কোনো প্রকারে তার জের চলে যায়— সেইটিই ভরসা।

তোমার শেষের চিঠিতে মন খুলে মত প্রকাশ করেছ বলে যে আমি চিঠি লেখা বন্ধ করেছি তা নয়। আমার অভ্যাস মত ঢেউটাকে শুধু চলে যেতে দিলাম। চিঠিপত্র লিখলে সামান্য একটি বুদ্বুদকে ঢেউয়ে পরিণত করা হত।

দেখা হলে মিসেস জনসনকে এবং অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের আমার সম্মান ও ভালোবাসা জানাবে।

সদা সত্যাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৪৫]

(মিসেস ওলি বুলকে লেখা)

মঠ, বেলুড়
হাওড়া জিলা,
বঙ্গদেশ
২৬ জানুয়ারি, ১৯০১

প্রিয় মাতা,

আপনার উৎসাহপ্রদ কথাগুলির জন্য অজস্র ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে আমার তা খুব প্রয়োজন ছিল। নতুন শতাব্দীর আবির্ভাব হল, কিন্তু বিষাদের আবহাওয়া কাটল না, বরং তা আরো ঘনীভূত হচ্ছে দেখছি। মিসেস সেভিয়ারকে দেখতে মায়াবতী গিয়েছিলাম। পথে শুনতে পেলাম খেতড়ির রাজা অকস্মাৎ মারা গেছেন। শোনা যাচ্ছে তিনি নিজের খরচে আগ্রায় প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরূপ কিছু সৌধ মেরামত করাচ্ছিলেন, পরিদর্শনের জন্য উচ্চ টাওয়ারে উঠেছিলেন। সেই টাওয়ারের অংশ বিশেষ ধ্বসে পড়ে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ নিহত হন।

চেক তিনখানা এসেছে। আমার আত্মীয় বোনের সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র তা তার কাছে পৌঁছুবে।

জো এসেছে। কিন্তু তার সঙ্গে এখনো আমার দেখা হয়নি।

যে মুহূর্তে বাংলাদেশে, বিশেষ করে মঠে আসি তখনই আমার হাঁপানির প্রকোপ দেখা দেয়; যখনই এই স্থান ত্যাগ করি তখনই আবার আরোগ্য লাভ করি।

আগামী সপ্তাহে মাকে নিয়ে তীর্থ যাত্রায় বেরুচ্ছি। সমস্ত তীর্থক্ষেত্র পর্যটন করে আসতে কয়েক মাস লেগে যেতে পারে। হিন্দু বিধবার একটি মস্ত বড় অভিলাষ তীর্থ করা। আমি সারাজীবন আমার আত্মীয়-পরিজনকে কেবল দুঃখই দিয়েছি। এখন মায়ের অন্তত এই একটি ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করছি।

মারগটের বিষয়ে ওসব কথা শুনে খুবই আনন্দিত হলাম। এখানে সবাই তাকে আবার স্বাগত জানাতে ব্যগ্র।

আশা করি, ডাঃ বোস ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন।

মিসেস হ্যামণ্ডের কাছ থেকেও একখানা সুন্দর চিঠি পেয়েছি। মহীয়সী মহিলা তিনি।

আমি এখন খুবই শান্ত সমাহিত এবং আত্মস্থ আছি। সব কিছুই প্রত্যাশার অতিরিক্ত ভালো লাগছে।

অজস্র ভালোবাসা সহ।

আপনার সন্তান
বিবেকানন্দ

[৪৬]

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা)

মঠ, বেলুড়

প্রিয় শশী,

মাকে নিয়ে আমি যাচ্ছি রামেশ্বরম, ব্যাস। মাদ্রাজে আদৌ যাব কিনা জানি না। যদি যাই তাহলে একেবারে অপ্রকাশ্যে। আমার দেহ ও মন সম্পূর্ণ ক্লান্ত; এখন আমি কাউকেই সহ্য করতে পারি না। কাউকে আমি চাই না। কাউকে সঙ্গে নেবার শক্তি, অর্থ, ইচ্ছা—কোনটাই আমার নেই। গুরু মহারাজের ভক্তবৃন্দ হোক আর না হোক, কিছু যায় আসে না। এরকম একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাটাই তোমার বোকামি।

তোমাকে আবার বলছি, আমি এখন জীবিত অপেক্ষা মৃত। এখন কাউকে দেখতে চাই না। যদি তার ব্যবস্থা না করতে পার তাহলে মাদ্রাজে যাব না। শরীর বাঁচানোর জন্য এখন আমাকে খানিকটা স্বার্থপর হতেই হবে।

যোগিন-মা এবং অন্যান্যরা তাদের নিজ নিজ পথে চলুন। আমার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় আমি কারও সঙ্গ নিতে পারব না।

তোমাদের প্রেমবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[৪৭]

(মিসেস ওলি বুলকে লেখা)

মঠ, বেলুড়
হাওড়া জিলা, বঙ্গদেশ
২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০১

প্রিয় মাতা,

কয়েকদিন পূর্বে ১৫০ টাকার চেক সমেত আপনার চিঠি পেয়েছি। আগের তিনটি চেক আমার আত্মীয় বোনকে দিয়েছি, তাই এই চেকখানা ছিঁড়ে ফেলব।

জো এখানে আছে, তার সঙ্গে আমার দুবার দেখা হয়েছে; সে এখন দেখা-সাক্ষাৎ করতে ব্যস্ত। ইংল্যাণ্ডে যাবার পথে মিসেস সেভিয়ারের শীঘ্রই এখানে আসবার কথা আছে। তার সঙ্গে আমিও ইংল্যাণ্ডে যাব এমন একটা কথা হয়েছিল; কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আমাকে মায়ের সঙ্গে বের হতে হবে এক দীর্ঘ তীর্থযাত্রায়।

বাংলাদেশে পা দিলেই আমার স্বাস্থ্য বিগড়ে যায়; এখন অবশ্য তাতে আর তত গ্রাহ্য করি না; ঠিক ঠিক চলছি এবং সেইভাবে কাজকর্ম করছি।

মারগটের সাফল্যের কথা শুনে সুখী হলাম; কিন্তু জো বলছে, তেমন নাকি অর্থকরী হচ্ছে না; ওখানেই তো মুস্কিল। শুধু টিকে থাকার তেমন কোনো মূল্য নেই, আর লণ্ডন থেকে কলকাতা অনেক তফাৎ। যা হোক, মা-ই জানেন। মারগটের

"মা কালী" প্রত্যেকেই প্রশংসা করছে; কিন্তু হায়! কিনতে গিয়ে বই পাওয়া যায় না; বই বিক্রী বাড়ানোর ব্যাপারে বিক্রেতারা অসম্ভব রকম উদাসীন।

মহত্তর ভবিষ্যতের জন্য এই নতুন শতাব্দীতে আপনাকে এবং আপনাদের শরীর স্বাস্থ্য আরো ভালো হোক, সর্ববিষয়ে আপনি এবং আপনারা উপযুক্ত অবলম্বন লাভ করুন—এই প্রার্থনা করি।

আপনার সন্তান
বিবেকানন্দ

[৪৮]

(মিস যোসেফাইন ম্যাকলয়েডকে লেখা)

বেলুড় মঠ
জিলা হাওড়া
১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯০১

প্রিয় জো,

বইস কলকাতায় আসছে শুনে যারপরনাই আনন্দিত হলাম। তাকে অবিলম্বে মঠে পাঠিয়ে দেবে। আমি এখানে থাকব। যদি সম্ভব হয় কয়েকদিন তাকে এখানে রাখব। তারপর সে আবার নেপালে চলে যেতে পারবে।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৪৯]

মঠ, বেলুড়
হাওড়া, বঙ্গদেশ
১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০১

প্রিয় জো,

তোমার দীর্ঘ সুন্দর পত্রখানা এইমাত্র পেলাম। মিস কর্নেলিয়া সোরাবজীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে এবং তাকে তোমার ভালো লেগেছে জেনে খুব খুশী হলাম। পুনায় তার পিতার সঙ্গে এবং আমেরিকায় এক ছোট বোনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সম্ভবত তার মাতারও মনে আছে আমার কথা—যে সন্ন্যাসী পুনায় লিমডির ঠাকুর সাহেবের বাড়িতে বাস করত।

আশা করি তুমি বরোদায় যাবে এবং মহারানীর সঙ্গে দেখা করবে।

আমি এখন অনেকটা ভালো আছি এবং আশা করি আরো কিছুকাল থাকব। মিসেস সেভিয়ারের কাছ থেকেও এখনই একখানা সুন্দর চিঠি পেয়েছি, তাতে তিনি তোমার সম্পর্কে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা লিখেছেন।

মিঃ টাটার সঙ্গে দেখা করেছ জেনে এবং তাঁকে দৃঢ়চেতা ও সজ্জন বলে বুঝতে পেরেছ জেনে খুবই আনন্দিত হলাম।

বোম্বাই যাবার মত শারীরিক সামর্থ্য থাকলে আমি নিশ্চয়ই আমন্ত্রণ গ্রহণ করব। কোন স্টীমারে কলম্বো যাত্রা করছ তার নামটি টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিয়ো।

অফুরন্ত ভালোবাসা জানবে।

তোমাদের স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[৫০]

(মিসেস ওলি বুলকে লেখা)

ঢাকা
২৯ মার্চ, ১৯০১

প্রিয় মাত',

ঢাকা থেকে প্রেরিত আমার অন্য চিঠিখানাও এর মধ্যে নিশ্চয়ই পেয়েছেন। কলকাতায় সারদানন্দ জ্বরে খুব ভুগছে; জায়গাটা একেবারে শয়তানের বাসা, নরক হয়ে উঠেছে। এখন খানিকটা সুস্থ হয়ে মঠে রয়েছে; ভগবানের দয়ায় মঠটি আমাদের বাংলাদেশের সবথেকে স্বাস্থ্যকর স্থানসমূহের অন্যতম।

আমার মা আর আপনার মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছে জানি না, আমি উপস্থিত ছিলাম না। মনে হয় মারগটকে দেখবার জন্য তাঁর এক বিপুল আগ্রহ, আর কিছু নয়।

মারগটের উদ্দেশে আমার উপদেশ এই, ইংল্যাণ্ডে বসে তার প্ল্যান পাকা করুক এবং বেশ কিছু কাল ধরে সেখানেই তা কার্যকর করুক, তারপর যেন সে ফিরে আসে। বাস্তব ভালো কাজের জন্য সময় দিতে হয়।

মিসেস ব্যানার্জি কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন; সারদানন্দ শরীরে একটু বল পেলেই দার্জিলিঙে তাঁর কাছে যাবে ভাবছে।

জাপান থেকে জোর কোনো সংবাদ এখনো পাই নি। মিসেস সেভিয়ার শীঘ্রই যাত্রা করবেন মনে করছেন। আমার মা, কাকীমা, বোন পাঁচদিন পূর্বে ঢাকায় এসেছিলেন, ব্রহ্মপুত্র নদীতে পুণ্যস্নান উপলক্ষে। নানা গ্রহসংস্থান যখনই একত্রে মিলিত হয়—ব্যাপারটা অবশ্য ঘটে খুব কমই—তখনই নদীর একটি বিশেষ স্থলে বিরাট জনসমাবেশ ঘটে। এ বছর এক লক্ষেরও বেশী লোক হয়েছিল; নদীতে মাইলের পর মাইল শুধু নৌকো।

নির্দিষ্ট স্থানটিতে নদীর প্রস্থ প্রায় এক মাইল, কিন্তু সবটা কাদার একটা বিশাল তাল! তবু বেশ দৃঢ় ছিল, কাজেই আমাদের চান, পুজো-অর্চা সব কিছুই হল।

ঢাকা আমার বেশ ভালোই লাগছে। মাকে এবং অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে আমি যাব বাংলাদেশের সব থেকে পূর্ব কোণে অবস্থিত পুণ্যস্থান চন্দ্রনাথে।

আমি আছি ভালোই। আশা করি আপনি, আপনার কন্যা এবং মারগট বেশ সুস্থ আছেন।

অনন্ত ভালোবাসা সহ

আপনার সন্তান বিবেকানন্দ

পুনশ্চ, আমার মা ও বোন আপনাকে ও মারগটকে ভালোবাসা জানাচ্ছে।

পুনশ্চ, তারিখটা আমি জানি না। বি

[৫১]

মঠ
১৫ মে, ১৯০১

প্রিয় স্বরূপ (আনন্দ),

নৈনিতাল থেকে লেখা তোমার পত্র বিশেষ উদ্দীপনাময়। আমি সবেমাত্র আসাম ও পূর্ববঙ্গ সফর করে ফিরেছি। যথারীতি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছি এবং ভেঙে পড়েছি।

যদি বরোদার মহারাজার সঙ্গে দেখা করলে সত্যকার কোনো কাজ হয় তাহলে আমি যেতে রাজী আছি; নতুবা এই লম্বা ভ্রমণের পরিশ্রম এবং অর্থব্যয়ের মধ্যে যেতে চাই না।

অতএব মহারাজার সঙ্গে দেখা করলে আমাদের কাজের বিশেষ সাহায্য হবে কিনা —এ বিষয়ে ভালো করে চিন্তা করে, খোঁজ-খবর নিয়ে তোমার কী মত তা জানিয়ে চিঠি দিয়ো।...

আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

তোমাদের বিবেকানন্দ

[৫২]

(মিস মেরী হালেকে লেখা)

মঠ, বেলুড়
হাওড়া জিলা, বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ
১৮ মে, ১৯০১

প্রিয় মেরী,

হোমড়া-চোমড়া নামের জুতোর ফিতের সঙ্গে বাঁধা থাকা কখনো কখনো খুবই দুরূহ হয়ে পড়ে। আমার চিঠির ক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটেছে। তুমি চিঠি লিখেছ ২২

জানুয়ারি, ১৯০১ সাল তারিখে। তখন তুমি একটি মস্ত নাম : মিস ম্যাকলয়েডের জুতোর ফিতের সঙ্গে আমাকে বেঁধেছ। ফলে চিঠিখানা তার অনুসরণে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছে। মাত্র গতকাল তা আমার কাছে পৌঁছুল জাপান থেকে। মিস ম্যাকলয়েড বর্তমানে ওখানে আছেন। সুতরাং স্ফীংক্স দানবীর ধাঁধার উত্তর দাঁড়াবে এই : "ক্ষুদ্র নামের সঙ্গে মস্ত নাম কখনো যুক্ত করবে না।"

তাহলে মেরী, তুমি ফ্লোরেন্স আর ইটালীতে খুব মজা পাচ্ছ; তুমি উপস্থিত কোথায় আছ তা আমি জানি না। কাজে কাজেই, ওগো মুটকী বুড়ি, এই চিঠিখানা ফেললাম মনরো এণ্ড কোম্পানির অনুগ্রহের ওপর, ৭ রু স্ক্রাইব এই ঠিকানায়।

তাহলে বুড়ি তুমি ফ্লোরেন্স আর ইটালীর লেকে লেকে খুব স্বপ্ন দেখে বেড়াচ্ছ। বেশ কথা; তোমার কবি অবশ্য তার শূন্যতায় আপত্তি জানাচ্ছে।

এখন তবে আমার কথা শুনবে, ভক্ত বোন! আমি ভারতে এসেছি গত হেমন্তকালে। সারা শীতকালটা ভুগেছি; এই গ্রীষ্মকালটা ঘুরে বেড়িয়েছি বিশাল নদী আর ম্যালেরিয়ার দেশ পূর্ববঙ্গ এবং আসামের মধ্য দিয়ে। দুইমাস কঠোর পরিশ্রমের পর একেবারে শয্যাশায়ী; এখন কলকাতায় ফিরে এসে ধীরে ধীরে সেরে উঠছি।

কয়েকমাস আগে উঁচু জায়গা থেকে পড়ে গিয়ে খেতড়ির রাজা মারা গেলেন। তাহলে বুঝতেই পারছ আমার চতুর্দিক এখন বিষাদময়, আর আমার নিজের স্বাস্থ্য শোচনীয়। তথাপি শীঘ্রই খাড়া হয়ে উঠব নিশ্চয়, এখন পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য অপেক্ষা করছি।

ইউরোপে যদি থাকতাম ও খুব ভালো হত, তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে বক বক করা যেত তাহলে, তারপর আবার তাড়াতাড়ি ফিরে আসতাম ভারতে; আজকাল আমি অনেক শান্ত হয়ে গেছি, আগেকার সেই অস্থিরতার তিন-চতুর্থাংশই ত্যাগ করেছি।

হ্যারিয়েট উলিকে, ইসাবেল ও হ্যারিয়েট ম্যাকিগুলিকে আমার ভালোবাসা জানাবে; মাকে আমার অনন্ত ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা জানাবে। মাকে বোলো হিন্দুর সূক্ষ্ম কৃতজ্ঞতাবোধ বংশ বংশ ধরে জেগে থাকে।

চির ভগবদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ, ইচ্ছে যখন হবে এক লাইন চিঠি দিও।

বি

[৫৩]

(মিস যোসেফাইন ম্যাকলয়েডকে লেখা)

মঠ, বেলুড়
হাওড়া জিলা
১৪ জুন, ১৯০১

প্রিয় জো,

জাপান এবং বিশেষ করে জাপানের শিল্পকলা তোমার ভালো লাগছে জেনে খুশী হলাম। তুমি ঠিকই বলেছ, জাপানের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শিখতে হবে। জাপান আমাদের যে সাহায্য দেবে তা সহানুভূতি এবং সম্মানের সঙ্গেই দেবে, পশ্চিম দেশ থেকে সে সাহায্য হবে সহানুভূতিশূন্য এবং ধ্বংসাত্মক। ভারত এবং জাপানের মধ্যে একটি সংযোগ প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই কাম্য।

আমার কথা এই, আসামে আমি পঙ্গু এবং বাতিল হয়ে পড়েছিলাম। এখন মঠের আবহাওয়া আবার আমাকে খানিকটা চাঙ্গা করে তুলছে। আসামের পাহাড়ী স্বাস্থ্য-নিবাস শিলং-এ আমার জ্বর হয়েছিল, হাঁপানির প্রকোপ বেড়েছিল, বৃদ্ধি পেয়েছিল শ্বেতসার, আর আমার দেহ ফুলে স্বাভাবিক আকারের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। মঠে এসে পৌঁছানো মাত্র ঐ সব লক্ষণ দূর হয়ে যায়। এবছর গরমটা প্রচণ্ড; কিন্তু খানিকটা বৃষ্টি সুরু হয়েছে, আশা করি শীঘ্রই বর্ষাকাল আসবে পূর্ণোদ্যমে। ঠিক এখনই আমার কোনো পরিকল্পনা নেই; তবে বোম্বাই প্রদেশ আমাকে খুব চাইছে, সেখানে শীঘ্রই যাব ভাবছি। সপ্তাহখানেকের মধ্যে বোম্বাই সফর সুরু করে দেব মনে করছি।

লেডী বেটি ৩০০ ডলার পাঠিয়েছেন বলছ, আমার কাছে তা এখনো এসে পৌঁছোয়নি; কিংবা তার আগমন সম্পর্কে জেনারেল প্যাটার্সনের কাছ থেকে কোনো সংবাদও পাইনি।

বেচারী স্ত্রী-পুত্র ইউরোপে পাড়ি দেবার পর খুবই কাতর হয়ে পড়েন, আমাকে বলেছিলেন গিয়ে দেখা করতে; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম যে এখনো নগরীতে ঢুকতে ভয় লাগে, কাজেই পুরোদমে বর্ষা সুরু হওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

হাঁ৷ প্রিয় জো, আমাকে যদি জাপানে যেতে হয় এবার তবে সারদানন্দকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার হবে কাজ চালাবার জন্য। মিঃ ম্যাক্সিমের কাছ থেকে লি হুয়াং চ্যাঙের কাছে প্রতিশ্রুত পত্রখানাও আমার চাই। বাকী সব মা ভালো জানেন। আমি এখনো অস্থিরসঙ্কল্প।

ভবিষ্যদ্বক্তাকে দেখতে তাহলে তুমি অ্যালানকুইনানে গিয়েছিলে? তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছ কি? তিনি কী বললেন? ইচ্ছে হলে বিস্তারিত লিখো।

জুলে বইস লাহোর পর্যন্ত গিয়েছিল, তাকে নেপালে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কাগজে পড়লাম, গরম সহ্য না করতে পেরে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তারপর জাহাজে

পাড়ি দিয়েছে। মঠে আমাদের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার কাছে সে এক ছত্র চিঠিও লেখেনি। তুমি এখন মিসেস বুলকেও নরওয়ে থেকে এই গোটা পথ ঘুরিয়ে জাপানে টেনে আনতে মনস্থ করেছ—নিঃসন্দেহে তুমি একটি শক্তিময়ী ম্যাজিসিয়ান মিস। দেখ জো, স্বাস্থ্য ভালো রেখো, আর মনের জোর বজায়রেখো। অ্যালানকুইনের লোকটির কথা বেশীর ভাগই সত্য হয়ে থাকে। তোমার জন্য অপেক্ষা করছে সম্মান ও গরিমা এবং মুক্তি। মেয়েদের স্বাভাবিক অভিলাষ হল বিবাহের মাধ্যমে পুরুষমানুষের ওপর ভর করে সমাজের উচ্চ মঞ্চে ওঠা; কিন্তু সে সব দিন আর নেই। তুমি জো কোনো পুরুষমানুষের সাহায্য ছাড়াই বড় হবে, তুমি যেমন আছ সেই অবস্থাতেই—সহজ সাধারণ জো, আমাদের জো, অনন্ত জো রূপেই···

আমরা এই জীবনের যথেষ্ট দেখে নিয়েছি, এখন আর এর বুদ্বুদ নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই; তাই নয় কি জো? মাসের পর মাস ধরে আমি চেষ্টা করছি যত ভাবাবেগ তাড়াতে; অতএব এখানেই থামছি, এখনকার মত বিদায়। মার ইচ্ছা আমরা একত্রে কাজ করি; ইতিপূর্বেই এর ফলে বহুর কল্যাণ হয়েছে; আরো বহুর কল্যাণ হবে; তবে তাই হোক। প্ল্যান করা অর্থহীন, নানা উঁচু কল্পনার কোনো দাম নেই; মা আপন ব্যবস্থা করবেনই।···নিশ্চিত থেকো।

অনন্ত ভালোবাসা ও অন্তরের আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

মিঃ ওকাকুরার কাছ থেকে এই মাত্র ৩০০ টাকার চেক এলো, আর আমন্ত্রণ। খুবই লোভনীয়, কিন্তু মা-ই তো সব জানেন।

বি

[৫৪]

মঠ, বেলুড়
১৮ জুন, ১৯০১

প্রিয় জো,

তোমার চিঠির সঙ্গে মিঃ ওকাকুরার টাকার রসিদ পাঠালাম। তোমার সব রকম চাতুরির টেক্কা দেব আমি।

যাহোক, যাবার জন্য আমি সত্যিই চেষ্টা করছি। তবে কি জান, যেতে একমাস, আসতে একমাস, আর থাকা মাত্র দিনকয়েক। তা হোক, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি; তবে আমার অতীব ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং কিছু আইন-সংক্রান্ত ব্যাপার ইত্যাদির জন্য একটু বিলম্ব হতে পারে।

চিরস্থায়ী ভালোবাসা সহ
বিবেকানন্দ

[৫৫]

মঠ, বেলুড়
হাওড়া, বঙ্গদেশ
ভারতবর্ষ, ১৯০১

প্রিয় জো,

আমার কাছে তোমার যে কৃতজ্ঞতা পাওনা আছে তা আমি কল্পনা দিয়েও পরিশোধ করতে পারি না। তুমি যেখানেই থাক আমার কল্যাণের কথা কখনো ভোল না। তাছাড়া আমার সব ভার বহন করতেও আছ তুমি, আমার সব বর্বরোচিত মেজাজও সহ্য করতে তুমি।

তোমার জাপানী বন্ধু খুবই সহৃদয়; কিন্তু আমার স্বাস্থ্য এত খারাপ যে, জাপানের জন্য সময় দিতে সমর্থ হব বলে মনে হয় না। অবশ্য নিজেকে বোম্বাই প্রদেশে টেনে নিয়ে যেতেই হবে; সহৃদয় বন্ধু-বান্ধবদের শুধু "কেমন আছ?" বলবার জন্য হলেও।

তারপর দুইমাস কাটবে যেতে-আসতে, আর থাকা মাত্র একমাস। তাতে কাজ করবার সুযোগ পাওয়া যাবে না, যাবে কি?

অতএব আমার ভাড়া বাবদ যে টাকাটা তোমার জাপানী বন্ধু দিয়েছেন সেটা তুমি তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ো। নভেম্বর মাসে তুমি যখন ভারতে আসবে তখন আমি তোমাকে তা দিয়ে দেব।

আসামে ভয়ানক অসুখে পড়েছিলাম, এখন ধীরে ধীরে সেরে উঠছি। বোম্বাইয়ের লোকেরা অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—এবার তাদের কাছে দেখা দিতেই হবে।

এইসব শুনেও যদি তুমি আমাকে আসতে বল তাহলে তোমার চিঠি পাওয়া মাত্র আমি রওয়ানা দেব।

মিসেস লেগেট লণ্ডন থেকে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছেন ৩০০ পাউণ্ড আমার কাছে ঠিক ঠিক পৌঁছেছে কিনা। পৌঁছেছে ঠিকই; আমি প্রাপ্তি স্বীকার করে তাঁর পূর্বের নির্দেশ অনুযায়ী C/o মনরো এণ্ড কোং, প্যারিস—এই ঠিকানায় সপ্তাহখানেক আগে চিঠিও দিয়েছি।

তাঁর শেষ চিঠিখানা আমার কাছে আসতে দেখি খামখানা একেবারে নির্লজ্জ রকমে ছেঁড়া খোলা। আমার ডাকের চিঠিপত্র খোলবার সময় ভারতে ডাকঘরগুলি সামান্য ভদ্রতা শোভনতারও ধার ধারে না।

ভালোবাসা জানবে।

তোমাদের বিবেকানন্দ

[৫৬]

মঠ

৫ জুলাই, ১৯০১

প্রিয় মেরী,

তোমার দীর্ঘ সুন্দর পত্রখানা পেয়ে খুব কৃতজ্ঞ হয়েছি ; মনটা চাঙ্গা করে তুলবার জন্য এখন আমার ঠিক এইরকম একটির প্রয়োজন ছিল। আমার স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হয়েছে, এখনো খারাপ আছে। মাত্র কয়েকদিনের জন্য সেরে উঠি ; কিন্তু আবার অসুস্থ হয়ে পড়তে হয় অনিবার্যভাবেই। ব্যাধির চরিত্রটাই এইরকম অবশ্য।

ইদানীং পূর্ববঙ্গ এবং আসামে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলাম। ভারতে কাশ্মীরের পর আসামই সব থেকে সুন্দর দেশ, কিন্তু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদী পাহাড় পর্বতের মধ্য দিয়ে একেবেঁকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তার মধ্যে মধ্যে দ্বীপ—দেখবার মতো বটে।

তুমি তো জান আমাদের হল নদীর দেশ। কিন্তু তাৎপর্যটি কী এর আগে আমিও কখনো বুঝিনি। পূর্ববঙ্গের নদীগুলি যেন আবর্তিত মিঠা জলের সমুদ্র, যেন নদী মাত্র নয়, তা এত দীর্ঘ যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে তাতে স্টীমার চলে। মিস ম্যাকলয়েড আছেন জাপানে। সেদেশ দেখে তিনি মুগ্ধ, আমাকে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু এই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা আমার স্বাস্থ্যে সইবে না বলে আমি নিরস্ত হয়েছি। আমি অবশ্য জাপান আগে দেখেছি।

তুমি তাহলে এখন ভেনিসে আনন্দ উপভোগ করছ। বুড়ো নিশ্চয়ই খাসা। তবে ভেনিস তো ছিল বৃদ্ধ শাইলকের বাড়ি, তাই না ?

এ বছর স্যাম তোমার সঙ্গে রয়েছে জেনে খুব আনন্দিত হয়েছি। উত্তরাঞ্চলে নিরানন্দ অভিজ্ঞতার পর ইউরোপের সব ভালো ভালো জিনিস সে নিশ্চয়ই আনন্দে উপভোগ করছে। সম্প্রতি আমার কোনো নতুন আকর্ষণীয় বন্ধু জোটেনি ; পুরাতন যাদের কথা তুমি জানতে তারা প্রায় সকলেই গত হয়েছেন, এমনকি খেতড়ির রাজাও। সম্রাট আকবরের সমাধি সেকেন্দ্রায় এক উঁচু মিনার থেকে পড়ে গিয়ে তিনি মারা যান। আগ্রায় এই আশ্চর্য সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন নিজ ব্যয়ে তিনি মেরামত করাচ্ছিলেন। একদিন পরিদর্শনে এসে তার পা ফসকে পড়ে যায়, তিনি একেবারে খাড়া কয়েকশত ফুট নীচে পড়ে যান। এইভাবেই প্রাচীনত্বের প্রতি অত্যধিক উৎসাহ ও মমত্বর দরুন আমাদের কখনো কখনো পস্তাতে হয়। মেরী সাবধান, তোমার যে ভারতীয় প্রাচীনত্বের নিদর্শনটি আছে তার জন্য অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাতে যেয়ো না।

মিশনের যে সীলটি আছে তার থাপটি হল অতীন্দ্রিয়বাদের প্রতীক ; সূর্য জ্ঞানের ; আলোড়িত জলরাশিতে কর্মকাণ্ড বোঝাচ্ছে ; পদ্ম প্রেমের প্রতীক ; হংসটি হচ্ছে সব কিছুর মধ্যে আত্মার রূপক।

স্যামকে এবং মাকে ভালোবাসা জানাবে।

চির প্রেমবদ্ধ

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

আমার চিঠি সংক্ষিপ্ত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। যেমনটি থাকা উচিত আমি ঠিক তেমনটি নেই। এই শরীরটার জন্য।

বি

[৫৭]

মঠ, বেলুড়
৬ জুলাই, ১৯০১

প্রিয় ক্রিস্টিন,

আমার কাছে সব আসে ঝোঁকের মাথায়—আজ আমাকে লেখার নেশায় ধরেছে। অতএব সর্বপ্রথম তোমাকেই কয়েক ছত্র লিখছি। লোকে জানে আমি নার্ভাস প্রকৃতির; আমি খুব ভাবিত হই। কিন্তু ক্রিস্টিন, ওবিষয়ে তুমিও কম যাও না। আমাদের একজন কবি লিখেছেন, "হয়ত পর্বতও উড়ে যাবে, শীতল হবে অগ্নিও, কিন্তু মহতের হৃদয় কখনো মহত্ত্ব হারাবে না।" আমি তো ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু আমি জানি তুমি মহৎ; তোমার সত্য অন্তঃকরণের প্রতি সর্বদা আমার আস্থা আছে। অন্য সব কিছু নিয়ে আমার ভাবনা থাকলেও তোমার সম্পর্কে নেই।

আমি তোমাকে সমর্পণ করেছি জগজ্জননীর নিকট। তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন, পথ দেখাবেন। কোনো অনিষ্ট তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না—কোনো কিছুই তোমাকে এক মুহূর্তের তরেও দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমি তা জানি।

সতত ভগবদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৫৮]

(মিস মেরী হালেকে লেখা)

মঠ, বেলুড়
হাওড়া জিলা
বঙ্গদেশ
২৭ অগস্ট, ১৯০১

প্রিয় মেরী,

তোমাকে অন্তত একটা লম্বা চিঠি লিখতে পারি—তোমার আশা অনুযায়ী আমার স্বাস্থ্য এতটুকুও ভালো থাকলে খুশী হতাম। বাস্তবিক পক্ষে প্রতিদিনই তা আরো খারাপ হচ্ছে; তার ওপর হাজার রকম জ্বালাতন এবং জটিলতা। আদৌ সেটা গ্রাহ্যই হচ্ছে না।

সুইটজারল্যাণ্ডের কুটির বাস তোমার আনন্দময় হোক কামনা করি—সুন্দর স্বাস্থ্য, ক্ষুধা বৃদ্ধি, আর তার সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলবার জন্য।

স্থানীয় এবং অন্যান্য প্রাচীনত্বের নিদর্শন নিয়ে কিছু আলোচনা ও চর্চা করা। পর্বতের মুক্ত বাতাস সেবন করছ জেনে খুব খুশী হলাম। স্যামের স্বাস্থ্য তেমন ভালো নেই জেনে তেমনই দুঃখিত হয়েছি। তা নিয়ে উৎকণ্ঠার কোনো কারণ নেই অবশ্য। স্যামের দেহ বেশ ভালোই।...

"পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রী-চরিত্র, দেবতারাই জানেন না, মানুষ তো কোন ছার!" আমার এখনকার অনুভূতি হয়ত খানিকটা মেয়েলি হতে পারে, কিন্তু আমার খুব মনে হচ্ছে—তোমার মধ্যে খানিকটা পুরুষভাব এসেছে। আহা মেরী, তোমার মেধা, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য সবকিছুই একটি প্রয়োজনীয় গুণের অভাবে —তোমার চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের অভাবে নষ্ট হতে বসেছে। তোমার ঔদ্ধত্য, তোমার মেজাজ প্রভৃতি সবই অসার, শুধু বিদ্রূপ। বেশী হলে তুমি এখনো বোর্ডিং স্কুলের মেয়ে মাত্র, কোনো মেরুদণ্ড নেই। সত্যিই কোনো মেরুদণ্ড নেই।

হায়রে! সারাজীবন এই দড়ি বেঁধে টানা! কাজটা অত্যন্ত নির্মম, পাশবিক; কিন্তু উপায় নেই। তোমাকে আমি ভালবাসি মেরী, ঐকান্তিকভাবে অকপটভাবে ভালবাসি। আমি তোমাকে লজেঞ্চুস জাতীয় ঠুনকো কথায় ভোলাবো না। আর ওসব আমার আসেও না।

তাছাড়া, আমি তো মরতে বসেছি; মূঢ়তার সময় আমার নেই। একটু চোখ খুলে তাকাও গো মেয়ে। তোমার কাছ থেকে এখন সোজা, কাটা কাটা চিঠি প্রত্যাশা করি; আক্রমণ করে চিঠি দিয়ো। আমার এখন সচকিত হবার খুব প্রয়োজন আছে।

ম্যাকভি দম্পতি এখানে যখন এসেছিলেন তাদের কথা কিছু শুনিনি। মিসেস বুল বা নিবেদিতার কাছ থেকে সরাসরি কোনো খবর বার্তা পাইনি, তবে মিসেস সেভিয়ার নিয়মিত সংবাদ দেন: ওরা সব নরওয়েতে মিসেস বুলের অতিথি।

নিবেদিতা ভারতে কবে আসবে কিংবা আদৌ সে ফিরে আসবে কিনা আমি জানি না।

আমি বলতে গেলে অবসরপ্রাপ্ত; আন্দোলনের ক্ষেত্রে কী ঘটছে তার খুব হিসেব রাখি না; তাছাড়া আন্দোলন বৃহত্তর হচ্ছে, এখন একজন লোকের পক্ষে তার সবকিছু জানা অসম্ভব।

খাওয়া ও ঘুমানোর চেষ্টা আর বাকী সময় দেহের শুশ্রূষা ছাড়া আমি আর এখন কিছুই করি না। বিদায় প্রিয় মেরী। আশা করি এই জীবনে কোথাও না কোথাও আবার আমাদের দেখা হবে। আর দেখা হোক না হোক, আমি রইলুম তোমার।

চির প্রেমবদ্ধ ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

[৫৯]

(শ্রী এম. এন. ব্যানার্জিকে লেখা)

মঠ বেলুড়
হাওড়া
২৯ অগস্ট, ১৯০১

স্নেহাশীর্বাদভাজনেষু,

আমার শরীর ক্রমেই সুস্থ হচ্ছে, অবশ্য এখনো আমি খুবই দুর্বল।...বর্তমান রোগের একমাত্র কারণ স্নায়ুদৌর্বল্য। যাই হোক, ক্রমেই সেরে উঠছি।

মা-ঠাকরুন* যে প্রস্তাব করেছেন তাতে আমি সবিশেষ কৃতার্থ। কিন্তু মঠের সবাই বলছে, নীলাম্বর বাবুর বাড়ি, এমন কি গোটা বেলুড় গ্রামই এই মাস এবং পরের মাসও ম্যালেরিয়ার প্রকোপে পড়ে। তাছাড়া, ভাড়াও অত্যধিক। অতএব আমার পরামর্শ হল, মা-ঠাকরুন যদি আসতেই চান তবে কলকাতায় একটি ছোট বাড়ি ঠিক করুন। আমিও সম্ভবত কলকাতায় গিয়েই থাকব। কারণ বর্তমান ব্যাধির ওপর আবার ম্যালেরিয়ার আক্রমণ আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। এখনো সারদানন্দ বা ব্রহ্মানন্দর মত নিই নি। তারা দুজনেই কলকাতায়। এ দুই মাস কলকাতা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর, এবং সেখানে খরচও অনেক কম।

ফল কথা, প্রভু তাঁকে যে রকম চালাবেন তাঁর সেই রকমেই চলা উচিত। আমরা শুধু পরামর্শ দিতে পারি, আর সেই পরামর্শ সম্পূর্ণ ভুল হতে পারে।

তিনি যদি বাস করার জন্য নীলাম্বরের বাড়িই নির্বাচন করেন তবে আগে থাকতেই ভাড়া প্রভৃতি ব্যাপারটা ঠিক করে নিয়ো। মার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক—আমি এইটুকুই বুঝি।

আন্তরিক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

সদা ভগবদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৬০]

(শ্রীএম. এন. ব্যানার্জিকে লেখা)

মঠ, বেলুড়
হাওড়া জিলা,
৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০১

স্নেহাশীর্বাদভাজনেষু,

ব্রহ্মানন্দ এবং অন্যান্যদের মতামত নিতে হয়েছে ; তারা সবাই ছিল কলকাতায় ; তাই তোমার শেষ পত্রের জবাব দিতে দেরী হল।

---

*সারদা মা

একটি সারা বছরের জন্য বাড়ি নেওয়া—কাজটা খুব ভালো করে ভেবে চিন্তা করে করা উচিত। এমাসে একদিকে বেলুড়ে যেমন ম্যালেরিয়ার ভয় আছে, অন্যদিকে কলকাতায় আছে প্লেগের বিপদ। তাছাড়া, গ্রামের একেবারে ভেতর দিকে যাওয়াটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করলে জ্বর এড়ানো যায়, নদীর ধারটা জ্বরজারি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। নদীর কাছে প্লেগ এখনো দেখা দেয়নি। এই গ্রামে যত জায়গা ছিল, প্লেগের মরশুমে তা এখন সব মাড়োয়ারীদের দ্বারা ভরতি।

তাছাড়া সব থেকে বেশী ভাড়া কত দিতে পারবে তাও জানানো দরকার, তা জানতে পারলে সেই মত বাড়ি আমরা দেখব। নগরীর কোনো এলাকায় বাড়ি নেওয়া—তাও আর একটি পরামর্শ। আমার কথা বলতে গেলে, আমি তো কলকাতায় প্রায় একজন বিদেশী বনে গেছি। কিন্তু অন্যেরা তোমার পছন্দ মত বাড়ি নিশ্চয়ই দেখে দেবে। নিম্নলিখিত দুইটি বিষয়ে যত তাড়াতাড়ি মনস্থির করবে ততই ভালো: (১) মা ঠাকরুন বেলুড়ে থাকবেন, কি কলকাতায়; (২) কলকাতায় থাকলে কত ভাড়ায় এবং কোন অঞ্চলে। তোমার জবাব পেলে এক লহমায় কাজ করে ফেলা যাবে।

আন্তরিক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সহ
তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

আমরা এখানে সবাই ভালো আছি। এক সপ্তাহ কলকাতায় কাটিয়ে মতি ফিরে এসেছে। গত তিন দিন ধরে এখানে দিনরাত বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের দুটি গোরুর বাচ্চা হয়েছে।

বি

[৬১]

(মিস যোসেফাইন ম্যাকলয়েডকে লেখা)

মঠ, বেলুড়
হাওড়া
৮ নভেম্বর, ১৯০১

প্রিয় জো,

অ্যাবেটসেণ্ট শব্দের ব্যাখ্যা সম্বলিত চিঠি এতদিনে তুমি নিশ্চয় পেয়েছ। আমি নিজে সে চিঠি লিখিনি, তারও পাঠাইনি। সে সময় আমি এত পীড়িত ছিলাম যে ও দুটির একটিও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পূর্ববঙ্গ ঘুরে আসার পর থেকেই আমি প্রায় শয্যাশায়ী। এখন অবস্থা আরো খারাপ, বাড়তি উপসর্গ হল দৃষ্টিশক্তিহ্রাস।

এসব কথা আমি লিখতে চাই না; কিন্তু দেখা যাচ্ছে কেউ কেউ খুঁটিনাটি সব জানতে চায়।

জাপানী বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে তুমি আসছ জেনে খুব আনন্দিত হলাম—আমার সাধ্যমত খাতিরযত্ন তাঁরা পাবেন। খুব সম্ভবত আমি মাদ্রাজে যাব। আগামী সপ্তাহে কলকাতা ছাড়ব ভাবছি; তারপরে শনৈঃ শনৈঃ এগুবো দক্ষিণ দিকে।

তোমার জাপানী বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে উড়িষ্যার মন্দিরগুলি দেখা যাবে কিনা জানি না। আমি "ম্লেচ্ছ" খাবার খেয়েছি বলে আমাকেই ভেতরে যেতে দেওয়া হবে কিনা জানি না। লর্ড কার্জনকে ভেতরে যেতে দেওয়া হয়নি।

যাহোক, আমি যতটা পারি তোমার বন্ধুদের জন্য সর্বদাই করব। মিস মুলার এখন কলকাতায়। আমাদের সঙ্গে অবশ্য তিনি দেখা করেননি।

অজস্র ভালোবাসা সহ
তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৬১]

গোপাল লাল ভিলা
বারানসী ছাউনি
৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২

প্রিয় স্বরূপ (আনন্দ),

...চারুর চিঠির জবাব প্রসঙ্গে চারুকে বোলো সে যেন নিজে ব্রহ্মসূত্র পড়ে। ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ আছে—একথা বলে সে কি বোঝাতে চায়? সে আসলে ভাষ্যগুলিকে বোঝাতে চাইছে, অন্তত তাই তো উচিত বলে বোধ হয়; আর শঙ্কর তো শেষ ভাষ্যকার। বৌদ্ধসাহিত্যে অবশ্য বেদান্তের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখা এমন কি অদ্বৈতবাদীও বটে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অমর সিংহ বুদ্ধদেবের একটি নাম অদ্বয়বাদী বলে উল্লেখ করছেন কেন? চারু লিখছে, উপনিষদে ব্রহ্মন্ শব্দের উল্লেখ নেই! ডাহা আহাম্মকি!

বৌদ্ধধর্মের দুই শাখার মধ্যে মহাযানকে আমি প্রাচীনতর মনে করি।

মায়াতত্ত্ব ঋক্-সংহিতার ন্যায়ই প্রাচীন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মায়া শব্দ আছে, তার বিকাশ ঘটেছে প্রকৃতি থেকে। আমার মতে ঐ উপনিষদ বৌদ্ধধর্ম থেকে প্রাচীনতর।

সম্প্রতি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমি অনেক আলোর সন্ধান পেয়েছি। আমি প্রমাণ করতে প্রস্তুত আছি যে,

(১) নানা রকমে শিব-আরাধনা বৌদ্ধদের পূর্বেই প্রচলিত ছিল, বৌদ্ধরা শৈবগণের পবিত্র স্থানগুলি দখল করতে চেষ্টা করেছিল, তাতে অকৃতকার্য হয়ে সেই

সকল স্থানের আবেষ্টনীর মধ্যেই নিজেদের নতুন নতুন স্থান করে নিয়েছিল; যেমন দেখতে পাবে বৌদ্ধগয়ায় এবং সারনাথে।

(২) অগ্নিপুরাণে গয়াসুর সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে তা ডাঃ রাজেন্দ্রলালের মতে বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য করা হয়েছে; আসলে তা আদৌ নয়, সেটি কেবল একটি প্রাচীন উপাখ্যান মাত্র।

(৩) বুদ্ধদেব যে গয়শীর্ষ পর্বতে বাস করতে গিয়েছিলেন তাতে প্রমাণ হয়, স্থানটির অস্তিত্ব আগে থাকতেই ছিল।

(৪) গয়াতে পিতৃ-উপাসনা পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল, আর পদচিহ্ন-উপাসনা—হিন্দুদের কাছ থেকে বৌদ্ধদের অনুকরণ।

(৫) বারাণসী যে শিব আরাধনার একটি প্রধান স্থান ছিল প্রাচীনতম রেকর্ড থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বৌদ্ধগয়া এবং বৌদ্ধসাহিত্য থেকে আমি আরো বহু নতুন তথ্য পেয়েছি। চারুকে বোলো সে যেন নিজে পড়ে, যেন মূর্খদের মতামত দ্বারা প্রভাবিত না হয়।

আমি এখানে বারানসীতে ভালোই আছি। এইভাবে যদি স্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতি হতে থাকে তাহলে সে এক মস্ত লাভ হবে।

বৌদ্ধধর্ম ও নয়া-হিন্দুধর্মের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে আমার মনে একটি সম্পূর্ণ বিপ্লব ঘটে গেছে। যে আভাস পেয়েছি তাকে বিকশিত করে তুলবার জন্য আমি হয়ত বেঁচে থাকব না; কিভাবে অগ্রসর হতে হবে তার ইঙ্গিত অবশ্য রেখে যাব; তোমাকে এবং তোমার গুরুভাইদের তা কার্যে পরিণত করতে হবে।

অজস্র ভালবাসা ও আশীর্বাদসহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৮৩]

(মিসেস ওলি বুলকে লেখা)

গোপাললাল ভিলা
বারানসী ছাউনি
১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২

প্রিয় মাতা,

মাতা ও কন্যাকে পুনর্বার ভারত স্বাগত জানাচ্ছে। জো দয়া করে মাদ্রাজের জার্নালের এক সংখ্যা পাঠিয়েছিল, তা দেখে খুব আনন্দ পেলাম। মাদ্রাজে নিবেদিতা যে সম্বর্ধনা লাভ করেছে তাতে মাদ্রাজ ও নিবেদিতা—দুয়েরই ভালো হবে। তার বক্তৃতাটি বাস্তবিকই সুন্দর।

আশা করি লম্বা জার্নির পর আপনি এবং নিবেদিতাও ভালো করে বিশ্রাম করছেন। আমার ইচ্ছা আপনি কলকাতার পশ্চিমে কয়েকখানা গ্রাম ঘণ্টাকয়েক

ঘুরে দেখুন; সেখানে প্রাচীন বাঙালি কুটীর দেখতে পাবেন, কাঠ, বাঁশ, বেত, মাইকা ও পর্ণের তৈরী কুটীর।

শিল্পরুচিসম্মত সব বাংলো। কিন্তু হায়! আজকাল যে কোনো শুয়োরের খোঁয়াড়কেই ঐ বাংলো নামের অনুকরণে নাম দেওয়া হচ্ছে।

প্রাচীনকালে কোনো লোক প্রাসাদ বানালেও, অতিথিদের সম্বর্ধনার জন্য একখানা বাংলোও বানাতেন। সেই শিল্প এখন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। নিবেদিতার স্কুলের সবটাই যদি ঐ কায়দায় বানাতে পারতাম তো খুশী হতাম। যে সামান্য কয়েকটি এখনো টিকে আছে তার অন্তত একটিও দেখতে পাওয়া উত্তম।

ব্রহ্মানন্দ সব ব্যবস্থা করবে, আপনাকে শুধু ঘণ্টাকয়েক পথ চলতে হবে।

মিঃ ওকাকুরা তাঁর সংক্ষিপ্ত সফর শুরু করেছেন। তিনি পরিদর্শন করতে চান আগ্রা, গোয়ালিয়র, অজন্তা, ইলোরা, চিতোর, উদয়পুর, জয়পুর এবং দিল্লী।

বারানসীর একটি উচ্চশিক্ষিত ধনী যুবক গতকাল সহরে ফিরে এসেছে; তার পিতার সঙ্গে আমাদের দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব। শিল্পকলার প্রতি ছেলেটির বিশেষ আগ্রহ। ক্ষয়িষ্ণু ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের জন্য সে স্বেচ্ছায় বহু অর্থ ব্যয় করছে। মিঃ ওকাকুরা চলে যাবার কয়েক ঘণ্টা পরেই ছেলেটি আমার কাছে এসেছিল। শিল্পময় ভারতের যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা মিঃ ওকাকুরাকে ঘুরে দেখানোর পক্ষে এই ছেলেটিই সব থেকে উপযুক্ত। আর আমার বিশ্বাস, মিঃ ওকাকুরার বুদ্ধি-পরামর্শ তার খুব কাজে লাগবে। ওকাকুরা একটি পোড়ামাটির তৈরী জলপাত্র পেয়েছেন, এখানে চাকর-বাকররা সে জিনিস নিত্য ব্যবহার করে। পাত্রটির আকৃতি এবং তাতে খোদাই করা কাজ দেখে তিনি তো মুগ্ধ। কিন্তু জিনিসটা মামুলী এবং মাটির তৈরী, কোথাও নিয়ে যেতে গেলে ধকল সহ্য করতে পারবে না। ওকাকুরা তাই সেটি আমার কাছে রেখে গেলেন এবং বলে গেলেন আমি যেন ওরকম একটি পাত্র পেতলে তৈরী করিয়ে দিই। কী করি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কয়েক ঘণ্টা পরেই এলো সেই তরুণ বন্ধু; কাজটির ভার তো সে নিল বটেই, ওকাকুরা যা দেখে অমন মোহিত তার চেয়ে ঢের বেশী উৎকৃষ্ট খোদাই করা টেরাকোটার শত শত ডিজাইন হাজির করতেও প্রস্তুত বলে জানাল।

চমৎকার সেই প্রাচীন ঢং-এর অনেক পুরাতন পেইন্টিংও সে দেখাবে বলেছে। প্রাচীন ঢং-এ অঙ্কন করতে পারে এমন একটিমাত্র পরিবারই এখনো বারানসীতে টিকে আছে। তাদের একজন একটি মটরদানার ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ শিকার-দৃশ্য অঙ্কন করেছে—তাতে প্রত্যেকটি ডিটেইল ও অ্যাকশন একেবারে নিখুঁত।

আশা করি ওকাকুরা ফেরবার পথে এই শহরে আবার আসবেন এবং এই ভদ্রলোকের আতিথ্য গ্রহণ করে শিল্পকলার যা অবশিষ্ট আছে তার কিছু নিদর্শন দেখবেন।

মিঃ ওকাকুরার সঙ্গে গেছে নিরঞ্জন; ভদ্রলোক জাপানী, তাই তার মন্দির প্রবেশে বাধা হবে না। আমার মনে হয়, শিবের আরাধনা করার জন্য তিব্বতীরা এবং উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য বৌদ্ধরা বরাবর এদিকে এসেছে।

ওকাকুরাকে শিবচিহ্ন স্পর্শ করতে এবং পুজো করতে দেওয়া হয়েছে। মিসেস অ্যানি বেস্যান্ট একবার সে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বেচারী এমন কি মন্দির প্রাঙ্গনেও ঢুকতে পান নি, অথচ তিনি খালি পায়ে গিয়েছিলেন, শাড়ী পরেছিলেন, পুরোহিতদের সামনে ধুলোয় পড়ে নিজেকে অনেক ছোট করেছিলেন। আমাদের বড় বড় মন্দিরের কোথাও বৌদ্ধদের অ-হিন্দু বলে মনে করা হয় না। আমার পরিকল্পনা এখনো স্থির হয় নি ; এই স্থান থেকে আমি শীঘ্রই অন্যত্র যেতে পারি।

শিবানন্দ এবং আর সব ছেলেরা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছে।

আপনার চির স্নেহবদ্ধ সন্তান
বিবেকানন্দ

[৬৪]

(ভগিনী নিবেদিতাকে লেখা)

বারানসী
১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২

সর্ব ক্ষমতার অধীশ্বরী হও তুমি! জগজ্জননী স্বয়ং তোমার কর্মে ও মনে অধিষ্ঠান করুন! আমি প্রার্থনা করি তোমার ক্ষমতা হোক অপরিসীম, অপ্রতিরোধ্য—আর তার সঙ্গে, সম্ভব হলে আসুক অনন্ত শান্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণর মধ্যে যদি কোনো সত্য থেকে থাকে, তবে তিনি যেন তোমাকে তার আশ্রয়ে গ্রহণ করেন, যেমন আমাকে গ্রহণ করেছেন, কিংবা তার চেয়েও সহস্রগুণ বেশী করে!

বিবেকানন্দ

[৬৫]

মঠ
২১ এপ্রিল, ১৯০২

প্রিয় জো,

মনে হয় জাপানে যাবার পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। মিসেস বুল চলে গেছেন, তুমি যাচ্ছ। আমি তো জাপানীদের সঙ্গে তেমন পরিচিত নই।

সদানন্দ কানাইকে নিয়ে জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গে নেপালে গেছে। ক্রিস্টিন আগে রওয়ানা হতে পারে নি, কারণ মারগট এই মাস না শেষ হতে যেতে পারে না।

সবাই বলছে আমি খুব চমৎকার আছি ; কিন্তু এখনো অত্যন্ত দুর্বল বোধ করছি,

আর জল খাওয়া একেবারে বন্ধ। যাহোক, রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, বেশ ভালো উন্নতি হয়েছে। পা ফোলা এবং অন্য উপসর্গগুলি দূর হয়েছে।

লেডি বেটি, মিঃ লেগেট, আলবার্টা এবং হোলিকে আমার অফুরন্ত ভালোবাসা জানাবে। জন্মের আগে থেকেই বেবির প্রতি আমার আশীর্বাদ রয়েছে এবং চিরকাল থাকবে।

মায়াবতী তোমার কেমন লাগল? এ বিষয়ে এক লাইন লিখে জানিয়ো।

অজস্র ভালোবাসা জানবে।

বিবেকানন্দ

[৬৬]

মঠ, বেলুড়
হাওড়া
১৫ মে, ১৯০২

প্রিয় জো,

মাদাম কালভেকে লেখা চিঠিখানা তোমাকে পাঠালাম।

... ...

আমি অনেকটা ভালো আছি, তবে যতটা আশা করেছিলাম তার চেয়ে ঢের খারাপ। নিরিবিলি থাকার একটি প্রবল আগ্রহ আমার হয়েছে। চিরকালের মত অবসর নেব—আমার আর কোনো কাজই থাকবে না। যদি সম্ভব হয় তবে আমি আবার পুরানো দিনের মতো ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করব।

তোমার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ হোক জো, তুমি আমার প্রতি স্বর্গদূতীর ন্যায় আচরণ করেছ।

চিরস্থায়ী ভালোবাসা সহ
বিবেকানন্দ

[৬৭]

(মিসেস ওলি বুলকে লেখা)

মঠ
১৪ জুন, ১৯০২

প্রিয় ধীরা মাতা,

...আমার মতে কোনো জাতিকে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের আদর্শ লাভ করতে হলে আগে তাকে সর্বপ্রথম বিবাহের শুদ্ধতা ও অবিচ্ছেদ্যতার মধ্য দিয়ে মাতৃত্বের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে হবে। রোমান ক্যাথলিকরা এবং হিন্দুরা

বিবাহবন্ধনকে পবিত্র এবং অবিচ্ছেদ্য রেখেছে, তার ফলে তার বিশুদ্ধ এবং মহাশক্তিমান বহু নারী ও পুরুষের জন্ম দিতে পেরেছে। আরবদের কাছে বিবাহ একটি চুক্তি কিংবা বলপূর্বক আত্মসাতের ব্যাপারমাত্র। সে বন্ধন ছিন্ন করা যেতে পারে ইচ্ছামাত্র। তাই সেখানে কুমারী বা ব্রহ্মচারীর আদর্শ বিকাশ লাভ করতে পারেনি। আধুনিক বৌদ্ধধর্ম এখন সকল জাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে যাদের ক্ষেত্রে বিবাহপ্রথার পূর্ণ বিবর্তন ঘটে নি, ফলে সন্ন্যাস-আশ্রমকে তারা একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার করে তুলেছে। অতএব যতদিন পর্যন্ত না জাপানীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি দৈহিক আকর্ষণ ও ভালোবাসা ছাড়াও বিবাহের মহৎ ও পবিত্র আদর্শ গড়ে উঠছে ততদিন তাদের মধ্যে মহৎ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর আবির্ভাব কী করে হতে পারে আমি তো তা বুঝতে পারি না। আপনি যেমন বুঝতে পেরেছেন যে সতীত্বই জীবনের গৌরব, আমারও এই বিষয়ে দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়েছে যে আমরণ সাধুচরিত্রসম্পন্ন জনকয়েক শক্তিশালী ব্যক্তির জন্ম দিতে হলে জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মধ্যে এই সুমহান পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন।…

অনেক কিছু লিখব ভেবেছিলাম, কিন্তু দেহ দুর্বল।

…"যে মনোবাঞ্ছা নিয়ে যে কেউ আমাকে পুজো করে আমি তার সেই মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ করি।"…

বিবেকানন্দ

[৩৮]

(মাস্টারমশাইকে লেখা)

আঁটপুর*
৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৯

প্রিয় ম—,

লক্ষবার ধন্যবাদ জানাই, মাস্টার! তুমিই রামকৃষ্ণের আসল তাৎপর্য বুঝেছ।
হায়, খুব সামান্য লোকই হায়, তাঁকে বুঝতে পারে!

তোমাদের বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে ওঠে—যে মতবাদ এর পর থেকে পৃথিবীতে শান্তি বর্ষণ করবে তারই মধ্যে কাউকে পরিপূর্ণরূপে আত্মস্থ দেখতে পেয়েও আমি যে পাগল হয়ে যাই না সেইটেই আশ্চর্য।

বি

*আঁটপুর হুগলী জেলার একটি গ্রাম। এটি স্বামী প্রেমানন্দর জন্মস্থান।

[৬৯]

গাজীপুর
২ এপ্রিল, ১৮৯০

প্রিয় কালী (অভেদানন্দ),

তোমার, প্রমদাবাবুর এবং বাবুরামের (প্রেমানন্দর) পত্র পেয়ে খুশী হলাম। এখানে আমি বেশ ভালোই চালাচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা জানিয়েছ। আমারও খুব ইচ্ছা, আর সেই কারণেই যেতে আমায় ভয় হচ্ছে। অধিকন্তু বাবাজী বারণ করছেন। তাঁর কাছ থেকে দিনকয়েকের জন্য ছুটি নিতে চেষ্টা করব। কিন্তু ভয় হল, তাই করতে গিয়ে আমি পাহাড়ে যেতে আকৃষ্ট হব ; হৃষিকেশের প্রতি আমার যে আকর্ষণ তা ঝেড়ে ফেলা কঠিন, বিশেষত আমার মতো দুর্বলচিত্ত লোকের পক্ষে। কটিবাতের আক্রমণটা, কিছুতেই আমাকে ছাড়বে না—সে আর এক যন্ত্রণা! কিন্তু ওসবে আমি অভ্যস্তও হয়ে উঠছি। প্রমদাবাবুকে আমার অসংখ্য নমস্কার জানাবে ; তার বন্ধুত্ব এমনই যে তাতে আমার দেহ ও মন দুইই উপকৃত হয়। তাছাড়া আমি তার কাছে বিশেষভাবে ঋণী। যেমন করেই হোক সবকিছুর একটা মোড় ঘুরবেই।

শুভেচ্ছাসহ,

তোমাদের স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[৭০]

বাগবাজার, কলকাতা
৬ জুলাই, ১৮৯০

প্রিয় শরৎ (সারদানন্দ) ও কৃপানন্দ,

তোমাদের পত্র যথাসময়ে পৌঁছেছে। লোকে বলে বছরের এই সময়ই আলমোড়া সব থেকে স্বাস্থ্যকর, অথচ তোমরা কিনা পীড়িত হয়ে পড়লে! আশা করি ম্যালেরিয়া নয়।...

গঙ্গাধরকে দেখছি সেই রকমই নমনীয় আছে, ঘোরাঘুরির ফলে তার অবাধ্যতা দূর হয়েছে, আমাদের প্রতি এবং প্রভুর প্রতি তার প্রেম আরো গভীর হয়েছে। সে সাহসী, নিষ্ঠাবান, নির্ভীক এবং অদম্য। একমাত্র যা প্রয়োজন তা হল তাকে পরিচালিত করার মত একটি মন যার প্রতি সে আপন প্রেরণাতেই সসম্মানে আত্ম-সমর্পণ করবে ; তার ফলে সে একটি উৎকৃষ্ট মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে।

এবার গাজীপুর ছাড়বার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না, কলকাতায় আসবার ইচ্ছা তো নয়ই। কিন্তু কালীর পীড়া আমাকে বারাণসীতে টেনে নিল, আর বলরামের

অকস্মাৎ মৃত্যুর কারণে আমাকে কলকাতায় আসতে হল। সুরেশবাবু এবং বলরাম উভয়েই গত! জি সি. ঘোষ মঠের ভার বহন করছেন।···যাবার ভাড়াটা যোগাড় করতে পারলেই আমি আলমোড়া যাবার চেষ্টা করব, সেখান থেকে এগুবো গারওয়ালে গঙ্গাতীরবর্তী কোনো এক স্থানে—যেখানে দীর্ঘকাল ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতে পারি। আমার সঙ্গে যাবে গঙ্গাধর। বাস্তবিক পক্ষে এই অভিপ্রায় নিয়েই আমি তাকে কাশ্মীর থেকে নিয়ে এসেছি।

আমার মনে হয়, তোমার কলকাতায় আসার জন্য ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই। পর্যটন যথেষ্ট হয়েছে, তাতে উপকারও হয়েছে; কিন্তু যেটা তোমার দরকার তার কোনো চেষ্টাই তুমি করোনি; তোমার এখন উচিত স্থির বসে ধ্যানে মগ্ন হওয়া। "ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে" বলে কুমারী মেয়েকে হঠাৎ ঘুম থেকে ডেকে তোলার ন্যায় সহজ কাজ জ্ঞান অর্জন নয়। আমার দৃঢ় মত এই যে, কোনো যুগেই খুব বেশী লোক জ্ঞান অর্জন করতে পারে না; সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের ক্রমাগত সেই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। আমার এই প্রাচীনপন্থী মত বুঝলে তো। আধুনিক সন্ন্যাসীর জ্ঞানের ভাঁওতা আমার খুব ভালোই জানা আছে। তোমাদের শান্তিলাভ ঘটুক, মনোবল আসুক! বৃন্দাবনে রাখালের (ব্রহ্মানন্দ) সঙ্গে আছে দক্ষ, সে নাকি সোনা করতে শিখেছে, পাক্কা জ্ঞানী নাকি হয়ে উঠেছে—রাখাল তো তাই লিখছে। ভগবান তার কল্যাণ করুন, তোমরা বলতে পার—আমেন!

আমার স্বাস্থ্য এখন বেশ ভালো আছে; গাজীপুরে থাকার ফলে শরীরের যে উন্নতি হয়েছে আশা করি তা বেশ কিছুকাল বজায় থাকবে। একবার হিমালয়ে যাবার খুব ইচ্ছা হচ্ছে। এবার আমি পাহাড়ী বাবা অথবা অন্য কোনো সাধু-সন্তর কাছে যাব না—ওঁরা সর্বোন্নত লক্ষ্য থেকে অন্যদিকে লোকের মন বিক্ষিপ্ত করে দেন। অতএব যাব সোজা ওপরের দিকে!

আলমোড়ার জলহাওয়া কেমন লাগছে? স—বা তোমরা, কারও নেমে আসার দরকার নেই। একই জায়গায় এত লোকের একসঙ্গে থাকার লাভ কি, যখন তাতে কারও আত্মার কোনো উন্নতি হয় না? কেবল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় মূর্খের মতো ঘুরে ঘুরে মোরো না; পর্যটন ভালো বটে, কিন্তু বীর হতে চেষ্টা করো।

"অহংকার ও মোহ থেকে মুক্ত হয়ে, নিজের মধ্যে যে আসক্তির পাপ আছে তাকে জয় করে, সমস্ত কামনা-বাসনা পরিহার করে, আনন্দ ও বেদনা নামক বিপরীত যুগল থেকে মুক্ত হয়েই মোহমুক্ত পুরুষ শাশ্বত লক্ষ্যে উপনীত হয়।" (গীতা)।

কে তোমাদের আগুনে ঝাঁপ দিতে বলছে? হিমালয়কে যদি সাধনার উপযুক্ত স্থান না বিবেচনা কর, তবে অন্য কোথাও যাও। একরাশ জিজ্ঞাসার বুদ্বুদ দুর্বল চিত্তেরই পরিচয় দেয়। ওঠো শক্তিমান, মনোবলে বলীয়ান হও! কাজ, কাজ করে চল! সযত্ন হও, সংগ্রাম করে চল! আর কিছু লিখবার নেই।

তোমাদের স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[১১]

আজমীর
১৪ এপ্রিল, ১৮৯১

প্রিয় গোবিন্দ সহায়,

…শুদ্ধচিত্ত এবং স্বার্থলেশশূন্য হতে চেষ্টা কর। তা-ই ধর্মের সারকথা।…

ভালোবাসা জানবে।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

[১২]

মাউণ্ট আবু
৩০ এপ্রিল, ১৮৯১

প্রিয় গোবিন্দ সহায়,

ব্রাহ্মণ ছেলেটির উপনয়ন করেছ কি? তুমি কি সংস্কৃত পড়ছ? কতদূর অগ্রসর হয়েছ? মনে হয়, প্রথম অংশটি সমাপ্ত করেছ।…শিবপূজার ব্যাপারে তোমার অধ্যবসায় আছে তো? যদি না থাকে তবে চেষ্টা কর। "দেবতার রাজ্য যাজ্ঞা কর, দেখবে সকল উৎকৃষ্ট জিনিস তোমাতেই যুক্ত হবে।" দেবতাকে মান্য করে চল, তোমার সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।…দুই কমাণ্ডার সাহেবকে আমার সম্মান জানিয়ো। তাঁরা উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, অথচ আমার ন্যায় ফকিরের প্রতিও সহৃদয়। বৎসগণ, ধর্মের রহস্য তত্ত্বের মধ্যে নিহিত নেই, আছে প্রয়োগে। সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা—এইটিই ধর্মের সারকথা। "প্রভু প্রভু বলে কাঁদলে হয় না, প্রভুর ইচ্ছা পালন করতে হয়।" তোমরা আলওয়ারিরা চমৎকার একদল তরুণ। আমি আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে তোমরা সমাজের ভূষণ হয়ে উঠবে, জন্মভূমির আশীর্বাদ-স্বরূপ হয়ে উঠবে।

আশীর্বাদক
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

কখনো কখনো সংসারের কাছে আঘাত খেলে বিচলিত হয়ো না। মুহূর্তেই তা দূর হয়ে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে সব কিছু।

—বি

[৭৩]

মাউন্ট আবু
১৮৯১

প্রিয় গোবিন্দ সহায়

তোমার জপের সঙ্গে যাও মন যেদিকে চায়। হরবক্সকে বোলো তার প্রাণায়াম সুরু করতে হবে নিম্নলিখিত ভাবে।

সংস্কৃত পড়াটা খুব যত্নের সঙ্গে চালিয়ে যাও।

ভালোবাসা জানবে।

তোমাদের
বি

[৭৪]

(ডাঃ নানজুণ্ডা রাওকে লেখা)

খেতড়ি
২৭ এপ্রিল, ১৮৯৩

প্রিয় ডাক্তার,

তোমার চিঠি এইমাত্র পৌঁছুল। আমার মতো অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি তোমার যে ভালোবাসা তাতে আমি কৃতকৃতার্থ। বালাজীর পুত্র-বিয়োগ হয়েছে জেনে যারপরনাই দুঃখিত হলাম। "প্রভুই দিয়েছিলেন, প্রভুই নিয়ে নিলেন; প্রভু নামের জয় হোক।" আমরা কেবল জানি, কিছুই হারায় না, হারাতে পারে না। আমাদের জন্য রয়েছে শুধুই আত্মনিবেদন, শান্ত সমাহিত এবং পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। সেনাপতি যদি কামানের মুখে যেতে আদেশ দেন, তবে সৈনিকের কোনো আপত্তি করার, এমন কি মৃদু গুঞ্জনেরও অধিকার নেই। বালাজীর সন্তাপে সান্ত্বনা দেবেন ভগবান, এই সন্তাপ যেন তাকে করুণাময়ী জগজ্জননীর বক্ষের নিকটতর করে!

আমি মনে করি, মাদ্রাজ থেকে জাহাজ ধরার প্রস্তাব কোনো কাজের কথা নয়, বোম্বাই থেকেই সব ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। ভট্টাচার্যকে বোলো (খেতড়ির মহারাজা) রাজা অথবা আমার গুরুভাইরা কখনো পথের প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করবেন না। আর রাজাজীর কথা যদি বল, আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসার সত্যিই কোনো সীমা নেই।

সর্ব মঙ্গলদায়ক ভগবানের আশীর্বাদ তোমাকে এই সংসারে এবং তার পরেও তোমার কল্যাণ করুক। এই আমার সতত প্রার্থনা।

সচ্চিদানন্দ*

*স্বামীজী এসময়ে 'সচ্চিদানন্দ' নামটিও ব্যবহার করতেন।

[৭৫]

(খেতড়ির মহারাজার কাছে লেখা)

আমেরিকা
১৮৯৪

…"ঘরবাড়িতে গৃহ হয় না, গৃহের অপরিহার্য অঙ্গ গৃহিনী"—একথা বলেছেন এক সংস্কৃতের পণ্ডিত ; কথাটা কত সত্য বাস্তবিক ! ঘরের যে ছাউনি আপনাকে রোদ বৃষ্টি ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করে আশ্রয় দিচ্ছে তার বিচার শুধু তার স্তম্ভ দিয়ে করা চলে না—সে স্তম্ভ সর্বোৎকৃষ্ট কোরিন্থিয়ান স্তম্ভ হলেও না ; তার বিচার হয় আত্মিক স্তম্ভ দিয়ে ; তা-ই তার মধ্যমণি, গৃহের আসল অবলম্বন—নারী। এই নিরিখে বিচার করলে পৃথিবীর যে কোনো গৃহের তুলনায় আমেরিকার গৃহ খাটো হবে না।

আমেরিকার গৃহ সম্পর্কে আমি অনেক কাহিনী শুনেছি। যথা, স্বাধীনতা সেখানে স্বেচ্ছাচার, নারীত্বহীন নারীর উন্মত্ত মুক্তি-নৃত্যের ঘায়ে গৃহজীবনের সমস্ত শান্তি ও সুখ পদদলিত, এবং এই রকম আরো অনেক বাজে কথা। এখন আমেরিকার গৃহজীবন সম্পর্কে এক বছর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর, আমেরিকান নারীগণকে দেখবার পর বুঝি ঐ রকম সিদ্ধান্ত কত ভুল এবং মিথ্যা ! আমেরিকান নারী ! আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ শত জীবনেও শোধ হবে না। আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা আমার জানা নেই। প্রাচ্যের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্ভব "প্রাচ্য দেশীয় অতিশয়োক্তি" দ্বারাই :—"যদি ভারত মহাসাগর হত একটি দোয়াত, হিমালয়ের সর্বোচ্চ পর্বত হত কলম, সমগ্র পৃথিবী হত লিপি আর লেখক হত স্বয়ং কাল" তবুও আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার প্রকাশ যথোপযুক্ত হত না।

গত বছর গ্রীষ্মকালে যখন এদেশে আসি আমি তখন বহু দূর দেশাগত এক ভবঘুরে প্রচারক, নামহীন, যশোহীন, এমন কোনো সম্পদ বা বিদ্যা আমার ছিল না যার দ্বারা নিজেকে পরিচিত করতে পারি—বন্ধুহীন, অসহায়, প্রায় দুস্থতার দীন হীন অবস্থায় আমাকে আহার দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে আমেরিকান নারীগণ, আমার সঙ্গে তারা বন্ধু-আচরণ করেছে, আমাকে তাদের গৃহে নিয়ে গেছে, আমার সঙ্গে তারা ব্যবহার করেছে পুত্রবৎ, তাদের নিজেদের ভ্রাতার ন্যায়। তারা আমার বন্ধুত্ব বজায় রেখেছে, এমন কি যখন তাদের নিজেদের পুরোহিতরা "এই বিপজ্জনক হিদেন"কে বর্জন করার জন্য উপদেশ দিয়ে গেছে—যখন তাদের সুহৃদরাও দিনের পর দিন "অজানা বিদেশী—এই সম্ভাব্য মারাত্মক লোকটিকে" আমল না দেবার জন্য উপদেশ দিয়েছে। কিন্তু মেয়েরা প্রমাণ করেছে তারাই মানুষের অন্তর্বস্তু এবং চরিত্র বেশী ভালো করে বুঝতে পারে—অনাবিল দর্পণেই প্রতিফলন দেখা সম্ভব হয়।

আর কত সুন্দর গৃহই না আমি দেখেছি। দেখলাম কত না মাতা, যাদের চরিত্রের অকপটতা, সন্তানের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কত না কন্যা এবং শুদ্ধ কুমারী দেখলাম, যারা "ডায়নার মন্দিরে তুষারমালার মতোই

শুদ্ধ"। আর তাদের সবাকার শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতা সর্বোন্নত স্তরের। আমেরিকার মেয়েরা তাহলে কি সবাই ডানাকাটা স্বর্গদূতী? একথা সত্য যে সর্বত্রই ভালো এবং মন্দ দুই-ই আছে—কিন্তু কোনো জাতিকে তার দুর্বলতা তার মন্দ চরিত্রের লোক দিয়েই বিচার করা চলে না; তারা আগাছা মাত্র, পড়ে থাকে পেছনের সারিতে। জাতিকে বিচার করতে হয় তার মহৎ সজ্জন ও পূত চরিত্রের লোকদের দিয়ে—যাদের মধ্যে জাতীয় জীবনের পরিচ্ছন্ন ও প্রবল প্রাণ-প্রবাহের পরিচয় পাওয়া যায়।

মাটিতে ছড়িয়ে থাকা অপক্ক, অপরিপুষ্ট, কীটভুক্ত ফল দিয়ে—তারা যদি সংখ্যায় বিপুলও হয়—কি আপনি আপেল গাছকে এবং তার ফলের স্বাদ বিচার করবেন? যদি একটিমাত্র সুপক্ক সুপরিপুষ্ট ফলও পাওয়া যায় তাহলে তারই মধ্য দিয়ে আপেল গাছের ক্ষমতা সম্ভাবনা ও জীবন সাধনার পরিচয় লাভ করা যায়। অপুষ্ট শত শত ফল দিয়ে তা সম্ভব নয়।

তারপর আমেরিকার আধুনিক মেয়েদের কথা: তাদের প্রশস্ত উদার মনোভাবকে আমি প্রশংসা করি। এদেশে অনেক উদার-মনা পুরুষও, এমন কি সঙ্কীর্ণতম গীর্জাতেও তেমন লোক আমি দেখেছি; কিন্তু একটি মস্ত পার্থক্য আছে: পুরুষমানুষ উদার হতে পারে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিনিময়ে; কিন্তু নারী যেখানেই ভালো কিছু দেখতে পায় সেখানেই তার প্রতি সহানুভূতিতে সে উদার হয়ে ওঠে, সেজন্য তাকে আপন ধর্ম সামান্যমাত্রও ছাড়তে হয় না। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চেতনা থেকে তার বুঝতে পারে ব্যাপারটা ইতিবাচক নেতিবাচক নয়, তা যোগের বিয়োগের নয়। তারা প্রতিদিন এবিষয়ে ওয়াকিবহাল হচ্ছে যে, প্রত্যেক জিনিসেরই ইতিবাচক এবং সত্যব্যঞ্জক দিকগুলি সংরক্ষিত হবে; সত্যব্যঞ্জক এবং ইতিবাচক দিকগুলির এই সংগ্রহকার্যকেই বলা যেতে পারে প্রকৃতির গূঢ় সত্তা নির্মাণের শক্তি, বিশ্বের নেতিবাচক এবং বিনাশী শক্তি তার দ্বারাই নির্মূল হয়।

চিকাগোতে বিশ্বমেলা কী অপূর্ব সাফল্যই অর্জন করল! কী সে অপূর্ব ধর্ম সম্মেলন! যেখানে পৃথিবীর সকল অংশের মানুষ আপন আপন ধর্মমত ব্যক্ত করেছে। ডাঃ বারোজ এবং মিঃ বোনির অনুগ্রহে আমিও আমার মত প্রকাশ করতে পেরেছি। মিঃ বোনি একজন আশ্চর্য লোক। একবার ভাবুন তো কী! বিরাট বিচক্ষণ মানুষটি, যিনি এই বিশাল ব্যাপারটির পরিকল্পনা করে তাকে মহৎ সাফল্যে ভূষিত করেছেন! অথচ তিনি ধর্মযাজক নন, আইনবিদ; তবু সকল চার্চের মহামান্য অতিথিদের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন তিনিই—মিষ্ট স্বভাব, বিদ্বান, ধৈর্যশীল মিঃ বোনি—যার উজ্জ্বল চোখ দুটির মধ্য দিয়ে যেন সমগ্র অন্তরাত্মা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।…

আপনাদের বিবেকানন্দ

[১৬]

(রাও বাহাদুর নরসিংহাচারিয়ারকে লেখা) চিকাগো
২৩ জুন, ’৯৪

প্রিয় মহাশয়,

আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহে সাহস পেয়ে একটু সুবিধা নিতে চাইছি। মিসেস পটার পামার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মহিলা প্রধানা। তিনি ছিলেন বিশ্ব-মেলার মহিলা সভানেত্রী। বিশ্বের নারীসমাজকে জাগিয়ে তুলতে তিনি বিশেষ আগ্রহান্বিত, একটি বৃহৎ নারীসংস্থার প্রধানা তিনি। তিনি লেডি ডাফরিনের বিশিষ্টা বান্ধবী, তাঁর অর্থ-সম্পদ ও পদ-মর্যাদার দৌলতে ইউরোপের নানা রাজ-পরিবারে তিনি সমাদৃত হয়েছেন। এ দেশে আমার প্রতি তিনি বিশেষ সহৃদয় ব্যবহার করেছেন। এখন তিনি চলেছেন চীন, জাপান, শ্যামদেশ এবং ভারত সফর করতে। ভারতে তাঁকে গভর্নরগণ এবং অন্যান্য মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ অবশ্যই সমাদর ও সম্মান করবেন। কিন্তু তিনি সরকারী সাহায্য না নিয়ে আমাদের সমাজ দেখতে চান। বহুবার তাঁকে আপনার কথা, ভারতীয় নারীসমাজকে জাগাতে আপনার প্রয়াসের কথা আমি বলেছি, মহীশূরে আপনার অপূর্ব কলেজটির কথাও বলেছি। এখানে আমাদের দেশবাসীরা এসে এইরকম যাদের সহৃদয়তা লাভ করে, তার পরিবর্তে আমেরিকার এই ধরনের ব্যক্তিবর্গের প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শন আমাদের একটি কর্তব্য বলে আমি মনে করি। আশা করি এই ভদ্রমহিলা আপনার কাছে সহৃদয় অভ্যর্থনা লাভ করবেন এবং আমাদের নারীসমাজের বাস্তব অবস্থা দেখবার ব্যাপারে যথাযথ সাহায্য পাবেন। আমি আপনাকে এই আশ্বাস দিতে পারি, ইনি মিশনারি নন, এমন কি ক্রিশ্চিয়ানরাও তাঁকে বলা যায় না। তিনি চান সকল ধর্ম থেকে পৃথক হয়ে সারা পৃথিবীর নারী সমাজের অবস্থার উন্নতি বিধান করতে। তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করলে এদেশে আমারও প্রচুর সাহায্য হবে। ভগবান আপনার কল্যাণ করুন!

আপনাদের চির স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

[১৭]

(মিস মেরী ও এইচ হালেকে লেখা) C/o জর্জ. ডব্লু. হালে এস্ক.
৫৪১ ডিয়ারবর্ন
চিকাগো
২৬ জুন, ১৮৯৪

প্রিয় বোনেরা,

মহান হিন্দী কবি তুলসীদাস তাঁর রামায়ণ অনুবাদ উৎসর্গ প্রসঙ্গে বলেন, “দুষ্ট এবং সাধু উভয়কেই আমি প্রণাম জানাই ; কিন্তু হায়! আমার কাছে দুইই

অত্যাচারী—দুষ্টরা অত্যাচার শুরু করে তাদের সংস্পর্শে আসা মাত্র—আর হায়রে সাধুরা আমার সঙ্গ ত্যাগ করা মাত্র আমার জীবন যায়।" আমি বলি আমেন। ঈশ্বরের সাধু সন্তানদের ভালোবাসাই যার কাছে পৃথিবীর সকল প্রেম ও আনন্দের সমষ্টি তাদেরই কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তার কাছে মারাত্মক নির্যাতন ছাড়া আর কিছু নয়—এইটিই আমার অনুভূতি।

কিন্তু এসব তো ঘটবেই। তোমরা আমার প্রেমাস্পদের বাঁশীর সুর, তোমরা আগে চলো, আমি অনুসরণ করি। তোমাদের মতো উন্নত উদার ও মিষ্ট শুদ্ধ-স্বভাবের বোনেদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার যে কী বেদনা ও যন্ত্রণা তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। ওঃ, আমি যদি গ্রীক দার্শনিক জেনোর মতো সুখে-দুঃখে নির্বিকার থাকার ক্ষমতা লাভ করতে পারতাম! আশা করি, সুন্দর গ্রামীণ দৃশ্যাবলী তোমাদের খুব ভালো লাগছে। "সারা জগৎসংসার যেখানে জাগ্রত, আত্মসংযম সম্পন্ন মানুষ তখন নিদ্রামগ্ন। জগৎ যেখানে ঘুমোয়, সেখানে সে জাগে।" জগৎ-সংসারের সামান্য ধূলিকণাও যেন তোমাদের স্পর্শ না করে। কবির ভাষায় এ সংসার ফুলের মালায় ঢাকা গলিত শবমাত্র। পার যদি কখনো তা স্পর্শ কোরো না। কলুষভরা খানা-খন্দের মতো এই জগৎসংসারে যেন তোমাদের পা না পড়ে, তার আগেই স্বর্গের পক্ষিশাবক তোমরা উঠে উর্ধ্বপানে উড়ে চলো।

"ওগো তোমরা যারা জেগে আছ তারা আবার ঘুমিয়ে পড়ো না।"

"জগৎসংসার তার বহু প্রাণীকে ভালোবাসুক, আমাদের আছেন একজনই প্রেমাস্পদ—তিনি আমাদের প্রভু। কে কী বলল তাতে আমরা গ্রাহ্য করি না; কিন্তু আমরা ভয় পাই তখনই যখন লোকেরা আমাদের প্রেমাস্পদকে নানা দানবীয় বৈশিষ্ট্য আরোপ করে চিত্রিত করার চেষ্টা করে। তারা যা খুশী করুক—আমাদের কাছে তিনিই একমাত্র প্রেমাস্পদ—তিনিই আমার প্রেম, প্রেম, আমার প্রেম, আর কিছুই নয়।"

"তাঁর কত ক্ষমতা আছে, কত গুণ আছে, সে হিসাব কে করবে! কল্যাণ করার মত শক্তি তাঁর আছে সে হিসাবেরই বা প্রয়োজন কী! আমরা শুধু একবার চির-কালের জন্য বলব—লম্বা টাকার থলির জন্য নয় আমাদের প্রেম, আমরা আমাদের প্রেম বিক্রয় করি না, আমরা দিই, চাই না।"

"তুমি দার্শনিক আমাদের বলছ তাঁর সত্তার কথা, ক্ষমতার কথা, তাঁর গুণাবলীর কথা—মূর্খ তুমি! আমরা তাঁর অধরের চুম্বন অপেক্ষায় মরে যাচ্ছি।"

"তোমার যাবতীয় বাজে কথা ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমাকে পাঠিয়ে দাও আমার প্রেমাস্পদের একটি চুম্বন—পারবে কি তুমি?"

"মূর্খ! ভয়ে ভীতিতে কার সম্মুখে তুমি কম্পমান নতজানু হচ্ছ? আমি আমার গলার হার নিয়ে তাঁর গলায় পরালাম; তাতে কলারের মতো একগাছা শিকল বেঁধে তাঁকে টেনে আনলাম সঙ্গে সঙ্গে; ভয় হয় পাছে একটি মুহূর্তের জন্যও তিনি দূরে সরে যান—সেই হার হল প্রেমের গলবন্ধনী, আর সেই শিকল প্রেমের ভাবাবেশ।

মূর্খ! তুমি জান না রহস্যটি কী;—তিনি অনন্ত অসীম। প্রেমের বন্ধনে তিনি আমার মুষ্টিতে ধরা দেন।"

"তুমি কি জান না বিশ্বচরাচরের প্রভু প্রেমের কেনা গোলাম?"

"তুমি কি জান না বিশ্বচরাচরের নিয়ন্তা বৃন্দাবনের গোপীনীদের কঙ্কণ ঝঙ্কারের তালে তালে নৃত্য করতেন?"

আমার উন্মত্ত প্রলাপকে মার্জনা কোরো; যা প্রকাশ করা সম্ভব নয় তাকেই প্রকাশ করতে যাওয়ার এই যে আমার মূঢ়তা তাকে ক্ষমা কোরো তোমরা। এ জিনিস শুধু অনুভব করা যায়।

আশীর্বাদ সহ তোমাদের ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

[৭৮]

গ্রীন একার ইন
ইলিয়ট, মাইনে
৩১ জুলাই, ১৮৯৪

প্রিয় বোনেরা,

তোমাদের কাছে অনেকদিন চিঠিপত্র লিখিনি, আমার তেমন কিছু লিখবারও নেই। এই জায়গাটি একটি খামারবাড়ি এবং সরাইখানা, এখানে এখন ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্টিস্টদের একটি অধিবেশন চলছে। গত বসন্তকালে নিউ ইয়র্কে থাকা কালে এই সভার মহিলা উদ্যোক্তা আমাকে এখানে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, আমি শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হয়েছি। জায়গাটি নিঃসন্দেহে সুন্দর এবং শীতল। আমার চিকাগোর বহু বন্ধুবান্ধবও এখন এখানে। নদীর ধারে খোলা মাঠে তাঁবু খাটানো হয়েছে, মিসেস মিলার, মিস স্টকহ্যাম এবং আরো কয়েকজন ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয় ওখানে রয়েছেন। তাদের সময় খুব স্ফূর্তিতে কাটে, কখনো কখনো তারা সবাই সারাদিনই তোমরা যাকে বল বৈজ্ঞানিক পোশাক তাই পরেই থাকেন। রোজই তাদের বক্তৃতাদি হয়। বোস্টনের কোনো এক মিঃ কলভিল এখানে এসেছেন, তিনি শুনছি রোজই স্পিরিট-প্রভাবে বক্তৃতা করে থাকেন। "ইউনিভার্সাল ট্রুথ" কাগজের সম্পাদিকা (?) এখানেই স্থিতি করে নিয়েছেন। তিনি ধর্মোপাসনা চালাচ্ছেন এবং সব ব্যাধি নিরাময়ের বিধান দিয়ে প্রত্যহ ক্লাস করছেন। আশা করছি, খুব শীঘ্রই তাঁরা অন্ধকে চক্ষু দান করবেন এবং এরকম আরো সব কাণ্ড করবেন। মোটের ওপর সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত সমাবেশ। ওঁরা সামাজিক নিয়ম-কানুনের তেমন ধার ধারেন না; সবাই বেশ মুক্ত স্বাধীন সুখী। মিসেস মিলস অবশ্য সত্যিই ব্রিলিয়ান্ট, তেমনি আরো বেশ কয়েকজন ভদ্রমহিলা।...ডেট্রয়েট থেকে আগত আর এক ভদ্রমহিলা—খুব সংস্কৃতসম্পন্না, তাঁর সুন্দর কালো চোখ এবং লম্বা চুল, তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন সমুদ্রের পনের মাইল ভেতরে অবস্থিত

অবস্থিত একটি দ্বীপে। আশা করি, সময়টা বেশ সুন্দর কাটবে।...বোধ করি, এখান থেকে আমি যাব আনিস কোয়ামে। জায়গাটি চমৎকার মনোরম, আর চানের ব্যবস্থা সত্যিই অপূর্ব। কোরা স্টকহ্যাম আমাকে একটি স্নানের পোশাক তৈরী করে দিয়েছে। জলে কাটাচ্ছি খুব আরামে—হাঁসের মতো; কাদার প্রাণীর পক্ষে ও ব্যাপারটা দারুণ আরামপ্রদ। আর লিখবার কিছু পাচ্ছি না। আমি এখন এতই ব্যস্ত যে মাদার চার্চের কাছে আলাদা চিঠি দেবার সময়ই পাচ্ছি না। মিস হাওয়েকে আমার ভালোবাসা ও নমস্কার জানিয়ো।

বোস্টনের মিঃ উড রয়েছেন এখানে, তিনি তোমাদের গোষ্ঠীর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু তিনি মিসেস হুইরলপুলের গোষ্ঠীভুক্ত হতে নারাজ। তিনি নিজেকে বলেন অধিবিদ্যা-রাসায়নিক-পদার্থবিদ—ধর্মীয় এবং এইরকম আরো কতরকম মনোরোগ চিকিৎসক! গতকাল এখানে এক প্রচণ্ড সাইক্লোন হয়ে গেল, তাতে তাঁবুগুলোর "চিকিৎসা" হয়েছে খুব ভালোই। যে বৃহৎ তাঁবুর তলায় তাদের বক্তৃতা সভা বসত "চিকিৎসার" ফলে তার মধ্যে অসাধারণ আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটল—সে একেবারে মনুষ্য দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেছে; শ দুয়েক চেয়ার আধ্যাত্মিক ভাবাবেশে চতুর্দিকে নেচে বেড়াচ্ছিল! মিলস কম্পানির মিসেস ফিগস প্রতিদিন সকালে একটি করে ক্লাস দেন; মিসেস মিলসও সারা জায়গা ঘুরে নেচে বেড়াচ্ছেন; তারা সবাই আছেন খুবই প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্যে। কোরার জন্য আমি খুশী; গত শীতকালে ওদের খুব দুঃখভোগ গেছে, এখন কিছু আমোদ-আহ্লাদ হাসি-তামাসায় তার উপকার হবে। ক্যাম্পে এরা সবাই যে স্বাধীনতা উপভোগ করে তা দেখলে তোমরা বিস্ময়ে হতবাক হবে, কিন্তু এরা সবাই বেশ ভালো এবং সচ্চরিত্র—খানিকটা খেয়ালী অস্থিরচিত্ত, অন্য কিছু নয়। আমি এখানে থাকব আগামী শনিবার পর্যন্ত।...

...এখানে একটি পাইন গাছ আছে, তার তলায় রোজ সকালে হিন্দু কায়দায় আমি বসি এবং এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলি; সেদিন রাতে এরা এই গাছের তলায় ঘুমুল। অবশ্য আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম; নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় সে এক চমৎকার রাত্রি যাপন; মাটি মায়ের কোলে শুয়ে ঘুমোনো, প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করলাম। রাত্রির সেই ঐশ্বর্যগরিমা তোমাদের কাছে আমি বর্ণনা করতে পারব না। এক বছরের যে পাশব জীবন কাটিয়েছি তারপর মাটিতে শুয়ে নিদ্রা, বনের মধ্যে গাছের তলায় ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকা—সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! সরাইখানার লোকেরা মোটের ওপর অবস্থাপন্ন, ক্যাম্পের লোকেরা স্বাস্থ্যবান, বয়সে তরুণ, নিষ্ঠাবান এবং পূতচরিত্র নারী ও পুরুষ। আমি তাদের শেখাই শিবোহম, শিবোহম, আর তারা সেকথা পুনরাবৃত্তি করে; নিষ্পাপ শুদ্ধচিত্ত তারা এবং সাহসেরও তাদের সীমা নেই। অতএব অত্যন্ত সুখে গরিমামণ্ডিত হয়ে আছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তিনি আমাকে দরিদ্র করেছেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তিনি তাঁবুর ছেলেমেয়েদের দরিদ্র করেছেন। ফুলবাবু আর বিবিরা আছেন হোটেলে, আর ক্যাম্পে রয়েছে লৌহদৃঢ় স্নায়ু, তিন পরতা ইস্পাতের মতো শক্ত মজ্জা এবং আগুনের হল্কার মতো তেজসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা। গতকাল প্রবল বর্ষণের মধ্যে, সব কিছু লণ্ড-ভণ্ড করে দেওয়া সাইক্লোনের মধ্যে এই সাহসী ছেলে-

মেয়েরা কীভাবে তাঁবুর দড়ি ধরে ঝুলে পড়ে সেসব উড়ে যেতে দেয়নি, কী রকম অকুতোভয়ে আপন শক্তিতে মহীয়ান হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা—যদি দেখতে তাহলে তোমাদের হৃদয় শক্ত ও উন্নত হত। এরকম ছেলেমেয়ে দেখবার জন্ম আমি শত মাইল যেতে প্রস্তুত। ভগবান ওদের কল্যাণ করুন! আশা করি তোমাদের গ্রামীণ জীবন খুব ভালো লাগছে। এক মুহূর্তের জন্মও মনে কোনো দুশ্চিন্তার ঠাঁই দিয়ো না। আমার একটা ব্যবস্থা হবেই, যদি না হয় তবে জানব আমার সময় হয়ে এসেছে—তখন আমি গত হব।

"হে মধুময়! বহু লোক তোমাকে বহু কিছুই দিতে ইচ্ছুক। আমি দীন—আমার আছে এই দেহ মন আত্মা। সবই তোমাকে অর্পণ করলাম। হে বিশ্ব-বিধাতা, প্রসন্ন হয়ে তুমি তা গ্রহণ কর, তা প্রত্যাখ্যান কোরো না।"—আমি এই ভাবেই চিরতরে আমার প্রাণ ও আত্মা সমর্পণ করেছি। একটা কথা—এখানকার লোকেরা একটু নীরস প্রকৃতির; অবশ্য সারা পৃথিবীতে খুব কম লোকই আছে যারা নীরস প্রকৃতির নয়। ওরা মাধবকে, মধুময়কে বোঝে না। হয় তারা বুদ্ধিজীবী, নয়ত তাদের বিশ্বাস আছে মনোরোগের প্রতি, বা টেবিল চালানো জাতীয় ডাকিনী-বিদ্যা ইত্যাদির প্রতি। এদেশের মতো আর কোথাও আমি "প্রেম, জীবন, স্বাধীনতার" কথা এত বেশী শুনিনি, আবার এ সকল ব্যাপারে এত কম উপলব্ধি এখানকার মতো অন্য কোথাও দেখিনি। এখানে ঈশ্বরকে দেখা হয় সন্ত্রাসের চেহারায় অথবা আরোগ্যের ক্ষমতারূপে, কম্পনের প্রতিফলন হিসাবে। ভগবান তাদের আত্মার শান্তি দিন! কাকাতুয়ার মতো এরা কেবল রাত দিন আওড়ায় প্রেম, প্রেম আর প্রেম!

এবার তোমাদের কথা। তোমাদের স্বপ্ন সুন্দর হোক, তোমাদের চিন্তা নিষ্কলঙ্ক হোক! তোমরা মহৎ, তোমরা সাধু। এখানকার এদের মতো অধ্যাত্মবোধকে বস্তুগত করার বদলে, অধ্যাত্মকে মাটির স্তরে টেনে নামানোর বদলে তোমরা বরং বস্তুকেই উন্নত কর অধ্যাত্ম স্তরে; অপরিসীম সৌন্দর্য শান্তি ও পবিত্রতার সেই জগৎকে—সেই অধ্যাত্ম ঐশ্বর্যকে প্রতিদিন অন্তত এক ঝলক অবলোকন কর, আর রাতদিন তাতেই বিভোর হয়ে থাকতে চেষ্টা কর। যা অপ্রাকৃত তাকে কখনো চাইবে না, এমন কি পদ-নখ দিয়ে তা স্পর্শও করবে না। তোমাদের আপন অন্তরে আছে সেই প্রেমাস্পদের স্থান—"অখণ্ড মল্লিকার" ন্যায় দিবা-রাত্রি যেন তোমাদের আত্মা তাঁরই পাদপদ্মে উপনীত হবার জন্য ঊর্ধ্ব গতি থাকে, তারপর দেহ ইত্যাদি যেমন চলে চলুক। জীবন বিলীয়মান, অপসৃয়মান স্বপ্নসম; যৌবন ও সৌন্দর্য শুকিয়ে যায়। দিনে ও রাতে বলবে, "তুমিই পিতা, মাতা তুমি, তুমি আমার স্বামী আমার প্রেম আমার প্রভু, হে আমার দেবতা—তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছু চাই না, কিছু না, আর কিছু না। তুমি আছ আমার মধ্যে, আমি তোমার মধ্যে, আমি তোমাতেই অন্তর্লীন, তুমিই আছ আমাতে।" ধন-সম্পদ সব যায়, সৌন্দর্য অপসৃত হয়, জীবন বিলীন হয়, দূর হয়ে যায় শক্তি ও ক্ষমতা—কিন্তু প্রভু থাকেন চিরকাল, প্রেম চিরকাল অক্ষয় থাকে। এই জগৎসংসারে দেহযন্ত্রকে সচল-কর্মঠ রাখা যদি

গৌরবের কাজ হয় তবে যন্ত্রণা-কাতর দেহ থেকে আমাকে বিমুক্ত করা আরো বেশী গরিমাময়—এই মুক্তিসাধনের দ্বারাই প্রমাণিত করতে পারা যায় যে তুমি "বস্তুসর্বস্ব নও"; তা সম্ভব হয় বস্তুতে পৃথক হতে দিয়ে।

দেবতাকে আঁকড়ে থাক! দেহের বা অন্য সব কিছুর কী ঘটল না ঘটল তাতে কী আসে যায়! অশুভের সন্ত্রাসের মধ্য থেকেও মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্য থেকেও বোলো—হে আমার দেবতা, আমার প্রেম! তুমি আছ এখানে, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। তুমি আছ আমারই সঙ্গে, আমি তোমাকে অনুভব করছি। আমি তোমার, আমাকে তুমি গ্রহণ কর। আমি বিশ্ব-সংসারের কেউ নই, আমি তোমারই। আমাকে তুমি ত্যাগ কোরো না। হীরা ছেড়ে কাচের পেছনে ছুটো না! এই জীবন একটি মস্ত সুযোগ। আর তুমি কি জীবনে শুধু পার্থিব আনন্দের অন্বেষণ করবে?—প্রভুই তো সর্ব সুখৈশ্বর্যের উৎস। উচ্চতমের অন্বেষণ কর, উচ্চতমের প্রতিই লক্ষ্য নির্দিষ্ট রাখ—দেখবে তুমি উচ্চতম স্তরেই উপনীত হয়েছ।

আশীর্বাদ সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

[৭২]

(মিসেস ওলি বুলকে লেখা)

হোটেল বেলভিউ
বীকন স্ট্রীট, বোস্টন
১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় মা সারা,

আমি আপনাকে আদৌ ভুলে যাইনি। আমি অমন অকৃতজ্ঞ হতে পারি তা আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন না! আপনি আমাকে আপনার ঠিকানা দেননি; আমি কিন্তু ল্যাণ্ডসবার্গের কাছ থেকে মিস ফিলিপস মারফৎ আপনার সংবাদ নিয়েছি। আমার কাছে মাদ্রাজ থেকে পাঠানো মেমোরিয়াল এবং ভাষণ সম্ভবত আপনি দেখেছেন। ল্যাণ্ডসবার্গের ওখানে আপনার কাছে পৌছানোর জন্য কিছু কপি আমি পাঠিয়েছি।

হিন্দু সন্তান কখনো মায়ের কাছে ঋণ দেয় না, সন্তানের ওপর মায়ের যেমন পূর্ণ অধিকার থাকে, তেমনি মায়ের ওপর সন্তানেরও। আপনি আমাকে সামান্য কয়েকটা নোংরা ডলার শোধ করে দেবার কথা বলাতে আমি অন্তত ক্ষুব্ধ হয়েছি। আপনার ঋণ কিন্তু আমি কখনো শোধ করতে পারব না।

উপস্থিত বোস্টনের কয়েকটি স্থানে আমি বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছি। আসলে আমি যা চাই তা হল এমন একটি স্থান যেখানে বসে আমার চিন্তা ও ভাবকে লিপিবদ্ধ করতে পারি। বলা যথেষ্ট হয়েছে, এবার লিখতে চাই। মনে হয়, সেজন্য আমাকে

যেতে হবে নিউ ইয়র্কে। মিসেস গুয়েরনসে আমার প্রতি খুবই সদয়, তিনি আমাকে সাহায্য করতে সদাই ইচ্ছুক। মনে করছি তাঁর কাছেই যাব, সেখানে বসে আমার বইখানা লিখব।

আপনার চির স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ,

দয়া করে আমাকে লিখে জানাবেন, গুয়েরনসেরা শহরে ফিরে এসেছেন কিনা, না কি ফিশকিলেই আছেন।

বি

[৮০]

বোস্টন
২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় মিসেস বুল,

আপনার দুখানা সহৃদয় পত্রই পেয়েছি। শনিবারে আমায় মেলরোজ-এ ফিরে যেতে হবে এবং সোমবার পর্যন্ত সেখানে থাকতে হবে। মঙ্গলবার আমি আপনার ওখানে আসব। কিন্তু জায়গাটির সঠিক অবস্থান ভুলে গেছি। দয়া করে যদি তা আমায় লিখে জানান তবে তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতার শেষ থাকবে না। বস্তুত ঐ রকমটাই আমি চাইছি—লিখবার উপযোগী নিরিবিলি একটি জায়গা। আপনি অনুগ্রহ করে যতটা জায়গা আমার জন্য ছেড়ে দিতে চেয়েছেন তার চেয়ে অনেক কম জায়গাতেই আমার চলে যাবে; যে কোনো জায়গায় গুড়িসুড়ি মেরে আমি থাকতে পারি, আর তাতে আমার কোনো অসুবিধাই হয় না।

আপনাদের
বিবেকানন্দ

বিবিধ

ধর্ম : পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য

সমস্ত পৃথিবীর ধর্মগুলি পাঠ করলে আমরা সাধারণত দুটি সাধনপদ্ধতি লক্ষ্য করি। একটা, ঈশ্বর থেকে মানুষের দিকে ধাবিত। যেমন সেমেটিক ধর্মগোষ্ঠীতে ঈশ্বরের ধারণা প্রায় প্রথম থেকেই বিকাশ লাভ করেছিল এবং আশ্চর্য, আত্মা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। এটা উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন ইহুদীদের মধ্যে আধুনিক কাল পর্যন্ত মানবাত্মা সম্পর্কিত কোনো ধারণা গড়ে ওঠেনি। মন এবং কিছু জড় পদার্থের সমষ্টি হল মানুষ এবং সেটাই সব। মৃত্যুতেই সবকিছু শেষ। অথচ অন্য দিকে এই গোষ্ঠীর মধ্যেই ঈশ্বর সম্পর্কে অতি বিস্ময়কর ধারণার স্ফুরণ হয়েছিল। এটাও অন্যতম সাধনপদ্ধতি। অন্য পদ্ধতিটি মানুষের ভেতর দিয়ে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত। এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি বিশেষভাবে আর্যজাতির এবং প্রথমটি সেমেটিকদের।

আর্যরা প্রথমেই আত্মাতত্ত্ব নিয়ে শুরু করেছিলেন। ঈশ্বর সম্পর্কে তখন তার ধারণা অস্পষ্ট, পার্থক্য নিরূপণে অসমর্থ এবং অপরিষ্কার; কিন্তু পরে আত্মা সম্পর্কে তার ধারণা যতই স্পষ্ট হতে লাগল, ঈশ্বর সম্পর্কেও সেই অনুপাতে স্পষ্টতর ধারণা তৈরী হল। সেজন্য বেদে সমস্ত সন্ধিৎসাই আত্মার মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত এবং ঈশ্বর সম্পর্কে আর্যদের যাবতীয় জ্ঞান সবই মানবাত্মার দ্বারা স্ফূর্ত। সেইজন্যই তাদের সমগ্র দর্শনে ঈশ্বরের জন্য অন্তর্মুখী অনুসন্ধান একটি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। আর্যরা নিজ অন্তরেই ঈশ্বরকে খুঁজেছেন। কালক্রমে এই সাধনপদ্ধতি তাদের স্বাভাবিক ও নিজস্ব হয়ে ওঠে। তাদের শিল্প ও দৈনন্দিন আচার-আচরণের মধ্যেও ঐ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। বর্তমানকালেও কোনো উপাসনারত ইওরোপীয়ের প্রতিকৃতিতে দেখি যে শিল্পী তাঁর দৃষ্টি ঊর্ধ্বে স্থাপন করান, উপাসক ঈশ্বরকে প্রকৃতির বাইরে খুঁজছেন, দূর আকাশে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত তাই যেন। অন্যদিকে ভারতীয় উপাসকের মূর্তিতে দেখি তাঁর চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত, যেন উপাসকের দৃষ্টি অন্তরে।

এই দুটিই মানুষের পর্যালোচনার বিষয়—বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি; এবং যদিও আপাতদৃষ্টিতে এ দুটি পরস্পরবিরোধী, সাধারণ মানুষের কাছে বহিঃপ্রকৃতি অথবা চিন্তা জগৎ দিয়েই তৈরী। বিশ্বের অধিকাংশ দর্শনশাস্ত্রেই, বিশেষত পাশ্চিমী দর্শনে প্রথমেই ধরে নেওয়া হয়েছে যে জড় এবং চেতনমন এ দুটি বিপরীতধর্মী অস্তিত্ব। কিন্তু পরিণামে আমরা দেখব যে এরা পরস্পরের কাছাকাছি আসবে ও অবশেষে একত্রিত হয়ে অনন্ত অখণ্ড বস্তুর সৃষ্টি করবে। এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে কোন একটি মতকে অন্য মতের থেকে উচ্চমান প্রতিপন্ন করা আমার ইচ্ছে নয়। বহিঃপ্রকৃতির মাধ্যমে যাঁরা সত্যের অনুসন্ধান করছেন তাঁরা যেমন ভ্রান্ত নন, অন্তঃপ্রকৃতির মধ্য দিয়ে যাঁরা ঐ অনুসন্ধানে প্রয়াসী তাঁরা উচ্চমানের এমন ভাববার কোনো কারণ নেই। এ দুটি বিভিন্ন পদ্ধতি। দুটি পদ্ধতিই বেঁচে থাকবে, দুটিরই পর্যালোচনা প্রয়োজন; পরিশেষে আমরা দেখব যে দুটি মত মিলিত হয়েছে। আমরা দেখব যে দেহ ও মন কেউই পরস্পরের পরিপন্থী নয় যদিও দেখা যায়, অনেকেই মনে করেন যে এই দেহ তুচ্ছ। পুরাকালে প্রত্যেক দেশেই এমন বহু লোক ছিল যারা দেহকে শুধু জরা, পাপ ও ঐ জাতীয় বস্তুর আধার বলে মনে

করত। যা হোক, পরে অবশ্য আমরা দেখেছি বেদের শিক্ষা অনুযায়ী এই দেহ মনে এবং মন দেহে মিশে গেছে।

একটা বিষয় স্মরণে রাখতে হবে যা সমস্ত বেদে ধ্বনিত হয়েছে—"যেমন একটা মাটির ঢেলা সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে আমরা পৃথিবীর সমস্ত মাটির বিষয়ে জানতে পারি, তেমনি সেটা কি যা জানতে পারলে আমরা অন্য সবই জানতে পারি?" মোটামুটি স্পষ্টত ব্যক্ত এই তত্ত্বই সমগ্র মানব-জ্ঞানের বিষয়বস্তু, এই একত্ব অনুসন্ধানের দিকে আমরা সবাই এগোচ্ছি। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি কর্ম, তা অতি বৈষয়িক, অতি স্থূল, অতি সূক্ষ্ম, অতি উচ্চ, অতি আধ্যাত্মিক হোক্ না কেন—সমানভাবে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে সেই একই আদর্শের দিকে—একত্ব অনুসন্ধান। একটি মানুষ প্রথমে একক। তারপর সে বিয়ে করল। আপাতদৃষ্টিতে এটা স্বার্থপর কাজ মনে হতে পারে কিন্তু এর পেছনে যে প্রেরণা, যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা ঐ একত্ব অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা। তার সন্তান-সন্ততি আছে, বন্ধুবান্ধব আছে; সে তার দেশকে ভালবাসে, এই পৃথিবীকে ভালবাসে এবং সবশেষে তার প্রেম সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়ে, দুর্নিবার গতিতে আমরা সেই একত্ব অনুসন্ধানের পূর্ণতার দিকে ধাবিত হচ্ছি, নিজের ক্ষুদ্র 'আমি'কে বিনাশ করে উদার থেকে উদারতর পথে। এটাই চরমতম লক্ষ্য, ঐ লক্ষ্যপথেই সমগ্র বিশ্ব ধাবমান। প্রতিটি অণু প্রধাবিত অন্য অণুর সঙ্গে মিলনের জন্য। অণু-পরমাণুর সঙ্গে অণু-পরমাণুর ঘন ঘন মিলন হচ্ছে আর সৃষ্টি হচ্ছে বিশাল গোলক, ভূলোক, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ এবং উপগ্রহ। আবার এরাও নিয়মমাফিক পরস্পরের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং পরিশেষে, আমরা জানি, সমস্ত জড়জগৎ ও চেতনজগৎ এক অখণ্ড সত্তায় মিশে যাবে।

নিখিল ভুবনে যে বিশাল ক্রিয়া চলমান, স্বল্পাকারে ব্যষ্টি মানুষেও সেই ক্রিয়া চলছে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যেমন নিজস্ব একটি ভিন্ন সত্তা আছে অথচ একত্ব, অখণ্ডের দিকে নিয়ত ধাবমান, তেমনি আমাদের ক্ষুদ্র জগতেও প্রতিটি জীব জগতের অবশিষ্টাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন করে জন্মগ্রহণ করছে। যে মানুষ যত বেশী অজ্ঞ, সে তত বেশী মনে করে সে মরবে অথবা জন্মগ্রহণ করবে—এই ধারণাগুলি তার বিচ্ছিন্নতাবোধেরই অভিব্যক্তি। কিন্তু দেখা যায় যে জ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়, নীতিজ্ঞান গঠিত হয় ও অখণ্ড চেতনার উন্মেষ ঘটে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ঐ শক্তিই মানুষকে পেছন থেকে নিঃস্বার্থ হওয়ার প্রেরণা জোগায়। এটাই সমস্ত নীতি-জ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ। পৃথিবীর যে কোন ভাষায়, যে কোন ধর্মে বা যে কোন অবতার দ্বারা প্রচারিত ধর্মনীতির সারাংশ হল এটি। 'নিঃস্বার্থ হও', 'আমি নয়, তুমি'—এই হল সকল নীতিধর্মের পটভূমি এবং এর দ্বারাই এই নৈর্ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত হয়—তুমি আমার অংশ, এবং আমিও তোমার, তোমাকে আঘাত করলে আমি নিজে আহত হই, তোমাকে সাহায্য করলে আমার নিজের সাহায্য হয় এবং তুমি জীবিত থাকলে সম্ভবত আমার মৃত্যু হতে পারে না। এই বিরাট পৃথিবীতে যতক্ষণ একটা কীটও জীবিত থাকে, ততক্ষণ আমি কি করে মরতে পারি? কারণ আমার জীবন তো ঐ

কীটের জীবনের মধ্যে নিহিত। সেই সঙ্গে আমরা এই শিক্ষাও পাই যে কোন মানুষকে সাহায্য না করে আমরা পারি না, কারণ তার মঙ্গলেই আমারও মঙ্গল।

এই বিষয়বস্তুই সমগ্র বেদান্ত এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে। এটা স্মর্তব্য যে সব ধর্মই সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমটা হল দর্শন—প্রত্যেক ধর্মের মূলনীতি ও সারাংশ। সেই নীতিগুলি পুরাণের আখ্যান, মহাপুরুষ বা বীরেদের জীবন, দেবতা, উপদেবতা বা দেবমানবদের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হয়। শক্তির বিকাশ সমস্ত পুরাণ-আখ্যানের মূল ভাব। এবং পুরাকালে আদিমযুগে রচিত নীচু মানের পুরাণে এই শক্তির বিকাশ দেখা যায় দেহের পেশীতে—সেখানে বর্ণিত বীরগণ শক্তিশালী ও বিপুলদেহী। একজন বীরই সেখানে বিশ্বজয়ে সমর্থ। মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে তার শক্তি দেহের ঊর্ধ্বে কোনো ব্যাপকতর ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। সেজন্য উচ্চমানের পুরাণগুলিতে মহাপুরুষরা উচ্চতর নীতিজ্ঞানের শক্তিশালী নিদর্শন হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন। পবিত্রতা এবং নীতিনিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাঁদের শক্তি বিকশিত হয়েছে। তাঁরা স্বতন্ত্র শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ—স্বার্থপরতা ও অনৈতিকতার দুর্বার স্রোতকে :ব্যাহত করার শক্তি তাঁদের আছে। সকল ধর্মের তৃতীয় অংশটি হল প্রতীকের উপাসনা, যাকে তোমরা যজ্ঞ বা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম বলে থাকো। কিন্তু পুরাণ-আখ্যান বা বীরদের জীবনকাহিনীর মাধ্যমে যা ব্যক্ত তা সকল মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়। অনেক নিম্নস্তরের মানুষও আছে। তাদের জন্য শিশুদের মত ধর্মের কিণ্ডারগার্টেন আবশ্যক এবং সেজন্যই প্রতীকের উপাসনা ও ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়েছে,—এগুলি ধরা যায়, নাড়া যায়, বোঝা যায়, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জড়বস্তুর মত দেখা যায় ও অনুভব করা যায়।

সুতরাং প্রত্যেক ধর্মেই তিনটি পর্যায় দেখা যাচ্ছে—দর্শন, পুরাণ এবং প্রতীক উপাসনার জন্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম। বেদান্তের পক্ষে একটি সুবিধে আছে যে সৌভাগ্যবশত ভারতবর্ষে এই তিন পর্যায়ের ধর্মেরই সংজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে, অন্যান্য ধর্মে তত্ত্বগুলি পুরাণ-আখ্যানের সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যে একটা থেকে আর একটাকে ভিন্ন করে দেখা বড় শক্ত। তত্ত্বগুলি গ্রাস করে পুরাণ-আখ্যান প্রাধান্য পায় এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তত্ত্বগুলি সাধারণের কাছে অদৃশ্য হয়ে যায়। তত্ত্বের টীকা, ব্যাখ্যা ইত্যাদি মূল তত্ত্বকে গৌণ করে দেয় এবং সকলে ঐ টীকা ব্যাখ্যাকেই মুখ্য করে সন্তুষ্ট হয় আর অবতার, প্রচারকদের কথা চিন্তা করে —ইতিমধ্যে মূলতত্ত্বের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, এত বেশী লোপ পায় তার অস্তিত্ব যে আজও যদি কেউ যীশুকে বাদ দিয়ে খ্রীষ্টধর্মীয় তত্ত্ব প্রচার করতে যায় তবে লোকে তাকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করবে এবং মনে করবে যে সে অন্যায় করেছে ও খ্রীষ্টধর্মের ওপর আঘাত হানছে। একইভাবে কেউ যদি ইসলামধর্ম প্রচার করতে যায়, মুসলমানদেরও একই প্রতিক্রিয়া হবে। কারণ বাস্তব ধ্যানধারণা, মহাপুরুষ ও সাধকদের জীবন-কাহিনী তত্ত্বগুলিকে আবৃত করেছে।

বেদান্তের সুবিধে হল এটা কোন ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি নয়। অতএব, স্বাভাবিক ভাবেই বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম বা ইসলামের মত কোন প্রচারক বা শিক্ষক এর তত্ত্বগুলিকে

গ্রাস বা আবৃত করেনি। তত্ত্বগুলি সবসময়েই চিরন্তন এবং প্রচারকরা এক্ষেত্রে যেন গৌণ—এদের কথা বেদান্তে নেই। উপনিষদগুলিতে কোন বিশেষ প্রচারক বা আদিষ্ট পুরুষের উল্লেখ নেই, এইরকম বহু আদিষ্ট পুরুষ এবং নারীর উল্লেখ আছে। প্রাচীন ইহুদীদের মধ্যে এই ধরনের কিছু ধারণা ছিল; কিন্তু তবু আমরা দেখি মোজেস ইহুদী সাহিত্যের বিরাট অংশ জুড়ে আছেন। অবশ্য আমি একথা বলছি না যে এই মহাপুরুষদের দ্বারা কোন জাতির ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রণ খারাপ। তবে যদি ধর্মের সমগ্র তত্ত্ব অংশটিকে অস্বীকার করা হয় তা ক্ষতিকর। তত্ত্বের প্রেক্ষিতে একটা ঐকতান সম্ভব, কিন্তু ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয়। ব্যক্তি আমাদের আবেগকে স্পর্শ করে কিন্তু তত্ত্ব আরও উচ্চতর ক্ষেত্রে আমাদের শান্ত বিচারবুদ্ধিকে স্পর্শ করে। তত্ত্বই অবশেষে জয়লাভ করবে কারণ ওটাই মানুষের মনুষ্যত্ব। আবেগ অনেক সময় আমাদের পশুদের স্তরে নামিয়ে আনে। বিচারবুদ্ধির চেয়ে ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গেই আবেগের বেশী সম্পর্ক; এবং সেইজন্য তত্ত্ব যখন অবহেলিত হয় ও আবেগ প্রাধান্য পায়, ধর্ম তখন ধর্মান্ধতা ও দলীয় রাজনীতিতে পর্যবসিত হয়। তখন ধর্মবিষয়ে মানুষের মনে ভয়াবহ অন্ধ ধারণার সৃষ্টি হয় এবং ফলত হাজার হাজার মানুষ তাদের ভায়ের গলায় ছুরি বসাতে প্রস্তুত হয়। এই কারণেই যদিও ঐ সব মহান ব্যক্তিত্ব ও আদিষ্ট মহাপুরুষদের জীবন মহৎ কার্যের প্রেরণা স্বরূপ, তত্ত্বচ্যুত হলে ঐ মহাপুরুষরাই বিপদের হেতু হয়ে যান। এইভাবেই পৃথিবীতে বহুবার ধর্মান্ধতা এসেছে ও রক্তস্নাত করেছে। বেদান্তে এই বিপদ নেই কারণ এতে কোন বিশেষ আদিষ্ট পুরুষ নেই। বেদান্তে অনেক 'দ্রষ্টা'-র কথা আছে যাদের মুনি বা ঋষি বলা হয়। দ্রষ্টা—এর শব্দার্থ যাঁরা সত্য এবং মন্ত্র দর্শন করেছেন।

মন্ত্র শব্দের অর্থ মনন, মনে ধ্যান দ্বারা লব্ধ এবং ঋষি এইসব মননের দ্রষ্টা। এই মন্ত্রগুলি কোন বিশেষ মানবগোষ্ঠীর বা কোন বিশেষ নরনারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, তিনি যত বড় ও মহানুই হোন না কেন। এমন কি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ বুদ্ধ বা খ্রীষ্টেরও নিজস্ব সম্পত্তি নয়। এই মন্ত্রগুলি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রেরও যেমন সম্পত্তি, বুদ্ধদেবেরও সম্পত্তি; অতি ক্ষুদ্র সরীসৃপ কীটেরও যেমন সম্পত্তি, খ্রীষ্টেরও তেমনি সম্পত্তি, কারণ ঐ তত্ত্বগুলি সার্বজনীন। এই মন্ত্রগুলির কখনো সৃষ্টি হয়নি, এগুলি শাশ্বত। মন্ত্রগুলি অজ—আধুনিক বিজ্ঞানের কোন পদ্ধতি অনুযায়ী সৃষ্ট নয়। এরা আবৃত থাকে এবং আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু প্রকৃতিতে তাদের চিরকালীন বিরাজ। নিউটন না জন্মালেও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তত্ত্ব যথারীতি বিরাজ করত ও কাজ করত। নিউটনের প্রতিভা ঐ তত্ত্ব উদ্ভাবণ ও আবিষ্কার করেছিল, প্রাণ দান করেছিল, এবং মানবজাতির কাছে একটি চেতনরূপ দিতে সমর্থ হয়েছিল। ধর্মতত্ত্ব এবং মহান্ আধ্যাত্মিক সত্যগুলি সম্পর্কেও একই কথা। তারা সব সময়েই ক্রিয়াশীল। যদি বেদ, বাইবেল, কোরানের কোন অস্তিত্ব না থাকত, যদি দ্রষ্টা এবং আদিষ্ট পুরুষগণ জন্ম গ্রহণ না করতেন তাহলেও এই ধর্মতত্ত্বগুলি থাকত। এগুলি এখন স্থগিত আছে, কিন্তু ধীরে এবং নিশ্চিত ভাবে মনুষ্যজাতি ও মনুষ্যপ্রকৃতির উন্নতির জন্য ক্রিয়াশীল থাকবে। তাঁরাই অবতার যাঁরা এই তত্ত্বগুলি দর্শন ও আবিষ্কার করেন এবং এই অবতাররাই

আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আবিষ্কারক। নিউটন বা গ্যালিলিও যেমন পদার্থবিজ্ঞানের ঋষি, এঁরাও তেমনি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ঋষি। এইসব তত্ত্বের ওপর তাঁরা কোন বিশেষ অধিকার দাবি করতে পারেন না, কারণ এরা প্রকৃতির সাধারণ সম্পদ ভুক্ত।

হিন্দুদের মতে বেদ চিরন্তন। চিরন্তন বলতে তারা কি বোঝায় এখন আমরা বুঝতে পারি—অর্থাৎ প্রকৃতির যেমন, কোন আদি-অন্ত নেই, এইসব তত্ত্বগুলিরও সেইরকম সুরু বা শেষ নেই। পৃথিবীর পর পৃথিবীর, মতবাদের পর মতবাদ সৃষ্ট হবে, কিছুকাল অবস্থান করবে, এবং আবার অবলুপ্ত হবে; কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির রূপ একই থাকবে। লক্ষ লক্ষ মতবাদ জন্মগ্রহণ করছে আবার বিলুপ্ত হচ্ছে। কিন্তু বিশ্ব একই রূপে বিরাজ করছে। কোন একটি বিশেষ গ্রহের আদি-অন্তের সময় সম্পর্কে তবু বলা যায় কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে এমন সময়নির্দেশ অর্থহীন। প্রাকৃতিক নিয়ম, পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্পর্কেও ঐ একই কথা। তাদের আদি-অন্ত নেই এবং মানুষ সাম্প্রতিককালে, তুলনামূলক ভাবে বলতে গেলে খুব জোর কয়েক হাজার বছর ধরে এগুলি আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়েছে। আমাদের সামনে এখনো অজস্র উপাদান রয়েছে। সুতরাং বেদ থেকে প্রথমেই যে মহান্ শিক্ষা আমরা লাভ করি তা হল, ধর্ম সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আধ্যাত্মিক সত্যের অনন্ত সমুদ্র আমাদের সামনে রয়েছে—এদের আমাদের কার্যকর করতে হবে, আবিষ্কার করতে হবে, জীবনে আনয়ন করতে হবে। পৃথিবীতে হাজার হাজার আদিষ্ট পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, আরও লক্ষ লক্ষ আবির্ভূত হবেন।

পুরাকালে প্রায় প্রতি সমাজেই অনেক আদিষ্ট পুরুষ ছিলেন। এমন একটা সময় আসবে যখন পৃথিবীর প্রতিটি শহরের রাস্তায় রাস্তায় আদিষ্ট পুরুষগণ ঘুরে বেড়াবেন। বিশেষত প্রাচীন যুগে সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী অসাধারণ ব্যক্তিদেরই আদিষ্ট পুরুষ হিসেবে গণ্য করা হত। সেদিন সমাগত যেদিন আমরা বুঝতে পারব যে ধার্মিক হওয়ার অর্থই ঈশ্বরের আদেশ পাওয়া এবং ঈশ্বর-আদিষ্ট না হয়ে নর বা নারী কেউই ধার্মিক হতে পারে না। আমরা বুঝব যে শুধু চিন্তা করা এবং সেই চিন্তাকে ব্যক্ত করাই ধর্মের গোপন কথা নয়—বেদের শিক্ষা অনুযায়ী ঐ ধর্মের উপলব্ধি নতুনতর, উচ্চতর তত্ত্বের উপলব্ধি, আবিষ্কার ও সমাজে তাদের সঠিক প্রচার প্রয়োজন। আদিষ্ট পুরুষ গড়ে তোলাই ধর্মপাঠের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বিদ্যায়তনগুলির এ ব্যাপারে শিক্ষা-কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠা উচিত। সমগ্র বিশ্ব আদিষ্ট পুরুষে পূর্ণ হবে। যতক্ষণ না মানুষ আদিষ্ট পুরুষ হয়, ধর্ম তার কাছে ব্যঙ্গের বস্তু বা নেহাতই কথার কথা হয়ে দাঁড়ায়। দেয়ালকে যেমন দেখি তার চেয়েও হাজার গুণে মনঃসংযোগে ধর্মকে আমরা দর্শন করব, উপলব্ধি করব, অনুভব করব।

কিন্তু ধর্মের এই সমস্ত বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশের পেছনে একটা মূলতত্ত্ব আছে এবং আমাদের জন্য তা আগেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রতিটি জড়বিজ্ঞানেরই সমাপ্তি ঘটে সেইখানে যেখানে সে ঐক্যের সন্ধান পায়, কারণ তার চেয়ে বেশী আমরা যেতে পারি না। পূর্ণ ঐক্যে উপনীত হওয়ার পর বিজ্ঞানের নতুন কোন তত্ত্ব আর বলার থাকে না। ধর্মেরও করণীয় হল খুঁটিনাটির ব্যবস্থা করা। উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞানের

যে কোন একটি শাখাকে ধরা যায়, যথা, রসায়নশাস্ত্র। ধরুন, এমন একটি মূল উপাদান পাওয়া গেল যা থেকে অন্য উপাদানগুলি তৈরী করা যায়। তখনই রসায়নশাস্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে চরমত্ব প্রাপ্ত হল। তারপর যা বাকী থাকবে তা হল প্রতিদিন ঐ মূল উপাদানটির নতুন নতুন সংযোগ আবিষ্কার করা এবং জীবনের সার্বিক প্রয়োজনে ঐ পদার্থগুলিকে প্রয়োগ করা। ধর্মের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। ধর্মের বিশাল তত্ত্ব, তার কার্যক্ষেত্র, পরিকল্পনা বহুকাল আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে যখন মানুষ জ্ঞানের পরম বাণী, বেদের 'আমিই সে' তত্ত্বটি উপলব্ধিতে সমর্থ হয়েছিল, তারা বুঝেছিল সেই একক-এর মধ্যেই সমস্ত জড়জগৎ, মনোজগৎ ঐক্যের স্ফূর্তি পায়, একে কেউ ঈশ্বর, কেউ ব্রহ্ম, কেউ আল্লা, কেউ জিহোবা বা অন্যান্য নামে অভিহিত করে। আমরা তার বেশী যেতে পারি না। এই মহান্ তত্ত্ব ইতিমধ্যেই আমাদের জন্যে ব্যাখ্যাত হয়েছে। আমাদের কাজ হবে একে পূর্ণ করা, কাজে পরিণত করা ও জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে প্রয়োগ করা। আমাদের এখন এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে প্রত্যেকে আমরা আদিষ্ট পুরুষ হতে পারি। আমাদের সামনে বিরাট কাজ।

আদিষ্ট পুরুষ বলতে কি বোঝায় প্রাচীনকালে অনেকেই তা অনুধাবন করতে পারত না। তারা ভাবত কোনো আকস্মিকতার, প্রবল ইচ্ছাশক্তি বা উচ্চতর বুদ্ধি-বৃত্তির প্রভাবে কোন মানুষ উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী হতেন। আধুনিককালে আমরা বলি যে এই জ্ঞান প্রতিটি জীবের, সে যেই হোক বা যেখানেই থাকুক, জন্মগত অধিকার এবং জগতে আকস্মিকতা বলে কোন বস্তু নেই। আমরা যখন মনে করি কেউ আকস্মিকভাবে কিছু লাভ করেছে তখন ভুল করি, কারণ প্রকৃত অর্থে সে বহুদিন ধরে ধীর এবং নিশ্চিতভাবে প্রাপ্তির জন্য সাধনা করেছে। সমস্ত প্রশ্নটাই আমাদের ওপর এইভাবে এসে পড়ে, "আমরা কি সত্যিই আদিষ্ট পুরুষ হতে চাই?" যদি চাই, তবে নিশ্চয়ই আমরা তা হব।

এই আদিষ্ট পুরুষ গড়ে তোলার বিরাট কাজ এখন আমাদের সামনে রয়েছে এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় ধর্মব্যবস্থাগুলিই এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করছে। শুধু তফাৎ এই যে, দেখা যায় অনেক ধর্ম ঘোষণা করে, আধ্যাত্মিকতার প্রত্যক্ষ অনুভূতি ইহজীবনে সম্ভব নয়, মৃত্যুর পর অন্য জগতে একটা সময় আসবে যখন সে আধ্যাত্মিক সত্য দর্শন করবে, উপলব্ধ হবে, এখন সেগুলিই তাকে বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু যারা এইরকম কথা বলে বেদান্ত তাদের জিজ্ঞেস করবে, "তাহলে আধ্যাত্মিকতার অস্তিত্বের প্রমাণ কোথায়?" এবং তখন তারা উত্তরে বলতে বাধ্য হবে যে সবসময়েই কিছু বিশিষ্ট মানুষ থাকেন যাঁরা ইহ-জীবনেই অজ্ঞেয় এবং অজ্ঞাতের সন্ধান পেয়েছেন।

তাও একটু অসুবিধে রয়ে যাচ্ছে। যদি ঐ সমস্ত মানুষগুলি অসাধারণ হন এবং আকস্মিকতায় শক্তি প্রাপ্ত হন, তবে তাদের বিশ্বাস করার কোন অধিকার নেই আমাদের। যা আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত তাতে বিশ্বাস করা পাপ, কারণ আমরা তা জানতে পারি না। জ্ঞানের অর্থ কি? যা কিছু অদ্ভুত, অসাধারণ তার বিনষ্টি।

ধরুন একটি বালক রাস্তায় বা কোন পশুশালায় গিয়ে অদ্ভুত আকারের একটা পশু দেখল। সে জানল না পশুটি কি? তারপর সে একটি দেশে গেল যেখানে ঐরকম পশু অনেক রয়েছে, তখন সে আশ্বস্ত হল এবং ওটি একটি বিশেষ শ্রেণীর পশু বলে বুঝতে পারল। মূলতত্ত্ব জানাকেই আমরা জ্ঞান বলি। তত্ত্ববিহীন কোন বস্তু-বিশেষের জ্ঞান, জ্ঞান নয়। মূলতত্ত্বের উল্লেখ ছাড়াই বা মূলতত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন কোন একটি বা অনেক বিষয়ে আমরা যখন জ্ঞান লাভ করি, তখন আমরা অন্ধকারেই থেকে যাই, প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না। এখন ঐসব আদিষ্ট পুরুষগণ যদি বিশেষ ধরনের মানুষ হন এবং সাধারণের আয়ত্তের অতীত যে জ্ঞান তা লাভের অধিকার যদি তাদেরই শুধু থাকে এবং অন্য কারো না থাকে, তাহলে ঐসব আদিষ্ট পুরুষদের আমাদের বিশ্বাস করা উচিত নয় কারণ তাঁরা মূল তত্ত্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন বিশেষ ধরনের দৃষ্টান্ত। আমরা তখনই তাদের বিশ্বাস করতে পারি যখন আমরা নিজেরা আদিষ্ট পুরুষ হতে পারি।

তোমরা সকলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সমুদ্র নাগিনী সম্পর্কিত নানা কৌতুক-ঘটনা পড়েছ। এমন কেন হতে যাবে? কারণ কিছু মানুষ অনেকদিন অন্তর এসে সমুদ্র-নাগিনীর কাহিনী প্রচার করে যায়, অথচ অন্য কেউ তা দেখেনি। ওদের বিশেষ কোন তত্ত্ব নেই এবং সেজন্যই পৃথিবী ওদের বিশ্বাস করে না। যদি কেউ আমার কাছে এসে বলে যে একজন আদিষ্ট পুরুষ হঠাৎ মহাশূন্যে বিলীন হলেন এবং সেখানে বিচরণ করতে লাগলেন, তাহলে সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা দেখার অধিকার আমার আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, "তোমার বাবা বা ঠাকুর্দা কি ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন?" সে উত্তরে বলে, "না, তা কেউ প্রত্যক্ষ করেন নি, তবে পাঁচহাজার বছর আগে এমন ঘটনা ঘটেছিল।" এবং আমি যদি না বিশ্বাস করি তাহলে অনন্তকাল ধরে আমায় নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

এ কি বিশাল কুসংস্কার! আর এর ফলস্বরূপ মানুষ দেব-স্বভাব থেকে পশু-স্বভাবে অধঃপতিত হয়। যদি সবকিছু অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে হয় তাহলে আমাদের বিচারবুদ্ধি আছে কেন? যুক্তির বিরুদ্ধে কোন কিছুকে বিশ্বাস করা কি মহাপাপ নয়? ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ দানটিকে ব্যবহার না করার কি অধিকার আছে আমাদের? আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে ঈশ্বর-প্রদত্ত দান ব্যবহারে অসমর্থ অন্ধ বিশ্বাসীর চেয়ে যুক্তিবাদী অবিশ্বাসীকে ভগবান ক্ষমা করবেন। অন্ধবিশ্বাসী নিজের প্রকৃতিকে অবনমিত করে ও পশুস্তরে অধঃপতিত হয়—তার ইন্দ্রিয়গুলির অধঃপতনের ফলে অবশেষে মৃত্যু হয়। আমরা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করব এবং যুক্তি যখন সকল দেশে প্রাচীন শাস্ত্রে কথিত এইসব আদিষ্ট পুরুষ ও মহাপুরুষদের কাহিনীকে প্রমাণ করবে, আমরা তখন বিশ্বাস করব। আমরা তখনই বিশ্বাস করব যখন নিজেদের মধ্যেও আদিষ্ট পুরুষ দেখতে পাব। আর তখনই আমরা আবিষ্কার করব যে তাঁরা কোন বিশেষ ধরনের মানুষ নন বরং কিছু তত্ত্বের জীবন্ত উদাহরণ মাত্র। জীবনে তাঁরা সাধনা করেছেন আর স্বভাবতই ঐ তত্ত্ব তাঁদের মধ্যে বিকশিত হয়েছে এবং আমাদেরও ঐসব তত্ত্বকে বিকশিত করার সাধনা

করতে হবে। তাঁরা আদিষ্ট পুরুষ আমরা জানব তখনই যখন আমরা নিজেরা অমন পুরুষ হয়ে উঠব। তাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন। তাঁরা ইন্দ্রিয়ের পরিসীমা পেরিয়ে অতীন্দ্রিয়কে অনুধাবন করেছেন। এসব কথা আমরা তখনই বিশ্বাস করব যখন ঐরকম নিজেরা করতে সমর্থ হব, তার আগে নয়।

এটাই বেদান্তের একমাত্র নীতি। বেদান্ত ঘোষণা করে যে ধর্ম জাগ্রত এবং প্রত্যক্ষ কারণ ইহকাল বা পরকাল, জন্ম ও মৃত্যু, এই জগৎ বা অন্য জগতের প্রশ্ন কুসংস্কারের প্রশ্ন। মানুষের চেষ্টা ছাড়া সময় খণ্ডিত হয় না, সময় অনন্ত। সামান্য কিছু প্রাকৃতিক পরিবর্তন ছাড়া দশটা বা বারোটার মধ্যে কি পার্থক্য আছে? সময় অনন্তকাল বহমান। অতএব, এই জীবন বা অন্য জীবনের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এটা শুধু সময়ের প্রশ্ন এবং সময়ের ক্ষেত্রে যেটুকু ক্ষতি হয় কাজের গতিবৃদ্ধি করে তার পূরণও সম্ভব। অতএব, বেদান্ত ঘোষণা করছে, ধর্ম বর্তমানেই উপলব্ধি করতে হবে এবং তোমাকে ধার্মিক হতে হলে প্রথমে ধর্মসংশ্লিষ্ট সংস্কার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কঠোর শ্রমের সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে, প্রতিটি বিষয় স্বয়ং দর্শন করতে হবে; এগুলি সম্পূর্ণ হলে তবেই তুমি ধর্ম লাভ করবে। তার আগে তুমি একজন নাস্তিক ছাড়া কিছু নও, বা নাস্তিকের চেয়েও নিকৃষ্ট কারণ নাস্তিক তবু আন্তরিক ও অকপট—সে সোজাসুজি দাঁড়িয়ে উঠে বলে—"আমি এসব জানি না।" আর অন্যেরা কিছু না জেনেও জগৎবাসীকে বলে বেড়ায়—"আমরা অতি ধার্মিক"। তাদের কী ধর্ম কেউ জানে না। কারণ তারা কিছু ঠাকুমা-কথিত গল্প মুখস্থ করেছে এবং পুরোহিতেরা তাদের ঐগুলি বিশ্বাস করতে বলেছে; তারা যদি না করে তাদের উদ্ধার নেই। এই রকমই চলে আসছে।

ধর্মের উপলব্ধিই একমাত্র পথ। আমাদের প্রত্যেককেই সেটা আবিষ্কার করতে হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্রগুলির কি মূল্য? মূল্য আছে, যেমন দেশকে জানতে গেলে তার মানচিত্রের প্রয়োজন আছে। ইংলণ্ডে আসার আগে আমি বহুবার ইংলণ্ডের মানচিত্র দেখছি এবং ইংলণ্ড সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে তুলতে ওগুলি আমায় সাহায্যও করেছে। তবু যখন এদেশে এলাম, মানচিত্রে ও দেশে কি বিরাট প্রভেদ! উপলব্ধি আর শাস্ত্রের মধ্যেও তেমনি প্রভেদ আছে। শাস্ত্রগুলি হল শুধু মানচিত্র, অতীত মানুষদের অভিজ্ঞতা—ওগুলি আমাদের একইভাবে বা আরও ভালভাবে অনুভূতি সঞ্চয়ে এবং আবিষ্কারে সাহস ও প্রেরণা জোগায়।

এটাই বেদান্তের প্রথম তত্ত্ব—উপলব্ধিই ধর্ম এবং যে উপলব্ধি করে সেই ধার্মিক। যে উপলব্ধি করে না আর যে "আমি জানি না" বলে এদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই—বরং যে নাস্তিক সে ভাল, কারণ নিজ অজ্ঞতা সম্পর্কে সে অকপট। এই ধর্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে আবার ধর্মশাস্ত্রগুলি আমাদের প্রভূত সাহায্য করে, শুধু পথপ্রদর্শক হিসেবেই নয়, সাধনপদ্ধতির উপদেশ দিয়েও; কারণ প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব অনুসন্ধান-পদ্ধতি আছে। এ পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে দেখবে যারা বলে—"আমি ধার্মিক হতে চেয়েছিলাম, উপলব্ধি করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি পারিনি, অতএব

আমি কিছুই বিশ্বাস করি না।" শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও এমন লোক আছেন। বহু লোক তোমায় বলবে "আমি সারাজীবন ধরে ধার্মিক হবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু দেখেছি ওর মধ্যে কিছু নেই।" আবার একই সঙ্গে এই ব্যাপারটাও তুমি লক্ষ্য করবে: ধরো, এক ব্যক্তি রাসায়নিক, মস্ত বৈজ্ঞানিক, তো যার কাছে এসে রসায়নশাস্ত্রের কথা বলল, তখন যদি তুমি তাকে বলো "আমি রসায়নশাস্ত্রের কিছু বিশ্বাস করি না, কারণ সারাজীবন রাসায়নিক হবার চেষ্টা করেছি কিন্তু এর মধ্যে কিছু পাই নি।" সেই বৈজ্ঞানিক তোমায় জিজ্ঞেস করবে, "তুমি কখন চেষ্টা করেছ হবার"। তুমি বলবে, "যখন শুতে যেতাম তখন বার বার এই কথা উচ্চারণ করতাম—হে রসায়নশাস্ত্র, আমার কাছে এসো, কিন্তু সে কখনো আসেনি।" এও ঠিক তেমনি। বৈজ্ঞানিক তখন হেসে তোমায় বলবে—"ওটা ঠিক যথার্থ পথ নয়। কেন তুমি দিনের পর দিন ল্যাবরেটরিতে গিয়ে অ্যাসিড বা অ্যালকালি দিয়ে নিজের হাও পোড়াও নি? রসায়নশাস্ত্র শেখবার ঐটাই পদ্ধতি।" ধর্মের ব্যাপারে তুমি কি ঐরকম শ্রম স্বীকার করতে রাজী আছ? প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব একটি শিক্ষা-প্রণালী আছে, ধর্মেরও সেইরকম আছে। ধর্মেরও নিজস্ব পদ্ধতি আছে এবং এবিষয়ে পৃথিবীর প্রাচীন আদিষ্ট পুরুষদের, যাঁরা ধর্ম উপলব্ধি করেছেন ও দর্শন করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে অবশ্যই আমরা ধর্মলাভের কোন না কোন শিক্ষা পেতে পারি ও পাব। তাঁরা আমাদের বিভিন্ন পদ্ধতি, বিশিষ্ট পদ্ধতি শেখাবেন যেগুলির মধ্য দিয়ে আমরা ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করব। তাঁরা আজীবন সংগ্রাম করেছেন, মনকে সূক্ষ্মতম অনুভূতির উপযুক্ত করে মানসিক উৎকর্ষের বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন এবং ধর্ম উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন। ধার্মিক হতে হলে, ধর্মকে উপলব্ধি ও অনুভব করতে হলে, আদিষ্ট পুরুষ হতে হলে, আমাদের ঐ সমস্ত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে ও সে অনুযায়ী সাধনা করতে হবে; এবং তখনও যদি আমরা কিছু না পাই, আমাদের বলবার অধিকার হবে, "ধর্মের মধ্যে কিছু নেই, কারণ আমি পরখ করেছি এবং ব্যর্থ হয়েছি।"

এটাই সমস্ত ধর্মের বাস্তব দিক। পৃথিবীর সমস্ত বাইবেলেই তুমি এটা পাবে। ধর্ম শুধু কিছু তত্ত্ব আর নীতিকথাই শিক্ষা দেয় না, বরং মহাপুরুষদের জীবনে ধর্মের আচরণ দেখতে পাওয়া যায়; এবং যখন আচার-আচরণ শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত থাকে না, এইসব মহাপুরুষদের জীবনে দেখবে যে তাঁরা আহার-বিহার নিয়ন্ত্রণ করছেন। মহাপুরুষদের সমগ্র জীবন, আচরণ, পদ্ধতি সবকিছুই তাদের ঘিরে থাকা সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক এবং সেজন্যই তাঁরা উচ্চতর আলো ও ঈশ্বর দর্শনের ক্ষমতা লাভ করেছেন। এবং আমরাও যদি ঐরকম ক্ষমতা লাভ করতে ইচ্ছা করি তাহলে আমাদের অনুরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। নিয়মিত তপস্যা ও সাধনার দ্বারা আমরা ঐ মার্গে উন্নীত হতে পারব। অতএব বেদান্তের পরিকল্পনাটি এইরকম: প্রথমে নীতিগুলি নির্ধারণ করা, লক্ষ্যবস্তুকে অঙ্কিত করে নেওয়া ও তারপর যে পদ্ধতির সাহায্যে লক্ষ্যে পৌঁছুনো যায় তার শিক্ষাগ্রহণ করা এবং ধর্মকে বোঝা ও উপলব্ধি করা।

আবার এই সমস্ত পদ্ধতিও বিচিত্র হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতিগতভাবে আমাদের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের কথা ভেবে একই পদ্ধতি একাধিক ব্যক্তির পক্ষে কদাচিৎ প্রযোজ্য হতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের মেজাজের বৈশিষ্ট্য আছে, অতএব পদ্ধতিও ভিন্ন হওয়া উচিত। কেউ কেউ দেখবে প্রকৃতিগতভাবে খুব আবেগপ্রবণ, কেউ দার্শনিক, যুক্তিবাদী। আবার অন্য কেউ আনুষ্ঠানিক বিধিনিয়মকে আঁকড়ে থাকে—যা স্থূল তাই পেতে চায়।

আবার দেখবে কেউ একজন আনুষ্ঠানিক পূজা বা মূর্তি ইত্যাদি পছন্দ করে না—সেগুলি তার কাছে মৃত্যুতুল্য। আবার আর একজন তার সারা শরীরে মাদুলি আর তাবিজের বোঝা নিয়ে ঘুরছে—সে ঐসব প্রতীক খুব ভালবাসে। আরও একজন যে খুব আবেগপ্রবণ, প্রত্যেককে দানধ্যান করতে ভালবাসে; সে কাঁদে, হাসে, আরও কতভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে। এই অনেক প্রকার মানুষের নিশ্চয়ই একটিই পদ্ধতি থাকতে পারে না। সত্য উপলব্ধির জন্য যদি একটাই পথ নির্দিষ্ট থাকত তাহলে অন্যেরা যারা ঐ পথের উপযুক্ত নয়, তাদের কাছে তা মৃত্যুস্বরূপ হোত। অতএব সাধনপদ্ধতি বিভিন্ন হওয়া উচিত। বেদান্ত তা বোঝে এবং পৃথিবীর সামনে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি নির্দেশ করতে চায়। তোমার রুচি অনুযায়ী তুমি যে কোন একটা গ্রহণ করো; এবং একটা যদি তোমার খাপ না খায়, আরও একটা আছে। এই আদিকে বিচার করলে আমরা দেখি যে জগতে এতগুলি ধর্মের সহাবস্থান কী গৌরবের কথা, বহুমানুষের রুচি অনুযায়ী মাত্র একজন গুরু বা আদিষ্ট পুরুষ না হয়ে বহু গুরুর অবস্থান কী মঙ্গল। মুসলমানরা সমস্ত পৃথিবীকে ইসলামধর্মে, খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টধর্মে এবং বৌদ্ধরা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করতে চান। কিন্তু বেদান্ত বলে—"যদি ইচ্ছা হয় পৃথিবীর প্রতিটি নরনারী নিজের নিজের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হোক। সমস্ত তত্ত্বের পেছনে কিন্তু একটাই তত্ত্ব আছে। যত বেশীসংখ্যক আদিষ্ট পুরুষ থাকবে, শাস্ত্র থাকবে, দ্রষ্টা থাকবে, পদ্ধতি থাকবে, ততই পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গল।" সমাজের ক্ষেত্রে যেমন যত বেশী বৃত্তির সংস্থান থাকে, সমাজের ততই মঙ্গল, মানুষের তত বেশী কর্মলাভের সুযোগ হয়, ধর্ম ও ভাবের জগতেও ঠিক তাই। আজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিকাশ হওয়াতে কত বিচিত্রভাবে মানুষ মানসিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পারছে। জাগতিক ক্ষেত্রেও অনেক কিছু সুযোগ সামনে পেলে মানুষের কত সুবিধে হয়, প্রয়োজন আর রুচি অনুযায়ী আমরা বেছে নিতে পারি। ধর্মজগতেও একই কথা প্রযোজ্য। ভগবানের এটা একটা গৌরবময় বিধান যে পৃথিবীতে এত ধর্মের অবস্থান; এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি এই সংখ্যা প্রতিদিন বেড়ে যাক, যতক্ষণ না প্রতিটি মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুবর্তী হচ্ছে।

বেদান্ত এটা বোঝে এবং সেইজন্য একটিই তত্ত্ব প্রচার করলেও বহু পদ্ধতিকে স্বীকার করে নেয়। বেদান্তের কারো বিরুদ্ধেই কিছু বলার নেই—তুমি খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদী বা হিন্দু হও না কেন, বিশ্বাস করো না কেন যে কোন পুরাণে, ন্যাজারেথের ঈশদূত, মক্কার মহম্মদ, ভারতের বা অন্য যে কোন জায়গার অবতার বা আদিষ্ট পুরুষের প্রতি তোমার আনুগত্য থাক্‌ না, তুমি নিজে একজন আদিষ্ট

পুরুষ হও না কেন—বেদান্তের কিছু বলার নেই। বেদান্ত সেই মূল তত্ত্ব প্রচার করে যা সকল ধর্মের পটভূমি এবং আদিষ্ট পুরুষ, মহামানব, দ্রষ্টাপুরুষরা যার জীবন্ত উদাহরণ ও প্রকাশমাত্র। আদিষ্ট পুরুষদের সংখ্যা তুমি যত ইচ্ছে বৃদ্ধি করো, বেদান্তের কোন আপত্তি নেই। বেদান্ত শুধু তত্ত্বটি প্রচার করে এবং সাধনপদ্ধতিটি তোমার ওপর ছেড়ে দেয়। তুমি যে কোন পথ গ্রহণ করো, যে কোন আদিষ্ট পুরুষের অনুগামী হও, কিন্তু সেই সাধনপদ্ধতিটি যেন তোমার প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায়, তাহলে তোমার উন্নতি নিশ্চিত।

আত্মার প্রকৃতি ও লক্ষ্য

প্রাচীনতম ধারণা হল এই যে মানুষ মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। মৃত্যুর পরও কিছু একটা বেঁচে থাকে এবং মানুষ মরে গেলেও সেটা বেঁচেই থাকে। মিশরীয়, ব্যাবিলনীয় এবং প্রাচীন হিন্দু,– পৃথিবীর এই তিনটি প্রাচীনতম জাতির মধ্যে তুলনা করাই ভাল হবে এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে এই ধারণা গ্রহণ করতে হবে। মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের মধ্যে একটা আত্মা-বিষয়ক ধারণা দেখতে পাই—সেটা যুগ্ম-আত্মা। তাদের মতে, এই দেহের ভেতরে আরও একটি দেহ আছে যা এখানে বিচরণ ও কর্ম করছে; এবং যখন বাহ্যদেহের মৃত্যু ঘটে, তখন দ্বিতীয় দেহটি বেরিয়ে আসে এবং বেশ কিছুকাল বেঁচে থাকে; কিন্তু এই দ্বিতীয় দেহটির জীবনকাল ঐ বাহ্যদেহটির সংরক্ষণের ওপর নির্ভর করে। যে দেহটিকে দ্বিতীয় দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে সেই দেহের কোন অঙ্গ আহত হলে দ্বিতীয় দেহেরও নিশ্চিত সেই অঙ্গ আহত হবে। সেইজন্যই প্রাচীন মিশরীয়দের মৃতকে সুগন্ধি দিয়ে, পিরামিড নির্মাণ করে সংরক্ষণ করার প্রথা আছে। ব্যাবিলনীয় ও প্রাচীন মিশরীয় উভয়দের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে দ্বিতীয় দেহটি অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারে না; খুব বেশী হলে সে কিছুকাল বেঁচে থাকতে পারে, অর্থাৎ ছেড়ে-আসা বাহ্যদেহটি যতদিন সংরক্ষিত হয় ততদিন।

তার পরের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, ঐ দ্বিতীয় দেহ সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে একটা ভয় জড়িয়ে আছে। এটা সব সময়ই অসুখী ও দুঃখী; তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে তার অস্তিত্ব। সে বারবার ফিরে আসছে জীবিতদের কাছে খাদ্য, পানীয় আর ভোগ্যের সন্ধানে, সেগুলো এখন সে আর পাচ্ছে না। সে নীলনদের জল পান করতে চাইছে, সেই বিশুদ্ধ জল যা সে আর পান করতে পারবে না। সে বেঁচে থাকতে যে খাদ্যগুলি উপভোগ করত সেগুলি ফিরে পেতে চাইছে; এবং যখন সে দেখছে সেগুলো সে কিছুতেই পাচ্ছে না ঐ দ্বিতীয় দেহ তখন হিংস্র হয়ে উঠছে, কখনো খাদ্য না পেলে জীবিতদের মৃত্যু আর বিপর্যয়ের শাসানি দিচ্ছে।

এর পর আর্যদের চিন্তায় আলোকপাত করলে আমরা বিরাট একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি। সেখানে এখনো দ্বিতীয় দেহের ধারণা বর্তমান—কিন্তু সেটা একপ্রকারের অধ্যাত্ম-দেহ; আরও একটি বড় পার্থক্য হল এই যে সেই অধ্যাত্মদেহ বা আত্মা যাই বলো না কেন, তার পরিত্যক্ত দেহের দ্বারা আবদ্ধ নয়। বিপরীতে, আত্মা আগের দেহের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেছে এবং সেইজন্যই আর্যদের মধ্যে মৃতদেহ পোড়ানোর অপূর্ব প্রথাটি রয়েছে, তারা মৃতের পরিত্যক্ত দেহ থেকে অব্যাহতি পেতে চায় আর মিশরীয়রা ঐ দেহকেই সুগন্ধি দিয়ে, পিরামিড নির্মাণ করে সংরক্ষণ করে। মৃতদেহকে নষ্ট করে ফেলার এই সবচেয়ে প্রাচীন প্রথা ছাড়াও কিছুটা উন্নত জাতিগুলির মধ্যে মৃতদেহ নষ্ট করার যে পদ্ধতি দেখা যায় তার দ্বারা বেশ বোঝা যায় আত্মা-ধারণাটি তাদের মধ্যে রয়েছে। যেখানেই দেহ পরিত্যক্ত আত্মার ধারণাটি মৃতদেহের ধারণার সঙ্গে যুক্ত, সেখানেই আমরা মৃতদেহকে সংরক্ষণ করার বা যে কোন

ভাবে তাকে পুঁতে ফেলার ধারণাটি সম্পৃক্ত দেখি। অন্যদিকে যাদের মধ্যে এই ধারণা বিকশিত যে আত্মা দেহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং মৃতদেহ ধ্বংস করলেও আত্মা আহত হয় না, তাদেরই মৃতদেহ পোড়ানোর রীতি আছে।

তাই আর্যদের মধ্যে মৃতদেহ পোড়ানোর প্রথা দেখা যায়, যদিও পারসিকরা এর পরিবর্তন করে একটি উচ্চস্থানে মৃতদেহকে উন্মুক্ত রাখবার রীতি মেনে চলে। কিন্তু ঐ উচ্চস্থান যার নাম দখ্মা, তার অর্থ হল দাহ করবার বা পোড়াবার স্থান; এর থেকেই বোঝা যায় যে তারাও পুরাকালে মৃতদেহ পোড়াত। আর্যজাতির ক্ষেত্রে আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই দ্বিতীয়-দেহ-র ধারণার সঙ্গে তাদের কোনো ভীতি জড়িত নেই। তারা খাদ্য বা সাহায্যের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে না বা সাহায্য না পেলে তারা হিংস্র হয়ে ওঠে না বা জীবিতদের ধ্বংস করবার শাসানি দেয় না। বরং তারা আনন্দময়, মুক্তির আনন্দে আনন্দিত। চিতার আগুন ঐ দুটি দেহের বিশ্লিষ্ট হওয়ার প্রতীক। চিতার আগুনকে বলা হয় দেহমুক্ত আত্মাকে ধীরে ধীরে পিতৃপুরুষদের কাছে নিয়ে যেতে, যেখানে কোনো দুঃখ নেই, চির-আনন্দ বিরাজমান।

এই দুটো ভাবধারাকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রকৃতিগতভাবে দুটি এক—একটি আশাবাদী অন্যটি নিরাশাবাদী। একটি অন্যটির বিবর্তন। এটা খুবই সম্ভব যে প্রাচীনকালে মিশরীয়দের মত আর্যরাও এই ভাবধারায় বিশ্বাস করত বা করতে পারত। তাদের প্রাচীন পুঁথিপত্র পড়লে আমরা এই সম্ভাব্যতার কথা বুঝতে পারি। কিন্তু ভাবটি নিশ্চিত সুন্দর এবং অসাধারণ। যখন কোন মানুষের মৃত্যু ঘটে তখন সেই আত্মা পিতৃপুরুষের কাছে বসবাস করতে চলে যায় ও তাদের সুখ-ঐশ্বর্য উপভোগ করে। এই পিতৃপুরুষেরা গভীর করুণার সঙ্গে তাকে গ্রহণ করে; আত্মা সম্পর্কে ভারতের এটাই প্রাচীনতম ধারণা। পরবর্তী কালে এই ধারণা উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়েছে। তখন আবিষ্কার করা হল যে এতদিন তারা যাকে আত্মা বলেছে তা বস্তুত আত্মা নয়। এই উজ্জ্বল দেহ, এই সূক্ষ্ম দেহ তা যত সূক্ষ্মই হোক, আসলে দেহই এবং দেহ সূক্ষ্ম বা স্থূল যে কোন উপাদান দিয়েই তৈরি। যা কিছুর কোন অবয়ব আছে তাই সীমিত ও অনন্ত নয়। অবয়বমাত্রেই পরিবর্তনশীল, আর যা পরিবর্তনশীল তা কী করে অনন্ত হয়। অতএব, এই উজ্জ্বল দেহের পেছনে তারা যেন এক সত্তার আবিষ্কার করেছেন যাকে মানুষের আত্মা বলা হয়। একেই আত্মা বা জীবাত্মা বলে। সেই থেকেই এই আত্মা-সম্পর্কিত ধারণার শুরু, অবশ্য তার পর একে বহু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। কেউ ভেবেছেন এই আত্মা অনন্ত; এটা খুব সূক্ষ্ম, প্রায় একটি অণুর মত সূক্ষ্ম, শরীরের একটি বিশেষ অংশে বাস করে এবং যখন মানুষের মৃত্যু হয় তার আত্মা উজ্জ্বল দেহ-র সঙ্গে অন্তর্হিত হয়। অন্যান্যরা আবার আত্মার আণবিক প্রকৃতি অস্বীকার করেছেন সেই একই যুক্তিতে, যে যুক্তিতে তাঁরা বলেন উজ্জ্বল দেহ আত্মা নয়।

এই সব বিভিন্ন মতবাদ থেকেই সাংখ্যদর্শনের উদ্ভব হয়েছে এবং সেখানে আমরা অনেক প্রভেদ দেখতে পাই। এই দর্শনের ধারণা হল—প্রথমত মানুষের একটি স্থূল দেহ আছে, সেই স্থূল দেহের পেছনে আছে সূক্ষ্ম দেহ যেটা মনের বাহন যেন; এবং তারও পেছনে আছে আত্মা, সেটা হল সাংখ্যমতে 'মনের জ্ঞাতা'

এবং সেটা সর্বত্র বিরাজমান। অর্থাৎ তোমার আত্মা, আমার আত্মা, প্রত্যেকের আত্মা একই সময়ে সর্বত্র বিরাজমান। এটা যদি নিরাকারই হবে তাহলে সে কী করে স্থান অধিকার করবে? যা স্থান অধিকার করে তাই সাকার। নিরাকার সবসময়েই অনন্ত। সুতরাং প্রত্যেক আত্মাই সর্বত্র বিরাজমান। দ্বিতীয় মতবাদটি আরও বেশী মজাদার। পুরাকালে তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে সব মানুষই প্রগতিশীল, অন্তত অনেকেই। তারা শুদ্ধতা, শক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা বর্ধিত; প্রশ্ন হ'ল এই জ্ঞান, শুদ্ধতা, শক্তি কোথা থেকে মানুষের মধ্যে বিকশিত হল? একটি শিশুর কোনোই জ্ঞান নেই। এই শিশু বড় হয়ে শক্তিমান ক্ষমতাসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। কখন এই শিশু তার জ্ঞানের ও শক্তির ঐশ্বর্য লাভ করল? উত্তর হল—গুলি তার আত্মার মধ্যেই ছিল, শিশুর আত্মার মধ্যে প্রথম থেকেই জ্ঞান ও শক্তি নিহিত ছিল। এই শক্তি এই শুদ্ধতা এই ক্ষমতা ঐ আত্মার ভেতর ছিল—কিন্তু অবিকশিত; এখন তারা বিকশিত হল। এই বিকাশ বা অবিকাশের অর্থ কি? সাংখ্যবাদীরা বলেন, প্রতিটি আত্মাই পবিত্র এবং পূর্ণ, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ; কিন্তু যেরকম মনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়, সেরকমভাবে তা নিজেকে বিকশিত করতে পারে। মন যেন আত্মার প্রতিফলনের আয়না। আমার মন যেমন আমার শক্তির কিছুটা অংশ প্রতিফলিত করছে তেমনি তোমার এবং অন্যদেরও করছে। যে আয়নাটি যত স্বচ্ছ সেখানে আত্মা তত বেশী স্পষ্ট। অতএব মানুষের মন অনুযায়ী বিকাশ বিভিন্ন হয়; কিন্তু সব আত্মাই পবিত্র এবং পূর্ণ।

অন্য একটি সম্প্রদায় আবার মনে করলেন যে এরকম হওয়া সম্ভব নয়। যদিও আত্মা প্রকৃতিগতভাবেই বিশুদ্ধ এবং পূর্ণ, এই বিশুদ্ধতা ও পূর্ণতা কখনো কখনো সঙ্কুচিত হয়, আবার কখনো প্রসারিত হয়। কিছু কিছু কাজ ও চিন্তা আছে যেগুলি আত্মার প্রকৃতিকে যেন সঙ্কুচিত করে, আবার অন্য কিছু কাজ ও চিন্তা আছে যেগুলি তার প্রকৃতিকে বিকশিত করে। এ বিষয়টিও আবার ব্যাখ্যাত হয়েছে। যে সমস্ত চিন্তা আর কাজ আত্মার পরিশুদ্ধতা আর শক্তিকে সঙ্কুচিত করে সেগুলি অশুভ কাজ, অশুভ চিন্তা এবং যেগুলি আত্মাকে বিকশিত হতে, শক্তিকে পরিস্ফুট হতে সাহায্য করে, সেগুলি মহৎ চিন্তা, শুভ কাজ। দুটি তত্ত্বের মধ্যে প্রভেদ সামান্য; মোটামুটি 'সঙ্কোচন' ও 'প্রসারণ' এই দুটি শব্দের ওপরই সব নির্ভর করছে। যে মতটি বিশ্বাস করে যে আত্মার যন্ত্র-স্বরূপ মনের গঠনের ওপরই আত্মার বিকাশের তারতম্য নির্ভর করে, সেটি স্পষ্ট মত বলা যায় নিঃসন্দেহে কিন্তু সঙ্কোচন ও প্রসারণ-মতবাদীরা এই দুটি শব্দের আশ্রয় নিতে চায়। তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত আত্মার সঙ্কোচন ও প্রসারণ বলতে কী বোঝায়। আত্মা হল চেতন। তুমি প্রশ্ন করতে পারো, স্থূল জড়-পদার্থ বা সূক্ষ্ম চেতন-মন সম্পর্কে সঙ্কোচন ও প্রসারণ বলতে কী বোঝায় কিন্তু এছাড়া যা জড় নয়, যা দেশকাল অতীত তার সম্বন্ধে ঐ শব্দদুটি কিভাবে প্রযোজ্য হবে। অতএব মনে হয় যে মতবাদে আত্মা সবসময়ই বিশুদ্ধ ও পূর্ণ, শুধু মানসিক গঠনের ভিন্নতা অনুযায়ী আত্মার প্রতিফলনের পার্থক্য ঘটে, সেই মতবাদই ভাল। মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্রেরও শুদ্ধি হয় এবং তখন সে আত্মার উন্নততর

প্রতিফলন ঘটায়। এইভাবে চলতে থাকে যতদিন না মন এতখানি শুদ্ধ হয় যাতে আত্মার সব অন্তর্নিহিত গুণগুলি বিকশিত হয়; তারপর আত্মার মুক্তি হয়।

এটাই আত্মার প্রকৃতি। কিন্তু লক্ষ্য কি? ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মার লক্ষ্য এক বলেই মনে হয়। একটি ধারণা সকলেই পোষণ করে আর তা হল আত্মার মুক্তি। মানুষ অনন্ত এবং এখন যে বদ্ধ অবস্থায় তার অস্তিত্ব সেটা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই বদ্ধ অবস্থার মধ্য থেকেই সে সংগ্রাম করে চলেছে যতদিন না অনন্তে পৌঁছোয়, অসীমকে পায়, যা তার জন্মগত অধিকার এবং স্বাভাবিক প্রকৃতি। আমরা চারদিকে যে এত সংযোগ, পুনঃ সংযোগ আর বিকাশ দেখছি সেগুলি কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়—পথপার্শ্বের ক্ষণিক ঘটনা মাত্র। পৃথিবী—সূর্য, চন্দ্র-নক্ষত্র, শুভ-অশুভ, ঠিক-ভুল, হাসি-কান্না, আনন্দ-দুঃখ ইত্যাদি সংযোগগুলি আমাদের অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে এবং সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই আত্মা তার বন্ধনমুক্তি ঘটিয়ে পূর্ণ বিকশিত হয়। আত্মা তখন আর অন্তঃ বা বহিঃপ্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ থাকে না। এটা তখন সকল নিয়ম, বন্ধন, প্রকৃতির অতীত হয়ে গেছে। প্রকৃতি তখন আত্মার অধীনে এসে পড়ে, আত্মা প্রকৃতির নয়, এখন যেমনটি মনে হচ্ছে। আত্মার ঐ একটিমাত্র লক্ষ্য। অন্যান্য যেসব অভিজ্ঞতা ও পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে আত্মা বিকশিত হচ্ছে তার লক্ষ্য মুক্তি, সেগুলি আত্মার জন্ম বলে মনে করা হয়। আত্মা যেন একটি নিম্নতর দেহের মাধ্যমে নিজেকে বিকশিত করার চেষ্টা করছে। যখন বুঝছে নিম্নতর দেহটি যথেষ্ট নয়, তাকে ফেলে দিয়ে উচ্চতর দেহ ধারণ করছে। তখন সেই দেহটির মাধ্যমে বিকশিত হওয়ার চেষ্টা করছে। সেটিকেও যথেষ্ট মনে না হলে বাতিল করছে, আরও একটি দেহ গ্রহণ করছে,—এইভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ না অবশেষে আত্মা এমন একটি শরীরের সন্ধান পাবে যার মাধ্যমে তার উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা বিকশিত হবে। তখনই আত্মার মুক্তিলাভ।

এখন প্রশ্ন হল আত্মা যদি অনন্ত এবং সর্বব্যাপী, আত্মা যদি সূক্ষ্ম চেতন, তাহলে তার পর পর শরীর অধিগ্রহণ করার কি অর্থ? তত্ত্বটি হল আত্মা আসেও না, যায়ও না, জন্মায় না, মরেও না। যে সর্বব্যাপী সে কী করে জন্মাবে? আত্মা দেহে বাস করে এটা একটা অর্থহীন বোকামি। অসীম কী করে সীমাবদ্ধ স্থানে বাস করবে। কিন্তু যখন একজন একটা বই পড়তে পড়তে পাতার পর পাতা উল্টে যায় তখন পাতাগুলো তাদের স্থান পরিবর্তন করে, পাঠক যথাস্থানেই থাকে—আত্মা সম্পর্কেও সেই এক কথা। সমগ্র প্রকৃতি হল সেই বই যা আত্মা পাঠ করছে। প্রতিটি জীবন যেন সেই বইয়ের এক-একটি পাতা, ঐ পাতাটা পড়া হয়ে গেলে সে ক্রমশ পাতা উল্টে যায়, যতদিন না বই পড়া শেষ হয় এবং সমগ্র প্রবৃত্তির অভিজ্ঞতা লব্ধ হয়ে আত্মা পূর্ণ হয়। আবার একই সময়ে আত্মা নড়েনি, আসেনি, যায়নি—শুধু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। কিন্তু আমাদের মনে হয় আমরা ঘুরছি। পৃথিবী ঘুরছে, তবু আমরা ভাবি পৃথিবী নয় সূর্য ঘুরছে, যেটা আমরা জানি একটা স্বীকৃত ভুল, ইন্দ্রিয়ের ছলনা। আমরা জন্মাই, আমরা মরি, আমরা আসি ও যাই—এগুলি ছলনা মাত্র। আমরা আসিও না, যাইও না, আমরা জন্মাইও না। কারণ আত্মা তবে কোথায়

যাবে? তার যাওয়ার কোন জায়গা নেই। এমন কোন জায়গা আছে যেখানে আত্মা আগে থেকেই নেই?

অতএব প্রকৃতির বিবর্তন এবং আত্মার বিকাশের তত্ত্বটি এসে পড়ে। বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় অর্থাৎ উচ্চতর সংযোগ আত্মায় নেই। আত্মা যেমন তেমনই। এগুলি প্রকৃতির ভেতর আছে। কিন্তু প্রকৃতি যেহেতু উচ্চ থেকে উচ্চতর সংযোগে বিবর্তিত হয়ে অগ্রসরমান আত্মার মহিমাও সেহেতু বিকশিত হচ্ছে। ধরো, এখানে একটা পর্দা আছে আর তার পেছনে খুব সুন্দর একটা দৃশ্য। পর্দায় একটা ছোট ছিদ্র আছে যার ভেতর দিয়ে ঐ দৃশ্যের খানিকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ধরো ঐ ছিদ্রটি বেড়ে গেল। ছিদ্রটি যতই বাড়তে লাগল, দৃশ্যটি ততই আমাদের দৃষ্টিতে স্পষ্টতর হল, এবং যখন সমস্ত পর্দাটি সরিয়ে নেওয়া হল তখন দৃশ্য আর তোমার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক রইল না, তুমি সবটাই দেখতে পাচ্ছ। এই পর্দা হল মানুষের মন। এরই পেছনে আত্মার মহিমা, পবিত্রতা, অনন্ত শক্তি রয়েছে এবং মন যতই স্বচ্ছ হতে থাকে, পবিত্রতর আত্মাও ততই নিজ মহিমায় বিকশিত হয়। এই নয় যে আত্মা পরিবর্তিত হচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে পর্দায়। আত্মা অপরিবর্তনীয়, অমর, পবিত্র, চির আশীর্বাদপ্রাপ্ত সত্তা।

সুতরাং শেষে তত্ত্বটি এইরকম দাঁড়াল—উচ্চতম থেকে নিম্নতম এবং নিকৃষ্টতম ব্যক্তি পর্যন্ত, জীবশ্রেষ্ঠ থেকে ক্ষুদ্রতম কীট পর্যন্ত সবাই সেই বিশুদ্ধ, পূর্ণ, অসীম আনন্দময় আত্মা। কীটের মধ্যে আত্মার অনন্ত শক্তি ও পবিত্রতার আংশিক বিকাশ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিকাশ। পার্থক্য শুধু বিকাশের অনুপাতে, মূলত আত্মা একই। সকল জীবের মধ্যেই সেই পবিত্র, পূর্ণ আত্মা অবস্থান করছে।

স্বর্গ বা অন্যান্য স্থানসমূহ সম্পর্কে তত্ত্বও আছে, তবে সেগুলো দ্বিতীয় শ্রেণীর মনে করা হয়। স্বর্গ-সম্পর্কিত ধারণাকে নিম্নস্তরের ধারণা মনে করা হয়। ভোগবিলাসের একটি স্থানের কামনা থেকেই এই ধারণার উৎপত্তি। আমরা বোকার মত আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতা দিয়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে সীমিত করতে চাই। শিশুরা মনে করে সমস্ত বিশ্বটাই বুঝি শিশুতে ভরা, পাগলরা মনে করে সমস্ত বিশ্বটাই বুঝি পাগলা-গারদ। সুতরাং যাদের কাছে পৃথিবীটা শুধু ইন্দ্রিয়-উপভোগের স্থান, যাদের সমস্ত জীবনটাই আহার ও আমোদে ব্যাপৃত এবং যাদের সঙ্গে এই কারণে পশুদের প্রভেদ সামান্য, তারা স্বাভাবিকভাবেই এমন একটা জায়গার কল্পনা করে যেখানে আরও ভোগ-সুখ পাওয়া যায়, কারণ এই জীবনটা ক্ষণস্থায়ী। তাদের ভোগকামনা অসীম, অতএব তারা এমন একটি জায়গার কথা ভাবতে বাধ্য যেখানে অবিরাম ইন্দ্রিয়-ভোগ আছে; এবং আমরা যত এগোই ততই দেখি যে যারা ঐ স্থানে যেতে চায় তাদের যেতে হয়; তারা স্বপ্ন দেখে এবং যখন একটি স্বপ্ন দেখা শেষ হয়, আরও একটি স্বপ্নের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দেয় যেখানে ইন্দ্রিয়-সুখের প্রাচুর্য; এবং যখন সেই স্বপ্ন ভেঙে যায়, তারা অন্য কোন কিছুর জন্য ভাবতে বাধ্য হয়। এইভাবে তারা স্বপ্ন থেকে স্বপ্নে তাড়িত হয়ে ফেরে।

তারপর আসে শেষ তত্ত্বটি—আত্মা সম্পর্কে আরও একটি ধারণা। যদি আত্মা প্রকৃতিগতভাবে পবিত্র এবং পূর্ণ এবং যদি প্রতিটি আত্মাই অনন্ত এবং সর্বব্যাপী, তাহলে কি করে বহু আত্মা থাকতে পারে? বহু অনন্ত একসঙ্গে থাকতে পারে না। বহুর কথা বাদ দিলেও, দুটি আত্মাও থাকতে পারে না। যদি দুটি অনন্ত থাকত, একটি অপরটিকে সীমিত রাখত এবং ফলস্বরূপ দুটিই সীমিত হোত। অনন্ত একটাই হতে পারে এবং সাহসের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে অনন্ত একটাই, দুটো নয়।

দুটি পাখি একটি গাছে বসে আছে, একটি ওপর দিকে, একটি নীচে, দুটিরই খুব সুন্দর পালক আছে। একটি ফল খাচ্ছে আর অন্যটি শান্ত, মহিমাময়, গৌরবমনস্ক হয়ে আছে। নীচের পাখিটি ফল খাচ্ছে, ভাল-মন্দ দুই, এবং ইন্দ্রিয়-ভোগের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং মাঝে মাঝে যখন সে তেতো ফল খাচ্ছে তখনই উঁচুর দিকে যাচ্ছে, ওপরদিকে তাকিয়ে দেখছে ওপরের পাখিটি শান্ত মহিমায় সেখানে বসে আছে, ভাল বা মন্দ কোন ফলের জন্যই তার পরোয়া নেই, সে আত্মস্থ, তৃপ্ত, কোন ইন্দ্রিয় উপ-ভোগের বাসনা নেই তার। সে নিজেই তার তৃপ্তি, অন্য তৃপ্তি কী খুঁজবে। নীচের পাখিটি ওপরের পাখিটিকে দেখছে ও তার কাছে যেতে চাইছে। নীচের পাখিটি একটু ওপরে উঠেছেও, কিন্তু তার পুরনো স্বভাব যায় না, তাই সে আবার একই ফল খাচ্ছে। আবার একটা অতিরিক্ত তেতো ফল খেয়ে সে আহত হচ্ছে ও ওপরদিকে তাকাচ্ছে। সেখানে সেই শান্ত সমাহিত পাখিটি! সে কাছে আসছে কিন্তু পূর্ব কর্ম অনুযায়ী নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে এবং আবার মিষ্টি, তেতো ফল খাচ্ছে। আবার একটি অত্যন্ত তেতো ফল সে খায়, পাখিটিকে ওপরে দেখে, কাছে যায়; এবং সে যতই কাছে যায়, উঁচু পাখিটির পালক থেকে ছিটকে-পড়া আলো তার ওপর প্রতিবিম্বিত হয়। তার নিজের পালকগুলি যখন খসে পড়ে এবং যখন সে যথেষ্ট কাছে চলে আসে সমগ্র দৃশ্যটাই পাল্টে যায়। মনে হয় নীচের পাখিটির কোন অস্তিত্বই ছিল না, যা ছিল তা ঐ ওপরের পাখিটির এবং নীচের পাখি বলে যা এতক্ষণ মনে হচ্ছিল তা ঐ ওপরের পাখিরই প্রতিচ্ছায়া।

এই রকমই আত্মার প্রকৃতি। মানুষের আত্মা ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য ধাবিত হয়, পার্থিব অহঙ্কারে অহঙ্কারী হয়, পশুর মত সে ইন্দ্রিয় সুখ নিয়ে বেঁচে থাকে। ক্ষণিক স্নায়বিক উত্তেজনা নিয়ে সুখী হয়। যখন আঘাত আসে কিছুক্ষণের জন্য মাথাটা ঘোরে এবং সবকিছু অদৃশ্য হতে শুরু করে, সে তখন বোঝে পৃথিবীকে যা ভেবেছিল তা নয়, জীবন অত মসৃণ নয়। ওপরদিকে তাকায় ও অনন্ত ঈশ্বরকে কিছুক্ষণের জন্য দেখে, সেই মহিমায় অনন্তের কাছাকাছি আসে কিন্তু আবার পূর্ব কর্ম অনুসারে নীচে নেমে যায়। আরও একটা আঘাত আসে, আবার সে সেখানে যায়। আর একবার সেই অনন্ত সত্তার অনুভূতি প্রাপ্ত হয়, কাছাকাছি যায়। এইভাবে যত কাছে যেতে থাকে ততই সে উপলব্ধ হয় যে তার নীচ, নিকৃষ্ট, অশ্লীল, স্বার্থপর ব্যক্তিত্ব ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীকে ত্যাগ করে ক্ষুদ্র সত্তাকে সুখী করার কামনা লোপ পাচ্ছে এবং ক্রমশ যতই সে নিকটবর্তী হয়, প্রকৃতিও অপসারিত হয়। যখন সে যথেষ্ট কাছাকাছি চলে যায়

তখন সমস্ত দৃশ্য পরিবর্তিত হয় এবং সে দেখতে পায় অন্য পাখিটি সেই অনন্ত সত্তা, যাকে সে এতদিন দূর থেকে লক্ষ্য করেছিল, যার অভূতপূর্ব গৌরব আর মহিমার আভাস পেয়েছিল, সেই তার নিজ আত্মা এবং সেটাই বাস্তব। যা সব কিছুতে সত্য-রূপে অবস্থান করে, যা প্রতি অণুতে বিরাজমান, যা সর্বব্যাপী, সমস্ত বস্তুরই যা মূল সত্তা, যা ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর—আত্মা তখন তাকে খুঁজে পায়—জানো, তুমিই সে ; জানো, তুমি মুক্ত।

মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব

প্রতীচ্যে মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা নিম্নমানের। মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু প্রতীচ্যে একে অন্যান্য বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা হয় অর্থাৎ উপযোগিতার বিচারে এর মূল্যায়ন হয়। মনোবিজ্ঞান বাস্তবত মানবজাতির কতটা উপকার করতে পারে? আমাদের ক্রমবর্ধমান সুখে সে কতখানি সংযোগ করতে পারে? আমাদের ক্রমবর্ধমান বাধাই বা সে কতটা লাঘব করতে পারে? এই সমস্ত বিচারে প্রতীচ্যে সবকিছুর মূল্যায়ন হয়।

লোকে বোধ হয় ভুলে যায় যে আমাদের জ্ঞানের শতকরা নব্বুই ভাগ আমাদের পার্থিব সুখ-দুঃখের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর প্রযুক্ত হতে পারে না। আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের খুব সামান্য অংশই দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্ত হয়। এর কারণ আমাদের চেতন মনের খুব অল্প অংশই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে অবস্থান করে। আমাদের খুব সামান্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চেতনতা আছে আর তাকেই আমরা সমগ্র মন ও জীবন বলে কল্পনা করি। কিন্তু বাস্তবত আমাদের অবচেতন মনের বিশাল সমুদ্রে তা একটি বিন্দুর মত। আমাদের সবটাই যদি ইন্দ্রিয়-অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে আমাদের সমস্ত লব্ধ জ্ঞানই ইন্দ্রিয়সুখের জন্য ব্যয়িত হোত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আসলে তা নয়। আমরা যতই পশুস্তর থেকে দূরে সরতে থাকি আমাদের ইন্দ্রিয়সুখও ততই কমতে থাকে এবং আমাদের ভোগ আকাঙ্ক্ষা বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই সূক্ষ্মতর হয় এবং 'জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান' এই বোধ ইন্দ্রিয়সুখ-নিরপেক্ষ হয়ে আমাদের মনের চরম আনন্দ হয়ে ওঠে।

কিন্তু প্রতীচ্যের উপযোগিতার মাপকাঠিতে বিচার করলেও দেখা যাবে মনোবিজ্ঞান সকল বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ। কেন? আমরা সবাই ইন্দ্রিয়ের দাস, আমাদের চেতন, অচেতন মনের দাস। কোন অপরাধী যে অপরাধী হয় তা তার নিজের ইচ্ছায় নয়—তার নিজের মন তার আয়ত্তে থাকে না এবং এজন্য সে তার নিজের চেতন ও অবচেতন মন এবং এমনকি অন্যদেরও মনের দাস হয়। সে তার মনের শক্তিশালী ঝোঁকটাকে প্রাধান্য দেয়; তার উপায় থাকে না; অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে তার নিজ প্রকৃতি, সুবিবেক ইত্যাদির বিরুদ্ধে ধাবিত হয়। সে তার মনের প্রবল নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য হয়। বেচারি, সে বড় অসহায়। এই জিনিসটা আমরা আমাদের জীবনেও ক্রমাগত দেখতে পাই। আমরা সবসময় আমাদের বিবেকের সুনির্দেশ অমান্য করছি এবং পরে তার জন্য আমরা নিজেদের ধিক্কার দিচ্ছি এবং অবাক হচ্ছি ভেবে যে কী করে অমন চিন্তা করেছিলাম। কী করে অমন কাজ করেছিলাম। তবু আবার করছি, আবার দুঃখ পাচ্ছি, ধিক্কার দিচ্ছি। কখনো মনে হয় সম্ভবত আমরা কাজটা করতে ইচ্ছে করেছি কিন্তু আসলে আমাদের ইচ্ছে করতে বাধ্য করা হয়। আমরা অসহায়! আমরা সবাই নিজের ও অন্যের মনের দাস। আমরা ভাল কি মন্দ তার প্রভেদ এক্ষেত্রে অর্থহীন। আমরা এখানে-

সেখানে চালিত হচ্ছি, কারণ আমরা অসহায়। আমরা বলে থাকি, আমরা ভেবেছি, আমরা করেছি ইত্যাদি। আসলে তা নয়। আমরা ভাবি কারণ আমাদের ভাবতে বাধ্য করা হয়। আমরা করি কারণ করতে বাধ্য হই। আমরা আমাদের ও অন্যান্যদের কাছে দাস। আমাদের অবচেতন মনের খুব গভীরে সঞ্চিত আছে আমাদের অতীতের চিন্তা আর কর্ম, শুধু জীবনেরই নয়, আরও আগের অন্যান্য জীবনেরও। এই মন্ময় মনের অসীম সমুদ্র অতীতের চিন্তা আর কাজে পরিপূর্ণ। এর প্রত্যেকটি স্বীকৃতি-লাভের জন্য চেষ্টা করছে, নিজেকে ব্যক্ত করতে চাইছে, তরঙ্গের পর তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে প্রবাহে, একটি আর একটিকে অতিক্রম করছে, চেতন মন তন্ময় মনকে অতিক্রম করছে। এই চিন্তা, এই সঞ্চিত শক্তি আমরা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা প্রতিভা ইত্যাদির সমার্থক করে দেখি। কারণ আমরা এদের উৎপত্তি কোথায় জানি না। আমরা অন্ধভাবে অনুসরণ করি, কোন প্রশ্ন করি না; এবং ফল হল দাসত্ব, খুব অসহায় দাসত্ব। এবং আমরা বলি আমরা মুক্ত, আমরা এক মুহূর্তের জন্য নিজেদের মনকে শাসন করতে পারি না, একটি বিষয়ের ওপর মনসংযোগ করতে পারি না, এক মুহূর্তের জন্য অন্য সবকিছু থেকে সরে এসে একটি বস্তুতে মনকে নিবদ্ধ রাখতে পারি না। তবুও আমরা আমাদের মুক্ত বলি। ব্যাপারটা ভেবে দেখো। যেভাবে করা উচিত বলে জানি সেভাবে অতি অল্প সময়ের জন্যও করতে পারি না। কোন ইন্দ্রিয়-বাসনা জেগে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা আমরা মেনে চলি। এই দুর্বলতার জন্য বিবেক দংশিত হয়, কিন্তু তবুও আমরা করি, আমরা সবসময় করছি। আমরা উচ্চমানের জীবনযাপন করতে পারি না, চেষ্টা করলেও পারি না। অতীত চিন্তা, অতীত জীবনের ভূত আমাদের অবদমিত রাখে। জগতের সমস্ত দুঃখের মূলে এই ইন্দ্রিয়-দাসত্ব। ইন্দ্রিয়-জীবনের উর্ধ্বে যাওয়ার অক্ষমতা, দৈহিক ভোগাকাঙ্ক্ষা — এগুলিই জগতের সমস্ত দুঃখ আর ভয়াবহতার কারণ।

মনোবিজ্ঞানই আমাদের শেখায় কী করে মনের এই উচ্ছৃঙ্খল গতিকে দমন করা যায়, কী করে মনকে ইচ্ছাশক্তির আয়ত্তে আনা যায় এবং তার স্বৈরাচারী প্রভাব থেকে কী করে মুক্তিলাভ করা যায়। অতএব মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অন্য সব বিজ্ঞান এবং জ্ঞান এর কাছে তুচ্ছ।

অনায়ত্ত মন ও অশাসিত ইচ্ছা আমাদের নিম্নগামী করবে সবসময় এবং অবশেষে ধ্বংস করবে; আয়ত্ত মন ও শাসিত ইচ্ছা অন্যদিকে আমাদের রক্ষা করবে, মুক্ত করবে। অতএব মনকে আয়ত্তে আনা উচিত এবং মনোবিজ্ঞান আমাদের শেখায় কী করে তা সম্ভব।

কোন বস্তুবিজ্ঞান পাঠ ও বিশ্লেষণ করতে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত তথ্য পাঠ ও বিশ্লেষণের ফলে ঐ বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু মনের পাঠ ও বিশ্লেষণে কোন তথ্য বা সকলের অধীন বাইরে থেকে সংগৃহীত উপাদান পাওয়া যায় না। মন নিজেই বিশ্লেষিত হয়। অতএব শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান হল মনের বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান।

প্রতীচ্যে মানসিক শক্তিকে, বিশেষত অসাধারণ মানসিক শক্তিকে যাদুবিদ্যা বা

রহস্যবিদ্যার তুল্য মনে করা হয়। সেজন্য সে দেশে তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে মনোবিজ্ঞানের উচ্চপর্যায়ের অনুশীলন ব্যাহত হয়েছে, যেমন হয়েছে রহস্য জাতীয় ব্যাপারে অনুরক্ত হিন্দু ফকিরদের মধ্যে।

পদার্থবিদরা সমস্ত পৃথিবীতে একই ফল লাভ করেন। তথ্যের ব্যাপারে তাদের কোন মতানৈক্য হয় না বা তথ্যলব্ধ ফলাফলের ক্ষেত্রেও হয় না। তার কারণ পদার্থ-বিজ্ঞানের তথ্য সবাই পেয়ে যান এবং সেগুলির সার্বিক স্বীকৃতি আছে এবং সিদ্ধান্ত-গুলিও তর্কশাস্ত্রের সূত্রের মত যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু মনোজগতের ব্যাপার আলাদা। এখানে কোন তথ্য নেই, কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদান নেই এবং এমন কোন সর্বজন-স্বীকৃত উপাদান নেই যা থেকে মনোবিজ্ঞানীরা একইভাবে পরীক্ষা করে একটি পদ্ধতি গড়ে তুলতে পারেন।

মনের খুব গভীরে আছে আত্মা, মানুষের প্রকৃত সত্তা। মনকে অন্তর্মুখী করে আত্মার সঙ্গে একাত্ম হও এবং সেই স্থিতাবস্থার আঙ্গিকে মনের আবর্তনকে প্রত্যক্ষ করা যায়, যেগুলি প্রায় সব মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। এই তথ্য, এই উপাদান তারাই পায় যারা মনের অনেক গভীরে প্রবেশ করতে পারেন। পৃথিবীর অধিকাংশ তথাকথিত অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে মনের প্রকৃতি ও শক্তি সম্পর্কে প্রভূত মতানৈক্য দেখা যায়। তার কারণ এরা মনের খুব গভীরে প্রবেশ করে না। তারা নিজেদের ও অন্যান্যদের সামান্য কিছু মানসিক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করেছে এবং এই সব বাহ্য অভিব্যক্তির আসল চরিত্রটা না জেনেই সেগুলোকে সার্বিকভাবে প্রযুক্ত হওয়ার যোগ্য উপাদান বলে প্রকাশিত করেছে, এবং প্রতিটি ধর্মীয় ছিটগ্রস্ত লোকেদেরই কিছু কিছু তথ্য, উপাদান আছে যেগুলি তারা দাবি করে গবেষণার জন্য মূল্যবান, কিন্তু প্রকৃত অর্থে যেগুলি তাদের উদ্ভট কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।

মন সম্পর্কে তুমি যদি অনুশীলন করতে চাও, তাহলে নিয়মানুগ শিক্ষা নিতে হবে; তোমাকে মনকে আয়ত্তে আনার অভ্যাস করতে হবে, চেতনের সেই স্তরে তোমার উন্নীত হতে হবে যেখান থেকে তুমি মনের উচ্ছৃঙ্খল আবর্তনে নিরপেক্ষ থেকে মনকে অনুশীলন করতে পারবে। নইলে তোমার দৃষ্ট উপাদানগুলি নির্ভরযোগ্য হবে না, সর্বজনে সেগুলি প্রযুক্ত হবে না এবং ফলত সেগুলিকে প্রকৃত তথ্য বা উপাদান বলা যাবে না।

যেসব মানুষ গভীরভাবে মনের অনুশীলন করেছে, দেশ বা ধর্মমত নির্বিশেষে তাদের উপলব্ধি চিরকালই একই হয়েছে। মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে যারা প্রবেশ করবে, তাদের প্রাপ্ত ফলাফলে কোন প্রভেদ থাকে না।

অনুভূতি এবং আবেগপ্রবণতার দ্বারাই মন ক্রিয়া করে। উদাহরণ স্বরূপ, আলোর রশ্মি চোখের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে এবং স্নায়ু দ্বারা বাহিত হয়ে মাথায় আনীত হয়, তবুও আমি আলো দেখতে পাই না। মস্তিষ্ক তখন আবেগকে মনের কাছে পৌঁছে দেয়, তবুও আমি আলো দেখতে পাই না; মন তখন প্রতিক্রিয়া করে

এবং আলোর অনুভূতি হয়। মনের প্রতিক্রিয়া হল আবেগ এবং ফলত চোখ বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে। মনকে আয়ত্তে রাখতে হলে তোমাকে অবচেতন মনের গভীরে প্রবেশ করতে হবে, সেখানকার চিন্তা, ভাবকে শ্রেণীগতভাবে বিন্যস্ত করতে হবে এবং সংযত করতে হবে। এটা হল প্রথম পদক্ষেপ অবচেতন মনকে আয়ত্তে এনে তুমি চেতন মনকে সংযত করতে পারবে।

প্রকৃতি ও মানুষ

প্রকৃতি সম্পর্কে আধুনিক ধারণায় সেটুকুই অন্তর্গত যেটুকু বিশ্বজগতের দৈহিক স্তরে অভিব্যক্ত। মন বলতে সাধারণত যা বোঝায়, প্রকৃতি হিসেবে তা বিবেচিত হয় না।

ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা প্রমাণ করতে গিয়ে দার্শনিকরা মনকে প্রকৃতি থেকে আলাদা করে দেখেন কারণ প্রকৃতি যেহেতু কঠোর নিয়মের দ্বারা সীমিত ও শাসিত, মনও সেরকম নিয়মের অধীন হয়ে যাবে। এই ধরনের দাবির ফলে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির তত্ত্বটি ধ্বংস হবে, কেন না যা নিয়মের অধীন তা কি করে স্বাধীন হতে পারে ?

এ বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। তাঁদের মতে ব্যক্ত বা অব্যক্ত, সমস্ত বাস্তব জীবনটাই নিয়মের অধীন, তাঁদের মতে মন ও বাহ্য প্রকৃতি দুই-ই একই নিয়মের অধীন। মন যদি নিয়মের অধীন না হয়, আমাদের বর্তমান চিন্তা যদি পূর্বচিন্তার ফলস্বরূপ না হয়, যদি একটি মানসিক অবস্থা আর একটি মানসিক অবস্থার দ্বারা অনুসৃত না হয়, তাহলে মনকে অযৌক্তিক বলা যায় ; এবং কে একই সঙ্গে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে স্বীকার ও যুক্তির ক্রিয়াকে অস্বীকার করতে পারে ? অন্যদিকে, মন কার্য-কারণ নিয়ম দ্বারা চালিত এটা স্বীকার করে কে বলতে পারে ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন ?

নিয়ম নিজেই কার্য-কারণের ক্রিয়া। পূর্ববর্তী কিছু ঘটনা অনুসারে পরবর্তী কিছু ঘটনা ঘটে। প্রতিটি পূর্ববর্তী ঘটনারই কার্য আছে। প্রকৃতির এটাই নিয়ম। নিয়মের এই ক্রিয়া যদি মনের ওপরও বর্তায় তাহলে মনও অধীন হয় ও ফলত স্বাধীন থাকে না। না, ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন নয়। কি করে তা হয় ? কিন্তু আমরা সবাই জানি, সবাই বুঝি যে আমরা স্বাধীন। জীবনের কোন অর্থ থাকে না, জীবনযাপন বৃথা হয়, যদি না আমরা স্বাধীন হই।

প্রাচ্যের দার্শনিকরা এই তত্ত্ব স্বীকার করেছেন বা উদ্ভাবন করেছেন যে মন এবং ইচ্ছাশক্তি দেশ, কাল, কার্য-কারণের দ্বারা তথাকথিত জড়বস্তুর মতই আবদ্ধ ; সুতরাং তারা কার্য-কারণ নিয়ম দ্বারা সীমিত ; আমরা কালের মধ্যে চিন্তা করি, আমাদের চিন্তাশক্তি কাল দ্বারা সীমিত ; যা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তা দেশ কালের মধ্যে আবদ্ধ। সবকিছুই কার্য-কারণ নিয়ম দ্বারা সীমিত।

যাকে আমরা জড় এবং মন বলি, তা একই পদার্থ, পার্থক্য শুধু কম্পনের তারতম্য। মনের খুব নীচু স্তরের কম্পনকেই জড় বলা হয়। জড়ের খুব উঁচু স্তরের কম্পনই হল মন, দুটিই একই উপাদান, এবং সেইজন্য যেহেতু জড় দেশ-কাল-কার্য-কারণের দ্বারা বদ্ধ, জড়ের উঁচু স্তরের কম্পন মনও ঐ একই নিয়মে বদ্ধ।

প্রকৃতির উপাদান সমজাতীয়, অভিব্যক্তির তারতম্যে পার্থক্য যেটুকু। এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ হল 'প্রকৃতি', যার আক্ষরিক অর্থ হল প্রভেদ। সবই এক উপাদান, শুধু অভিব্যক্তি বিভিন্ন।

মন জড় হয়ে যায় এবং জড়ও যথাসময়ে মন, এটা শুধু কম্পনের প্রশ্ন।

একটা ইস্পাতের দণ্ড নাও এবং এমন শক্তি প্রয়োগ করো যাতে ওটা কম্পিত হয়—

কি ঘটবে ? এটা যদি একটা অন্ধকার ঘরে করা হয় তাহলে প্রথমেই তুমি একটি শব্দ শুনবে, গুনগুন শব্দ। শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি করো, দেখবে ইস্পাতদণ্ডটি আলোকময় হয়ে উঠছে ; আরও শক্তি দাও, ইস্পাতটি অদৃশ্য হবে। এটি তখন মন হয়ে যাবে।

আর একটি উদাহরণ নাও : আমি যদি দশদিন আহার না করি, আমি কোন চিন্তা করতে পারি না। শুধু কিছু ছড়ানো-ছিটানো চিন্তা আমার মনে থাকবে। আমি খুব দুর্বল এবং সম্ভবত নিজের নামটাও মনে নেই। তখন আমি একটু রুটি খাই এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই চিন্তা করতে শুরু করি ; আমার মনের শক্তি ফিরে এসেছে। রুটিটা তখন মন হয়ে গেছে। একইভাবে, মন তার কম্পনের মাত্রা কমিয়ে দেয় এবং দেহে অভিব্যক্ত হয়, তখন সে জড় হয়ে যায়।

জড় না মন কে প্রথম আমি উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি : একটি মুরগী ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে আর একটি মুরগীর জন্ম হয়, সেই মুরগীটি আবার ডিম পাড়ে, সেই ডিমটি থেকে আরও একটি মুরগীর জন্ম হয় এবং এইভাবে কার্যপরম্পরায় চলতে থাকে। এখন কোন্‌টা প্রথম, ডিম না মুরগী ? তুমি এখন কোন ডিমের কথা ভাবতে পারো না যা কোন মুরগী পাড়েনি, অথবা কোন মুরগীর কথা যা কোন ডিম থেকে জন্মায়নি। কে প্রথম এ নিয়ে কিছু নয়। আমাদের প্রায় সব ধারণাই এই ডিম-মুরগীর ব্যাপারের মত।

মহৎ সত্যগুলি সরল বলেই লোকে বিস্মৃত হয়। মহৎ সত্য সরল কারণ সেগুলি সর্বজনপ্রযোজ্য। সত্য সবসময়ই সরল। মানুষের অজ্ঞতার জন্যই জটিলতার জন্ম।

মানুষের স্বাধীন কর্তৃত্ব মনেতে নেই, কারণ মন বদ্ধ। সেখানে কোন স্বাধীনতা নেই। মানুষ মন নয়, আত্মা। আত্মা চিরকালই স্বাধীন, অসীম এবং অনন্ত। এখানেই মানুষের স্বাধীনতা, এই আত্মায়। আত্মা সবসময়ই স্বাধীন কিন্তু মন তার ক্ষণস্থায়ী তরঙ্গগুলির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে আত্মাকে দেখতে পায় না ও দেশ-কাল-কার্য-কারণের ধাঁধায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে—যার নাম মায়া।

এটাই আমাদের বন্ধনের কারণ। আমরা সবসময় মন এবং মনের উদ্ভূত পরিবর্তনগুলির সঙ্গে নিজেকে এক ভাবছি।

মানুষের স্বাধীন কর্তৃত্ব আত্মায় প্রতিষ্ঠিত এবং আত্মা নিজেকে স্বাধীন উপলব্ধি করে, মনের বন্ধন সত্ত্বেও সবসময় এই কথা ঘোষণা করছে যে "আমি স্বাধীন! আমি যা, আমি তাই।" এটাই আমাদের স্বাধীনতা। সদামুক্ত, অসীম চিরন্তন আত্মা যুগে যুগে তার মনরূপ যন্ত্রের সাহায্য অভিব্যক্ত হচ্ছে।

মানুষের সঙ্গে তাহলে প্রকৃতির সম্পর্কটা কি ? জীবের নিম্নতম স্তর থেকে মানুষ পর্যন্ত, আত্মা প্রকৃতির মাধ্যমে নিজেকে বিকশিত করছে। নিম্নতম বিকশিত জীবনের মধ্যেও আত্মার শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি আছে এবং ক্রমবিকাশের পদ্ধতির মাধ্যমে আত্মা নিজেকে বিকশিত করছে।

বিবর্তনের সমস্ত প্রক্রিয়াটাই হল আত্মার বিকশিত হওয়ার সংগ্রাম। প্রকৃতির বিরুদ্ধে এটা একটা চিরায়ত সংগ্রাম। প্রকৃতি অনুযায়ী নয়, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম

করেই মানুষ বর্তমান রূপ পেয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলা, ঐকতান রেখে চলা—ইত্যাদি আমরা খুব শুনতে পাই। এটা ভুল ধারণা। এই টেবিল, এই কলসী, খনিজপদার্থ, একটি গাছ, সব কিছুরই প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে। সম্পূর্ণ ঐকতান আছে, কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার মানে অচলাবস্থা, মৃত্যু। মানুষ কী করে এই বাড়িটি তৈরী করেছিল? প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে? না, প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নয়, তার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করেই মনুষ্য প্রগতি সম্ভব।

মনঃসংযোগ ও শ্বাসক্রিয়া

মনঃসংযোগ করবার ক্ষমতার তারতম্যই মানুষ আর পশুর মধ্যে মুখ্য পার্থক্য। যে কোন কাজের সাফল্যের মূলেই রয়েছে মনঃসংযোগ। মনঃসংযোগ বা একাগ্রতা সম্পর্কে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু জানে। এর ফল প্রতিদিনই আমরা দেখি। শিল্প, সংগীত ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চস্তরের কৃতিত্ব এই একাগ্রতারই ফল। পশুর মনঃসংযোগের ক্ষমতা খুব সামান্য। যাঁরা পশুদের শিক্ষা দেন তাঁরা এ ব্যাপারে প্রায়ই অসুবিধার সম্মুখীন হন—পশুকে যা শেখানো হয় সে নিয়তই তা ভুলে যায়। সে অনেকক্ষণ ধরে কোন বিষয়ের ওপর একাগ্র হতে পারে না। এখানেই মানুষের সঙ্গে পশুর প্রভেদ—মানুষের মনঃসংযোগের ক্ষমতা অনেক বেশী। এই একাগ্রতার তারতম্যই আবার মানুষে মানুষে প্রভেদ নিরূপণ করে। সবচেয়ে নিম্নস্তরের মানুষের সঙ্গে সবচেয়ে উচ্চস্তরের মানুষের তুলনা করো, দেখবে মনঃসংযোগের মাত্রার তারতম্যই পার্থক্য নিরূপণ করছে। পার্থক্য শুধু এইখানেই।

প্রত্যেকেরই মন কখনো কখনো একাগ্র হয়ে যায়। আমরা সেইসব জিনিসের ওপরই মনঃসংযোগ করি, যেগুলি আমরা ভালবাসি, আবার যে বিষয়ে মনঃসংযোগ করি সেগুলি প্রিয় হয়ে ওঠে। কে এমন মা আছেন যিনি তাঁর ছেলের অতি সাধারণ মুখটিও ভালোবাসেন না? সেই মুখ তাঁর কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মুখ। ঐ মুখে মনঃসংযোগ করেছেন বলেই তিনি ভালোবাসেন; সকলেই যদি ঐ মুখখানির ওপর মনঃসংযোগ করতে পারত সকলেই ভালোবাসত তাকে। সকলের কাছেই সেটা সুন্দরতম হয়ে উঠত। আমরা সেই জিনিসের মনঃসংযোগ করি যেগুলি আমাদের প্রিয়। খুব সুন্দর গান শুনি আমরা, মন তখন সেখানে নিবিষ্ট হয়, সরিয়ে নিতে পারি না। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যারা মনোনিবেশ করে, সাধারণ লঘু সঙ্গীত তাদের ভাল লাগে না এবং এর বিপরীতটাও সত্যি। স্বরের দ্রুত অনুস্থতির ফলে সঙ্গীত সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে। একটি শিশু জীবন্ত সঙ্গীত পছন্দ করে কারণ তাতে স্বরের দ্রুততা মনকে অমনোযোগী হওয়ার সুযোগ দেয় না। যে মানুষ লঘু সঙ্গীত পছন্দ করে, সে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পছন্দ করে না কারণ পরেরটি জটিল এবং অনুধাবন করতে বেশীমাত্রায় একাগ্রতা প্রয়োজন।

এই ধরনের একাগ্রতার সবচেয়ে বড় অসুবিধে হল আমরা মনকে আয়ত্তে রাখি না, বরং মনই আমাদের আয়ত্তে রাখে। সম্পূর্ণ বাইরের কোন জিনিস যেন মনকে টেনে নিয়ে যতক্ষণ খুশী নিজের কাছে ধরে রাখে। আমরা খুব সুললিত সুর শুনি বা সুন্দর একটি চিত্র দেখি আর মন তাতে নিবিষ্ট হয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে সরানো যায় না।

আমি যদি তোমাদের পছন্দমত কোন বিষয় নিয়ে বলি, আমার বক্তব্যের ওপর তোমাদের মন নিবিষ্ট হয়। আমি তখন তোমাদের মনকে তোমাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেড়ে নিয়ে ঐ বিষয়ের ওপর নিবিষ্ট রাখি। এইভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের মন আকৃষ্ট হয়, একাগ্র হয়। আমাদের কিছু করবার থাকে না।

এখন প্রশ্ন হল এই একাগ্রতাকে কি বাড়ানো যায় বা আমরা কি এটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি? যোগীরা বলেন, হ্যাঁ, পারি। যোগীরা বলেন, আমরা মনকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি। নীতির দিক থেকে একাগ্রতার ক্ষমতা বৃদ্ধি করার বিপদও আছে—কোন বিষয়ে একাগ্র হয়ে সেখান থেকে আর মনকে সরিয়ে আনা যায় না। এই অবস্থাটা খুবই যন্ত্রণাদায়ক। মনকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার অক্ষমতাই আমাদের প্রায় সকল দুঃখের কারণ। অতএব, মনঃসংযোগের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতাও বৃদ্ধি করতে হবে। কোন বস্তুতে একাগ্র হতে শিখলেই চলবে না, প্রয়োজনে সেখান থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে এনে বিষয়ান্তরে তাকে নিবিষ্ট করতে পারা চাই। নিরাপত্তার জন্য এই দুটিকে সমানভাবে অর্জন করা প্রয়োজন।

এটাই মনের পদ্ধতিবদ্ধ উন্নতি। আমার মতে তথ্যসংগ্রহ করা নয়, মনের একাগ্রতা অর্জনই শিক্ষার প্রাণ। আমায় যদি আবার শিক্ষাগ্রহণ করতে হোত এবং আমার ইচ্ছেমত করতে পারতাম, আমি মোটেই তথ্য পাঠ করতাম না। আমি মনের একাগ্রতা ও বিচ্ছিন্নতার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলতাম এবং তারপর একটি নিখুঁত যন্ত্রের সাহায্যে ইচ্ছেমত তথ্য সংগ্রহ করতাম। শিশুদেরও একই সঙ্গে মনকে একাগ্র ও বিচ্ছিন্ন করবার শক্তি অর্জনের শিক্ষা দেওয়া উচিত।

আমার উন্নতি হয়েছে একমুখী। ইচ্ছেমত মনকে বিচ্ছিন্ন করবার ক্ষমতা অর্জন না করেই মনঃসংযোগের ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলেছিলাম। এবং আমার জীবনে গভীর দুঃখের কারণ এটাই। এখন আমি ইচ্ছেমত মন বিচ্ছিন্ন করতে পারি, কিন্তু এটা অনেক পরে শিখেছি।

কোন বিষয়ে আমরা নিজেরাই যেন একাগ্র হতে পারি; বিষয় যেন আমাদের মনকে আকৃষ্ট না করে। সাধারণভাবে আমরা একাগ্র হতে বাধ্য হই। বিভিন্ন বিষয়ের আকর্ষণে আমাদের মন যেখানে নিবিষ্ট হয়, আমরা তাকে বাধা দিতে পারি না। মনকে আয়ত্তে আনতে হলে, ঠিক যেখানে ইচ্ছে সেখানেই তাকে নিবিষ্ট করতে হলে বিশেষ শিক্ষার দরকার। অন্য কোন উপায়ে এটা সম্ভব নয়। ধর্মের অনুশীলনে মনের সংযম একান্ত প্রয়োজন। এই অনুশীলনে মনকে ঘুরিয়ে মনেরই ওপর একাগ্র করতে হয়।

মনকে আয়ত্ত করার শিক্ষা শুরু প্রাণায়াম দিয়ে। নিয়মিত শ্বাসক্রিয়া দেহে একটি সুসমঞ্জস অবস্থার সৃষ্টি করে; এবং তখন মনকে ধরা সহজ হয়। প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হলে প্রথমেই আসনের কথা এসে পড়ে। যে কোন ভঙ্গিমায় সহজেই বসা যায়, তাই হল উপযুক্ত আসন, মেরুদণ্ডকে ভারমুক্ত রাখতে হয়, দেহের ভার বুকের পাঁজরের ওপর রাখতে হয়। কোন চাতুরির সাহায্যে মনকে সংযত রাখার চেষ্টা কোর না, একমাত্র সহজ শ্বাসক্রিয়াই এক্ষেত্রে প্রয়োজন। কঠোরব্রতের সাহায্যে একাগ্র হওয়ার প্রয়াস ভ্রান্তিমাত্র। ঐ রকম অভ্যাস করো না।

মন দেহের ওপর ক্রিয়াশীল, আবার দেহও মনের ওপর। তারা পরস্পরের ওপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করে। প্রতিটি মানসিক অবস্থা শরীরের ওপর প্রভাবিত হয়

আবার প্রতিটি শারীরিক ক্রিয়া মনের ওপর প্রকটিত হয়। শরীর আর মনকে দুটো আলাদা অস্তিত্ব ভাবলে কোন ক্ষতি নেই, আবার দুয়ে মিলে একই শরীর—দেহ তার স্থূলাংশ, মন তার সূক্ষ্মাংশ—এমন ভাবলেও ক্ষতি নেই। এরা পরস্পরের ওপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করছে। মন সবসময়ই শরীরে রূপান্তরিত হচ্ছে। মন আয়ত্তে আনার শিক্ষায় শরীর দিয়ে শুরু করা ভাল। মনের চেয়ে শরীরের সঙ্গে সহজে বুঝতে পারা যায়।

যে যন্ত্র যত বেশী সূক্ষ্ম, তার শক্তি তত বেশী। মন অনেক সূক্ষ্ম এবং দেহের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী। এ কারণে শরীর দিয়ে শুরু করাই সহজ।

প্রাণায়াম হচ্ছে সেই বিজ্ঞান যার সাহায্যে শরীরকে অবলম্বন করে মনের কাছে পৌঁছুনো যায়। এইভাবে আমরা শরীরকে আয়ত্তে আনি, তারপর শরীরের সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলি অনুভব করি, ক্রমে সূক্ষ্মতর ও প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রবেশ করি এবং মনের কাছে গিয়ে পৌঁছুই। শরীরের সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলি অনুভব করা মাত্রই সেগুলি আমাদের আয়ত্তে আসে।

কিছুকাল পরে শরীরের ওপর মনের ক্রিয়াও অনুভূত হবে। তুমি বুঝতে পারবে মনের একাংশ কী করে অন্য অংশের ওপর কাজ করছে এবং মন স্নায়ুকেন্দ্রগুলিকে কাজে লাগাচ্ছে—কারণ মনই স্নায়ুমণ্ডলীর পরিচালক। তুমি বুঝতে পারবে যে বিভিন্ন স্নায়ু তরঙ্গের ভেতর দিয়ে মনই ক্রিয়াশীল।

এইভাবে নিয়মিত প্রাণায়ামের ফলে মনকে আয়ত্তে আনা যায়—প্রথমে স্থূল দেহ পরে সূক্ষ্ম দেহের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।

প্রাণায়ামের প্রথম ব্যায়ামটি খুবই নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর। এর দ্বারা অন্তত তোমার স্বাস্থ্য লাভ হবে ও শরীরের সাধারণ অবস্থার উন্নতি হবে। অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি আস্তে আস্তে ও সাবধানে করতে হয়।

ধর্মের মূলকথা

আমি পৃথিবীর প্রাচীন অথবা আধুনিক, বিলুপ্ত অথবা জীবন্ত ধর্মগুলিকে চারটি বিভাজনে সবচেয়ে ভালো সুন্দরভাবে বুঝতে পারি—

১। প্রতীকী তত্ত্ব—মানুষের ধর্মভাব সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের জন্য বিবিধ বাইরের সাহায্য কাজে লাগানো।

২। ইতিহাস—প্রতিটি ধর্মের স্বীকৃত ধর্মগুরুদের জীবনীতে বিধৃত আছে তাঁদের ধর্মের দর্শন। পৌরাণিক তত্ত্বও এর অন্তর্ভুক্ত, কারণ একটা জাতি বা একটা কালের কাছে যা পুরাণ, অন্য জাতি বা অন্য কালের কাছে তা ইতিহাস। মানবজাতির পথ-প্রদর্শকদের কাহিনীর বহুলাংশও বংশপরম্পরায় পৌরাণিক কাহিনী হিসেবে গৃহীত হয়।

৩। দর্শন—প্রত্যেক ধর্মের পূর্ণতা যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৪। অতীন্দ্রিয়বাদ—ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও যুক্তি অপেক্ষা উচ্চতর এমন বিদ্যা, যা কোন এক বিশেষ অবস্থায় কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা সকলে অর্জন করেন। ধর্মের অন্য বিভাগেও এর সঞ্চরণ আছে।

বিশ্বের প্রাচীন বা আধুনিক সব ধর্মেই এই নীতির একটি অথবা একাধিক বর্তমান, অবশ্য খুব উন্নত ধর্মে এই চারটি নীতিই উপস্থিত। এই উন্নত ধর্মগুলির মধ্যে অনেক-গুলোর আবার কোন পবিত্র গ্রন্থ নেই বা সেগুলি অবলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু যে ধর্মগুলি পবিত্র গ্রন্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলি এখনও বর্তমান।

পৃথিবীর সব মহান ধর্মই পবিত্র গ্রন্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বৈদিক ধর্ম বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত (ভুল করে যাকে বলা হয় হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম , অবেস্তীয় ধর্ম অবেস্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

মোশের ধর্ম ওল্ড-টেস্টামেন্টের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত ত্রিপিটকের ওপর, খ্রীষ্টধর্ম নিউ-টেস্টামেন্টের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামধর্ম কোরানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। চীনের তাওপন্থী ও কনফুসিয়াসবাদীদেরও নিজস্ব গ্রন্থ আছে। কিন্তু এই ধর্মগুলি বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে এইগুলিকে বৌদ্ধধর্মেরই তালিকা-ভুক্ত করা যায়। সত্যি বলতে গেলে সম্পূর্ণভাবে জাতিভিত্তিক কোন ধর্ম নেই, তবুও বলা যেতে পারে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বৈদিক, ইহুদী ও অবেস্তীয় ধর্ম যে জাতিগুলির মধ্যে পূর্ব থেকে ছিল, এখনও তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান। বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টানধর্ম ও ইসলামধর্ম তাদের জন্মলগ্ন থেকেই প্রসারধর্মী। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বজয়ের লিপ্সা ভীষণভাবে দেখা যায়। জাতিগত ধর্ম-গুলিকেও এই বিজয়-অভিযানে অংশগ্রহণ করতে হবে। জাতিগতই হোক আর প্রসার-ধর্মীই হোক ধর্মগুলির প্রত্যেকটি ইতোমধ্যেই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে নিজেরাই ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এই ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে এই ধর্মগুলির মধ্যে একটিও এককভাবে সমগ্র মানব-জাতির ধর্ম হওয়ার উপযুক্ত নয়। প্রত্যেক জাতি থেকে উদ্ভূত ধর্ম সেই জাতির

কতগুলি বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করে এবং ঐ বৈশিষ্ট্যগুলির সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি থাকায়, ঐ ধর্মগুলির কোনটিই বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সমতা রেখে বিশ্বমানবতার উপযোগী ধর্ম হতে পারে না। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক ধর্মে একটা নেতিবাচক দিক আছে, প্রত্যেক ধর্মই মানবচরিত্রের কিছু অংশের উন্নতি সাধনে সাহায্য করে। কিন্তু বাদবাকি অংশ যা তার সৃষ্টির উৎস যে জাতি তার জীবনে নেই, তাকে অবদমিত করে রাখে। সুতরাং এই ধরনের কোন ধর্ম যদি সার্বজনীন ধর্ম হয় তা হলে তা বিশ্বমানবতার পক্ষে বিপজ্জনক ও অধঃপতনের কারণ হবে।

বিশ্বের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায় বিশ্বকে একটা রাষ্ট্রনীতিক সাম্রাজ্যে পরিণত করা এবং বিশ্বব্যাপী ধর্মসাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা, মানুষের এই দুটি স্বপ্নই বহুকালের। মহান দিগ্বিজয়ীদের পরিকল্পনাগুলি বারংবার ব্যর্থ হয়েছে কারণ বিশ্বের সামান্য অংশ জয় করার পূর্বেই অধিকৃত রাজ্যগুলি খণ্ডবিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

তদ্রূপ প্রত্যেক ধর্ম তার শৈশব উত্তরণের পূর্বেই নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

তথাপি এটা সত্য বলে মনে হয় যে, সমগ্র মানবজাতির অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংহতি স্থাপনই প্রকৃতির পরিকল্পনার যদি ন্যূনতম প্রতিরোধের নীতি হয় প্রকৃত ধর্মনীতি তা হলে আমার মনে হয় প্রত্যেক ধর্ম নানা-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও তার দ্বারা ধর্মের সংরক্ষণই হয়, এর ফলে গোঁড়া একঘেয়েমির প্রবণতা ধ্বংস হয় এবং কর্মপদ্ধতির একটি স্পষ্ট পথরেখা সূচিত হয়।

মনে হয় পরিসমাপ্তিতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধ্বংসের বদলে তাদের বহুমুখিতা সম্প্রসারিত হবে যতক্ষণ না প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই একক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

আবার অন্যদিকে প্রচলিত সকল ধর্মের মিলনে একটি মহান দর্পণ গড়ে উঠলেই ঐক্যের পশ্চাদ্‌ভূমি সৃষ্টি হবে। পৌরাণিক কাহিনী অনুষ্ঠানাদি দ্বারা কখনই ঐক্যসাধন সম্ভব হবে না; কারণ অমূর্তভাবের তুলনায় তার স্থূল রূপভেদে আমাদের মতপার্থক্য বেশী। একই তত্ত্ব স্বীকার করলেও প্রত্যেক ব্যক্তি তার আদর্শ গুরুর মহত্ত্ব সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করে। সুতরাং উল্লিখিত ধর্মগত মিলনে দর্শনের সংগতি পাওয়া যাবে—তাই হবে ঐক্যের ভিত্তি। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব ধর্মগুরুর সাধনপদ্ধতিকে অভিরুচি অনুযায়ী গ্রহণের স্বাধীনতা পাবে; সবই যেন সেই ঐক্যের অভিব্যক্তি। এই মিলনের বাণী হাজার হাজার বছর ধরে ধ্বনিত হচ্ছে। কেবলমাত্র পারস্পরিক বিরোধিতার ফলে এই মিলন খুব দুঃখজনক ভাবে প্রতিহত হয়েছে।

পরস্পর-বিরোধিতার পরিবর্তে আমাদের উচিত ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে মতবাদ আদান-প্রদানে সাহায্য করা; মানবজাতিকে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষার জন্য জাতিতে জাতিতে ধর্মশিক্ষকের বিনিময় করা; এইভাবেই বিশ্বের বিচিত্র ধর্ম বিষয়ে মানুষ শিক্ষা পাবে। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ দুশো বছর আগে বৌদ্ধসম্রাট মহামতি অশোক যা করেছিলেন—আমাদেরও উচিত সেইরকম অন্যের নিন্দা না করা, অন্যের দোষ খুঁজে না বেড়িয়ে তাকে সাহায্য করা, তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া, এবং আলোকিত হয়ে ওঠা।

বস্তুবাদী জ্ঞানের বিপরীত অধিবিদ্যক জ্ঞানের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া এক মহা সোরগোল পড়ে গেছে।

বর্তমান জীবন ও বর্তমান বিশ্বকে দৃঢ়তর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অধিবিদ্যক জ্ঞানও ইহকাল অতিশায়ী জীবনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা সারা বিশ্বেই একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে; এমন কি ধর্ম প্রচারকেরাও একের পর এক এই ফ্যাশনের কাছে দ্রুত আত্মসমর্পণ করছেন। অবশ্য ভাবনাহীন জনগণ সর্বদাই আপাত আনন্দদায়ী জিনিসকেই অনুসরণ করে, কিন্তু যাঁদের আরো কিছু জানার কথা, যাঁরা নিজেদের তথাকথিত দার্শনিক বলে প্রচার করেন, তাঁরাও যখন এই অর্থহীন ফ্যাশনের অনুসরণ করেন, তখন ব্যাপারটা দুঃখজনক হয়ে ওঠে।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যতক্ষণ স্বাভাবিক থাকে ততক্ষণ তারাই হয় আমাদের সবচেয়ে বিশ্বাসী পথপ্রদর্শক এবং তাদের সংগৃহীত তথ্যগুলিই হচ্ছে মানুষের জ্ঞানের ভিত্তি, একথা কেউ অস্বীকার করবে না। অধিকন্তু যারা মনে করে মানবসমাজের সমগ্রজ্ঞান শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় উপলব্ধির ফল ছাড়া আর কিছুই নয় তাহলে আমরা তা স্বীকার করি না। যদি ভৌত বিজ্ঞান বলতে নিছক ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই না বোঝায়, তাহলে আমরা বলব ঐ ধরনের বিজ্ঞান কোনদিন ছিল না এবং কোনদিন থাকবেও না। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোন জ্ঞানই কখনও বিজ্ঞান হতে পারবে না।

নিঃসন্দেহে ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানের উপাদান চয়ণ করে এবং তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সন্ধান করে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই—তারপর থামতে হয়। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক জগতে তথ্য সংগ্রহ কতকগুলি অধিজাগতিক ধারণার যথাস্থান ও কালের শর্তাধীন। দ্বিতীয়তঃ পশ্চাদ্ ভূমিকায় যদি কতকগুলি অমূর্ত ধারণা না থাকে তবে তথ্যগুলির বর্গীকরণ অথবা সাধারণীকরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। সাধারণীকরণ যত উচ্চস্তরের হবে অধিবিদ্যক ধারণার পটভূমিও তত অমূর্ত হবে—যেখানে অসংলগ্ন তথ্যগুলিও গুছিয়ে নেওয়া যায়। সুতরাং বস্তু, শক্তি, মন, আইন, কার্য-কারণ-সম্বন্ধ স্থান এবং কাল হচ্ছে খুব উচ্চ পর্যায়ের অমূর্ত ভাবনার ফল। এবং কেউই কোনদিন এই বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করেনি। অথবা বলা যায়, এই ব্যাপারগুলি সবই অধিবিদ্যক। তবু এইসব অধিবিদ্যক ধারণাগুলি ছাড়া ভৌতজগতের কোন ব্যাপারই বোধগম্য হয় না।

শক্তির অনুষঙ্গে নির্দিষ্ট গতিকে বোঝা যায়—কতগুলি ইন্দ্রিয়ানুভূতি বোঝা যায় বস্তুর অনুষঙ্গে; আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় বাইরের পরিবর্তন; মনের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তার পরিবর্তন—কতগুলি নিয়ম কার্য-কারণের প্রেক্ষিতে—যেমন স্থান ও আইনের ধারণা বোঝা যায়। অথচ বস্তু অথবা শক্তি, আইন-কানুন অথবা কার্য-কারণ-সম্বন্ধ, স্থান অথবা কাল এইগুলি কেউ কোনদিন দেখেনি অথবা কল্পনাও করেনি। বলা যেতে পারে অমূর্ত ধারণার প্রতীকরূপে এইগুলির কোন অস্তিত্ব নেই এবং এই ধারণাগুলি তাদের শ্রেণী থেকে পৃথক নয় অথবা পৃথকীকরণযোগ্যও নয়, এগুলি গুণনিচয় মাত্র। অমূর্ত ধারণা সম্ভব কিনা, শ্রেণী সাধারণীকরণ ছাড়াও

অন্য কিছু আছে কিনা—এই প্রশ্ন ছাড়াও এটা স্পষ্ট যে—বস্তু ও শক্তি স্থান ও কাল, কার্য-কারণ সম্বন্ধ, নিয়ম ও মনের ধারণাগুলি হল বিভিন্ন শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত ও স্বাধীন একক। যখন অধিবিদ্যামূলক ধারণাগুলি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা করা হয়, তখনই তারা ইন্দ্রিয় অনুভূতির লব্ধ ব্যাপারগুলির ব্যাখ্যারূপে প্রতিফলিত হয়। বলা যেতে পারে, এই ধারণাগুলির বৈধতা ছাড়াও, তাদের সম্পর্কে দুটি তথ্য দেখতে পাই—প্রথমত তারা হল অধিবিদ্যামূলক। দ্বিতীয়ত কেবলমাত্র অধিবিদ্যামূলকরূপেই এগুলি প্রাকৃতিক ব্যাপার ব্যাখ্যা করে, অন্যভাবে নয়।

বহির্জগত অন্তর্জগতের অনুরূপ, না অন্তর্জগতের অনুরূপ বহির্জগত; বস্তু মনের অভিক্ষেপ, না মন বস্তুর অভিক্ষেপ। পারিপার্শ্বিক অবস্থা মনকে চালিত করে, না মন পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে চালিত করে—এই প্রশ্ন আবহমানকাল ধরেই চলে আসছে, অথচ এই প্রশ্ন আজও আগের মতই নতুন এবং জীবন্ত। এদের মধ্যে কার অগ্রাধিকার অথবা কার্য-কারণ-সম্বন্ধ—মনই বস্তুর কারণ না বস্তুই মনের কারণ—এ সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন ছাড়াও এটা প্রতীয়মান যে বহির্জগত অন্তর্জগতদ্বারা তৈরী হোক বা না হোক, এটা অন্তর্জগতের অনুরূপ হতে বাধ্য, ফলত তবেই আমরা এই বিষয়ে জানতে সক্ষম হব। ধরা যাক বহির্জগতই অন্তর্জগতের কারণ, তবুও আমাদের মানতে হবে যে এই বহির্জগৎ যাকে আমরা মনের কারণ বলছি, তা আমাদের কাছে অজানা এবং অজ্ঞেয়। কারণ আমাদের মন বহির্জগতের ততটুকুই জানতে পারে যতটুকু প্রতিফলিত হয়। বস্তুটির নিজস্ব প্রতিফলন এর কারণ হতে পারে না। মনের সাহায্যে বাস্তব জগতের যে অংশটুকু ছিন্ন করে আমরা জানতে পারি—তা কখনই আমাদের মনের কারণ হতে পারে না; কারণ মনের মাধ্যমেই তার অস্তিত্বকে জানা যায়। সুতরাং মনকে বস্তুর মধ্যে অনুমান করা অসম্ভব। বস্তুত এটা বলাই অযৌক্তিক। কারণ অস্তিত্বের যে অংশে চিন্তাশক্তি ও জীবনের গুণাবলীর প্রতিফলন নেই এবং যা বহির্জগতের গুণ দ্বারা সমৃদ্ধ, তাকেই বস্তু বলি। এবং সে অংশে বহির্জগতের প্রতিফলন নেই এবং যা চিন্তাশক্তি ও জীবনের গুণাবলীর দ্বারা সমৃদ্ধ, তাকে বলি মন। অর্থাৎ মন থেকে বস্তু অথবা বস্তু থেকেই মন—এটাই যদি প্রমাণ করতে চাই তাহলে যে সব গুণাবলী দিয়ে এদের চিনেছি, তাদেরই আবার যোগফলরূপে দেখানো হবে। অতএব মন বা বস্তুর কার্যকারণ সম্পর্কিত বাগযুদ্ধটি একটা ধাঁধা ছাড়া আর কিছুই না।

আবার এইসব বিতর্কের মধ্যে মন ও বস্তু সম্পর্কিত, বিভিন্ন অনুপপত্তির ধারণা ও নিয়ম হিসেবেই স্থান পেয়েছে। কখনও মন কথাটিকে বস্তুর বিপরীত অথবা বস্তু থেকে পৃথক কিছু হিসেবে প্রয়োগ করা হয়; আবার কখনো 'মন' অর্থে মন ও বস্তু উভয়কেই বোঝায়; অর্থাৎ যেখানে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ উভয়েই বস্তুবাদী অর্থে ব্যাখ্যাত। বস্তু কথাটিকে কখনো সীমিত অর্থে ব্যবহার করা হয় ইন্দ্রিয়বেদ্য বহির্জগতের রূপে, আবার কখনও বস্তু বলতে বোঝায় বহির্জগত ও অন্তর্জগতে ঘটনাবলীর মূল কারণ। বস্তুবাদীরা যখন ভাববাদীদের আতঙ্কিত করে বলেন যে তারা পরীক্ষাগারের পদার্থ থেকে মন তৈরী করবেন, তখন আসলে তারা পদার্থ ও পরমাণু থেকেও উচ্চতর চিন্তাকে অভিব্যক্ত করার জন্য সর্বদা সংগ্রাম করে; এমন কিছু সে চিন্তা করে যা হল

বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের ঘটনাবলীর উৎস, তাকে সে বস্তু বলে আখ্যা দেয়। অপর দিকে ভাববাদীরা বস্তুবাদীদের সব পদার্থ ও পরমাণুর ধারণাকে :তাদেরই চিন্তাপ্রসূত মনে করে। তারা এমন কিছুর আভাস পায় যাতে মন ও বস্তুর কার্য-কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব, যাকে তাঁরা প্রায়ই ঈশ্বর নামে অভিহিত করেন। বলা যেতে পারে একদল বিশ্ব জগতের একটা অংশকে জেনে তাকে বহির্জগত হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন—অপর দল অন্য অংশকে জেনে তাকে অন্তর্জগৎ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। যথার্থ ব্যাখ্যা করতে উভয় প্রয়াসই ব্যর্থ হয়েছে। এর একমাত্র ব্যাখ্যা হল এমন কিছু সৃষ্টি করতে হবে যা মন ও বস্তু উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

মন ছাড়া চিন্তার অস্তিত্ব অসম্ভব এ ধরনের যুক্তিও দেওয়া যেতে পারে; ধরে নেওয়া যাক, এমন একটা সময় ছিল যখন কোন চিন্তা, কোন বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। আমরা জানি, তাহলে তো নিশ্চিতভাবে কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। অপর পক্ষে, এটা বলা যেতে পারে অভিজ্ঞতা ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব, এবং আমরা জানি অভিজ্ঞতা। পূর্ব থেকে বহির্জগৎ ও মনের অস্তিত্বকে ধরে নেয়। অর্থাৎ বস্তুর অস্তিত্ব ছাড়া অভিজ্ঞতাও অসম্ভব।

এদের একটিরও যে আরম্ভ আছে তা বলাও অসম্ভব। সাধারণীকরণই হল জ্ঞানের মূলমন্ত্র। সদৃশ বস্তুর সঞ্চয়ন ছাড়া সাধারণীকরণ অসম্ভব। এমন কি পূর্বজ্ঞান ছাড়া তুলনা করাও অসম্ভব। সুতরাং পূর্বজ্ঞান ছাড়া জ্ঞানের অস্তিত্বও অসম্ভব; চিন্তাশক্তি ও বস্তু উভয়ের অস্তিত্বের ওপরই জ্ঞান নির্ভরশীল বলে উভয়েরই কোন আরম্ভকাল নেই।

আবার সাধারণীকরণ—যা হল ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মূলমন্ত্র, তাও অসম্ভব হবে যদি না একটা কিছুর ওপরে অসংলগ্ন অনুভূতির ঘটনাসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। ছবি আঁকার জন্য যেমন ক্যানভাসের প্রয়োজন, তেমনি বাহ্যিক অনুভূতির গোটা জগতে এমন কিছুর প্রয়োজন যার সাহায্যে ক্রমানুসারে তথ্যসমূহকে সাজিয়ে বিশ্ব অস্তিত্বের ধারণা জাগানো যায়। যদি চিন্তাশক্তি বা মন হয় বহির্জগতের ক্যানভাস, তাহলে তার আরো কিছুর প্রয়োজন হয়। মন হল বিবিধ অনুভূতি ও ইচ্ছার শ্রেণী সমবায়,—এটা কোন একক বিষয় নয়; সুতরাং ঐক্যের পটভূমি হিসেবে মনের মন-বহির্ভূত কিছু চাই। এখানেই সব বিশ্লেষণের অবসান, কেন না যথার্থ ঐক্য সাধনের একটা পথ খুঁজে পাওয়া গেছে। যতক্ষণ না একটা অবিভাজ্য এককে পৌঁছনো যাচ্ছে ততক্ষণ একটি যৌগিক পদার্থের বিশ্লেষণ শেষ হতে পারে না।

চিন্তাশক্তি ও বস্তু উভয়ের ঐক্যের যে ব্যাপার আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয় তাই হল প্রত্যেক ব্যাপারের সর্বশেষ অবিভাজ্য ভিত্তি; কারণ এরপর আর বিশ্লেষণের কথা আমরা ভাবতে পারি না। অবশ্য এর বেশি বিশ্লেষণের প্রয়োজনও নেই, যেহেতু এরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আমাদের বহির্জগত ও অন্তর্জগতের যাবতীয় অনুভবগুলির বিশ্লেষণ।

তখন আমরা মানসিক ও বৈষয়িক ঘটনাবলীর একটা সমগ্রতা দেখতে পাই, এবং তার চেয়ে বেশি কিছু যেখানে উভয়ের একত্র বিচরণ—সেটিও আমাদের অনুসন্ধানের ফল।

চিন্তাশক্তির অতীত বিষয়টি ইন্দ্রিয় অনুভূতি নয়; এটা হল যুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা এবং আমাদের সব ইন্দ্রিয় অনুভূতির মধ্যে অনুস্যূত একটা অসংজ্ঞাযোগ্য উপস্থিতির অনুভব। আরও দেখতে পাই যে যুক্তি ও সাধারণীকরণপ্রবণতার নিছক খাতিরে আমরা চালিত হই। একথা বলা যায় যে, মন ও বস্তুগত ব্যাপারের অতীত কোন সত্তা বা শক্তি অনুমান করারও কোন প্রয়োজন নেই।

ঘটনাবলীর সমগ্রতা যা আমরা জানি অথবা জানতে পারি তাই যথেষ্ট, নিজেকে ব্যাখ্যা করার জন্য নিজ অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কিছু অর্থহীন। অনুভূতির অতীত কোন বিশ্লেষণ অসম্ভব, এমন একটি সত্তার অনুভূতি যার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে সব কিছু আসলে বিভ্রান্তিকর। আমরা জানি যে, প্রাচীনকাল থেকেই চিন্তাবিদদের মধ্যে এই দুটি গোষ্ঠী আছে। একদল দাবি করেন যে মানুষের মনে ধারণা অমূর্ত ভাব তৈরী করা একান্তভাবে অপরিহার্য; এরাই জ্ঞানের স্বাভাবিক পথপ্রদর্শক। এই প্রক্রিয়া কখনও থেমে থাকে না, যতক্ষণ না তা সমগ্র ঘটনাবলীর অতীত একটা অবস্থায় পৌঁছায় এবং এমন একটা ধারণা (Concept) সৃষ্টি করে যা সর্ববিষয়ে অর্থাৎ স্থান, কাল ও কার্য-কারণের ক্ষেত্রে যদি ধীরে ধীরে চরম ও পরম রূপে গণ্য হয়। চিন্তা ও বস্তুবিষয়ক সমগ্র ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করে একটা পরম উপলব্ধিতে পৌঁছান যায়, প্রথমে স্থূল, তারপর তাকে সূক্ষ্মে রূপান্তরিত, আরও সূক্ষ্মতর পর্যায়ে এইভাবে উন্নীত করে যতক্ষণ না এমন একটা অবস্থায় পৌঁছান যায় যাতে সব সমস্যার সমাধান। এটা নিশ্চিত যে এই চূড়ান্ত ফলের অতীত যা কিছু সবই সেই পরমের ক্ষণস্থায়ী রূপ মাত্র। শুধু মাত্র এই চূড়ান্ত ফলই সত্য আর বাদ বাকি সব তার অভিক্ষেপ। সুতরাং প্রকৃত সত্য অনুভূতিগম্য নয়, অনুভূতি-অতিরিক্ত।

অপরদিকে, অন্যদল মনে করেন যে এই বিশ্বজগতে একমাত্র সত্য হল ইন্দ্রিয় প্রেরিত অনুভূতি। আমাদের সব ইন্দ্রিয় উপলব্ধির অতীতচারী কোন কিছুর অনুভূতি যদি প্রতীয়মান হয়, তবে তা আসলে শুধু মনেরই চাতুরি, অতএব অসত্য। অপরিবর্তনীয় কোন কিছুর ধারণা ছাড়া পরিবর্তনশীল কোন বিষয় বোধগম্য হতে পারে না।

যদি অপরিবর্তনীয় কোন কিছুর সাপেক্ষে পরিবর্তনযোগ্য বিষয়ের কথা বলা হয়, তা হল শুধুমাত্র আপেক্ষিকভাবে অপরিবর্তনীয়ের কথা।

সুতরাং অন্য কিছুর অনুষঙ্গে তাকে বুঝতে হবে। এইভাবে এই শ্রেণীচক্রের দীর্ঘতা যতই বড়ো হোক অপরিবর্তনীয় শক্তির অনুষঙ্গ ছাড়া পরিবর্তনযোগ্য শক্তিকে উপলব্ধি করার যে অক্ষমতা তা থেকেই যাচ্ছে। কারণ সব পরিবর্তনযোগ্য বিষয়ের পটভূমিতে আরোপিত আছে শর্ত।

সমগ্রের একটা অংশকে সঠিক বলে গ্রহণ করার অধিকার কারোর নেই— অপর পক্ষে অন্য অংশকে বেঠিক বলে পরিত্যাগ করার অধিকারও কারো নেই। মুদ্রার এক পিঠ গ্রহণ করলে যত অপছন্দই হোক তার অপর পিঠকেও গ্রহণ করতে হয়।

আবার মানুষ তার প্রতিটি আচরণে স্বাধীনতা জাহির করে। সর্বোত্তম চিন্তাবিদ থেকে অজ্ঞতম ব্যক্তিও নিজ স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন। তেমনি প্রত্যেক

ব্যক্তিই সামান্য ভাবনাচিন্তার পর বুঝতে পারে যে তার প্রতিটি ক্রিয়ার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও শর্ত আছে। ঐ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও শর্ত বাদ দিলে তার বিশেষ ক্রিয়াকর্ম আসলে কার্য-কারণ সম্বন্ধেরই প্রকাশ।

আবার সেই একই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। উদ্ভিদের বেড়ে-ওঠা অথবা পাথরের পতনের মত মানুষের ইচ্ছাশক্তিও কার্য-কারণ সম্পর্কিত নিয়মাবলী দ্বারা দৃঢ়ভাবে যুক্ত।

তবুও এই সব বন্ধনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার অবিনাশী ধারণার প্রকাশ। আবার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে স্বাধীনতার ধারনাই হল মায়া এবং মানুষ হচ্ছে সম্পূর্ণভাবেই প্রয়োজনের সৃষ্টি।

এখন একদিকে স্বাধীনতার ধারণাকে মায়া বলে নস্যাৎ করার কোন ব্যাখ্যা নেই; অপর দিকে প্রয়োজনীয়তা, বন্ধন বা কার্য-কারণের ধারণাকে কেনই বা অন্য ব্যক্তির বিভ্রান্তি বলব না? বস্তুকে ব্যাখ্যা করে এমন যে কোন তত্ত্ব প্রথম আঘাতেই যদি ব্যাখ্যা করতে সম্পূর্ণত অক্ষম হয়, তাহলে বুঝতে হবে গোড়ায় গলদ।

অতএব আমাদের সামনে একটি পথই উন্মুক্ত তা হল প্রথমেই আমাদের স্বীকার করতে হবে যে এ-দেহ স্বাধীন নয়—ইচ্ছাশক্তিও নয়। কিন্তু দেহ ও মনের অতীত এমন কিছু আছে যা মুক্ত।

মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর

মাদ্রাজের বন্ধু, স্বদেশবাসী এবং সহকর্মিগণ,

ভারতবর্ষের ধর্মের সেবায় আমার নগণ্য কাজ আপনাদের গ্রহণযোগ্য হয়েছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। শুধু এজন্য নয় যে আপনারা আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে ও সুদূর বিদেশভূমিতে আমি যা কিছু করেছি সেগুলির প্রসংসা করেছেন। বরং নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল যে, যদিও একের পর এক বিদেশী আক্রমণের ঘূর্ণি উৎসর্গিত প্রাণ ভারতবর্ষের উপর দিয়ে বয়ে গেছে, যদিও আমাদের শতাব্দী-ব্যাপী অবহেলা এবং বিজেতাদের ঘৃণা প্রাচীন আর্যাবর্তের গৌরব দৃশ্যত মলিন করেছে, শত শত বৎসরের প্লাবন মুছে দিয়েছে আর্য সংস্কৃতির রাজকীয় স্তম্ভ, চমৎকার খিলান, এবং সুন্দর কোণগুলি তৎসত্ত্বেও আমাদের কেন্দ্র এখনো মজবুত ভিত্তি, এখনও অটুট। যে আধ্যাত্মিক ভিত্তিপ্রস্তরের উপর গড়ে উঠেছে ঈশ্বরের মহিমা এবং সর্বজীবে দয়ার চমৎকার স্মারক সৌধটি, সেই ভিত্তি আজও সুদৃঢ় অনড় রয়েছে।

আপনারা সেই মহাপুরুষকে উদার চিত্তে প্রশংসা করেছেন, ভারতবর্ষ এবং সমগ্র পৃথিবীর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত যাঁর বাণী আমি, তাঁর সবচেয়ে অযোগ্য সেবক, বহন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেটিই আপনাদের সহজাত আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রমাণ, যার বলে বলীয়ান আপনারা। ঐ মহাপুরুষটির জীবন ও বাণীতে শুনেছেন সে আধ্যাত্মিক প্লাবনের প্রথম গুঞ্জন, যে প্লাবন নিকট ভবিষ্যতে সমস্ত দুর্বার শক্তি নিয়ে ভারতবর্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তার সর্বশক্তিমান জলধারায় ভেসে যাবে সব দুর্বলতা, ত্রুটি, হিন্দুজাতি উন্নীত হবে ঈশ্বরের পূর্ব-নির্দিষ্ট আসনে, তার শতাব্দী-ব্যাপী দুঃখ স্বীকারের পুরস্কারস্বরূপ, অতীত দিনের তুলনায় অনেক বেশী মহিমা-মণ্ডিত হবে।

দক্ষিণ ভারতে আপনাদের কাছে উত্তর ভারতীয়রা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কারণ আধুনিক ভারতবর্ষে যেসব উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে তার অধিকাংশেরই মহান উৎস আপনারা। মহান ভাষ্যকারগণ, যুগস্রষ্টা আচার্যগণ—শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতিদের জন্ম দক্ষিণ ভারতে। মহান শঙ্করের আনুগত্য স্বীকার করবেন পৃথিবীর প্রত্যেক অদ্বৈতবাদী ; মহান রামানুজের স্বর্গীয় স্পর্শ নিপীড়িত অচ্ছ্যুৎদের আলোয়ারে রূপান্তরিত করেছিল।

সমগ্র ভারতবর্ষ যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের প্রভাব উপলব্ধি করেছিল, উত্তর ভারতের সেই একমাত্র সাধক পুরুষটির অনুগামীরাও মহান মধ্বের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। এমন কি আজও বারানসীর গৌরবের ধারা বহন করে চলেছে দক্ষিণ ভারত। আপনাদের ত্যাগের আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে হিমালয়ের সুউচ্চ শিখরে অবস্থিত পবিত্র তীর্থস্থানগুলি। মহান সাধকদের রক্ত প্রবাহিত আপনাদের ধমনীতে, আপনাদের জীবন আচার্যদের আশীর্বাদধন্য। সুতরাং এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে যে আপনারাই সর্বপ্রথম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী উপলব্ধি করেছেন এবং তাকে গ্রহণ

করতে পেরেছেন। বৈদিক জ্ঞানের আধার ছিল দক্ষিণ ভারত এবং মূঢ়দের মারাত্মক অজ্ঞতা বারবার প্রকট হওয়া সত্ত্বেও শ্রুতিই যে এখনও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বিভাগের মেরুদণ্ডস্বরূপ একথা আপনারা স্বীকার করবেন।

জাতিতত্ত্ববিদ্ অথবা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে সংহিতা অথবা বেদের ব্রাহ্মণ অংশের গুণগত উৎকর্ষ যত বেশীই হোক না, বিভিন্ন বেদী, বলিদান, উৎসর্গের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে 'অগ্নিমীলে' অথবা 'ঈষেত্বোর্জত্বা' অথবা 'শন্তো দেবীর ভীষ্টয়ে' প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্র যত সুফলই দিক না কেন—এ সব কিছুরই একমাত্র ফল—'ভোগ', এবং কেউ কখনও বলেননি যে এর দ্বারা মোক্ষলাভ হতে পারে। সেদিক থেকে বিচার করলে জ্ঞানকাণ্ড, আরণ্যক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রুতিগুলি, যেগুলি আধ্যাত্মিকতার পথ, মোক্ষ মার্গ, পরিচালিত করে। এগুলিই ভারতবর্ষকে সবসময় নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে এবং আগামী দিনেও করবে। পক্ষপাতমূলক ধারণার জন্য আধুনিক হিন্দু চিরকালীন ধর্মের গোলক ধাঁধা ও শ্রেণী-বিন্যাসের জটিলতায় পথ হারিয়েছে। সে উপলব্ধি করতে পারছে না সেই একমাত্র ধর্মের অর্থ যে ধর্মের সার্বজনীন অভিযোজন হল, তার 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' ঈশ্বরের যথার্থ প্রতিরূপ। চূড়ান্ত বস্তুবাদী দেশগুলির কাছ থেকে পুরনো ব্যবহৃত আধ্যাত্মিক সত্য ধার করে সে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

এই অজ্ঞতা নিয়ে আধুনিক হিন্দুযুবক তার পিতৃপুরুষের ধর্ম উপলব্ধি করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে অবশেষে সে পূর্ণ জিজ্ঞাসা থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয়। তখন সে একজন হতাশাগ্রস্ত অজ্ঞেয়বাদীমাত্র; অথবা ঐ ধরনের কিছুমাত্র; সহজাত ধর্মীয় চেতনার প্রেরণায় নির্জীব জীবন যাপন করতে না পেরে এরা প্রাচ্যের সুরভিমণ্ডিত পাশ্চাত্য বস্তুবাদের কিছু অসার তত্ত্ব নিশ্চিন্তে গলধঃকরণ করে শ্রুতির ভবিষ্যৎ বাণীকে অভ্রান্ত প্রমাণিত করে:

"পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ"।

অর্থাৎ—অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধদের মতই মূর্খেরা বিভ্রান্ত ভাবে ইতঃস্তত ঘুরে মরে। একমাত্র তারাই পরিত্রাণ পেতে পারে যাদের আধ্যাত্মিক চেতনা সংগুরুর সঞ্জীবনী স্পর্শ লাভ করে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।

ভগবান ভাষ্যকার যথার্থই বলেছেন—

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ॥

অর্থাৎ—"মনুষ্য জন্ম, মুক্তির ইচ্ছা এবং মহাত্মাদের সঙ্গ পৃথিবীতে এই তিনবস্তু অত্যন্ত কষ্টলভ্য, এবং এ বিষয়ে ঈশ্বরের করুণা লাভের প্রয়োজন আছে।"

পরমাণু, দ্ব্যণু, ত্রসরেণু প্রভৃতি বিষয়ে চমৎকার সিদ্ধান্তপ্রসূ বৈষয়িকদের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণই হোক, অথবা জাতি, দ্রব্য, গুণ, সমবায় ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় নৈয়ায়িকদের অপূর্ব বিশ্লেষণই হোক। বিবর্তনবাদের জনক সাংখ্যের সুগভীর চিন্তাধারাই হোক, অথবা এসবের ফলস্বরূপ ব্যাসসূত্রই হোক—মানবমনের এ সমস্ত বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের একমাত্র ভিত্তি শ্রুতি। এমন কি বৌদ্ধ বা জৈনদের দার্শনিক

রচনাগুলিতেও শ্রুতির সাহায্য কখনই অগ্রাহ্য হয়নি। অনন্ত কিছু বৌদ্ধগোষ্ঠী এবং অধিকাংশ জৈন ধর্মগ্রন্থে শ্রুতির শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য শ্রুতির কিছু অংশ ব্রাহ্মণদের সংযোজন বলে বিবেচিত হওয়ায় জৈন ও বৌদ্ধসম্প্রদায় একে 'হিংসক শ্রুতি' আখ্যা দিয়েছেন এবং এই অংশের গ্রহণ যোগ্যতা অস্বীকার করেন। স্বর্গত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীও ইদানীংকালে অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

যদি ভারতবর্ষের অতীত ও বর্তমান চিন্তাপ্রণালীর কেন্দ্রসকল জানতে চাওয়া হয়, অথবা কেউ বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্বলিত হিন্দুধর্মের প্রকৃত মেরুদণ্ডকে জানতে চান তবে নিঃসন্দেহে ব্যাসসূত্রগুলিকেই সেই মেরুদণ্ড বা কেন্দ্রস্থল হিসাবে নির্দেশিত হবে। স্বর্গীয় নদীর মনোরম কলতান মুখরিত হিমালয়ের অরণ্যানীর হৃদয়স্তব্ধকারী গাম্ভীর্যের মধ্যে অদ্বৈতকেশরীর অস্তি-ভাতি-প্রিয়রূপ বজ্র গম্ভীর স্বর কেউ শ্রবণ করুন, অথবা বৃন্দাবনের মনোহর কুঞ্জে 'পিয়া পীতম' কূজনই শুনুন বারানসীর মঠগুলির সন্ন্যাসীদেব গভীর ধ্যানেই নিমগ্ন হোন, অথবা নদীয়ার সন্ন্যাসীটির অনুগামীদের আত্মহারা নৃত্যেই যোগদান করুন, বড় কলে, তেঙ্কলে ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আচার্যদের পদতলে উপবেশন করুন, অথবা মাধ্বগোষ্ঠীর আচার্যদের বাণী ভক্তিভরে শ্রবণ করুন; ধর্মনিরপেক্ষ শিখদের সমরবাণী "ওয়া গুরু কি ফতে"ই শ্রবণ করুন অথবা উদাসী এবং নির্মলাদের গ্রন্থসাহেবের উপদেশই শুনুন; তিনি 'সৎ সাহেব' বলে কবীরের সন্ন্যাসী-ভক্তদের অভিবাদন করুন এবং সানন্দে সখীদের ভজন শ্রবণ করুন; রাজপুতানার সংস্কারক দাদুর মনোহর কাহিনীগুলি পাঠ করুন অথবা তাঁর মহান শিষ্য সুন্দরদাসের রচনা থেকে শুরু করে বিখ্যাত রচয়িতা নিশ্চল দাসের বই যা গত তিন শতাব্দীতে যে কোন ভারতীয় ভাষায় লিখিত বইগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে সেই 'বিচার সাগর'ই পাঠ করুন; এমন কি উত্তর ভারতের কোন ভাঙ্গী মেথরকে তার লালগুরুর বাণী শোনাতে বলুন— দেখবেন এ সমস্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী ও আচার্যরা সেই ধর্মপ্রণালীকেই অনুসরণ করেছেন শ্রুতি যার প্রামাণ্য গ্রন্থ, গীতা যার ঈশ্বর-প্রদত্ত টীকা, 'শারীরিক সূত্র' যার সংহত প্রণালী। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যগণ থেকে শুরু করে, লালগুরুর দরিদ্র নিপীড়িত মেথর শিষ্য পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায় সেই একই ধর্মপ্রণালীর বিভিন্ন রূপ।

অতএব দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এবং অদ্বৈতের আরও কিছু স্বল্প হেরফের নিয়ে যে প্রস্থানত্রয় তাই হল হিন্দুধর্মের 'প্রামাণ্য'। প্রাচীন নারাশংসির (বেদের কাহিনী ভাগ) আধুনিক সংস্করণ পুরাণগুলিতে পাওয়া যায় এর উপাখ্যানভাগ, এবং বৈদিক ব্রাহ্মণভাগের (বেদের যজ্ঞ ও ব্যাখ্যার অংশগুলি) আধুনিক সংস্করণ তন্ত্রগুলিতে রয়েছে অনুষ্ঠানাদির কথা। সুতরাং প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে প্রস্থানত্রয় সমস্ত গোষ্ঠীর কাছেই সুপরিচিত। কিন্তু প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব পুরাণ ও তন্ত্র রয়েছে। আমরা আগেই বলেছি তন্ত্রে পাই বৈদিক অনুষ্ঠানাদির রূপান্তর। সেগুলি সম্বন্ধে হঠাৎ কোন অদ্ভুত ধারণা করার আগে আমি বলবো কোন ব্যক্তি যেন ব্রাহ্মণভাগ বিশেষত অধ্বর্যু ব্রাহ্মণভাগের সঙ্গে মিলিয়ে তন্ত্রগুলি পড়েন। দেখা যাবে যে তন্ত্রের বেশীর ভাগ মন্ত্রই ব্রাহ্মণভাগ থেকে হুবহু নেওয়া হয়েছে। শ্রৌত এবং স্মার্ত অনুষ্ঠানাদি ছাড়া হিমালয়

থেকে কন্যাকুমারীকা পর্যন্ত যেসব ধর্মীয় আচার প্রচলিত আছে সেগুলি সবই তন্ত্র থেকে নেওয়া হয়েছে এবং শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সমস্ত সম্প্রদায়ের উপাসনাই তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। আমি কখনই একথা ধরে নিইনি যে হিন্দুরা তাঁদের ধর্মের এই উৎসগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত আছেন। বিশেষত নিম্নবঙ্গে, অনেকে এইসব সম্প্রদায় এবং এই মহৎ প্রণালীগুলির নামও জানেন না। কিন্তু জানতই হোক অথবা অজানতই হোক প্রস্থানত্রয়ে যেসব পরিকল্পনা দেওয়া আছে তাঁরা সেগুলিই অনুসরণ করছেন।

এছাড়া যেখানেই হিন্দীভাষার প্রচলন আছে, সেখানকার নিম্নবর্ণের লোকেরাও আমাদের নিম্নবঙ্গের উচ্চবর্ণের লোকদের তুলনায় বেদান্ত ধর্ম বিষয়ে অনেক বেশী জ্ঞান রাখেন।

কেন এ রকম হয়েছে ?

মিথিলাভূমি থেকে নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হয়ে শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ ও অন্যান্য অনেক প্রতিভার সযত্ন লালনে গড়ে উঠেছে বাংলার ন্যায়সূত্র, তার্কিক নিয়মের এমন বিশ্লেষণবিধি, কোন কোন ক্ষেত্রে যা পৃথিবীর অন্য সমস্ত ন্যায়বিধির তুলনায় শ্রেষ্ঠ। অপূর্ব, সুনিবদ্ধ সংযত ভাষায় লেখা বাংলার এই ন্যায়শাস্ত্র হিন্দুস্থানের সর্বত্র সম্মানিত ও পঠিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল সে বেদচর্চা এখানে অত্যন্ত অবহেলিত হয়েছে, এবং গত কয়েক বছরের আগে পর্যন্ত পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' পড়াতে পারেন এমন লোকের অভাব বাংলাদেশে ছিল। একবারই মাত্র একজন মহাপুরুষ এই অবিচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকের জাল ছিঁড়ে ঊর্ধ্বারোহণ করেছিলেন তিনি—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। অন্তত একবার বাংলাদেশের ধর্মীয় আলস্য দূর হয়েছিল এবং কিছু সময়ের জন্য ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের সঙ্গে বাংলাদেশ যোগসূত্র স্থাপন করতে পেরেছিল।

কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষণীয় যে যদিও শ্রীচৈতন্য ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন এবং সে হিসাবে তিনি নিজেও একজন ভারতী; কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক প্রতিভার প্রথম জাগরণ হয়েছিল মাধবেন্দ্র পুরীর সংস্পর্শে। মনে হয় বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক চেতনার উদ্‌বোধনে এক অদ্ভুত প্রেরণা পুরীদের ছিল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন তোতাপুরীর কাছে।

ব্যাস সূত্রগুলির শ্রীচৈতন্য-কৃত ভাষ্যগুলি হয় হারিয়ে গেছে অথবা এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর শিষ্যরা দক্ষিণ ভারতের মাধ্বদের সঙ্গে যোগ দেন। ধীরে ধীরে রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামীর মত মহাপুরুষদের আসন অধিকার করলেন বাবাজীরা; শ্রীচৈতন্যের এই মহান আন্দোলন দ্রুত বিনষ্টির পথে অগ্রসর হচ্ছিল; গত কয়েক বছরে আবার তার পুনরুজ্জীবন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। আশা করি, বৈষ্ণব ধর্ম আবার হৃতগৌরব ফিরে পাবে।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সারা ভারতব্যাপী। যেখানেই ভক্তিমার্গের প্রচলন, সেখানেই তাঁর গুণগ্রাহী, তাঁর বাণী সেখানে পঠিত হয়, সেখানেই তিনি পূজিত হন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সমস্ত বল্লভাচার্য সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়েরই একটি শাখা। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের বঙ্গদেশীয় তথাকথিত শিষ্যরা অনেকেই জানেন না যে তাঁর প্রভাব আজও

সমগ্র ভারতবর্ষে কিভাবে কাজ করে চলেছে। জানবেনই বা কি করে? এই সব শিষ্যরা আজ মঠাধ্যক্ষ (গদীয়ান) হয়েছেন, অথচ তাঁদের গুরু খালি পায়ে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে আচণ্ডাল মিনতি জানিয়েছেন ঈশ্বরকে ভালোবাসতে।

ভারতবর্ষের ধর্মজীবন থেকে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্ন হবার আর একটি কারণ হল এখানকার অদ্ভুত, অশাস্ত্রীয় কুলগুরু প্রথা। সবচেয়ে বড় কারণ হল বাংলাদেশ কখনও মহান সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পায়নি, যাঁরা এমনকি আজও সর্বোচ্চ ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতিভূ। বাংলাদেশের উচ্চ সম্প্রদায় ত্যাগ কখনই পছন্দ করেন না। তাঁরা ভোগে আগ্রহী। অধ্যাত্মিক বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি তাঁরা পাবেন কোথা থেকে? "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মানশুঃ"—অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারাই অমৃতের উপলব্ধি হয়েছিল। এর অন্যথা হবে কি করে?

অপরপক্ষে হিন্দীভাষাভাষীদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে কিছু অত্যন্ত প্রভাবশালী ত্যাগী ধর্মগুরুর আবির্ভাব হয়েছে যাঁরা বেদান্ত দর্শনকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। বিশেষত পাঞ্জাবকেশরী রঞ্জিৎ সিং-এর শাসনকালে ত্যাগের আদর্শে যেভাবে অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল, তার ফলে বেদান্ত দর্শনের সর্বোত্তম শিক্ষায় সর্বনিম্ন সম্প্রদায়ের লোক শিক্ষিত হয়েছিল। পাঞ্জাবী কৃষকমেয়ে প্রকৃতই গর্ব করে বলতে পারতো যে তার চরকাও "সোহম্" "সোহম্" ধ্বনি তোলে। হৃষিকেশের অরণ্যে আমি মেথর ত্যাগীদেরও সন্ন্যাসীর বেশে বেদান্ত পড়তে দেখেছি এবং অনেক উদ্ধত উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকও তাঁদের চরণপ্রান্তে বসে জ্ঞান অর্জন করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করেন। হবে নাই বা কেন? "অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং"—অর্থাৎ নীচু শ্রেণীর লোকের কাছ থেকেও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করা যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে ধর্ম শিক্ষায় উত্তর-পশ্চিম ভারত রয়েছে। বাংলাদেশ, বোম্বাই অথবা মাদ্রাজের তুলনায় অনেক বেশী এগিয়ে রয়েছে। দশনামী, বৈরাগী, পন্থী প্রভৃতি পরিব্রাজক ত্যাগী সম্প্রদায় ধর্মকে প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেন, তার পারিশ্রমিক মাত্র একটুকরো রুটি। তাঁরা কত উদার, কত মোহমুক্ত! স্বাধীন বা কচুপন্থী (যাঁরা কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করেন না) সন্ন্যাসীদের একজন রাজপুতানার সর্বত্র শত শত বিদ্যালয় এবং দাতব্য আশ্রম সমাপন করেছেন। তিনি বনে চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন, হিমালয়ের গিরিসঙ্কটে লৌহসেতু নির্মাণ করেছেন এবং এই মানুষটি কোনদিন একটি পয়সা হাত দিয়ে ছোঁন নি। একটিমাত্র কম্বল ছাড়া তাঁর কোন পার্থিব সম্পদ নেই, এই কম্বলের জন্য তাঁর নাম হয়েছে 'কম্বলী স্বামী'। ঘরে ঘরে তিনি অন্ন ভিক্ষা করেন। কোন একটি বাড়িতে তাঁকে আমি সম্পূর্ণ ভোজন করতে দেখিনি, পাছে গৃহস্বামীর অসুবিধা হয়। বহুজনের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি। আপনারা কি মনে করেন যে যতদিন এইসব মনুষ্যরূপী দেবতারা পৃথিবীতে রয়েছেন এবং চিরকালীন ধর্মকে রক্ষা করছেন তাঁদের দেবতুল্য চরিত্রের দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে, ততদিন প্রাচীন ধর্ম বিলোপ পাওয়া সম্ভব?

আমেরিকায় পাদ্রীরা বছরের ছমাস প্রতি রবিবার দুঘণ্টা ধর্মোপদেশ দেবার জন্য তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ এমনকি নব্বই হাজার টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক বেতন পান।

ধর্মের জন্য এরা লাখ লাখ টাকা খরচ করছে আর আমাদের নব্য বাঙালী যুবকরা জেনেছেন যে কমলী স্বামীর মত সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, দেবতুল্য লোকেরা অলস ভবঘুরে মাত্র! "মদ্ভক্তা নাশ্চ মে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ'।—'যারা আমার ভক্তদের অনুগামী তারাই আমার শ্রেষ্ঠ পূজারী।'

একজন সম্পূর্ণ অজ্ঞ বৈরাগীর দৃষ্টান্তই নেওয়া যাক। তিনিও যখন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান, তখন তুলসীদাস থেকে শুরু করে চৈতন্য চরিতামৃত ও দক্ষিণ ভারতীয় আলোয়ারদের সম্পর্কে তাঁর যা জ্ঞান আছে তাই তিনি গ্রামবাসীদের জানানোর চেষ্টা করেন। এটা কি কিছু সৎকাজ নয়? এ সবের পারিশ্রমিক হিসাবে তিনি এক টুকরো রুটি আর একখণ্ড বস্ত্র ভিক্ষা করেন। এঁদের নির্দয় সমালোচনা করার আগে আমার ভায়েরা চিন্তা করুন, আপনাদের দরিদ্র স্বদেশবাসীর জন্য কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন? যাদের শোষণ করে আপনারা শিক্ষিত হয়েছেন, যাদের নিষ্পেষিত করে সামাজিক সম্মান লাভ করেছেন। 'বাবাজীরা ভবঘুরে মাত্র' এই শিক্ষা দেবার জন্য আপনারা আপনাদের শিক্ষকদের পারিশ্রমিক দেন।

আপনাদেরই স্বদেশবাসী কয়েকজন বঙ্গদেশীয় হিন্দুধর্মের এই পুনরুত্থানকে 'নতুন বিকাশ' আখ্যা দিয়ে সমালোচনা করেছেন। তারা যা খুশী বলুন। কারণ হিন্দুধর্ম সবেমাত্র বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। এতদিন ধর্ম বলতে এখানকার লোকেরা পান-আহার ও বিবাহ-বিষয়ক দেশাচারকেই বুঝতো। রামকৃষ্ণের শিষ্যরা আজ সারা ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তা সদ্‌শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না, সংক্ষিপ্ত পরিসরে এখানে সে আলোচনার সুযোগ নেই; কিন্তু আমাদের সমালোচকদের আমি কিছু আভাস দেব যা থেকে তাঁরা আমাদের অবস্থা সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন।

প্রথমতঃ আমি কখনই বলিনি যে হিন্দুধর্মের প্রকৃত ধারণা পাওয়া যায় কাশীদাস অথবা কৃত্তিবাসের রচনার মধ্যে, যদিও তাঁদের বক্তব্য 'অমৃতসমান' এবং তাঁদের শ্রোতারা 'পুণ্যবান'। কিন্তু আমাদের অবশ্যই মহান বেদজ্ঞ, দার্শনিক ও আচার্যদের এবং সারা ভারতে ছড়ানো তাঁদের শিষ্যদের শরণাপন্ন হতে হবে।

ভ্রাতৃগণ, আপনারা যদি গৌতমের সূত্র দিয়ে শুরু করেন এবং আপ্ত সম্পর্কিত তাঁর মতবাদগুলিকে বাৎস্যায়নের টীকার আলোয় ব্যাখ্যা করেন, শবর ও অন্যান্য ভাষ্য-কারদের সাহায্যে যদি মীমাংসাসূত্র পাঠ করেন, যদি 'অলৌকিক প্রত্যক্ষ' বা অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য উপলব্ধি করেন, আপ্ত কারা এবং সর্বজীবের পক্ষে আপ্ত হওয়া সম্ভব কি না, যদি বোঝেন বেদের সত্যতার প্রমাণ হল যে সেগুলি আপ্তবাক্য, যজুর্বেদের মহিধরের মুখবন্ধ পড়ার অবসর যদি আপনাদের থাকে, তাহলে দেখবেন বেদের সহজতর ভাষ্য খুঁজে পাওয়া যায় মানুষের অন্তর্নিহিত জীবনের নিয়ম-গুলির মধ্যেই; সেজন্যেই বেদ সর্বকালের।

সৃষ্টির অনাদিতত্ত্ব শুধু হিন্দুধর্মের নয়, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মেরও ভিত্তিপ্রস্তর।

বর্তমানে ভারতবর্ষের সমস্ত সম্প্রদায়কেই মোটামুটি জ্ঞানমার্গী ও ভক্তিমার্গী এই দুভাগে ভাগ করা চলে। যদি অনুগ্রহ করে শঙ্করাচার্যকৃত শারীরকভাষ্যের উপক্রমণিকা

পাঠ করেন তাহলে দেখবেন সেখানে জ্ঞানের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে ব্রহ্মোপলব্ধি অথবা মোক্ষলাভ উপচার, শ্রেণী, বর্ণ অথবা তন্ত্রের উপর নির্ভরশীল নয়। সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ নৈতিক সাধনা, অর্থাৎ সাধনচতুষ্টয় যাঁর আছে তিনিই সে জ্ঞান লাভ করবেন। এমন কি বাঙালী সমালোচক-বৃন্দও ভালোভাবে অবগত আছেন সে ভক্তিমার্গের কয়েকজন আচার্য বলেছেন যে মোক্ষলাভের জন্য কোন বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ এমন কি মনুষ্যজন্মেরও প্রয়োজন নেই। ভক্তিই হল একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু।

সবক্ষেত্রেই ভক্তি ও জ্ঞানযোগকে নিঃশর্ত বলা হয়ে থাকে, এবং তার ফলে মোক্ষ-লাভের জন্য জাতি, ধর্ম ইত্যাদির শর্তারোপ কোন ধর্মাচার্যই করেন না। "অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ" এই ব্যাসসূত্রটির যে ব্যাখ্যা শঙ্কর, রামানুজ এবং মধ্ব দিয়েছেন তা লক্ষ্য করবেন।

সমস্ত উপনিষদ, এমনকি সংহিতা পাঠ করে কোথাও মোক্ষের সংকীর্ণ ধারণা খুঁজে পাবেন না, সে ধরনের ধারণা অন্য ধর্মগুলিতে রয়েছে। সহনশীলতার কথা বলতে গেলে তা সর্বত্র রয়েছে, এমন কি যজুর্বেদের সংহিতার চত্বারিংশৎ অধ্যায়ের তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শ্লোকের শুরু হচ্ছে—(যদি আমার সঠিক মনে থাকে)—'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাং।' এই ভাব হিন্দুধর্মের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

যতক্ষণ কেউ সামাজিক বিধিনিয়ম মেনে চলেছে, ততক্ষণ ইচ্ছানুযায়ী ইষ্ট দেবতা বেছে নেবার জন্য, নাস্তিক অথবা অজ্ঞেয়বাদী হবার জন্য ভারতবর্ষে কোন লোককে কি কখনও চরমদণ্ড দেওয়া হয়েছে? কোন সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করার অপরাধে সমাজ কাউকে শাস্তি দিতে পারে, কিন্তু কোন লোক, এমন কি অতি নীচ পতিতের জন্যও মোক্ষলাভের পথ বন্ধ নয়। এ দুটিকে কখনই মিশিয়ে ফেলা চলবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মালাবারে একজন উচ্চবর্ণের লোক যে রাস্তায় যাতায়াত করেন সে রাস্তায় একজন চণ্ডালকে চলাচল করতে দেওয়া হয় না, কিন্তু লোকটি যদি খ্রীষ্টান অথবা মুসলমান হন তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে যে কোন জায়গায় যেতে অনুমতি দেওয়া হবে এবং এই নিয়ম বহু শতাব্দী ধরে একজন হিন্দুরাজার রাজ্যেই চলে এসেছে। অদ্ভুত শোনালেও এ থেকে এমন কি অতি প্রতিকূল অবস্থাতে পরধর্মসহিষ্ণুতার একটা প্রমাণ মেলে।

যে ধারণা হিন্দুধর্মগুলিকে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম থেকে পৃথক করেছে, সে ধারণা ব্যক্ত করার জন্য তপস্বীরা সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষিত করেছেন, তা হল মানুষকে এ জীবনেই ব্রহ্ম উপলব্ধি করতে হবে। অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্যভাবে অদ্বৈতবাদ আরো বলে, "ঈশ্বরকে জানার অর্থ ঈশ্বত্ব লাভ।"

এই মতের ফলস্বরূপ সবচেয়ে উদার ও মহৎ ভাবের আবির্ভাব হয়েছে—শুধু বৈদিক ঋষি, বিদুর, ধর্মব্যাধ ও অন্যান্য প্রাচীন মহাপুরুষরা এই ভাবের কথা বলেছিলেন তা নয়, কিন্তু এই তো সেদিন দাদুপন্থী একজন ত্যাগী তাঁর 'বিচার সাগর' গ্রন্থে সাহসভরে ঘোষণা করলেন: "যাঁর ব্রহ্মোপলব্ধি হয়েছে তিনিই ব্রহ্ম। তাঁর বচনই

বেদ, সংস্কৃত অথবা যে কোন আঞ্চলিক ভাষাতেই বলুন না কেন, তাঁর বাক্য লোকের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করবে।"

অতএব দ্বৈতবাদ অনুসারে ঈশ্বরোপলব্ধি অথবা অদ্বৈতবাদ অনুসারে ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়াই বেদের যাবতীয় উপদেশের মূল লক্ষ্য।

বেদের সমস্ত উপদেশই আমাদের সেই লক্ষ্যে উন্নীত করার সোপানমাত্র। ভগবান ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের মহত্ত্ব হল তিনি ব্যাসের ভাবগুলিকে নিজ প্রতিভাগুণে অপূর্ব ব্যাখ্যা করেছেন। স্বয়ম্ভূ হিসাবে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আপেক্ষিক সত্য হিসাবে একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় অথবা অন্যদেশীয় সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ই সত্য। শুধু কয়েকটি ধর্মসম্প্রদায় অন্যান্যদের তুলনায় উচ্চতর। ধরুন এক ব্যক্তি সোজা সূর্যের দিকে যাত্রা করল। প্রতি পদক্ষেপে সূর্যের নতুনরূপ তার কাছে প্রতিভাত হবে। যতদিন না সেই ব্যক্তি প্রকৃত সূর্যের কাছে পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ নতুন আলো, নতুন আকৃতির বিভিন্ন সূর্য সে দেখবে। প্রথমে সূর্যকে তার একটি বড় গোলক মনে হয়েছিল, তারপর সেই সূর্যের আয়তন ক্রমশ বাড়তে থাকল। আসলে লোকটি যেমন দেখেছিল সূর্য কখনই সেরকম একটি ক্ষুদ্রাকৃতির গোলক নয়; যাত্রাপথে ক্ষণে ক্ষণে সূর্যের যে বিভিন্ন রূপ তার চোখে প্রতিভাত হয়েছিল সূর্য আদপেই সেরকম কিছু নয়। তবুও একথা কি সত্যি নয় যে আমাদের সেই পথিক সবসময় সূর্যকেই দেখে এসেছে, অন্য কিছুকে নয়? সেইভাবে এইসব সম্প্রদায়ই সত্য—কোনটা প্রকৃতসূর্য যাকে আমরা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—অদ্বিতীয় সত্তা বলে থাকে, তার অনেক কাছে, কোনটা অনেক দূরে।

যেহেতু বেদই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা থেকে আমরা এই প্রকৃত পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারি, অন্যান্য ঐশ্বরিক ধারণা যাঁর ক্ষুদ্র ও সীমিত দর্শনমাত্র, যেহেতু 'সর্বলোকহিতৈষিণী' শ্রুতি পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় স্তরগুলির মধ্য দিয়ে উপাসককে অতি সন্তর্পণে নিয়ে যায়। এবং যেহেতু পৃথিবীর অন্য সব ধর্ম এই স্তরগুলিরই এক একটি স্তব্ধগতি, স্থিতিশীল রূপ, সে কারণে বলা চলে যে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম এই নামহীন সীমাহীন, চিরকালীন বৈদিক ধর্মের অন্তর্গত। শত শত জীবন ধরে চেষ্টা করুন, যুগ যুগ ধরে মনের প্রতিটি আনাচে কানাচে খুঁজে দেখুন—এমন কোন মহান ধর্মভাব পাবেন না, যা এই আধ্যাত্মিকতার অনন্ত খনিতে ছিল না।

তথাকথিত হিন্দু পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে আপনাদের একটি কথাই বলবো—প্রথমে অনুসন্ধান করুন এগুলি কিসের বিভিন্ন রূপ এবং জানুন পুরোহিতরা প্রকৃত পূজা করছেন কোথায়, মন্দিরে, প্রতিমায়, না কি তাঁদের আপন দেহমন্দিরে। প্রথমে জানুন তাঁরা কী করছেন—শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশী নিন্দুক এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—তখনই দেখবেন বেদান্ত দর্শনের আলোয় এই পৌত্তলিকা আপনিই ব্যাখ্যাত হবে।

তবুও এইসব কর্ম বাধ্যতামূলক নয়। অপরপক্ষে মনুসংহিতার সেই অংশ দেখুন যেখানে প্রতিটি বৃদ্ধ লোককে (বর্ণাশ্রম ধর্মের) চতুর্থ আশ্রম গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে। বৃদ্ধ সে আশ্রম গ্রহণ করুন বা না করুন, সমস্ত কর্ম তাঁকে পরিত্যাগ করতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে একথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে এইসব কর্ম 'জ্ঞানে পরি-

সমাপ্যতে'—জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয়। সেদিক থেকে বলতে গেলে, অন্যান্য দেশের বহু ভদ্রব্যক্তির তুলনায় একজন হিন্দু কৃষকের ধর্মশিক্ষা অনেক বেশী। জনৈক বন্ধু আমার ভাষণে ইউরোপীয় দর্শনের পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারের সমালোচনা করেছেন। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে পারলে আমি খুশী হতাম। এটি আমার পক্ষে সহজতর হত, যেহেতু ধর্মভাবনার প্রকৃত বাহন হল সংস্কৃত ভাষা। কিন্তু বন্ধুটি ভুলে গিয়েছিলেন যে আমি পাশ্চাত্য শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছি; যদিও জনৈক হিন্দুধর্মপ্রচারক বলেছেন যে হিন্দুরা তাদের সংস্কৃত গ্রন্থগুলির অর্থ বিস্মৃত হয়েছে এবং পাশ্চাত্যের ধর্মপ্রচারকরাই সে অর্থ পুনরুদ্ধার করেছে, তৎসত্ত্বেও পাশ্চাত্য ধর্ম-প্রচারকদের সেই বিশাল সমাবেশে আমি এমন একজনকেও খুঁজে পেলাম না যিনি একটি সংস্কৃত ছত্রও বুঝতে পারেন। অথচ তাঁদের মধ্যে অনেকেই বেদ ও হিন্দুধর্মের অন্যান্য সকল পবিত্র উৎসের সমালোচনা করে অনেক গুরুগম্ভীর নিবন্ধ পড়েছেন।

একথা সত্যি নয় যে আমি কোন ধর্মের বিরোধী। একইভাবে এ ধারণাও অমূলক যে আমি ভারতবর্ষে অবস্থানকারী খ্রীষ্টধর্মপ্রচারকদের বিরোধী। আমি শুধু আমেরিকায় তাঁদের টাকা তোলার কিছু পদ্ধতির প্রতিবাদ করবো। জনৈক হিন্দু জননী তাঁর শিশুসন্তানকে গঙ্গায় কুমীরের মুখে ছুঁড়ে দিচ্ছেন, ছোটদের পাঠ্য-পুস্তকে এ ধরনের ছবি ছাপানোর কী অর্থ? করুণা উদ্রেক করে আরও টাকা পাবার জন্য ছবিটিতে মাকে কালো রঙে ও শিশুটিকে সাদা রঙে চিত্রিত করা হয়েছে। অথবা স্বামী স্ত্রীকে বেঁধে নিজ হাতে পুড়িয়ে মারছে যাতে সে প্রেত হয়ে তার স্বামীর শত্রুদের নিগৃহীত করতে পারে—এ ধরনের ছবিরই বা কী অর্থ? কয়েকদিন আগে এদেশের ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটি বই প্রকাশিত হল, সে বইয়ে একজন ভদ্র-লোক তাঁর কলকাতা ভ্রমণের বৃত্তান্ত দিয়েছেন। তিনি নাকি কলকাতার রাস্তায় বিধর্মীদের উপর গাড়ি চালিয়ে দেওয়া দেখেছেন। এদেরই একজনকে আমি মেমফিসে বলতে শুনেছি যে ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে শিশুকঙ্কালে পরিপূর্ণ একটি পুকুর আছে।

খ্রীষ্টের এইসব শিষ্যদের প্রতি হিন্দুরা কি অন্যায় করেছে যে হিন্দুদের 'ঘৃণ্য', 'শয়তান', সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ 'পিশাচ' বলে সম্বোধন করতে প্রতিটি খ্রীষ্টান শিশুকে নির্দেশ দেওয়া হয়?

এখানকার ছেলেমেয়েদের রবিবাসরীয় বিদ্যালয় শিক্ষাক্রমের একাংশ হল খ্রীষ্টান ছাড়া অন্য যে কোন সম্প্রদায়ের লোককে ঘৃণা করা, বিশেষত হিন্দুদের; যাতে ছোটবেলা থেকেই তাঁরা খ্রীষ্টান মিশনে চাঁদা দিতে শেখে। সত্যের খাতিরে না হোক, অন্তত নিজেদের শিশুদের নৈতিক বোধের খাতিরে, খ্রীষ্টান মিশনারিদের এধরনের শিক্ষাদান বন্ধ করা উচিত। পরবর্তী কালে এইসব শিশুরা যে নিষ্ঠুর, বিবেকহীন নারী-পুরুষে পরিণত হয় এতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে কি? গোঁড়া-পন্থীদের কাছে সেই মিশনারিই সর্বোচ্চ আসনে আসীন যিনি চিরন্তন নরকযন্ত্রণা ও নরকাগ্নি ও গন্ধকের বর্ণনা নিখুঁতভাবে দিতে পারেন। এদেশে পুনরুত্থানবাদী সম্প্রদায় বলে পরিচিত এক গোষ্ঠীর ধর্মপ্রচার শোনার ফলে আমার এক বন্ধুর বালিকা-

বাসীকে পাগলা গারদে পাঠাতে হয়েছিল। মনে হয়, গন্ধক ও নরকাগ্নির মাত্রা তার পক্ষে একটু বেশীই হয়ে পড়েছিল। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ থেকে কি ধরনের বই প্রকাশিত হয় দেখুন।

কোন হিন্দু যদি খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে অমন একটি ছত্রও লেখেন তাহলে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারকরা প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠবেন।

স্বদেশবাসিগণ, এক বছরেরও বেশী আমি এদেশে আছি। এই সমাজের আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে দেখেছি এবং আমার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে এটুকু বলতে পারি যে মিশনারিরা সারা দুনিয়ার কাছে আমাদের শয়তান প্রতিপন্ন করলেও আমরা শয়তান নই এবং দেবদূত হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিলেও ওরা দেবদূত নয়। খ্রীষ্টান-ধর্মপ্রচারকরা হিন্দুধর্মের অপবিত্রতা, শিশুহত্যা এবং হিন্দু বিবাহব্যবস্থার দোষত্রুটি নিয়ে যত কম আলোচনা করবেন ততই তাঁদের পক্ষে মঙ্গল। কতগুলি দেশের আসল ছবি কোথাও না কোথাও আছে যেগুলি হিন্দুসমাজ সম্পর্কে মিশনারিদের এইসব কল্পিত ছবিকে মুছে দিতে পারে। কিন্তু মাইনে-করা গালিবাজ হওয়া আমার জীবনের লক্ষ্য নয়। হিন্দুসমাজ সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক একথা আমি কখনই বলবো না। যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সেখানে আছে, শত শত বছরের দুর্ভাগ্যবশত যে সব অপবিত্রতা দেখা দিয়েছে সেগুলি সম্বন্ধে আমার চেয়েও বেশী ওয়াকিবহাল কেউ নয়। হে আমার বিদেশী বন্ধুগণ, আপনারা যদি প্রকৃত সহৃদয়তা নিয়ে এগিয়ে আসতে চান আমাদের সাহায্য করতে, ধ্বংস করতে নয়, তাহলে ঈশ্বর আপনাদের দ্রুত ভারতবর্ষে প্রেরণ করুন। কিন্তু যদি সময়ে অসময়ে একটি পতিত জাতের মাথায় কটূক্তি বর্ষণ করে আপনারা আপনাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠতার বিজয় পতাকা ওড়াতে চান, তাহলে আমাকে স্পষ্টতই বলতে হবে যে সামান্যতম ন্যায়সঙ্গত বিচারেও তুলনামূলকভাবে নীতিবান জাত হিসাবে হিন্দুরা পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জাতের অনেক ঊর্ধ্বে।

ভারতবর্ষে ধর্মকে কখনও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়নি। নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ইষ্টদেব, গোষ্ঠী অথবা গুরু নির্বাচনের জন্য কোন ব্যক্তিকে জবাবদিহি করতে হয়নি, এবং ধর্মের বিকাশ এখানে যেভাবে হয়েছিল পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তা হয়নি। অপরপক্ষে ধর্মের এই বিভিন্ন অনন্ত রূপের বিকাশের জন্য একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর দরকার ছিল এবং ভারতবর্ষে সমাজকে সেই কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। ফলত সমাজ হয়ে পড়ল সুকঠিন ও অনড়। কারণ স্বাধীনতাই বিকাশের একমাত্র শর্ত। অন্যদিকে পাশ্চাত্যে পরিবর্তনশীল ক্ষেত্রটি ছিল সমাজ এবং ধর্ম ছিল স্থায়ী হিন্দু। বস্তুতই ছিল মূলমন্ত্র এবং এমন কি এখনও এটিই ইউরোপীয় ধর্মের মূলমন্ত্র। প্রতিটি নয়া মতবাদকেই রক্তগঙ্গা পার হয়ে সামান্যতম সুবিধাটুকু আদায় করতে হয়েছে। ফলে এক চমৎকার সামাজিক সংগঠন পাওয়া গেছে, যার ধর্ম কোনদিনই সবচেয়ে স্থূল বস্তুবাদী ধারণার ঊর্ধ্বে ওঠেনি।

আজ পাশ্চাত্য তার নিজের অভাব উপলব্ধি করতে পেরেছে। এবং 'মানুষের যথার্থ স্বরূপ ও আত্মা'—অধুনা এই হল পাশ্চাত্যের অগ্রণী ধর্মবেত্তাদের মূলমন্ত্র। সংস্কৃত

দর্শনের ছাত্র জানেন যে হাওয়া কোনদিক থেকে বইছে, কিন্তু যতক্ষণ সে শক্তি নতুন জীবনের স্পর্শ দেয়, ততক্ষণ তার উৎপত্তিস্থল নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

ভারতবর্ষে নতুন পরিবেশের উদ্ভব হওয়ার ফলে সামাজিক সংগঠনগুলির নতুন বিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। গত শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ থেকে ভারতবর্ষ সমাজসংস্কারক ও সংস্কার-সংগঠনে ছেয়ে গেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল তাদের প্রত্যেকেই ব্যর্থ হয়েছে। আসল রহস্যটি তাদের অজানা ছিল। একটি বিরাট শিক্ষাই তাদের হয়নি। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে তারা আমাদের সমস্ত সামাজিক দোষত্রুটিকে ধর্মের ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছেন, এবং একটি গল্পে বর্ণিত জনৈক ব্যক্তি তাঁর বন্ধুর কপালে বসে থাকা মশাকে মারতে গিয়ে যেমন মারাত্মক আঘাত করে মশা ও বন্ধু দুজনকেই মেরে ফেলেছিল ঠিক সেরকম আঘাতই এইসব সংস্কারকের দল হানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সৌভাগ্যক্রমে তারা শুধুমাত্র অনড় পাথরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে সেই আঘাতেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছেন। এইসব মহৎপ্রাণ নিঃস্বার্থ ব্যক্তিরা, যাঁরা ভুল প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন তাঁরা ধন্য। অতিকায় দানবের ঘুম ভাঙাতে সংস্কার উন্মত্ততার ঐ বৈদ্যুতিক আঘাত দেবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এরা সবাই ছিলেন ধ্বংসকারী, গঠনকারী নয়। সুতরাং সাধারণ মরণশীল লোকেদের মতই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।

আসুন আমরা এদের শুভকামনা করি এবং এদের অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হই। তাঁরা শেখেননি যে সমস্ত কিছুই ভেতর থেকে সৃষ্টি হয়ে বাইরে প্রকাশিত হয়, সমস্ত বিবর্তনই পূর্ববর্তী সঙ্কোচনের প্রসারমাত্র। তাঁরা জানতেন না যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক উপাদানকে একটি বীজ সংমিশ্রিত করতে পারে মাত্র, কিন্তু সে তার নিজের প্রকৃতি অনুযায়ীই অঙ্কুরিত হয়। যতদিন হিন্দুজাত বিলুপ্ত না হচ্ছে এবং এক নতুন জাত এদেশে বসতি না গড়ছে ততদিন এরকম কিছু হওয়া অসম্ভব—প্রাচ্যে প্রতীচ্যে যত চেষ্টাই চলুক না কেন বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ভারতবর্ষ ইউরোপ হতে পারে না। সমস্ত পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা, মহত্ত্বের বৃদ্ধা জননী এই ভারতবর্ষ, যেখানে ঋষিদের চরণচিহ্ন পড়েছে, দেবতুল্য লোকেরা আজও সেখানে বেঁচে রয়েছেন, এই দেশ কি কোনদিন অবলুপ্ত হবে?

হে ভ্রাতৃগণ, সেই অ্যাথেনীয় ঋষির আলোকবর্তিকা চেয়ে নিয়ে আমি আপনাদের অনুসরণ করবো, এ পৃথিবীর সমস্ত শহর, গ্রাম, অরণ্যানী, সমতল প্রান্তর ঘুরে বেড়াবো—শুধু এধরনের মহৎপ্রাণ, দেবতুল্য লোক অন্য কোনদেশে রয়েছেন আমাকে দেখিয়ে দিন। একথা ঠিক যে ফলেই বৃক্ষের পরিচয়।

ভারতবর্ষের প্রতিটি আমগাছে নীচে পড়ে থাকা, অপক্ক, কীটদষ্ট আম ঝুড়ি ঝুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে তাদের প্রতিটির বিষয়ে শত শত গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেও একটি আমের সঠিক বর্ণনাও আপনি দিতে পারবেন না। কিন্তু একটি সুপক্ক, সুমিষ্ট আম গাছ থেকে পাড়লে, আপনি জানতে পারবেন আম জিনিসটি প্রকৃতপক্ষে কি রকম।

একইভাবে এইসব মনুষ্য-দেবতারা হিন্দুধর্মের প্রকৃতস্বরূপ প্রকাশ করেন। হাজার হাজার বছরের ঝঞ্ঝা সহ্য করে যে জাতি আজও চিরকালীন তারুণ্যের উদ্দীপনা অক্ষত

রাখতে পেরেছে, শতাব্দীর পরিমাপে যে জাতি সংস্কৃতির মূল্যায়ন করে, সেই জাতির চরিত্র, ক্ষমতা ও সম্ভাবনাগুলিকে তুলে ধরেন এই দেবতুল্য ব্যক্তিরা।

ভারতবর্ষ কি লুপ্ত হবে, তাহলে সারা বিশ্ব থেকে আধ্যাত্মিকতা নিশ্চিহ্ন হবে, নিশ্চিহ্ন হবে সব নৈতিক উৎকর্ষ, ধর্মের প্রতি সুমধুর সহানুভূতি, সমস্ত আদর্শবাদ।

তার জায়গায় যুগ্ম দেবদেবীরূপে কাম ও বিলাসিতা রাজত্ব চালাবে, অর্থ যার পূজারী, শঠতা, হিংসা ও প্রতিযোগিতা যার উৎসব এবং মানব-আত্মা যার বলি। এ কখনও হতে পারে না। কষ্টসহিষ্ণুতা কর্মক্ষমতার তুলনায় অনেক বড়ো। ভালোবাসার শক্তি, ঘৃণার শক্তির তুলনায় অনেক ক্ষমতাসম্পন্ন। যাঁরা ভাবছেন যে হিন্দুধর্মের বর্তমান নবজাগরণ আসলে দেশাত্মবোধের প্রকাশ মাত্র তাঁরা ভ্রান্ত।

আসুন প্রথমে সেই অপূর্ব বিষয়টির পর্যালোচনা করা যাক।

এটি কি কৌতূহলোদ্দীপক নয় যে আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার তুরন্ত্ অগ্রগতির চাপে যখন পাশ্চাত্যের প্রাচীন গোঁড়া ধর্মের দুর্গ ধূলিসাৎ হচ্ছে; যখন ধর্মবিশ্বাস অথবা চার্চ সমিতির সম্মতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রণালীর কাঁচপাত্রগুলি এই বিজ্ঞানেরই হাতুড়ির ঘায়ে চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে, পাশ্চাত্য ধর্মতত্ত্ব যখন আক্রমণোদ্যত আধুনিক ভাবনার বিরামহীন স্রোতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না, যখন অন্যান্য সমস্ত ধর্মপুস্তক আধুনিক চিন্তার চাপে তাদের মূলগ্রন্থগুলির বিস্তৃত ও উদার ব্যাখ্যা খুঁজে বার করতে বাধ্য হয়েছে, এবং এই প্রচেষ্টা করতে গিয়ে তাদের অধিকাংশই যখন খণ্ডিত হয়ে অকেজো জিনিসের ভাঁড়ারে জমা পড়ছে; পাশ্চাত্যের অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তি চার্চের সঙ্গে সমস্ত ছিন্ন করে অশান্তি-সমুদ্রে দিশাহারা হয়ে যখন ভেসে বেড়াচ্ছেন—সেই সময়, বৈদিক আলোক-ঝর্ণার জীবনসুধা পান করেছিল যে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম, শুধু তারাই কেন পুনরুত্থিত হচ্ছে?

পাশ্চাত্যের অস্থির নাস্তিক অথবা অজ্ঞেয়বাদীরা একমাত্র গীতা অথবা ধর্মপদেই তাঁদের আত্মার আশ্রয়সম্বল খুঁজে পেয়েছেন। অদৃষ্ট চক্রের গতি পরিবর্তিত হয়েছে এবং যে হিন্দু সাশ্রুনয়নে তার নিজ বাসভূমি শত্রুর হাতের প্রজ্জ্বলিত আগুনে পুড়তে দেখেছে, আধুনিক চিন্তার অনুসন্ধানী আলো সেই আগুনের ধোঁয়া অপসারিত করার পর সেই হিন্দুই চেয়ে দেখছে যে তার বাসভূমি আজও সমস্ত শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্যান্য অট্টালিকাগুলি হয় ধ্বংস হয়েছে, অথবা হিন্দু পরিকল্পনার ছাঁচে নতুনভাবে তৈরী হয়েছে। আজ সে চোখের জলে মুছে নিয়ে দেখছে যে কুঠার 'ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ অশ্বত্থের' মূলোচ্ছেদ করতে উদ্যত হয়েছিল সেটি শল্যচিকিৎসকের রোগহর ছুরির কাজই করেছে।

সে বুঝেছে যে তার ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য কোন শাস্ত্রের বিকৃতার্থ করার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই অসাধু বুদ্ধির। শুধু তাই নয়, সে তার শাস্ত্রের দুর্বল অংশকে দুর্বলই বলতে পারে; কারণ অরুন্ধতী দর্শন ন্যায় তত্ত্বানুযায়ী সমাজের দুর্বল-শ্রেণীকে সাহায্য করার জন্যই ঐগুলিকে প্রাচীন ঋষিরা সৃষ্টি করেছিলেন। যাঁরা এই সর্বব্যাপী সদাবিস্তারশীল ধর্মপদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন—যে পদ্ধতি জড়জগতে যা কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে অথবা যা কিছু আবিষ্কৃত হবে সমস্ত কিছুকেই ঠাঁই দিতে

পারে—সেইসব প্রাচীন ঋষিরা ধন্যবাদার্হ। আধুনিক হিন্দু সেইগুলিকে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে এবং এই তথ্য আবিষ্কার করতে পেরেছে যে, যেসমস্ত আবিষ্কার ধর্মসম্প্রদায়ের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্রতার পক্ষে মারাত্মক প্রমাণিত হয়েছিল বুদ্ধি ও চেতনজগতে যা পুনরাবিষ্কার মাত্র, সেগুলি তার পূর্বপুরুষদের বহু যুগ আগে ধ্যানলব্ধ তুরীয় অবস্থায় অতীন্দ্রিয় জগতের প্রাপ্ত সত্য। সুতরাং কোন কিছুই তাকে ত্যাগ করতে হবে না, অন্য কোথাও অন্য কিছুরই সন্ধানে যেতে হবে না। যদি সে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই অশেষ জ্ঞানভাণ্ডারের যৎসামান্যও তার প্রয়োজনে সদ্ব্যবহার করতে পারে, তাহলে তাই তার পক্ষে যথেষ্ট হবে। এখন সে তাই করতে শুরু করেছে এবং আগামী দিনে আরও বেশী পরিমাণে করবে। এইটিই কি বর্তমান পুনরুত্থানের প্রকৃত কারণ নয়? বাংলার নব্যযুবকেরা, আপনাদের কাছে আমি সবিশেষ আবেদন জানাচ্ছি ভায়েরা, লজ্জার কথা হলেও আমরা জানি, যে-সমস্ত প্রকৃত দোষের জন্য বিদেশীরা হিন্দুজাতির অবমাননা করে, তার জন্য একমাত্র দায়ী আমরাই। অন্যান্য ভারতীয় সম্প্রদায়ের উপর অনেক অসঙ্গত কুৎসার বোঝা চাপানোর কারণ আমরাই। কিন্তু ঈশ্বর মহিমাময়, আমরা আজ আমাদের ভুল সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছি, এবং তাঁর আশীর্বাদে আমরা শুধু নিজেদেরই বিশুদ্ধ করবো না, সনাতন ধর্মের আদর্শগুলি রূপায়িত করতে সমস্ত ভারতবর্ষকে সাহায্য করবো।

ক্রীতদাসের কপালে প্রকৃতি সবসময় একটি চিহ্ন অঙ্কিত করেন, তা হল—ঈর্ষার কলঙ্ক; আসুন আমরা সেই চিহ্নটিকে প্রথমেই মুছে ফেলি। কাউকেই হিংসা করবেন না। প্রত্যেক সৎকর্মে ব্রতীকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়াতে প্রস্তুত থাকুন। তিন জগতের প্রত্যেকের জন্য শুভচিন্তা প্রেরণ করুন।

আসুন, আমরা আমাদের ধর্মের মূল সত্যের ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হই, সে সত্য বৌদ্ধ, জৈন নির্বিশেষে সমস্ত হিন্দুরাই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। সেই সত্য হল মানুষের আত্মা, যে আত্মা অবিনশ্বর, সর্বব্যাপী, যার জন্ম নেই, যার মহিমা বেদও প্রকাশ করতে অক্ষম, যার মহিমার কাছে সূর্য, নক্ষত্রপুঞ্জ, নীহারিকামণ্ডলী সমন্বিত এই বিশ্বপ্রকৃতি একটি বিন্দুর সমতুল্য। প্রতিটি নারী-পুরুষ, এমন কি সর্বশ্রেষ্ঠ দেবগণ থেকে শুরু করে আমাদের পায়ের নীচে যে কীট ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রত্যেকেই এরকম একটি আত্মার বর্ধিত অথবা ক্ষুদ্র সংস্করণ। পার্থক্য প্রকারগত নয়, পরিমাণগত।

আত্মার এই অসীম শক্তি জড়ের উপর প্রভাব বিস্তার করলে পার্থিব উন্নতি হয়, চিন্তাকে প্রভাবিত করলে, বুদ্ধিবৃত্তির জন্ম হয়, এবং আত্মা নিজেকে প্রভাবিত করলে মানুষকে ঈশ্বরে রূপান্তরিত করে।

আসুন সর্বপ্রথম আমরা নিজেরা ঈশিত্ব অর্জন করি। তারপর অন্যদের দেবতা হয়ে উঠতে সাহায্য করবো। 'নিজে পূর্ণ হও এবং অন্যকে পূর্ণ কর'—এই যেন আমাদের ব্রত হয়। মানুষ পাপী একথা বলবেন না। বলুন সে ঈশ্বর। শয়তানের অস্তিত্ব যদি থেকেও থাকে, তাহলে আমাদের কর্তব্য হবে সর্বদা ঈশ্বরকে স্মরণে রাখা, শয়তানকে নয়।

ঘর যদি অন্ধকার হয়, তাহলে সেই অন্ধকারকে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করে, তার-জন্য বারবার ক্ষোভ প্রকাশ করলে অন্ধকার অপসৃত হবে না—বরং আলো আনুন। আসুন আমরা উপলব্ধি করি যে, যা কিছু নঙর্থক, বিধ্বংসী, যা কিছু শুধু সমালোচনা মাত্র, তা সবই বিদায় নিতে বাধ্য। একমাত্র সদর্থক, গঠনমূলক বস্তুই অমর, চিরস্থায়ী। আসুন আমরা বলি "আমরা সৎস্বরূপ", "ঈশ্বর সৎস্বরূপ" এবং "আমরাই ঈশ্বর", "শিবোহম্", "শিবোহম্"—এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে এগিয়ে চলুন। জড় নয়, চৈতন্যই আমাদের লক্ষ্য। যা কিছুর নাম ও আকৃতি রয়েছে তা সবই নিরাকারের অধীনস্থ। এই চিরসত্যই শ্রুতি শিক্ষা দিয়েছে। আলো আনুন, অন্ধকার আপনা হতে দূরীভূত হবে। বেদান্তের সিংহ গর্জন করুক—শৃগালরা তাদের গর্তে প্রবেশ করবে। ভাবনাগুলিকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরুন। ফল আপনিই মিলবে। রাসায়নিক পদার্থগুলিকে একত্রিত করুন, সেগুলি আপনা হতেই জমাট বাঁধবে। চৈতন্যের শক্তি আনুন, ভারতবর্ষের সমস্ত কোণে কোণে তা ছড়িয়ে দিন; কাঙ্ক্ষিত বস্তু আপনা-আপনিই আসবে।

নিজের মধ্যে যে দেবত্ব রয়েছে তাকে প্রকাশ করুন, সবকিছু ছন্দোবদ্ধভাবে তার চারপাশে জড় হবে। বেদে বর্ণিত ইন্দ্র ও বীরোচনের উদাহরণ স্মরণ রাখবেন, দুজনকেই তাঁদের দেবত্ব সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। বীরোচন দেহকেই তার ঈশ্বর মনে করলো। কিন্তু দেবতা হবার জন্য ইন্দ্র বুঝলেন যে আত্মার কথাই বলা হচ্ছে। আপনারা ভারতবর্ষের সন্তান। আপনারা দেবতার বংশধর। জড় কখনও আপনাদের ব্রহ্ম হতে পারে না; দেহ কখনও আপনাদের ব্রহ্ম হতে পারে না।

ভারতবর্ষ পুনরুত্থিত হবে, তবে দৈহিক শক্তির বলে নয়, আধ্যাত্মিক শক্তির বলে; ধ্বংসের পতাকা হাতে নিয়ে নয়, শান্তি, প্রেমের পতাকা নিয়ে, সন্ন্যাসীর গৈরিক বসনের সহায়তায়। ধনবলে নয়, ভিক্ষাভাণ্ডের মহিমায়। নিজেকে দুর্বল বলবেন না। আত্মা সর্বশক্তিমান। মুষ্টিমেয়, কতকগুলি যুবকের কথা ভাবুন, ভগবান রামকৃষ্ণের দিব্য চরণস্পর্শে যাঁদের অভ্যুদয় হয়েছে। আসাম থেকে সিন্ধু পর্যন্ত, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করেছেন। হিমালয়ের কুড়ি হাজার ফিট শৃঙ্গ অতিক্রম করে, বরফের উপর দিয়ে হেঁটে, তিব্বতের রহস্য ভেদ করেছে। তারা তাদের রুটি ভিক্ষা করেছে, বস্ত্রখণ্ড দিয়ে নিজেদের আচ্ছাদিত করেছে; তাদের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, পুলিশ তাদের অনুসরণ করেছে, হাজতবাস করতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সরকার তাদের নির্দোষিতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়ে ছেড়ে দিয়েছেন।

এখন তাদের সংখ্যা কুড়ি। আগামীকাল যাতে এই সংখ্যাকে দুহাজারে পরিণত করা যায় সে চেষ্টা করুন। বাংলার নবযুবকগণ, এ প্রয়োজন আপনাদের দেশের, এ প্রয়োজন সমস্ত পৃথিবীর। যে দেবত্ব আপনাদের অন্তর্নিহিত রয়েছে তাকে জাগ্রত করুন। এই শক্তিই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তাপ, শৈত্য সহ্য করতে আপনাদের সাহায্য করবে। বিলাসবহুল ঘরে বসে, জীবনের সমস্ত আরামে পরিবৃত হয়ে, সামান্য সখের ধর্ম করা বিদেশীদের পক্ষে ভালো হতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের একটি

উচ্চতর অনুভূতি রয়েছে। সে সহজেই মুখোশ ধরে ফেলে। আপনাদের ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ ছাড়া কোন মহৎকাজ সম্পাদিত হয় না। এই পৃথিবীর সৃষ্টির জন্য পরমপুরুষ স্বয়ং নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। আপনাদের সুখশয্যা ত্যাগ করুন, নাম সম্মান প্রতিপত্তির মোহ ত্যাগ করুন, শুধু তাই নয় জীবন উৎসর্গ করুন, এবং মানুষের সঙ্গে মানুষকে গ্রন্থিবদ্ধ করে এক বিশাল সেতু নির্মাণ করুন যা দিয়ে জীবন-সমুদ্র পাড়ি দেওয়া যায়। সমস্ত শুভশক্তিকে একত্রিত করুন, কোন ধর্মপতাকার নীচে আপনি রয়েছেন তা দেখা নিষ্প্রয়োজন। আপনার রঙ সবুজ, নীল, লাল যাই হোক না কেন তা নিয়ে ভাবনার কিছু নেই, সমস্ত রঙ মিলিয়ে তীব্র উজ্জ্বল সাদা রঙ তৈরী করুন, যা প্রেমের রঙ। আমাদের কাজ করতে হবে। ফল যা হবার তা আপনি হবে। আপনার দেবত্ব লাভের পথ যদি কোন সামাজিক নিয়ম রুদ্ধ করে, তাহলে আত্মার শক্তির কাছে সে মাথা নত করতে বাধ্য। আমি ভবিষ্যতের দিকে তাকাই না, তাকাতে চাইও না। কিন্তু জীবনের মতই স্বচ্ছ একটি কল্পনা আমি স্পষ্ট দেখতে পাই : সেই পুরাতনী মাতা আবার জাগ্রত হয়েছেন, তাঁর নবনির্মিত সিংহাসনে উপবেশন করেছেন, পূর্বাপেক্ষা অনেক মহিমান্বিতা হয়ে। শান্তি ও আশীর্বাদের সঙ্গে তাঁর নাম সমস্ত বিশ্বে প্রচারিত করুন।

কর্মে ও প্রেমে আপনাদের চিরকালের
বিবেকানন্দ

জনৈক বন্ধুকে প্রেরিত সান্ত্বনাবার্তা

"মাতৃগর্ভ হতে আমি উলঙ্গ এসেছি এবং সেখানে ফিরবো উলঙ্গ হয়ে, ঈশ্বর যা দিয়েছিলেন তা তিনিই ফিরিয়ে নিয়েছেন। ঈশ্বরের মহিমা অক্ষয় হোক।" মানুষের পক্ষে সবচেয়ে পীড়াদায়ক দুর্দৈবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন সেই প্রাচীন ইহুদী সাধু (Job) এবং কোন ভুল তিনি করেননি। অস্তিত্বের সমস্ত রহস্য এখানেই নিহিত। সমুদ্র তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হতে পারে এবং ঝড়ের গর্জনও শোনা যাবে, কিন্তু একদম গভীরে রয়েছে চিরশান্তি, অসীম শুদ্ধতা, অসীম আনন্দ। "যারা শোকসন্তপ্ত তারা ভাগ্যবান, কারণ তারা শান্তি পাবে।" কেন? কারণ এই তীব্র যন্ত্রণার সময় পিতামাতার আর্তনাদ উপেক্ষা করে এক অদৃশ্য শক্তি হৃদয়কে মথিত করে, যখন দুঃখ, শূন্যতা, হতাশার ভারে পায়ের তলা থেকে পৃথিবীর মাটি উধাও হয়, এবং সমস্ত দিগন্তকে যখন দুর্ভেদ্য যন্ত্রণা ও সম্পূর্ণ নৈরাশ্যের একখণ্ড পাত বলে মনে হয়—তখনই অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলিত হয়, অকস্মাৎ আলো জ্বলে ওঠে, স্বপ্ন মুহূর্তেই উধাও হয়, এবং স্বতঃলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা সুন্দর রহস্য—অস্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়াই।

হ্যাঁ, ঠিক তখনই। যখন হৃদয়ের ভার অনেক দুর্বল তরীকে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম, সেই মুহূর্তেই প্রতিভাবান ব্যক্তি যিনি শক্তিমান, আদর্শপুরুষ, উপলব্ধি করেন সেই অসীম, সদামঙ্গলময় সচ্চিদানন্দকে, আদি অন্তহীন পুরুষ যিনি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে পূজিত হয়ে থাকেন। যে শৃঙ্খল আত্মাকে দুর্দশার গহ্বরে বন্দী করে রেখেছিল এই আঘাতের মুহূর্তেই তা ভেঙে যায়, মুক্ত আত্মা তখন ধীরে ধীরে উর্ধ্বলোকে আরোহণ করতে থাকে যতক্ষণ না সে ঈশ্বরের রাজ্যে পৌঁছায়, 'যেখানে অসাধু ব্যক্তিরা উপদ্রব করে না এবং শ্রান্তরা বিশ্রাম লাভ করে।' ভায়া, দিনরাত প্রার্থনা করা বন্ধ কোর না। দিনরাত একথা বলতে ভুলো না—"তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"

"কেন'র প্রশ্ন আমাদের নয়
কর্মে ও মরণেই আমাদের অধিকার।"

হে ভগবান তোমার মহিমা শাশ্বত হোক এবং তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমরা জানি যে আত্ম-সমর্পণ আমাদের করতেই হবে; প্রভু আমরা জানি যে মাতৃরূপিণী তোমার দুই হাতই আমাদের আঘাত করছে 'আত্মা চায় আত্মসমর্পণ কিন্তু দেহ দুর্বল'। হে প্রেমময় পিতা, হৃদয়ের যন্ত্রণা তোমারই শেখানো শান্ত সমর্পণ-নীতির বিরুদ্ধতা করছে।

তুমি আমাদের বল দাও। হে প্রভু তোমার নিজবংশকে চোখের সামনে ধ্বংস হতে দেখেও তুমি নির্লিপ্তভাবে বসেছিলে। হে প্রভু, মহান শিক্ষক, তোমাকে আমরা আহ্বান করি, তুমি আমাদের শিখিয়েছো যে সৈনিক শুধু নিঃশব্দে আজ্ঞা পালন করবে। এসো প্রভু, এসো পার্থসারথি—আমাদের দাও সেই শিক্ষা যে শিক্ষা মহাবীর অর্জুনকে দিতে গিয়ে তুমি বলেছিলে যে তোমাতে আত্মসমর্পণই হল এ জীবনে

শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। যাতে তোমার বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাচীনকালের মহাপুরুষদের সঙ্গে আমিও দৃপ্তচিত্তে, সম্পূর্ণ নিবেদিত প্রাণে বলতে পারি—ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু। প্রভু তোমাকে শান্তি দিন, দিবারাত্র এই প্রার্থনা জানাই—

বিবেকানন্দ

ভক্তিযোগ

প্রার্থনা

স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায়॥
যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবং মাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥

'তিনি বিশ্বাত্মা; তিনি অমর, তিনি অধিকর্তা, অনুশাসক, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বত্র-বিরাজমান এবং বিশ্বের রক্ষাকর্তা; তিনি নিত্যশাসক। বিশ্বকে চিরকাল শাসন করার মতো যোগ্যতা আর কারো নাই।

'তিনিই সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মাকে (বিশ্ব-চেতনাকে) জন্ম দিয়েছেন, এবং তিনিই তাঁর কাছে বেদাদি প্রকাশ করেছেন; মুক্তিসন্ধানে আমি আশ্রয় চাইছি জ্যোতির্ময়ের সেই স্বয়ং একের মধ্যে—যার দ্যুতি বোধকে আত্মার অভিমুখে পরিচালিত করে।'

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৭-১৮ শ্লোক)

ভক্তির সংজ্ঞা

প্রকৃত ও একনিষ্ঠ অনুসন্ধানই হল ভক্তিযোগ। এই অনুসন্ধানের সূত্রপাত, ক্রমধারা ও সমাপ্তি হয় প্রেমে। ঈশ্বরের জন্য চূড়ান্ত 'প্রেমোন্মাদনার একটি মুহূর্তই এনে দেয় মুক্তি।·· নারদ তাঁর 'ভক্তি-সূত্রের ব্যাখ্যায় বলেন—"ভক্তি হল ঈশ্বরের প্রতি আত্যন্তিক প্রেম। মানুষ তা লাভ করলে সকলকেই ভালোবাসে, কাউকেই ঘৃণা করে না, এবং পায় চিরতৃপ্তি।" "পার্থিব লাভালাভের মধ্যে এই ভালবাসাকে সীমিত করা যায় না।" কারণ, পার্থিব কামনা থাকা পর্যন্ত ঐ ভালোবাসা জন্মাতে পারে না। "ভক্তি হল কর্মের চেয়ে বড়, যোগের চেয়ে বড়; কারণ কর্ম ও যোগ কোনো না কোনো লক্ষ্যের অভিমুখীন হয়ে থাকে, আর ভক্তি স্বপ্রকাশেই হয় লক্ষ্য ও পথ দুই-ই।"

আমাদের ঋষিদের জীবনে ভক্তিই ছিল নিত্য এক বিষয়। শাণ্ডিল্য বা নারদের মতো ভক্তিসম্বন্ধীয় বিশেষ লেখকবৃন্দ ছাড়া ব্যাস-সূত্রাদির মহাভাষ্যকার জ্ঞানপন্থীগণও প্রেম প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা বড়ই অর্থপূর্ণ। এক ধরনের শুষ্কজ্ঞান পরিবেশনের উদ্দেশ্যে ভাষ্যকার যখন শাস্ত্রাদির সর্বাংশকে না হলেও অধিকাংশকে ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, তখনো উপাসনা অধ্যায়ের সূত্রসমূহের ক্ষেত্রে ঐভাবে অগ্রসর হওয়াটা সহজ হয় না।

লোকে সময় সময় ভেবে থাকে জ্ঞান ও ভক্তিতে পার্থক্য আছে, কিন্তু প্রকৃতই তেমন পার্থক্য নেই। আমরা ক্রমান্বয়ে দেখতে পাব, দুটোই শেষ পর্যন্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে একটা জায়গায় এসে মিলে যায়। রাজযোগের বেলায়ও ঠিক তাই হয়, এবং তা মুক্তি প্রাপ্তির উপায়রূপে অনুসরণ করলে (পণ্ডিত-মূর্খ ভেল্কিবাজদের ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যবশত যে রকমটা প্রায়ই হয়ে থাকে) আমাদের ঠিক সমলক্ষ্যেই পৌঁছে দেয়।

ভক্তির সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয় তা মহান অধ্যাত্ম লক্ষ্যে পৌঁছবার সবচেয়ে সহজ স্বাভাবিক পন্থা। অন্যদিকে, এর সবচেয়ে বড় অসুবিধাটা হল, এই ভক্তিই নিম্নস্তরে অবস্থান করে প্রায়ই ঘৃণার্হ উন্মাদনায় পর্যবসিত হয়। এই উন্মাদ ধরনের হিন্দু-মুসলমান কি খ্রীষ্টান লোকেরা কেবলমাত্র নিম্নস্তরের ভক্তদের মধ্য থেকেই এসে থাকে। প্রিয়বস্তুর প্রতি নিষ্ঠায় একাগ্রতা ছাড়া যে যথার্থ প্রেমের উদয় হতে পারে না, তাই আবার অন্যসব কিছুই পরিবর্জনের কারণ হয়ে ওঠে। প্রত্যেক ধর্মে, কি প্রত্যেক দেশে দুর্বল ও অপরিণত মন শুধু তাদের নিজ নিজ আদর্শকেই ভালোবাসার জন্য একমাত্র যে-পথ গ্রহণ করে থাকে তা হল অন্যদের আদর্শকে ঘৃণা করা। এতেই এই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যে-লোক ভগবান সম্পর্কে আন্তরিকভাবে বড়ই একনিষ্ঠ, সেই লোকই অন্য আদর্শের ব্যাপার দেখা বা শোনা মাত্রই কেন চিৎকার করে উন্মাদ হয়ে ওঠে। এই ধরনের প্রেম অনেকটা যেন অন্যের অনধিকার থেকে প্রভুর সম্পত্তি রক্ষা করার জান্তব প্রবৃত্তিবিশেষ, তবে কিনা শ্ব-বৃত্তি (কুকুরের বৃত্তি) ঐ প্রকৃতির মনুষ্যের যুক্তিবোধের চেয়ে বরং ভালোই। কারণ, মানব যে বেশেই তার সামনে আসুক না, কুকুর তাকে শত্রু বলে কখনোই ভুল করে না। তাছাড়া, উন্মাদ লোক সবরকম

বিচারবোধই হারিয়ে ফেলে, তার একান্ত ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনাই তাকে এমনভাবে অধিকার করে রাখে যে অন্ত কোনো লোক যা বলছে তা সত্য কি মিথ্যা তা তার কাছে একটা প্রশ্নই নয়,—তার একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয় : যে বলছে সে কে ? স্বয়তে যে লোক দয়ালু সজ্জন ও সাধু এবং প্রেমিকস্বভাব, সেই লোকই জঘন্যতম কাজ করতে দ্বিধা করে না—যদি সে কাজ তার ভ্রাতৃমণ্ডলীর বাইরের লোকের উপরে করা হয়।

তবে এহেন বিপদ বর্তমান থাকে ভক্তির প্রাথমিক বা 'গৌণী' অবস্থায় মাত্র। ভক্তি যখন পূর্ণতা বা পক্বতা প্রাপ্ত হয়ে পরা-স্তরে ওঠে, তখন আর ঐ রকম উন্মাদ ধরনের জঘন্য দশা দেখা দেবার আশঙ্কা থাকে না ; উচ্চমার্গের ভক্তিদ্বারা উদ্বোধিত হলে আত্মা প্রেমময় ঈশ্বরের এত কাছে গিয়ে পৌঁছায় যে সেখানে ঘৃণার উদ্গীরণ আর সম্ভব নয়।

আমাদের সকলের পক্ষেই এই জীবনে আমাদের চরিত্রকে সুসমঞ্জসরূপে গঠন করা হয়ে ওঠে না ; তবু আমরা জানি যে চরিত্রে জ্ঞান প্রেম ও যোগ—এই তিনের সুষম মিলন ঘটেছে সেই চরিত্রই হল সবচেয়ে মহৎ। পাখিদের উড়বার জন্য দরকার হয় তিনটি জিনিসের : দুটি ডানা ও একটি লেজ। জ্ঞান হল এক ডানা, ভক্তি হল আর এক ডানা, এবং ভারসাম্য রক্ষার জন্য হল যোগ। যারা উপাসনার ব্যাপারে এই তিনটি দিককেই সুসমঞ্জস ভাবে গ্রহণ করতে পারে না—কেবলমাত্র ভক্তিকেই একমাত্র পন্থা-স্বরূপ অবলম্বন করে তাদের সর্বদাই মনে রাখা দরকার, আকার প্রকার ও নিয়মকানুন—এসব অগ্রসর আত্মার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হলেও তার একমাত্র মূল্য হল তারা আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি সুনিবিড় প্রেম অনুভব করার মতো অবস্থা সৃষ্টি করে।

জ্ঞানগুরু ও প্রেমগুরু—এই দুই দলই ভক্তির শক্তি স্বীকার করেন, তাঁদের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নাই। জ্ঞানীরা ভক্তিকে আশ্রয় করেন মুক্তির উপায়রূপে, এবং ভক্তরা ভক্তিকে দেখেন উপায় ও লক্ষ্য এই দুইরূপেই। আমার মনে হয়, দুটোর মধ্যে পার্থক্য বেশী কিছু নয়। বস্তুত, ভক্তি যখন উপায়রূপেই গৃহীত হয় তখন তা হয় নিম্নস্তরের অধিকার। আর, পরবর্তী ধাপে উচ্চস্তর এই নিম্নস্তরবোধ থেকে অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে। প্রত্যেকেই কিন্তু নিজ নিজ আরাধনা-পদ্ধতির উপর বিশেষ জোর দিয়ে থাকে, ভুলে যায় যে পূর্ণ-প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সত্য দেখা দেবেই—এমন কি অযাচিত ভাবে। আর, ঐ রকম পূর্ণজ্ঞান থেকে প্রকৃত প্রেমকে পৃথক করা যায় না।

একথা মনে রেখে, আসুন, আমরা বুঝতে চেষ্টা করি এ বিষয়ে মহান বৈদান্তিক ভাষ্যকারগণ কী বলেন। 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' সূত্র ব্যাখ্যায় ভগবান শঙ্কর বলছেন—"এইভাবে লোকে বলে থাকে, লোকটি রাজার অনুরক্ত বা গুরুর অনুরক্ত' ; তার সম্পর্কেই এমনটা বলা হয়ে থাকে—সে গুরুর অনুসরণ করে, এবং ঐ অনুসরণকেই একমাত্র লক্ষ্যরূপে বরণ করে। অনুরূপ ভাবে লোকে বলে—'সতীনারী ধ্যান করে তার স্বামীকে' ; এখানেও একপ্রকার আগ্রহপূর্ণ ও বিরামহীন স্মরণকেই বোঝানো হয়ে থাকে।" শঙ্করের মতে এটা হল ভক্তি।

"আবার, একপাত্র থেকে অন্যপাত্রে প্রবাহিত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো এক নিত্য-নিয়ত স্মরণই হল ধ্যান। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই রকম স্মরণ যখন অধিকারে আসে, সব বন্ধনই খুলে যায়। সেইহেতুই শাস্ত্রে বলেছে নিয়ত স্মরণই হল মুক্তির উপায়। আর, এই স্মরণ হল দর্শনতুল্য, কারণ উক্ত অর্থই এই বাক্যে প্রস্ফুট রয়েছে: 'তাঁকে যখন দূরে ও কাছে দেখা যায়, তখন হৃদয়ের সব বন্ধনই খুলে পড়ে, বিদূরিত হয় সমস্ত সন্দেহ, নিশ্চিহ্ন হয় সব কর্মফল।' যে নিকটে আছে তাঁকে দর্শন করা যায়, কিন্তু যে দূরে আছে তাকে কেবলমাত্র স্মরণ করা যায়। যেদিক থেকেই হোক শাস্ত্র বলে—আমাদের নিকটের যিনি এবং দূরের যিনি তাঁকে দর্শন করতে হবে। তার অর্থ, উল্লিখিত স্মরণ ও দর্শন একই রকম। এই স্মরণই উদ্ভাসিতরূপে হয়ে ওঠে দর্শন। শাস্ত্রগ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকে দেখা যায় আরাধনা হল সতত স্মরণ। যে জ্ঞানপ্রক্রিয়া হল বারংবার আরাধনা সদৃশ তাকেই বলা হয়েছে সতত স্মরণ··· এইভাবে যে স্মরণ প্রত্যক্ষ দর্শনের মতো উচ্চস্তরে উঠে যায় তাকেই শ্রুতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে মুক্তির উপায়স্বরূপ। 'এই আত্মায় পৌঁছান যায় না বিচিত্র বিজ্ঞানের সহায়তায়, বুদ্ধির সহায়তায় বা বেদাধ্যয়ন দ্বারা। যে এই আত্মাকে আকাঙ্ক্ষা করে আত্মা তার দ্বারা প্রাপ্ত হয়। এই আত্মা স্বয়ং তার কাছে প্রকাশিত হন।' কেবলমাত্র শ্রবণ চিন্তা বা মনন দ্বারা আত্মা লভ্য নয়,—এই কথার পরেই বলা হয়েছে 'আত্মা যাকে কামনা করে আত্মা তার দ্বারাই প্রাপ্ত হয়।' একান্ত প্রিয় যে তাকেই তো কামনা করা হয়। যিনিই এই আত্মাকে ঐকান্তিকভাবে ভালোবাসেন তিনিই আত্মার সর্বাপেক্ষা প্রিয় হন। এই প্রিয়জন যাতে আত্মাকে লাভ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ঈশ্বর স্বয়ং সহায় হন। কারণ ঈশ্বরই বলেছেন: 'যারাই আমার প্রতি নিয়ত অনুরক্ত হয়ে আমাকে আরাধনা করে, আমি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে এমনভাবে পরিচালনা করি যাতে তারা আমার কাছে চলে আসে।' তাই বলা হয়েছে: প্রত্যক্ষ দর্শনের মতোই এই স্মরণ যার কাছে পরম প্রিয়, যেহেতু ঐ স্মরণ-দর্শনের বিষয়ই প্রিয়,—তাকেই পরমাত্মা কামনা করে, তার দ্বারাই পরমাত্মা প্রাপ্ত হয়। এই নিয়ত স্মরণকেই নির্দিষ্টভাবে বুঝানো হয় ভক্তি শব্দদ্বারা।"—এমনটাই বলেছেন ভগবান রামানুজ তাঁর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-বিষয়ক ভাষ্যে।

পতঞ্জলি সূত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা অর্থাৎ "পরমপুরুষের আরাধনা"-র উপর টীকা করতে গিয়ে ভোজ বলেছেন—"প্রণিধান হল সেই প্রকারের ভক্তি যেখানে ইন্দ্রিয়-উপভোগাদি রূপ ফলসন্ধান না করে, সমস্ত কর্মই গুরুর গুরু যিনি তাঁর কাছে সমর্পণ করা হয়। ভগবান ব্যাসও প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞাসূত্রে বলেছেন—প্রণিধান হল "সেই প্রকারের ভক্তি যার সহায়তায় পরমপুরুষের করুণা যোগীর উপর বর্ষিত হয় এবং তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে তাকে ধন্য করা হয়।" শাণ্ডিল্যের মতে "ভক্তি হল ঈশ্বরের প্রতি আত্যন্তিক প্রেম।" আর, সর্বশ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা হল ভক্তরাজ প্রহ্লাদের:

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

অবোধগণ ইন্দ্রিয় ভোগ-বস্তুগুলির জন্য মৃত্যু-উপেক্ষাকারী যে প্রেম অনুভব করে, আমি তোমাকে ধ্যান করার সময় সেই রকম প্রেম যেন আমার হৃদয় থেকে অপসৃত

না হয়। প্রেম! কার জন্ম? পরমপুরুষ ঈশ্বরের জন্য। অন্যরকম সবকিছুই যত বড় হক না, তার জন্য প্রেমাকর্ষণ ভক্তি নয়; কারণ, রামানুজ তাঁর শ্রী-ভাষ্যে এক প্রাচীন আচার্যের কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন—আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তা জগদন্তর্ব্যবস্থিতাঃ। প্রাণিনঃ কর্মজনিতসংসারবশবর্তিনঃ॥ যতস্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ। অবিদ্যান্তর্গতাঃ সর্বে তে হি সংসারগোচরাঃ॥ ব্রহ্মা থেকে সুরু করে একগুচ্ছ ঘাস পর্যন্ত পৃথিবীতে যা কিছুই আছে তারা কার্য-কারণে জন্ম-মৃত্যুর দাস, এবং সেজন্যই তারা ধ্যানের বিষয়রূপে সহায়ক হতে পারে না, কারণ তারা সকলেই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন ও পরিবর্তনশীল। শাণ্ডিল্য দ্বারা ব্যবহৃত অনুরক্তি সম্বন্ধে টীকা করতে গিয়ে ভাষ্যকার স্বপ্নেশ্বর বলেন: অনু অর্থ পরবর্তী, এবং রক্তি অর্থ আসক্তি, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রকৃতি ও মহিমা বিষয়ক জ্ঞানের পরে উদ্ভূত যে আসক্তি; তা না হলে স্ত্রী বা পুত্রকন্যার প্রতি অন্ধ আকর্ষণের নামও হয় ভক্তি। স্পষ্টতই দেখা গেল, ভক্তি হল ধর্মবোধের দিকে ক্রমবিস্তার বা ক্রমোন্নত এক মানস-প্রয়াস —আরাধনা-উপাসনা থেকে সুরু করে ঈশ্বরের জন্য প্রেমের পরম এক নিবিড়তম আত্যন্তিকতা।

ঈশ্বর কে? জন্মাদ্যস্য যতঃ—"যার থেকে বিশ্বের জন্ম জীবন ও বিলয়"—তিনিই ঈশ্বর—তিনি "নিত্যবিশুদ্ধ, পবিত্র, চিরমুক্ত, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বকরুণাময়, সকল গুরুর গুরু"; এবং সর্বোপরি সা ঈশ্বরঃ অনির্বচনীয়-প্রেমস্বরূপঃ—"তিনি তাঁর স্বপ্রকৃতির প্রভু—অনির্বচনীয় প্রেমের প্রভু।" এসব নিশ্চয়ই ব্যক্তিক-ঈশ্বরের সংজ্ঞা। তাহলে কি দুই ঈশ্বর আছেন—'এই নয়, এই নয়' যেমন; সৎ-চিৎ-আনন্দ, দার্শনিকের অস্তি-জ্ঞানের আনন্দ, এবং ভক্তদের প্রেমের ঈশ্বর? না, ঐ এক সৎ-চিৎ-আনন্দই প্রেমময় ঈশ্বর—একের মধ্যেই ব্যক্তিক ও অব্যক্তিক ঈশ্বর। সর্বদা এটা বোঝা দরকার যে ভক্তের উপাস্য ব্যক্তিক ঈশ্বর ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন নয়। সমস্তই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম; তবে কেবলমাত্র ব্রহ্ম একক বা নিগু'ণ রূপে এমন হয়ে ওঠেন যে তাঁকে ভালোবাসা বা উপাসনা করা যায় না; তাই ভক্তজন ব্রহ্মের সম্বন্ধসূচক রূপটিই অর্থাৎ কিনা পরম বিধাতা পরমেশ্বর রূপটিই পছন্দ করেন। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক: মৃত্তিকা বা পদার্থ থেকে তৈরী করা যায় কত অসংখ্য জিনিস। কিন্তু মৃত্তিকা হিসাবে সবই তো এক; বিভিন্ন মূর্তিই তাদের পৃথক করে দেখাচ্ছে। ওই সবের প্রত্যেকটিই তৈরী হবার আগে তো মৃত্তিকাতেই নিহিত ছিল তাদের বর্তমান রূপ,—পদার্থ হিসাবে সব তো একই; রূপ লাভ করেই এবং রূপ বর্তমান থাকা পর্যন্তই তারা এক-একটি হল স্বতন্ত্র ও পৃথক; মাটির ইঁদুর নিশ্চয়ই মাটির হাতী নয়, কারণ তারা যা তা তো তাদের ঐ রূপের জন্যই—অগঠিত মৃত্তিকা হিসাবে যদিও তারা একই। পরম সত্যের বা অন্য ভাষায় মানব-মানসে বিধৃত পরম সত্তার ব্রহ্মের সর্বোচ্চ সম্ভাবিত রূপই হল ঈশ্বর। সৃষ্টি যেমন নিত্য ঈশ্বরও তেমন। ব্যাস তাঁর সূত্রাদির চতুর্থ পরিচ্ছেদের চতুর্থ পাদ-এ, মোক্ষপ্রাপ্তিতে মুক্তাত্মার অসীম-তুল্য শক্তি ও জ্ঞানের আবির্ভাবের কথা বলার পরে, একটি ব্যাখ্যাসূত্রে মন্তব্য করেছেন—অন্য কারোই বিশ্বকে সৃজন পালন বা ধ্বংস করার ক্ষমতা থাকতে পারে না, কারণ তা একমাত্র ঈশ্বরেরই অধীন। ওই সূত্র ব্যাখ্যায় দ্বৈতবাদী টীকাকার-ভাষ্যকারের পক্ষে এটা দেখানো সহজ যে জীব নামক অধীন আত্মার পক্ষে ঈশ্বরের অসীম শক্তি ও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা একেবারেই অসম্ভব। মাধবাচার্য নামক পূর্ণাঙ্গরূপে দ্বৈতবাদী ভাষ্যকার বরাহপুরাণ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে ঐ অনুচ্ছেদটি সম্পর্কে বলেছেন তাঁর স্বকীয় সংক্ষেপ-পদ্ধতিতে।

এই ব্যাখ্যা-সূত্রটি ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার রামানুজ বলেছেন—"মুক্ত আত্মার শক্তির মধ্যে বিশ্বসৃষ্টি ইত্যাদির অত্যাশ্চর্য শক্তি এমন কি সবকিছুর উপরে আধিপত্য বর্তমান থাকে,—না, ওই সব বাদ দিয়ে মুক্তাত্মার মহিমা কেবল পরমাত্মার প্রত্যক্ষ দর্শনেই? এই সন্দেহের উপস্থিতিতে আমরা যুক্তি হিসাবে পাই: এটা যুক্তিযুক্ত যে মুক্তাত্মা বিশ্বের উপর প্রভুত্ব লাভ করে, কারণ শাস্ত্রের। উক্তি: 'পরমপুরুষের পরমাত্মার সঙ্গে সে পরম সমতা লাভ করে এবং তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়।' এখন পরম সমতা ও সর্ব আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা তো পরমেশ্বরের অদ্বিতীয় শক্তি ছাড়া অর্থাৎ

কি না বিশ্বশাসনের দ্বিতীয়-রহিত শক্তি ছাড়া লাভ করা যায় না। সুতরাং সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ও পরমাত্মার সঙ্গে চূড়ান্ত সমতা লাভ করতে হলে নিখিল বিশ্বকে শাসন করবার শক্তিই অর্জন করতে হয়—এমনটা আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়। এই কথার উত্তরে আমাদের কথা হল—মুক্তাত্মা সমস্ত ক্ষমতারই অধিকারী হয়, একমাত্র বিশ্বশাসনের ক্ষমতা ছাড়া। চেতন ও অচেতন সমস্ত কিছুরই নিয়ন্ত্রণ হল বিশ্বশাসন। প্রকৃত স্বরূপের আবরণরূপী সবকিছুই যে মুক্তাত্মার উপর থেকে দূরীভূত হয়েছে একমাত্র তিনিই ব্রহ্মকে অবাধে দর্শন করেন বটে, তবে বিশ্বকে শাসন করার অধিকারী হন না। শাস্ত্রীয় গ্রন্থ থেকেই এর প্রমাণ দেওয়া যায়—'যাঁর থেকে সব কিছুরই সৃষ্টি, যাঁর দ্বারা সমস্ত সঞ্জীবিত এবং যাঁর মধ্যে সকলেই বিগত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে—তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করছ, তিনিই ব্রহ্ম। বিশ্বশাসনের এই গুণ যদি মুক্তাত্মাদের পক্ষেও সাধারণ অধিকারের বিষয় হয়, তবে বিশ্বশাসনাধিকার বিষয়ে শাস্ত্রবচন ব্যাখ্যায় ব্রহ্মের ঐ সংজ্ঞাটি প্রযুক্ত হত না। কেবল অসাধারণ গুণরাজিই কোনো কিছুর সংজ্ঞা নির্ধারণ করে থাকে; তাই শাস্ত্রগ্রন্থে পাই: 'প্রিয় বৎস, সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিল একমাত্র এক—অদ্বিতীয় এক। তিনি দেখলেন ও অনুভব করলেন—"আমি বহুকে জন্ম দেব।" তিনি সৃষ্টি করলেন তাপ।' 'বস্তুতই, প্রথমে ছিলেন একমাত্র ব্রহ্ম। তিনি বিবর্তনে প্রকাশিত হলেন। তিনি জন্ম দিলেন ভাগ্যবানরূপী ক্ষত্রসমূহকে। সমস্ত দেবগণই হলেন ক্ষত্র, যেমন—বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান।'—'বস্তুত, প্রথমে ছিলেন একমাত্র ব্রহ্ম; অন্য কোনো অস্তিত্বের স্পন্দন ছিল না; তিনি পৃথিবী সৃষ্টির চিন্তা করলেন—পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।' 'একমাত্র নারায়ণ বিরাজমান ছিলেন; ব্রহ্মা নয়, ঈশান নয়, দ্যাবা-পৃথিবী নয়, তারা নয়, জল নয়, অগ্নি নয়, সোম নয়, সূর্য নয়। তিনি নিঃসঙ্গ থাকায় প্রীত হলেন না। ধ্যানান্তে জন্ম নিল তাঁর এক কন্যা, দশ অবয়ব ইত্যাদি'; এবং অন্যত্র পাওয়া যায়—'যিনি পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবী থেকে স্বতন্ত্র, যিনি আত্মায় থেকেও... ইত্যাদি'; শ্রুতি শাস্ত্রে পরমাত্মাকে বলা হয়েছে বিশ্বশাসনকার্যের কর্তা...বিশ্বশাসনের এই সব বর্ণনায় মুক্তাত্মার এমন কোনো স্থান নাই যার দ্বারা ঐরকম আত্মা বিশ্বশাসনের গুণাধিকারী হতে পারে।"

পরবর্তী সূত্র ব্যাখ্যায় রামানুজ বলেন—"তুমি যদি বল তা নয়, কারণ প্রমাণস্বরূপ বেদেই আছে বিরুদ্ধ প্রমাণ, এবং তাতে অধীন দেবতাদের ক্ষেত্রে মুক্তাত্মার মহিমার কথা উল্লিখিত আছে।" এটাও কিন্তু সমস্যার সহজ সমাধান মাত্র। রামানুজের পদ্ধতি যদিও সমগ্রের ঐক্য স্বীকার করে তবু তাঁর মতে সৃষ্টির অস্তিত্বের সমগ্রতার মধ্যেই রয়েছে কত চিরন্তন বিভেদ। সুতরাং কর্মক্ষেত্রে এই পদ্ধতি দ্বৈতবাদী হওয়ায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা রামানুজের পক্ষে সহজ হয়েছিল।

এবার আমরা বুঝতে চেষ্টা করব অদ্বৈতবাদের মহান প্রবক্তাগণ কী বলেন। আমরা দেখতে পাব অদ্বৈত-পদ্ধতি দ্বৈতবাদীদের সমস্ত প্রত্যাশা ও আদর্শ অটুট রেখেই, অধ্যাত্ম মানবের সমুচ্চ পরিণামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সমস্যাটির স্বকীয় সমাধান উপস্থিত করেছেন। যাঁরা মুক্তির পরেও স্বকীয় মনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার

আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁরা তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ও সগুণ ব্রহ্মের আশীর্বাদ গ্রহণে যথেষ্ট সুযোগ পাবেন। ভগবদ্গীতায় এই সম্পর্কে বলা হয়েছে—"হে রাজন, প্রভুর গৌরব-গুণরাশি হল এমনই যে ঋষিদের একমাত্র আনন্দ হল স্বীয় সত্তায়; যাঁদের সমস্ত বন্ধনই স্খলিত হয়েছে এমনকি তাঁরাও সর্ববিরাজমানকে একমাত্র ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসেন।" এঁরা হলেন—সাংখ্যশাস্ত্রে যাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে —এঁরা সৃষ্টিচক্রের প্রকৃতিতে মগ্ন হন, যাতে পূর্ণতা প্রাপ্তির পরে তাঁরা সৃষ্টি-পদ্ধতির প্রভু হতে পারেন; কিন্তু এঁদের কেউ কখনই ঈশ্বরের সমান হন না। যেখানে সৃষ্টি নাই, সৃষ্ট নাই, স্রষ্টা নাই; যেখানে জ্ঞাতা নাই, জ্ঞেয় নাই, জ্ঞান নাই; যেখানে আমি নাই, তুমি নাই, সে নাই; যেখানে কর্তা নাই, কর্ম নাই, সম্বন্ধ নাই— "সেখানে কে কার দ্বারা সৃষ্ট হয়?" এমন ব্যক্তিগণ উত্তীর্ণ হয়েছেন সব কিছুর ওপারে —যেখানে শব্দ পৌঁছতে পারে না, মন যেতে পারে না, সেখানে সেখানকার কথায় শ্রুতি বলেছে এইভাবে—'এ নয়, এ নয়।' কিন্তু যারা এই অবস্থায় পৌঁছতে পারবে না তাদের পক্ষে ত্রিরূপ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন অবশ্যই থেকে যাবে, আর থেকে যাবে দুইয়ের অন্তর্যোগ-স্বরূপ ঈশ্বর। তাই প্রহ্লাদ যখন আত্ম-বিস্মৃত হয়ে বিশ্বকে দেখতে পায়নি, বিশ্বের কারণকেও নয়,—সমস্তই তাঁর কাছে হয়েছিল অসীম ও নাম-আকারহীন অভেদাত্মক এক অসীম সত্তা; কিন্তু যখনি তার মনে হল সে হল প্রহ্লাদ, অমনি তার সামনে দেখা দিল বিশ্ব, এবং তার "সীমাহীন গুণাকার-রূপ বিশ্বপতি।" অনুরূপ হয়েছিল ভাগ্যবতী গোপীদেরও। তারা যখন তাদের ব্যক্তিগত প্রতিমূর্তি ও তার সবচেতনাই হারিয়ে ফেলল, তারা নিজেরাই হয়ে গেল এক একজন কৃষ্ণ, আবার কৃষ্ণকে তাদের একমাত্র আরাধ্যরূপে ভাবতে সুরু করতেই তারা হয়ে গেল সেই গোপী। তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান-মুখাম্বুজঃ। পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ তখন "পীতাম্বর পরিহিত মাল্যভূষিত শ্রীকৃষ্ণ তার হাসি-হাসি কমলাননে দেখা দিল; সেই রূপ প্রাণের দেবতা মন্মথকেও হার মানায়।"

এবার আচার্য শঙ্করে ফিরে যাওয়া যাক, তিনি বলেছেন—"যাঁরা সগুণ ব্রহ্মের আরাধনা করেই পরম বিধাতার সঙ্গে যুক্ত হন এবং তাঁদের মনকে অটুটরূপে বজায় রাখেন তাদের মহিমা কি সীমাবদ্ধ, না সীমামুক্ত? এই সংশয় উপস্থিত হতেই আবার যুক্তিস্বরূপ পাই: তাদের মহিমা সীমামুক্ত অর্থাৎ অসীম বলা উচিত, কারণ শাস্ত্রেই বলেছে—'তাঁরা তাঁদের স্বরাজ্য লাভ করেছে', 'উপাসনা করে সমস্ত দেবতা।' 'সব লোকেই তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়।' এর উত্তর হিসাবে ব্যাস লিখেছেন—'বিশ্বশাসন করার ক্ষমতা থাকে না।' বিশ্বসৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষমতা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষমতা—যেমন অনিমা প্রভৃতি আয়ত্ত করেন যাঁরা মুক্তাত্মা। কিন্তু বিশ্বকে শাসন-নিয়ন্ত্রণ, তা কেবলমাত্র নিত্যভাবে ও সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত। কেন? কারণ, তিনি হলেন সৃষ্টি প্রভৃতি সম্পর্কের শাস্ত্রীয় বাক্যের অধিকর্তা এবং সেখানে মুক্তাত্মাদের কথা উল্লিখিত হয় না, কোনো প্রসঙ্গেই নয়। একমাত্র পরমেশ্বরই বিশ্ব-শাসন-নিয়ন্ত্রণে ব্রতী। সৃষ্টি-আদি বিষয় সম্পর্কে শাস্ত্র-

বাক্যের সবটাই তাঁর দিকে লক্ষীভূত। তাছাড়া, নিত্যসম্পূর্ণরূপ একটি বিশেষণও রয়েছে। শাস্ত্রে আরও বলছে, অনিমা প্রভৃতি ঈশ্বরানুসন্ধান ও ঈশ্বরোপাসনা থেকেই হয়। তাই বিশ্বশাসনে তাদের কোনো স্থান নাই। তাছাড়া, তাদের নিজ নিজ চিত্তবৃত্তি থাকার জন্য, তাদের ইচ্ছাশক্তিও স্বতন্ত্র হতে পারে; কাজে কাজেই একজন সৃষ্টি চাইছেন, আরেকজন চাইতে পারেন ধ্বংস। এই দ্বন্দ্ব নিরসনের এক-মাত্র উপায় হল সমস্ত ইচ্ছারই কোনো এক ইচ্ছার অধীন হওয়া। উপসংহার হল, মুক্তাত্মার মানসবৃত্তিও পরম শাসকের ইচ্ছাধীন। কাজেই ভক্তিকে ব্রহ্মের অভিমুখীন করা যায় কেবলমাত্র তাঁর ব্যক্তিত্ব সগুণ সম্পর্কেই।

নির্গুণ পরমাত্মায় যাদের মন সংযুক্ত, তাদের পক্ষে এই পথ আরো কঠিন। আমাদের স্বভাবের স্রোতে সহজে ভেসে চলে ভক্তি। যে ব্রহ্ম বিগ্রহরূপী নয়, তাকে আমরা ধারণায় আনতে পারি না একথা সত্য, কিন্তু তাই বলে আমাদের জ্ঞাত সব-কিছু সম্পর্কেই তা সত্য নয়। পৃথিবীর সর্বোত্তম মনস্তত্ত্ববিদ্ ভগবান কপিল কত যুগ পূর্বে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, আমাদের দৃষ্টি ও বোধের অধীন অন্তরঙ্গ কি বহিরঙ্গ সব কিছুরই সংগঠনে মানবিক চেতনাই হল অন্যতম উপাদান। দেহ থেকে অগ্রসর হয়ে ঈশ্বর পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর প্রত্যেকটি পদার্থই হল চেতনা বা অন্যকিছু—তা যাই হোক না কেন; এবং এই ব্যত্যয়হীন মিশ্রণকেই আমরা সাধারণত মনে করি বাস্তব সত্য। সুতরাং ঈশ্বর যেহেতু বিগ্রহ নন, তাই তাকে অবাস্তব অসত্য বলাটা একেবারেই মূর্খতা। এটা যেন আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের উচ্চকলহের মতো শোনায়! এই কুৎসিত ধরনের দম্ভপূর্ণ কলহের গোড়ায় রয়েছে 'রিয়াল' অর্থাৎ 'সত্য' শব্দটি নিয়ে 'খেলা'।

গূঢ়ার্থ ও বাচ্যার্থদ্বারা যতটা ক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত হতে পারে 'ঈশ্বর' শব্দটির ভাবধারা ততটাই অধিকার করে আছে, এবং যে কোন কিছুর মতোই ঈশ্বর সত্য; আর, যেদিক থেকেই হোক শেষ পর্যন্ত যা উল্লিখিত হল, সত্য শব্দটি তার চেয়ে বেশী কিছু বোঝায় না। এমনটা হল ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের দার্শনিক ধ্যান-ধারণা।

ভক্তের কাছে এসব নীরস বর্ণনার প্রয়োজন কেবলমাত্র তার সংকল্পকে শক্তিশালী করতে, তার বাইরে তা কোনো কাজের হয় না। কারণ সে এমন এক পথে অগ্রসর হচ্ছে যে পথ অবিলম্বেই তাকে নিয়ে যাবে যুক্তিবুদ্ধির অস্বচ্ছ ও অস্থির ক্ষেত্রের কুয়াশাচ্ছন্ন বন্ধুর সীমার বাইরে—অগ্রসর করে দেবে চেতনলোকে। সে ভগবৎ-কৃপায় এমন এক স্তরে পৌঁছায় যেখানে পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক দুর্বলের শক্তিহীন যুক্তি বহু পিছনে পড়ে থাকে, এবং অন্ধকারে বুদ্ধিজীবীর দিশাহারা যাত্রার স্থলে দেখা দেয় প্রত্যক্ষ দর্শনের দিবালোক। সে আর যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস করে না, সে প্রায় নিজেই দেখতে পায়। সে আর তর্ক করে না, সে অনুভব করে। তাহলে একি ভগবানকে দেখা নয়, ভগবানকে অনুভব করা নয়, ভগবানের মধ্যে আনন্দ পাওয়া নয়,—অন্য সব কিছুর চেয়েও মহানরূপে? হাঁ, এমন ভক্তের অভাব নেই যিনি মনে করেন মোক্ষ বা মুক্তির চেয়েও এসব বড়। তাহলে এটাও কি সর্বোচ্চ ধরনের উপযোগিতা নয়? অনেক লোক আছে—পৃথিবীতে তাদের সংখ্যাও কম নয়—যারা বিশ্বাস করেন যা দেহের পক্ষে আরামদায়ক একমাত্র তাই হল কার্যকরী ও প্রয়োজনীয় বিষয়। এমন কি ধর্ম, ঈশ্বর, নিত্যতা, আত্মা—এসবের কিছুই তাদের কাছে কাজের কিছু নয়, কারণ এসব তো অর্থ বা দৈহিক সুখ আনে না। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে সাহায্য করে না এবং ক্ষুধা পূরণ করে না—এমন সব কিছুই তেমন লোকের কাছে কার্যকরী নয়। প্রত্যেক মনের কাছে অবশ্য কার্যকারিতাটা তার বিশেষ অভাববোধের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই খাওয়া পরা বংশরক্ষা করা ও মৃত্যুবরণ করা—এসবের উর্ধ্বে যারা কখনোই উঠতে পারেনি তাদের একমাত্র লাভ-বোধ হল ইন্দ্রিয়-উপভোগে, আর এদেরকেই বহুজন্ম পরিগ্রহ করতে হয় উচ্চতর কোনো কিছুকে অনুভব করার শিক্ষালাভ করার জন্য। আর, এই পার্থিব জীবনের ভঙ্গুর স্বার্থ-বিষয়ের চেয়ে আত্মার নিত্য স্বার্থই যাদের কাছে আরো বেশী মূল্যবান, যাঁদের কাছে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি হল অবোধ শিশুর খেলার মতো —তাঁদের কাছে ভগবান ও ভগবৎপ্রেম মানবজীবনের উচ্চতম ও একমাত্র সার্থকতা। ভগবানের করুণায় এই অতি-পার্থিবতার জগতে তেমন কিছু ব্যক্তি এখনো বর্তমান আছেন।

আগেই যেমন আমরা বলেছি, ভক্তিযোগকে গৌণী বা প্রস্তুতিমূলক এবং পরা বা পরম—এই দুই রূপে বিভক্ত করা যায়। অগ্রসর হতে হতে আমরা দেখতে পাব প্রস্তুতি-স্তরে অগ্রসর হবার জন্য অনেকরকম বাস্তব ধরনের সহায় তার প্রয়োজন হয়; সকল ধর্মের পুরাণ-বিষয়ক এবং রূপকধর্মী অংশগুলি স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠেছে এবং তা প্রথমদিকে উৎসুক আত্মাকে বেষ্টন করে ঈশ্বর-অভিমুখী করে তোলে। যে ধর্ম-পদ্ধতিতে উচ্চাঙ্গ পুরাণ ও ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডের অজস্র প্রকাশ ঘটেছে একমাত্র সেখানেই দেখা দিয়েছে আধ্যাত্মিক মহামানববৃন্দ—এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ধর্মের শুষ্ক গোঁড়ামিপূর্ণ রূপই বর্জন করে যা কিছু কবিত্বময়, যা কিছু সুন্দর ও মহান, ভগবানের অভিমুখে টলটলায়মান পদক্ষেপে শিশুমনের কাছে যা কিছুই দৃঢ় সহায়; ধর্মের ঐসব রূপ

আধ্যাত্মিক গৃহছাদের মূল স্তম্ভগুলিকেই ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করে—সত্যের ভ্রান্ত ও কুসংস্কারমূলক ধারণাবশে দূরীভূত করে ফেলে যা-কিছুই জীবনদায়ক, মানবাত্মার বর্ধিষ্ণু অধ্যাত্ম তরুর জন্য প্রয়োজনীয় যা-কিছু গঠনমূলক উপাদান। কিন্তু ঐ ধরনের সব ধর্মেও অতিশীঘ্রই এই উপলব্ধি ঘটে যে তাদের কাছে শেষপর্যন্ত পড়ে থাকে শূন্যপাত্র—যত্নপ্ত শব্দমালা এবং হয়ত বা একধরনের সামাজিক সাফাই অথবা তথাকথিত সংস্কার-উদ্দীপনা।

যাদের ধর্ম হল এই রকমের সেই অসংখ্য মানুষেরা হল সচেতন বা অচেতন পদার্থ বিশেষ—ইহজীবনে ও পরবর্তী জীবনে তাদের লক্ষ্য ও আদর্শ কেবল উপভোগ এবং তাদের কাছে সেটাই মানবজীবনের সুরু ও শেষ—তাদের কাছে সেটা 'ইষ্টাপূর্ত' বিশেষ; জাগতিক আরামের জন্য রাস্তা পরিষ্কার ও ঝাড়ু দেওয়ার মতো কাজটাই তাদের মতে মানবজীবনের চরম সার্থকতা; মূর্খতার ও উন্মাদনার অদ্ভুত ধরনের মিশেলী ভাবের অনুগামীদের যথার্থ রূপ যত শীঘ্রই প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং যথাযোগ্য ভাবেই ঈশ্বরবিরোধী ও বস্তুবাদীর দলে তারা ভিড়ে যায়, ততই জগতের মঙ্গল। সততা ও আধ্যাত্মিক আত্মবোধের এককণামাত্রও শত শত টন চপল কথা-বার্তা ও বাজে ভাবালুতার চেয়ে ওজনে ভারী। এইসব মূর্খতা ও উন্মত্ততার শুষ্ক ধূলি-রাশি থেকে একজন—মাত্র একজন অধ্যাত্ম মহামানবের উদ্ভব হয়েছে দেখাতে পারো? যদি না পারো মুখ বন্ধ করে হৃদয়ের সমস্ত জানালাগুলি খুলে দাও সত্যের স্বচ্ছ কিরণের দিকে, শিশুর মতো বসো গিয়ে ভারতের ঋষিদের পায়ের কাছে—যাঁরা জানেন তাঁরা কী বলছেন। আসুন, আমরা একাগ্র মনে শুনি তাঁরা কী বলছেন।

গুরুর প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেক আত্মাকে সম্পূর্ণ হতেই হয়, এবং প্রত্যেকটি জীবই শেষপর্যন্ত পৌঁছায় সম্পূর্ণতার স্তরে। আমাদের বর্তমান অবস্থা হল আমাদেরই অতীতের কর্ম ও চিন্তার ফলাফল; আর ভবিষ্যতে আমরা যা হব তা হল আমাদের বর্তমান চিন্তা ও কর্মের ফলাফল। কিন্তু এই যে আমাদের ভবিতব্য গঠন—এখানে বাহির থেকে সহায়তা লাভের কথাটা বাদ যাচ্ছে না; বরং অসংখ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় এইরকম সহায়তা একান্তই দরকার। এই সহায়তা যখন আসে আত্মার ঐ সমুচ্চক্ষমতা ও সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হয়, অধ্যাত্মজীবন জাগ্রত হয়, বৃদ্ধি সতেজ হয় এবং শেষপর্যন্ত মানুষ পবিত্র ও সম্পূর্ণ হয়।

এই ত্বরান্বিত প্রেরণা গ্রন্থ থেকে লাভ করা যায় না। এক আত্মা কেবল অন্য আত্মা থেকেই প্রেরণা পেতে পারে। সারা জীবন ধরে আমরা গ্রন্থের পর গ্রন্থ পাঠ করে যেতে পারি, খুব ধীসম্পন্ন হতে পারি, কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখতে পাই আমরা আধ্যাত্মিক দিক থেকে মোটেই উন্নত হইনি। মানুষের ভিতর উচ্চস্তরের ধী-উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গেই যে সমানুপাতিক ভাবে আধ্যাত্মিক দিকটারও উন্নতি হবে একথা যথার্থ নয়। বই পড়তে পড়তে আমরা ভ্রান্তিবশত এমনটা ভাবি যে এতে আমাদের আধ্যাত্মিক দিক থেকে সাহায্য হচ্ছে; কিন্তু আমাদের উপরে গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রভাবটা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব এতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিই লাভবান হয়—আভ্যন্তরীন শক্তি নয়। আধ্যাত্মিক বিকাশ ত্বরান্বিত করতে গ্রন্থের এই অপর্যাপ্ততার কারণেই আমরা অধ্যাত্ম বিষয়ে অতি চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ও সত্যিকার অধ্যাত্ম জীবন যাপনে বড় ভয়ানকভাবেই অযোগ্য হয়ে পড়ি। শক্তিকে তরান্বিত করার উদ্দেশ্যে অন্য আত্মা থেকে প্রেরণা লাভ করতেই হয়।

যাঁর আত্মা থেকে এইরূপ প্রেরণা আসে তাঁকেই বলা হয় গুরু বা শিক্ষাদাতা; আর, যাঁর আত্মায় ওই প্রেরণা সঞ্চারিত হয় তাকে বলে শিষ্য বা ছাত্র। প্রেরণাকে এক আত্মা থেকে অন্য আত্মায় সঞ্চারিত করতে হলে প্রথমত আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন হল প্রেরণাদানকারী আত্মার যেন প্রেরণা সঞ্চালিত করার মতো ক্ষমতা থাকে, এবং দ্বিতীয়ত, প্রেরণা-গ্রহণকারী আত্মারও যেন সঞ্চালিত হবার মতো যোগ্যতা থাকে। বীজকে হতে হবে প্রাণবন্ত; এবং জমিনকে হতে হবে প্রস্তুত এক কর্ষিত ক্ষেত্র; এই দুই শর্তই পূর্ণ হলে পরমাশ্চর্যরূপে এক বিশুদ্ধ ধর্মভাব দেখা দেয়। "যথার্থ ধর্মপ্রচারককে হতে হয় আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন, এবং তাঁর শ্রোতাদেরও হতে হবে সচেতন কুশলী।"—আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা; এবং দুজনেই আশ্চর্য প্রকৃতির ও অসাধারণ ব্যক্তি হলে ঘটে যায় এক বিস্ময়কর অধ্যাত্ম জাগৃতি, অন্যথায় তা হয় না। একমাত্র ঐরূপ ব্যক্তিই হন যথার্থ শিক্ষাদাতা, এবং একমাত্র ঐরূপ ব্যক্তি হন যথার্থ ছাত্র—যথার্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষী। অন্য সবাই কেবল আধ্যাত্মিকতা নিয়ে ছেলেখেলা

করে থাকে। তাদের মধ্যে একটুখানি ঔৎসুক্যই মাত্র জাগ্রত হয়, তাদের মধ্যে জলে ওঠে একটুখানি বুদ্ধিজাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তবে তারা ধর্মরাজ্যের দিগন্ত-সীমায় একটুখানি দাঁড়াতেই পারে মাত্র। অবশ্য, এরও যে কিছু মূল্য না আছে তা-নয়, কারণ কালক্রমে তা ধর্মের জন্য সত্যিকার তৃষ্ণাও জাগিয়ে তুলতে পারে। আর, প্রকৃতির এক রহস্যময় বিধান হল—জমিন তৈরী হলেই বীজ এসে পড়ে, এবং এসে পড়বেই। মানুষ যখন মনেপ্রাণে ধর্মলাভের জন্য একান্ত উদগ্রীব হয়ে ওঠে ধর্মীয় শক্তির সঞ্চালক নিজে দেখা দিয়ে আত্মার সহায়ক হবেই। গ্রহণকারী আত্মা যখন ধর্মের আলোকজাত আকর্ষণ-ক্ষমতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন ঐ আকর্ষণে সাড়া দিয়ে স্বতই আলোক প্রেরণ করে।

অবশ্য, এই পথে কিছু ভয়ানক ধরনের বিপদও থাকে। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গ্রহণকারী আত্মার ক্ষণিকের আবেগকেই যথার্থ ধর্মীয় তৃষ্ণা বলে ভুল করা এক বিপদ। আমরা তা আমাদের মধ্যেও দেখতে পারি। আমাদের জীবনে কতবার দেখি আমরা যাকে ভালোবাসতাম সে মারা গেল, আমরা ভয়ানক আঘাত পেলাম, মনে হল পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে গেল; তখন চাই সুনিশ্চিত ও উচ্চতর কিছু—তখন আমাদের মনে হয় আমাদের ধার্মিক হতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই ঐ অনুভবের তরঙ্গ মিলিয়ে যায় এবং আমরা পড়ে থাকি ঠিক আগে যেখানে ছিলাম। এহেন প্রেরণাকে আমরা সকলেই ধর্মের জন্য সত্যিকারের তৃষ্ণা বলে ভুল করি; কিন্তু যে পর্যন্ত এই সাময়িক আবেগের ভ্রান্তি ঘটে সে পর্যন্ত অবিরাম ধর্মের জন্য আত্মার সেই অবিরাম এক যথার্থ আকাঙ্ক্ষা দেখা দেবে না, এবং আমাদের প্রকৃতির মধ্যেও আমরা আধ্যাত্মিক প্রেরণা-সঞ্চালক সত্যকার কিছুরও সন্ধান পাব না। তাই, যখনই আমরা সত্যসন্ধানের ক্ষেত্রে অভিযোগ করে বলি—এত আকাঙ্ক্ষার ফলও ব্যর্থ হল, তখন অমনধারা অভি-যোগের বদলে আমাদের প্রথম কর্তব্য হল আমাদেরই আত্মার ভিতরে দৃষ্টিপাত করা এবং সন্ধান করা আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাটি যথার্থ কিনা। এবং তখন ধরা পড়বে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরাই সত্যকে লাভ করার যোগ্য ছিলাম না—যথার্থ আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা আমাদের ছিল না।

যে গুরু সঞ্চালক তাঁর সম্পর্কে রয়েছে আরো বড় রকমের বহু বিপদ। অজ্ঞানতায় মগ্ন থেকেও অনেকেই আত্ম-অহঙ্কারে ভাবে যে তাঁরা হলেন সর্বজ্ঞ, এবং এখানেই তারা থামে না বরং অন্যকেও স্বেচ্ছায় নিজ কাঁধে নিয়ে যেতে চায়; আর তখন এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ-চালনা করতে গেলে দুজনেই খাদে পড়ে যায়।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।—"অন্ধকারেবাসকারী, স্বমতে বুদ্ধিমান, মিথ্যা জ্ঞানে স্ফীত ব্যক্তি ইতস্তত সঞ্চরণ করে—অন্ধচালিত অন্ধের ন্যায়।"—(কঠোপনিষদ, ১।২।৫)। জগৎ এদের দ্বারাই পূর্ণ। প্রত্যেকেই হতে চায় শিক্ষাদাতা, প্রত্যেকটি ভিখারীই দান করতে চায় লক্ষ লক্ষ টাকা! এহেন ভিখারীরা যেমন হাস্যকর, তেমনি ঐ শিক্ষাদাতাগণও।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের গুণাবলী

তাহলে শিক্ষককে চিনব কী করে? সূর্যকে প্রকাশ করতে টর্চ-আলোর দরকার হয় না, তাকে দেখবার জন্যে দীপ জ্বালতে হয় না। সূর্য উদিত হলে স্বতই আমরা সে সত্য সম্পর্কে অবহিত হই, কোনো লোকশিক্ষক আমাদের সাহায্য করতে এলে আমাদের মনপ্রাণ আত্মা স্বতই জানতে পারে তার উপরে ইতিমধ্যেই আলোক-বর্ষণ সুরু হয়েছে। "সত্য তার নিজের ভিত্তিতেই দাঁড়ায়, সে যে সত্য—তা প্রমাণের উদ্দেশ্যে অন্যকিছুরই প্রয়োজন হয় না—সত্য হল স্বয়ং দীপ্যমান। তা আমাদের প্রকৃতির অন্তরতম কোণেও প্রবেশ করে, এবং তার উপস্থিতির সম্মুখে সমস্ত জগৎ দাঁড়িয়ে বলে ওঠে—"এটা সত্য।" যাঁদের বোধি ও সততা সূর্যকিরণের মতো উজ্জ্বল, তাঁরাই হলেন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং মানবলোকের অধিকাংশই তাঁদের দেবতাজ্ঞানে আরাধনা করেন। আমরা কিন্তু ন্যূন ধরনের শিক্ষকদের নিকট থেকেও সাহায্য পেতে পারি; তা, আমরা কেবল প্রথমেই ভিতর থেকে বুঝতে পারি না—সঠিক কাদের কাছ থেকে শিক্ষা ও পথনির্দেশ লাভ করতে পারি। তাই বিশেষ পরীক্ষা, বিশেষ শর্ত পূরণ প্রয়োজন হয় শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের তৃপ্তির জন্যেই।

শিক্ষাগ্রহণকারীর পক্ষে প্রয়োজনীয় শর্তগুলি হল পবিত্রতা, জ্ঞানের জন্য যথার্থ তৃষ্ণা এবং অধ্যবসায়। কোনো অপবিত্র আত্মাই ধার্মিক হতে পারে না। চিন্তায় বাক্যে ও কর্মে পবিত্রতাই একান্তভাবে প্রয়োজন—যিনিই ধার্মিক হতে চান। জ্ঞানতৃষ্ণার কথাটা হল সেই পুরানো প্রবাদ: আমরা যা চাই ঠিক পাই। মনপ্রাণে স্থির ভাবে আশ্রয় করেছি এমনটা ছাড়া কিছুই আমরা পেতে পারি না। ধর্মের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠা সত্যই খুব কঠিন, সাধারণত যেমনটা আমরা কল্পনা করি মোটেই তত সহজ নয়। ধর্মকথা শোনা বা ধর্মগ্রন্থ পড়াটা হৃদয়ে সত্যকার অভাববোধের পরিচায়ক নয়; সতত একটা বর্ধমান প্রচেষ্টা, একটা নিত্য সংগ্রাম—আমাদের নিম্নপ্রকৃতিকে অবিরাম রোধ করা চাই—যে পর্যন্ত না উচ্চতর অভাববোধ কার্যত অনুভূত হতে হতে শেষবিজয় লাভ হয়। এ তো দু-একদিনের ব্যাপার নয়,—বছরের পর বছরের বা বহুজীবনের ব্যাপার; এই সংগ্রাম বহু জন্মজন্মান্তর পর্যন্তও পরিব্যাপ্ত হতে পারে। কখনো সাফল্য আসতে পারে একেবারে অকস্মাৎ, তবু যা নিরবধিকাল বলে মনে হতে পারে তেমনটার জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। যে শিক্ষার্থী এইরকম অধ্যবসায়ের মনোভাব নিয়ে যাত্রা করবে সে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত লাভ করবে সাফল্য ও সিদ্ধি।

শিক্ষক সম্পর্কে আমাদের দেখতে হবে তিনি শাস্ত্রের ভাবাত্মা সম্পর্কে অবহিত আছেন কিনা। সমস্ত পৃথিবীই তো পড়ে বাইবেল, বেদ, কি কোরান; কিন্তু তা তো কেবল শব্দাবলী, অন্বয়, শব্দব্যুৎপত্তি, শব্দতত্ত্ব—ধর্মের শুকনো হাড় যত। যে শিক্ষক শব্দ নিয়ে, ভাষা নিয়ে বেশী কারবার করেন—এবং ভাষার স্রোতে মনকে ভেসে যেতে দেন, তিনি ভাবকে হারিয়ে ফেলেন। কেবলমাত্র শাস্ত্রের ভাবাত্মার জ্ঞানই প্রকৃত ধর্মশিক্ষককে গঠন করে তুলতে পারে।

শাস্ত্রের শব্দজাল হল এক প্রকাণ্ড অরণ্যসদৃশ—মানবমন সেখানে পথহারা হয়ে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্।—"শব্দজাল হল অরণ্যানী সদৃশ; মনের অদ্ভুত বিচরণের কারণ এটিই।" "শব্দ-যোগের বিচিত্র সুললিত ভাষায় কথা-বলার বিচিত্র পদ্ধতি, শাস্ত্রের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করার বিচিত্র পন্থা—এসব হল বিদ্বানদের বিচার ও বিনোদনের জন্য; ওসব অধ্যাত্মদৃষ্টি গঠনে কোনো কাজে আসে না।"

বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলং।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥

যারা এসব ক্রিয়া-পদ্ধতিকে অন্যের কাছে ধর্ম বলে চালাতে চায় তাদের আকাঙ্ক্ষাটা হল তাদের বিদ্যার বাহাদুরী দেখানো—সারা দুনিয়া যাতে তাদের মহাপণ্ডিত বলে প্রশংসা করে। আপনারা দেখতে পাবেন পৃথিবীর কোনো মহান শিক্ষকই কখনো "শাস্ত্রীয় অত্যাচার" করার চেষ্টা করেননি—শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি নিয়ে কেবল খেলা করেননি। তবু তো তাঁরা সুন্দরভাবেই শিক্ষা দান করেছেন, অন্যদিকে যাদের শেখাবার মতো কিছুই নেই তারাই কখনোবা একটা শব্দ নিয়ে তার ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে তিন খণ্ড গ্রন্থ লিখে ফেলেছেন—প্রথমে কে ব্যবহার করেছে শব্দটা, সেই লোকটি কী খেত, এবং কতক্ষণ ঘুমোত, এবং আরো আরো অনেক কিছু।

ভগবান রামকৃষ্ণ একবার এক গল্প বলেছিলেন: কয়েকজন লোক এক আম-বাগানে ঢুকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে গুনতে লাগল অঙ্কুর পাতা ও শাখা, পরীক্ষা করতে লাগল তাদের রঙ, তুলনা করতে লাগল তাদের আকার প্রকার, এবং সব জিনিসই খুব সযত্নে লিখে লিখে রাখতে লাগল; আর তারপর প্রত্যেক বিষয়-সূচীর উপর সুরু করল পাণ্ডিতী আলোচনা—এবং সেই আলোচনা তাদের কাছে অবশ্য খুবই ভালো লাগছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ছিল অন্যদের চেয়ে একটু বুদ্ধিমান, সে ওইসব ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আম খেতে সুরু করল। সে কি বিজ্ঞ নয়? তাই এই পত্র ও পত্রাঙ্কুর গণনা এবং মন্তব্য রচনার কাজটা ওরাই করুক বসে, ওসব কাজের যোগ্য জায়গাও আছে ঠিকই, কিন্তু এই অধ্যাত্ম রাজ্যে নয়। এই 'পত্র-গণক'-দের মধ্যে কখনো দেখবে না কোনো শক্তিশালী ধরনের আধ্যাত্মিক ব্যক্তি। যে ধর্মে মানুষের সর্বোচ্চ মহিমার প্রকাশ, সেখানে এত কসরতের প্রয়োজন হয় না। তুমি যদি ভক্ত হতে চাও তবে তোমাকে মোটেই জানতে হবে না কৃষ্ণ জন্মেছিলেন মথুরায় না ব্রজপুরে, জন্মে কি করছিলেন, বা গীতা শিক্ষা দিয়েছিলেন ঠিক কোন্ তারিখে। তোমার প্রয়োজন শুধু গীতায় উচ্চারিত কর্তব্য ও প্রেমের সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে প্রাণে আকাঙ্ক্ষা অনুভব করা। এর খুঁটিনাটি ও গ্রন্থকার সম্পর্কে যত সব জ্ঞাতব্য তা কেবল পণ্ডিতদের উপভোগের জন্য। তা, তারা যা চায় তাই নিয়ে থাক না। তাদের বিজ্ঞ বাগবিতণ্ডায় 'শান্তি! শান্তি!' বলে এসো আম খাওয়া যাক।

শিক্ষকের পক্ষে অযোগ্য দ্বিতীয় শর্ত-গুণ হল পাপস্পর্শহীনতা। অনেক সময়েই প্রশ্ন করা হয়ে থাকে—'শিক্ষকের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্প.র্ক আমাদের অনুসন্ধান করার

কী প্রয়োজন? তিনি যা বলছেন তাই শুধু বুঝে দেখা ও পালন করাই আমাদের কর্তব্য।' এটাও ঠিক নয়। কোনো ব্যক্তি যদি আমাকে গণিততত্ত্ব বা রসায়নশাস্ত্র বা পদার্থবিজ্ঞানের কোনো বিষয় শিক্ষা দিতে চান তিনি যিনিই হোন না, কিছুই আসে যাচ্ছে না, কারণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রয়োজন, শুধু বুদ্ধিগত আয়োজন-প্রস্তুতি, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অপবিত্র চিত্তে অধ্যাত্ম-আলো থাকতে পারে না। অপবিত্র লোকে কি শেখাতে পারে ধর্ম? যেমন কারো পক্ষে অধ্যাত্ম সত্য অর্জনের জন্য বা অন্যকে ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য যথার্থ উপায় হল হৃদয় ও মনের পবিত্রতা। ঈশ্বরের জ্যোতি দর্শন বা অসীমের একটু ঝিলিক অনুভব সম্ভব হয় না—আত্মাই যদি অপবিত্র থাকে। তাই ধর্মশিক্ষক সম্পর্কে আমাদের প্রথমে দেখতে হবে তিনি কী, এবং তারপরে, তিনি কী বলেন। তাঁকে পূর্ণরূপে পবিত্র হতেই হবে, এবং একমাত্র তাহলেই তাঁর কথায় মূল্য দেখা দেয়, কারণ একমাত্র তখনি তিনি হন যথার্থ 'সঞ্চালক-যন্ত্র' সদৃশ। তার নিজের মধ্যেই যদি আধ্যাত্মিক বল না থাকে তবে কী সঞ্চালিত করবেন? শিক্ষার্থীদের মনে যাতে সহৃদয়ভাবে সঞ্চালিত হতে পারে, সেজন্যে শিক্ষকের মনে যথাযোগ্য অধ্যাত্ম স্পন্দন বিকিরিত হওয়া প্রয়োজন। সত্যসত্যই, শিক্ষকের কাজ হল কিছু-একটা সঞ্চালিত করা, শিক্ষার্থীর মধ্যে বর্তমান বুদ্ধি বা অন্যান্য বৃত্তিকে কেবলমাত্র উত্তেজিত করাই নয়। শিক্ষকের কাছ থেকে বাস্তব প্রশংসাজনক ও সমর্থনযোগ্য কিছু-একটা আশা করা চাই এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে তা সঞ্চারিত হওয়া চাই। তাই শিক্ষককে পবিত্র হতে হবে।

তৃতীয় শর্ত-গুণ হল উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে। শিক্ষক অন্য কোনো স্বার্থের উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেবে না—অর্থের জন্য নয়, নামের জন্য নয়, যশের জন্য নয়; তার সব কাজ উদ্ভূত হবে মানবসাধারণের জন্য। অধ্যাত্মশক্তি সঞ্চালিত হতে পারে একমাত্র প্রেমের পথে। কোনো রকম লাভ বা নামযশের আকাঙ্ক্ষার মতো স্বার্থ-মনোভাব এই বাহক-মাধ্যমকে অবিলম্বেই ধ্বংস করে ফেলে। ঈশ্বর হল প্রেম, এবং ঈশ্বরকে যিনি প্রেমময় রূপে জেনেছেন তিনিই ঐশ্বরিকভাবের বিষয়ে শিক্ষাদাতা হতে পারেন এবং হতে পারেন মানুষের কাছে ভগবানস্বরূপ।

যদি দেখ তোমার শিক্ষকের মধ্যে এইসব শর্তমূলক গুণাবলী পুরোপুরিই আছে তবে বেঁচে গেলে; যদি না থাকে তো তার কাছে শিক্ষালাভ করাটা নিরাপদ নয়, কারণ বিপদ হল সে তোমার হৃদয়ে ঐশ্বরিক গুণ বহন করে আনবে না, আনবে বরং শয়তানের গুণ। সর্বপ্রকারেই এই বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করা চাই।
শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।

—"যিনি শাস্ত্রে বিজ্ঞ, পাপমুক্ত, লোভ-দুষ্ট নন, এবং সর্বোত্তম ব্রহ্মজ্ঞাতা" তিনিই যথার্থ শিক্ষক।

যা বলা হল তা থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে সর্বত্রই এবং সকলেই ভালোবাসায় আমরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে পারি না, উঁচুদৃষ্টিতে দেখতে ও ধর্মের সামঞ্জস্যবোধ রচনা করতেও নয়।

"চলন্ত নদীর স্রোতে গ্রন্থরাজি, প্রস্তরে প্রস্তরে ধর্মবাণী, সর্বত্রই সত্যের প্রকাশ"

—এসব কথা কবিত্ব হিসাবে ভালোই; কিন্তু কোনো মানুষের মধ্যে যদি সত্যের বীজ না থাকে এসব কিছুই তো মানুষকে এককণা সত্যও দান করতে পারে না। প্রস্তর বা নদী ধর্মবাণী প্রচার করে কার কাছে? মানবাত্মার কাছে—অন্তরের পবিত্র মন্দিরে পদ্ম যার প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে। আর এই পদ্মকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে যে আলোক, তা নিঃসৃত হয় সৎ ও বিজ্ঞ শিক্ষকের কাছ থেকে। এইভাবে হৃদয় উন্মীলিত হলে তবেই তা এই স্বর্গীয় বিশ্বের নদী বা পাথর থেকে, সূর্য বা নক্ষত্র থেকে বা যে কোনো কিছু থেকেই শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য হয়, কিন্তু বদ্ধ হৃদয় তো ওদের মধ্যে দেখবে শুধু পাথর বা নদী মাত্র। এক অন্ধ যাদুঘরে যেতে পারে, কিন্তু তাতে সে তো কোনোরকমেই লাভবান হবে না; প্রথমে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে হবে, তারপরে সে নিজেই বুঝে নেবে যাদুঘরের সব জিনিস তাকে কি কি শিক্ষা দিতে পারে।

ধর্মাকাঙ্ক্ষীর কাছে এই দৃষ্টি-উন্মোচনকারীই হলেন শিক্ষাদাতা। তাই শিক্ষকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটি হল পূর্বপুরুষের সঙ্গে বংশধরের সম্পর্কের মতো। ধর্মগুরুর সম্পর্কে হৃদয়ে নম্রতা বশ্যতা এবং শ্রদ্ধা না থাকলে আমাদের মধ্যে ধর্মবোধ জন্মাতেই পারে না; এবং এটা একটা উল্লেখজনক সত্য যে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যেখানে এই সম্পর্ক বিরাজমান, একমাত্র সেখানেই জন্ম নেয় বিরাট অধ্যাত্ম-শক্তিবিশিষ্ট মানবগণ। অন্যদিকে যেসব দেশে এই রকম সম্পর্ক উপেক্ষিত হয় সেখানে ধর্মগুরুরা হয়ে ওঠে বক্তৃতা-দানকারী মাত্র—এবং অপেক্ষা করতে থাকেন তার পাঁচ ডলার দক্ষিণার জন্য, আর শিক্ষার্থীটি অপেক্ষা করতে থাকে ঐ শিক্ষকের মুখের শব্দরাজি দিয়ে তার মস্তিষ্কটি ঠেসে ভরতে; আর তারপর যায় যে যার পথে। এহেন অবস্থায় আধ্যাত্মিকতা হয়ে পড়ে অজ্ঞাত কোনো বিষয়, তা সঞ্চালিত করারও কেউ থাকে না, সঞ্চালিত হবার মতো কেউও নয়। ঐ ধরনের লোকদের কাছে ধর্ম হল এক কারবার বিশেষ; তারা ভাবে টাকার জোরেই তারা তা লাভ করতে পারে। ঈশ্বরের কাছে ঐ ধর্ম যদি এত সহজেই পাওয়া যেত! কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হবার নয়।

যে ধর্ম হল সর্বোত্তম জ্ঞান ও সর্বোত্তম বোধি তা তো কেনা যায় না, বই থেকেও পাওয়া যায় না। দুনিয়ার সর্বত্র প্রবেশ করতে পার, হিমালয়ের আল্পস কি ককেশাসের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পার, সাগরের তলা পরীক্ষা করে দেখতে পার, তিব্বতের আর গোবি সাহারার সমস্ত কোণে কানাচ খুঁজতে পার, কিন্তু তোমার হৃদয় ধর্মকে গ্রহণ করবার মতো প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত এবং তোমার গুরুর আগমন না হওয়া পর্যন্ত ধর্মকে তো কোথাও পাবে না। আর, যখন সেই ঈশ্বর-নিযুক্ত গুরুর আগমন হবে, তাঁকে গ্রহণ করো শিশুর মতো বিশ্বাস ও সরলতা নিয়ে; তাঁর প্রভাবকে বরণ করার উদ্দেশ্যে অবাধে হৃদয় খুলে দাও, দেখো তার মধ্যেই ঈশ্বরের প্রতিরূপ।

অবতার গুরু এবং তাঁর অবতার-রূপ

যেখানেই তাঁর নাম উচ্চারিত হয় সেই স্থানই পবিত্র। যিনি তাঁর নাম-কথা বলেন তিনি কত অগ্রসর, এবং যাঁর নিকট থেকে আমরা অধ্যাত্ম-সত্য লাভ করি তাঁর কাছে আমাদের উচিত সশ্রদ্ধভাবে অগ্রসর হওয়া। আধ্যাত্মিক সত্যের এই রকম মহান শিক্ষক পৃথিবীতে খুব কমই আছেন, কিন্তু তবুও তাঁরা পৃথিবীতে আছেন। মানবজীবনে তাঁরা হলেন সুন্দরতম পুষ্পবিশেষ। অহেতুকদয়াসিন্ধুঃ—"উদ্দেশ্য সূত্রহীন দয়ার সাগর।" আচার্য মাং বিজানীয়াৎ—"আমাকেই গুরু বলে জানো!" —ভাগবতে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। যে মুহূর্তে পৃথিবী থেকে এঁরা সবাই চলে যাবেন, পৃথিবীও হয়ে পড়বে নরকবিশেষ, এবং ধ্বংস হয়ে যাবে।

সাধারণ ধরনের শিক্ষকদের চেয়ে উচ্চস্তরের মহত্তর একশ্রেণীর শিক্ষক আছেন তাঁরা হলেন ঈশ্বরের অবতার। তাঁরা স্পর্শদ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তিকে সঞ্চালিত করতে পারেন—এমন কি ইচ্ছামাত্র। সবচেয়ে নিম্নস্তরের এবং সবচেয়ে পতিত চরিত্রও তাঁদের আদেশে এক মুহূর্তের মধ্যেই সাধুসন্ত হয়ে উঠতে পারেন। তাঁরা হলেন সকল গুরুর গুরু—মানবের মধ্যে ঈশ্বরের সর্বোচ্চ প্রকাশ। তাঁদের বাদ দিয়ে ঈশ্বরদর্শন সম্ভব নয়। স্বতই তাঁদের উপাসনা করতে হয়; আর, বাস্তবিকই একমাত্র তাঁদেরকে আমাদের উপাসনা করতেই হয়। এই মানবিক প্রকাশরূপের মাধ্যম ব্যতীত কেউই সত্যিসত্যি ঈশ্বরকে দর্শন করতে পারে না। অন্যদিক থেকে ঈশ্বরকে দর্শন করতে চাইলে ঈশ্বরকে নিয়ে আমরা গড়ে তুলব জঘন্য যত হাস্যাস্পদ রূপ, আর ঐ রূপকেই মূল ঈশ্বরের চেয়ে নিকৃষ্টও মনে করব না। গল্পে আছে, এক মূর্খকে শিবের মূর্তি গড়তে বলা হয়েছিল, বহুদিনের চেষ্টায় সে গড়ে তুলল কিনা এক বাঁদর। কাজেই, ঈশ্বরকে তাঁর পরম পূর্ণতায় যখনই ঈশ্বররূপে আমরা চিন্তা করি, আমরা বড় করুণভাবে ব্যর্থ হই; কারণ যতক্ষণ আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা তাঁকে মানুষের চেয়ে বড় কিছু বলে ভাবতে পারি না। একদিন আসবে যখন আমরা আমাদের মনুষ্যপ্রকৃতির ঊর্ধ্বে উঠে যাব, এবং তাঁকে তাঁর স্ব-রূপেই জানতে পাব। কিন্তু যে পর্যন্ত আমরা মানুষই আছি তাঁকে মানুষের মধ্যে এবং মানুষ-রূপেই উপাসনা করব। যতই বলো, আর যতই চেষ্টা করো, মানবরূপে ছাড়া ঈশ্বরকে ভাবতে পারবে না। তুমি ঈশ্বর বিষয়ে এবং স্বর্গলোকাধীন সর্ববিষয়েই বড় বড় বুদ্ধিদীপ্ত ভাষণ দান করতে পারো, হতে পারো মস্ত বড় যুক্তিবাদী—তোমার সন্তোষ মতো প্রমাণ করতে পারো যে ঈশ্বরের অবতারদের যেসব পরিচয় পাওয়া যায় সবই অর্থহীন মূর্খতা। কিন্তু, ক্ষণেকের জন্য এসো সাধারণ বাস্তব-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করা যাক। এই ধরনের আশ্চর্য-বুদ্ধির পশ্চাৎপটে কী বর্তমান? শূন্য, কিছুই নয়—কেবলমাত্র ফেনা। এবার যখন শুনতে পাবে ঈশ্বরের অবতারদের বিরুদ্ধে এক মহা-বুদ্ধিমান ব্যক্তির বক্তৃতা হচ্ছে, সোজা গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করো—ঈশ্বর সম্পর্কে তার ধারণাটা কিরূপ, "সর্বজ্ঞ" "সর্বত্র-বিরাজমান" ও সমরূপ শব্দাদির বানানটা ছাড়িয়ে

সে আর কী বোঝে? তার কাছে অবশ্য এদের কোনোই অর্থ নাই, তার নিজ মনুষ্যপ্রকৃতির বাইরের কোনো ভাবই সে তার অর্থরূপে দেখতে পায় না, রাস্তায় একটা লোক, যে কোনোকিছুই পড়াশোনা করেনি—তার চেয়ে সে বেশীকিছু নয়। তবে কিনা রাস্তার লোকটি চুপচাপ থাকে এবং পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিতও করে না, আর এই বাক্যবাজটি মানুষের মধ্যে অশান্তি ও দুর্গতি আনে। সর্বোপরি, ধর্ম হল বোধপ্রাপ্তি, এবং আমাদের অবশ্যই দরকার হল আভ্যন্তরীন স্বতঃ-অভিজ্ঞতাকে বোলচাল থেকে স্বতন্ত্র করে দেখা। আমাদের আত্মার গভীরে যখন কোনো অভিজ্ঞতা দেখা দেয় তখনই তা হয় চেতনা। এ প্রসঙ্গে সাধারণ বুদ্ধির মতো অসাধারণ বুদ্ধি আর কিছুই নয়।

মানুষের বর্তমান সংগঠনের সীমাবদ্ধতার জন্যই ঈশ্বরকে কেবলমাত্র মানুষরূপে দেখতে হবেই। এই ধরো, মোষগুলো ঈশ্বরকে উপাসনা করতে চায়, তখন তারা তাদের প্রকৃতি অনুসারে ঈশ্বরকে দেখবে এক অতিকায় মোষরূপে। একটা মাছ যদি ঈশ্বরকে উপাসনা করতে চায়, ঈশ্বরকে ধারণা করতে হবে প্রকাণ্ড মাছরূপে, এবং মানুষকেও তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে মানুষরূপে। এইসব ধারণা কিন্তু বিকৃতভাবে সক্রিয় কল্পনার ফল নয়। মানুষ মোষ মাছ—এইগুলিকে ভাবা যাক নানারকম পাত্রেরই প্রতীক। এইসব পাত্রই ঈশ্বররূপী সমুদ্রে পৌছাচ্ছে—যার যা আকার ও ক্ষমতা অনুযায়ী জলপূর্ণ হবার জন্য। মানুষের ক্ষেত্রে জল আকার পাচ্ছে মানুষের, মহিষের ক্ষেত্রে মহিষের আকার, মাছের ক্ষেত্রে মাছের আকার। প্রত্যেকটি পাত্রেই রয়েছে ঈশ্বররূপী সাগরের একই জল। মানুষ তাঁকে দেখবার সময় দেখে মানুষরূপে, আর জীবজন্তুরা—ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনোরূপ ধারণা সম্ভব হলেই অবশ্য, ঈশ্বরকে দেখতে পেত জীবজন্তু রূপেই—যার যেমন আদর্শ তেমনি রূপেই। সুতরাং ঈশ্বরকে মানুষরূপে না দেখে উপায় কি, আর তাই তাঁকে মানুষরূপেই উপাসনা করতে হয় বৈ'কি! নান্য পন্থা।

দুই প্রকারের লোক ঈশ্বরকে মানুষরূপে উপাসনা করে না, এক হল মনুষ্যরূপী পাষণ্ড—যার কোনো ধর্মবোধ নেই, আর এক হলেন পরমহংস—যিনি মানুষের সবরকম দৌর্বল্যের উর্ধ্বে উঠে গেছেন, নিজের মনুষ্যপ্রকৃতির সমস্ত বন্ধন-সীমা যিনি পার হয়ে গেছেন। তাঁর কাছে তো সমস্ত প্রকৃতিই তাঁর আত্মপ্রকৃতি। একমাত্র তিনিই পারেন ঈশ্বরকে আত্মরূপেই আরাধনা করতে। 'এবং এখানেই, অন্য ক্ষেত্রাদির মতোই দুই বিপরীত দিকের মিলন ঘটে যায়। এক চরম অজ্ঞতা, অন্য চরম জ্ঞান— এ দুটোর কোনোটাই উপাসনার ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না। মনুষ্যরূপী পাষণ্ড উপাসনা করে না তার অজ্ঞতা হেতু, তার জীবন্মুক্তগণ (মুক্তাত্মাগণ) উপাসনা করেন না, যেহেতু তাঁদের নিজেদের মধ্যেই ঈশ্বরের বোধ ঘটে। এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী অবস্থায় থেকেও কেউ যদি বলেন—তিনি মানবরূপেই ঈশ্বরকে উপাসনা করবেন না, তার সম্পর্কে একটু বুঝেসুঝে চলবে; বেশী রুক্ষ শব্দ ব্যবহার না করলে বলতে হয় সে যা-খুশি বলে; আর তার ধর্মটি হল বিকৃতমস্তিষ্ক ও শূন্যমগজওয়ালাদের জন্যই।

ঈশ্বর মানবের দুর্বলতার কথা হৃদয়ঙ্গম করেন, তাই মানবের কল্যাণের জন্য দেখা দেন মানবরূপে।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌।
ধর্ম সংস্থাপনায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

—"যখনি ধর্মের নতি ঘটে ও দুষ্টের আধিপত্য সুরু হয়, আমি প্রকাশিত হই। ধর্মসংস্থাপনা ও অধর্মের বিনাশের জন্য সৎব্যক্তিদের রক্ষণের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।"

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥

—"মূর্খেরা বিশ্বপতি রূপে আমার প্রকৃত সত্তার কথা জেনে মানবরূপে আমার স্বরূপকে দেখে উপহাস করে।"—অবতার সম্পর্কে গীতায় শ্রীকৃষ্ণের ঘোষণা এইরূপই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন—"বিরাটাকার বন্যা এলে সব নদী-নালাই কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাদের দিক থেকে কোনো প্রচেষ্টা বা চেতনারও প্রয়োজন হয় না; তেমনি যখন তাঁর আবির্ভাব ঘটে, আধ্যাত্মিকতার বন্যা সমগ্র জগতকে সহসা প্লাবিত করে, আর সবাই অনুভব করে আকাশে বাতাসেও আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ জাগরণ।"

এবারে মহা-অবতার মহাপুরুষদের সম্পর্কে নয়, কেবলমাত্র আলোচনা করছি সিদ্ধগুরুদের সম্পর্কে (যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন অর্থাৎ লক্ষ্যে পৌছেছেন); তারা শিষ্যকর্তৃক ধ্যেয়মন্ত্রের সাহায্যেই শিষ্যদের মধ্যে অধ্যাত্মজ্ঞানের বীজ বপন করে থাকেন। এই মন্ত্র কিরূপ? ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রমতে নিখিল বিশ্বের প্রকাশে আছে নাম ও রূপ দুই-ই। মানবিক ক্ষুদ্রসৃষ্টিতে নামরূপ-শর্তমুক্ত অবস্থায়, চিত্তবৃত্তিতে একটিমাত্র তরঙ্গও থাকা সম্ভব নয়। প্রকৃতি সম্পূর্ণতই কোনো পরিকল্পনার মতো সংগঠিত; একথা যদি সত্য হয় তো নিখিল বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারেও ঐ রকম নাম-রূপের শর্ত নিশ্চিতই আছে। যথা একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ।—"এক মুঠো মাটিকে জানলেই যেমন মাটির তৈরী সব জিনিসকে জানা হয়", তেমনি ক্ষুদ্রতম মানব সৃষ্টির জ্ঞানই নিয়ে যাবে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির জ্ঞানের দিকে। এখন, আকার হল বাহিরের আবরণ, আর তার নাম বা ভাব হল ভিতরের সার বা শাঁস। দেহ হল এই আকার, আর মন বা অন্তঃকরণ হল নাম, এবং ধ্বনি-প্রতীকগুলি সর্বত্রই বাক্‌শক্তিসম্পন্ন জীবের ক্ষেত্রে নাম-এর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ 'মহৎ'-এ বা চিত্তে (চিত্তবৃত্তিতে) উত্থিত চিন্তাতরঙ্গ প্রথমে দেখা দেবে শব্দরূপে, এবং তারপরেই জটিলতর আকারাদিরূপে।

বিশ্বজগতে ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ অথবা বিশ্বমহৎ প্রথমে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন নাম-রূপে, তারপর আকার-রূপে অর্থাৎ এই বিশ্ব-রূপে। এই সম্পূর্ণ প্রকাশিত বোধগম্য আকার হল বিশ্ব, তার পশ্চাতে রয়েছে চিরন্তনরূপে অব্যক্ত 'স্ফোট'—বিশ্বশক্তির প্রকাশরূপ বা শব্দ। এই চিরন্তন স্ফোট—সমস্ত আদর্শ বা নামাদির অনিবার্য এক চিরন্তন উপাদান—হল এমন এক শক্তি, যার মাধ্যমে বিশ্ব-অধিকর্তা সৃষ্টি করেছেন এই বিশ্ব; না, অধিকর্তা স্বয়ং প্রথমে অধীন-রূপ গ্রহণ করেন স্ফোটরূপে, এবং তারপর নিজেকে বিবর্তিত করে তোলেন আরো প্রমূর্ত চেতনময় বিশ্বরূপে। এই স্ফোটের জন্য একটিমাত্র সম্ভাব্য প্রতীক আছে এবং তাই হল ওঁ (ওম্)। যেহেতু কোনোরকম বিশ্লেষণের দ্বারাই ভাব থেকে আকারকে পৃথক করা যায় না, এই ওম্ এবং নিত্য চিরন্তন স্ফোট হল অভিন্ন; এবং সেইহেতুই সমস্ত শব্দের মধ্যে পবিত্রতম—সমস্ত নাম ও রূপের জননী এই ওম্ থেকেই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে মনে করা হয়। কিন্তু এটা বলা যায়, ভাব ও ভাষা যদিও অভিন্ন, তবু একই ভাবের জন্য থাকতে পারে বহু শব্দপ্রতীক; এবং তাই, এই বিশেষ ওম্ শব্দটিই বিশ্বপ্রকাশক ভাবের প্রতিনিধিত্ব করবে, এমন প্রয়োজন হয় না—এহেন আপত্তির উত্তর হল: এই ওম্-ই একমাত্র সর্বব্যাপী শব্দ—এর দ্বিতীয় নাই। স্ফোট হল সমস্ত শব্দের উপাদান বটে, তবু তার পূর্ণাঙ্গ রূপে গঠিত অবস্থায় কোনো নির্দিষ্ট শব্দবিশেষ নয়। অর্থাৎ কিনা এক শব্দ থেকে আর এক শব্দের পার্থক্য সৃষ্টিকারী সমস্ত বৈশিষ্ট্য যদি দূরীভূত হয়, তবে যা থাকে তা হল স্ফোট; তাই এই স্ফোটকে বলা হয় নাদ-ব্রহ্ম—শব্দ-ব্রহ্মন্। এখন, অব্যক্ত স্ফোটকে প্রকাশের অভিপ্রায়ে প্রতিটি শব্দ-প্রতীকই তাকে এতটা সুনির্দিষ্ট করে

তুলবে যে তা আর স্ফোট থাকবে না ; মোটেই সুনির্দিষ্ট না করেও যে প্রতীক প্রায় সর্বাংশেই তার প্রকৃতিকে প্রকাশিত করে তাই হয় যথার্থ প্রতীকরূপে 'ওম্' এবং একমাত্র 'ওম্'। কারণ, এই ত্রি-অক্ষর অ উ ম সংযুক্ত হয়ে ওমরূপে উচ্চারিত হয়ে সমস্ত সম্ভাবিত শব্দেরই সাধারণ প্রতীক হতে পারে। 'অ' অক্ষরটি সমস্ত শব্দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম-ভেদাত্মক, তাই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—অক্ষরাণাং অকারোঽস্মি —"অক্ষরাদির মধ্যে আমি অ।" এখন, সমস্ত উচ্চার্য ধ্বনিরই সৃষ্টি হয় মুখ-গহ্বরস্থ জিহ্বামূল থেকে সুরু করে অধরোষ্ঠ থেকে—কণ্ঠধ্বনি হল অ, ম হল ওষ্ঠধ্বনি, এবং উ হল জিহ্বামূল থেকে ওষ্ঠ পর্যন্ত অগ্রসর এক বেগ বিশেষ। এই ওম্ যথাযথভাবে উচ্চারিত হলে ধ্বনি-সৃষ্টির সম্পূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ডকে বোঝায়, অন্য কোনো শব্দেই এমনটা বোঝায় না। তাই ওম্ হল স্ফোটের যোগ্যতম প্রতীক—এবং স্ফোট হল ওম্ শব্দেরই সঠিক অর্থবাচক। প্রতীক যেহেতু উদ্দিষ্ট বস্তু থেকে কখনই পৃথক হতে পারে না, ওম্ এবং স্ফোট তাই এক ও অভিন্ন। এবং স্ফোট যেহেতু প্রকাশিত বিশ্বের সূক্ষ্মতর রূপে ঈশ্বরের অধিকতর নিকটবর্তী এবং ঐশ্বরিক বিজ্ঞানের প্রথম অভিব্যক্তি, সেইহেতু এই ওম্-ই ঈশ্বরের যথার্থ প্রতীক। আবার 'এক ও অদ্বিতীয়' ব্রহ্ম—যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—যিনি অভেদরূপে জীবন-জ্ঞান-শান্তি, তাঁকে অসম্পূর্ণ মানবাত্মা কেবল বিশেষ দিক থেকে বিশেষ গুণযুক্ত রূপেই ধারণা করতে পারে, এবং এই বিশ্বসৃষ্টির ক্ষেত্রেও তাই।

প্রভাবশালী উপাদানাদি বা তত্ত্বাদি দ্বারাই আরাধনাকারীর মনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। তার ফলে একই ঈশ্বরকে দেখা যাবে বহুরকম অভিব্যক্তিতে, বহুরকম প্রকৃষ্ট গুণাবলীর অধিকারী রূপে, এবং এই এক বিশ্বই দেখা দেবে বহুরকম আকারে। সর্বাপেক্ষা কম-ভেদাত্মক ও সর্বাপেক্ষা সার্বজনীন প্রতীকরূপী ওম্-এর প্রসঙ্গেও ভাব ও ধ্বনি অভেদাত্মক রূপে পরস্পর সম্পর্কান্বিত, এবং অনুরূপ ভাবেই এই অভেদাত্মক সম্বন্ধ-সূত্রটি ঈশ্বর ও বিশ্ব সম্পর্কে বহু ভেদাত্মক মতের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে ; কাজেই প্রত্যেক ক্ষেত্রে তার প্রকাশের জন্য শব্দপ্রতীক থাকতেই হয়। এই শব্দপ্রতীক সূত্রেই ঋষিদের গভীরতম আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থেকে জন্মলাভ করে, ঈশ্বর ও বিশ্ব সম্বন্ধে যতটা সম্ভব সুনির্দিষ্ট মতকে প্রতীক-রূপ দেয় এবং প্রকাশ করে। ওম্ যেমন বোঝায় অখণ্ডকে—অভেদাত্মক ব্রহ্মকে, অন্যগুলি বোঝায় খণ্ডকে—ঐ সত্তারই খণ্ড রূপকে ; এবং এই সবই ঈশ্বর-ধ্যানে ও প্রকৃত জ্ঞানার্জনে সহায়ক হয়।

প্রতিরূপ ও মূর্তির আরাধনা

এবারে যেদিকগুলি বিবেচনা করতে হবে তা হল প্রতীক-পূজা অথবা ঈশ্বরের প্রতিরূপ হিসাবে কমবেশী সন্তোষজনক যা-কিছু তার পূজা এবং প্রতিমা-পূজা। প্রতীক মাধ্যমে ঈশ্বর-পূজা বলতে কী বুঝায়? তা হল—অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যাহনুসন্ধানম্—"যা ব্রহ্ম নয় তাকেও ব্রহ্ম ভেবে ভক্তিভরে পুজো করা"—বলেছেন ভগবান রামানুজ। "মনকে ব্রহ্মরূপে পূজা কর, এটা হল অন্তরঙ্গ ব্যাপার; এবং আকাশকে ব্রহ্মরূপে পূজা কর, এটা হল দেবতা প্রাসঙ্গিক।"—বলেছেন ভগবান শঙ্কর। মন হল এক আন্তর-প্রতীক, আর আকাশ হল বহিঃ-প্রতীক; এই উভয়কেই ঈশ্বরের প্রতীকরূপে পূজা করতে হবে। তিনি আরো বলেছেন—"অনুরূপভাবে সূর্য হল ব্রহ্ম, এবং তা হল আদেশ, নামকে যে ব্রহ্মরূপে পূজা করে—এমনধারা অনুচ্ছেদগুলিতে প্রতীক-পূজা সম্পর্কে সন্দেহের উৎপত্তি হয়।" প্রতীক শব্দের অর্থ হল অভিমুখে গমন করা; প্রতীক-উপাসনা অর্থ হল প্রতিরূপ হিসাবে এমন কিছুর উপাসনা করা, যা এক বা একাধিক বিষয়ে ক্রমেই ব্রহ্মের ন্যায়, যদিও তা ব্রহ্ম নয়। শ্রুতিতে উল্লিখিত প্রতীক ছাড়াও পুরাণে ও তন্ত্রে আছে বহু প্রকার প্রতীক। এই জাতীয় প্রতীক-উপাসনার মধ্যে ধরা যায় বিভিন্ন প্রকারের পিতৃ-উপাসনা ও দেব-উপাসনা।

এখন, ঈশ্বরকে এবং একমাত্র তাঁকেই উপাসনা করাই হল ভক্তি; দেব বা পিতৃ অথবা অনুরূপ কিছুর উপাসনা ভক্তি নয়। বিভিন্ন প্রকারের দেবতাদের বিভিন্ন প্রকারের উপাসনা হল ক্রিয়াকাণ্ডমূলক কর্মের অন্তর্গত এবং সেটা উপাসকের মনে একপ্রকারের স্বর্গীয় উপভোগ রূপেই শুধু দেখা দিতে পারে,—ভক্তিস্তরে উঠতে পারে না, বা মুক্তির দিকে অগ্রসর করে দিতে পারে না। একটা কথা তাই সযত্নে মনে রাখতে হবে যদি সর্বোচ্চ দার্শনিক আদর্শস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে প্রতীক-উপাসনার দ্বারা প্রতীকের স্তরে নামিয়ে আনা হয় (যেমনটা অনেক সময় হয়ে থাকে), এবং প্রতীককেই যদি উপাসকের আত্মারূপে বা তার অন্তর্যামী রূপে গ্রহণ করা হয়, তবে উপাসক বিপথগামী হয়ে পড়ে; কারণ কোনো প্রতীকই উপাসকের আত্মা হতে পারে না। অন্যপক্ষে ব্রহ্মই হল যেখানে উপাসনার বিষয় এবং প্রতীক হল প্রতিরূপ বা ইঙ্গিত মাত্র এবং যার মাধ্যমে সর্বত্র বিরাজমান ব্রহ্মকেই উপাসনা করা হয়—সেখানে প্রতীককেই আদর্শ মূর্তিতে করা হয় সর্ব-কারণনিয়ন্তা ব্রহ্ম এবং সেই উপাসনা নিশ্চিতই কল্যাণকর; কেবল তাই নয়, এটা সর্বমানবের জন্যই একান্ত প্রয়োজন—যে পর্যন্ত উপাসনা প্রসঙ্গে মনের প্রাথমিক বা প্রস্তুতি অবস্থাটা তারা পার না হয়। কাজেই যখনি কোনো দেবতাকে বা অন্যসৃষ্টিকে তাদের স্ব-ভূমিকায়ই উপাসনা করা হয়, সেই উপাসনা হয় কেবলমাত্র ধর্মকর্ম; এবং বিদ্যা (বিজ্ঞান)-রূপে তা ঐ নির্দিষ্ট বিদ্যাধীন ফলমাত্রই দান করতে পারে; কিন্তু দেবতা বা অন্য কোনোকিছুকে যখন ব্রহ্মরূপে দেখে উপাসনা করা হয়, তখন ঈশ্বর-উপাসনার সমফল লাভ করা যায়। স্মৃতি ও শ্রুতি শাস্ত্রের অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় দেবতা বা ঋষিরা কোনো

অসাধারণ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে উর্ধ্বে তুলে ধরা হয়,—যেন তাঁকে তাঁর প্রকৃতি থেকেই আদর্শায়িত করে তোলা হয় ব্রহ্মরূপে এবং তাঁকেই তখন উপাসনা করা হয়। অদ্বৈতবাদী বলেন—"নাম ও রূপ বাদ দিলে সবই কি ব্রহ্ম নয়?" "যিনি প্রভু তিনিই কি প্রত্যেকের অন্তরতম আত্মা নন?"—বলেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। ফলম্ আদিত্যাদ্যুপাসনেষু ব্রহ্মৈব দাস্যতি সর্বাধ্যক্ষত্বাৎ—"ব্রহ্ম স্বয়ং এমনকি আদিত্যাদির উপাসনার ফল দান করেন, কারণ তিনি হলেন সর্বনিয়ন্তা।" শঙ্কর তাঁর ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্যে বলেছেন—ঈদৃশং চাত্র ব্রহ্মণঃ উপাস্যত্বং যতঃ প্রতীকেষু তদ্দৃষ্ট্যাধ্যারোপণং প্রতিমাদিষু ইব বিষ্ণ্বাদীনাম্—"এইভাবেই ব্রহ্ম হন উপাসনার বস্তু, কারণ তিনি ব্রহ্মরূপে প্রতীকাদির উপরে আরোপিত হন, যেমন বিষ্ণু প্রভৃতির উপরে প্রতীক আরোপিত হয়।"

এইরূপ ভাব প্রতীক-উপাসনার মতো প্রতিমার উপাসনার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়ে থাকে,—অর্থাৎ কিনা প্রতিমা যদি কোনো দেবতা বা সাধুর হয়, এবং উপাসনা ভক্তি অনুযায়ী হয়, তা মুক্তির দিকে পরিচালিত করে না, কিন্তু তা যদি এক ভগবানের জন্য হয় তো ভক্তি ও মুক্তি দুটোই আসে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মের মধ্যে আমরা পাই বৈদান্তিক ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং খ্রীষ্টধর্মের কোনো কোনো শাখা—যা সরাসরি প্রতিমা ব্যবহার করেন; কেবলমাত্র দুটি ধর্ম—মুসলিমধর্ম ও প্রটেস্টান্ট শ্রেণীর ধর্ম ঐরকম কোনো সাহায্য গ্রহণ করে না। মুসলমানগণ তবু অনেকটা দরগা স্থলেই হাকেজ ও শহীদগণের কবরস্থান করে থাকেন। আর প্রটেস্টান্টগণ ধর্মের ব্যাপারে বাস্তব বা সুস্পষ্ট সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে দিনের পর দিন আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে কেবলই দূর থেকে এতদূরে চলে যাচ্ছে যে, এখন অগ্রসর প্রটেস্টান্ট ও অগস্ট কোমত্-এর শিষ্যবৃন্দ তথা কেবলমাত্র নীতিবাদ-প্রচারক অজ্ঞেয়বাদীদের মধ্যে বড় একটা পার্থক্য নেই।

আবার, খ্রীষ্টানধর্মে কি মুসলিমধর্মে যেটুকু প্রতিমা-উপাসনা আছে, প্রতীক বা প্রতিমা-উপাসনারই জন্য, ঈশ্বরের 'দৃষ্টিসৌকর্যম্'-এর জন্যই অর্থাৎ দর্শনের সহায়তার জন্যই নয়। কাজেই তাকে বড়জোর বলা যায় ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড, আর তা ভক্তি বা মুক্তি কোনোটাই আনতে পারে না। এই ধরনের প্রতিমা-উপাসনায় ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে অন্যকিছুর দিকেই নিষ্ঠাকে প্রয়োগ করা হয়, আর তাই এই ধরনের প্রতিমা বা কবরস্থান বা মন্দির বা সমাধি-স্তম্ভ ব্যবহারই তো পুতুলপূজা; একদিক থেকে দেখলে এটা পাপ বা অন্যায় নয়—এটা আচারানুষ্ঠান—এটা একরকম কর্ম, এবং তা থেকে যেমনটা ফল পাওয়া যায় তা উপাসকেরা পায়ও।

বাঞ্ছিত আদর্শ

ইষ্টনিষ্ঠার দ্বারা আমরা কী বুঝি এবারে তাই দেখা হবে। যিনিই ভক্ত হতে চান তাঁর জানা চাই—"যত মত, তত পথ।" তাঁর জানা দরকার বিভিন্ন প্রকার ধর্মের বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণী হল এক ভগবৎ-মহিমারই বিচিত্র প্রকাশ। "লোকে তোমাকে কত নামেই ডাকে, কিন্তু তার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তো তোমার সর্ববিরাজমান স্বরূপ··· তুমি উপাসকের কাছে এই সবরূপেই উপস্থিত হও; তোমার প্রতি মনেপ্রাণে যতক্ষণ নিবিড় প্রেম রয়েছে, ততক্ষণ তো স্থলগন বলে স্বতন্ত্র কিছু নেই। তোমার প্রবেশদ্বার কত অবাধ; কিন্তু আমি অভাগা, তোমাকে ভালোবাসতে পারি না।" শুধু এ নয়, ভক্তকে দেখতে হবে তার মধ্যে যেন ঘৃণা না থাকে, এমন কি বিভিন্ন ধর্মশাখার প্রবর্তকরূপে যাঁরা আলোকবর্তিকা—তাঁদের সমালোচনাও নয়, তাঁদের কোনোরকম নিন্দা শোনাও নয়। খুব কম লোকই পাওয়া যায় যাঁর মধ্যে একাধারেই আছে অসীম সহানুভূতি এবং সপ্রশংসা মনোভাবমূলক ক্ষমতা, এবং তারই সঙ্গে সুনিবিড় ভালোবাসা। আমরা সাধারণত নিয়মমতো দেখতে পাই উদার ও সহানুভূতিশীল সম্প্রদায়গুলি ধর্মানুভবের তীব্রতা হারিয়ে ফেলে, এবং তাদের দ্বারা ধর্ম অধঃপতিত হতে হতে যেন এক রাজনৈতিক-সামাজিক ক্লাব-জীবনে পর্যবসিত হয়। অন্যপক্ষে, অত্যন্ত সঙ্কীর্ণমনা দলও নিজেদের দলীয় আদর্শে খুবই প্রশংসাজনক অনুরাগ দেখালেও সেই অনুরাগের প্রতিটি কণা তারা অর্জন করেছে পরমতাবলম্বীদের প্রত্যেককেই ঘৃণা করে। ভগবানের কাছে এই পৃথিবীটা যদি ভালোবাসার এবং মহানুভব লোকেই পূর্ণ থাকত! কিন্তু এমন তো বড় একটা দেখা যায় না। তবু আমরা জানি মানবলোকের অনেককেই প্রেমের গভীরতা ও বিশালতার মধ্যে সুন্দর সমন্বয়ের সৃষ্টির আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার শিক্ষাদান কার্যত সম্ভব। এবং এটা সম্ভব ইষ্টনিষ্ঠার পথে অর্থাৎ "বাঞ্ছিত আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তির পথে"। মানবজাতির সম্মুখে প্রত্যেক ধর্মের প্রতিটি শাখার আছে একটিমাত্র আদর্শ, কিন্তু চিরন্তন বৈদান্তিক ধর্ম বিশ্বমানবের কাছে খুলে দিয়েছে আধ্যাত্মিকতার অন্তর-মন্দিরে প্রবেশের জন্য অসংখ্য দ্বারপথ,—বিশ্বমানবের সামনে তুলে ধরেছে আদর্শের অশেষপ্রায় রূপ, আর তার প্রত্যেকটিতেই বর্তমান চিরন্তন এক-এরই প্রকাশ। বেদান্ত বড় সহৃদয়ভাবে আকাঙ্ক্ষী নরনারীদের কাছে পথনির্দেশ দান করছে—কত প্রকারের কত পথ, কি অতীতে কি বর্তমানে, মানবজীবনের বাস্তব-কঠিন প্রস্তরভূমি থেকেই কেটে বার করেছেন যত মহান সন্তানেরা, এবং সেপথ দু-হাত বাড়িয়ে সকলকেই আহ্বান করছে—এমনকি যারা অনাগত তাদেরকেও আহ্বান করছে সত্যের সেই আলয়ে এবং সেই শান্তি-সাগরে—যেখানে মায়াজালমুক্ত মানবাত্মা নিজেই পৌঁছতে পারে পূর্ণ-স্বাধীনরূপে এবং চিরন্তন আনন্দে।

ভক্তিযোগ তাই বিশেষ করে গ্রহণীয় এই আদেশ দিচ্ছে যে কাউকেই ঘৃণা করো না কিংবা মুক্তির অভিমুখীন কোনো পথকেই অস্বীকার করো না। কিন্তু তবু বাড়ন্ত চারাকে চারদিকে বেড়া দিয়ে রক্ষা করতেই হয়—যে পর্যন্ত না তা বৃক্ষ হয়ে ওঠে। ভাব ও আদর্শের অবিরত পরিবর্তনের মধ্যে ঠিক সময়টির আগেই অনাবৃতভাবে থাকলে

কচি চারাটি তো মরে যাবে। ধর্মীয় উদারতার নামে বহুলোককেই দেখা যায়, অলস ঔৎসুক্যের খাতিরে কেবলই তারা আদর্শ পাল্টেই চলেছেন। তাদের পক্ষে নতুন-কিছু শোনাটাই এক রোগবিশেষ—এক ধরনের ধর্মীয় প্রান-বাতিক। তারা নতুন-নতুন ধরনের কিছু শুনতে চায় কেবল সাময়িক এক স্নায়বিক উত্তেজনা উপভোগের জন্যই, যখন তাদের উপর একজাতীয় উত্তেজনার ফল দেখা দেয় তো আরেক উত্তেজনার জন্য প্রস্তুত হয়। এই লোকদের কাছে ধর্ম হল একজাতীয় বুদ্ধিগ্রাহ্য আফিমের নেশা, আর এইখানে এসেই তাদের শেষ হয়। ভগবান রামকৃষ্ণ বলেছেন—"আর একরকমের লোক আছে, তারা হল গল্পকথিত সেই মুক্তো-খোলসের মতো। শুক্তি সমুদ্রের তলভূমি ছেড়ে জলের উপরদিকে উঠে আসে বারিবর্ষণ গ্রহণ করবার জন্য—স্বাতী নক্ষত্রের ঠিক উদয়-লগ্নটিতে। শুক্তির মুখটি খুলে রেখে সে সমুদ্রের উপরে ভাসতে থাকে—বর্ষাজলের একটি ফোঁটা ধরতে পারা পর্যন্ত, আর তারপর নেমে আসে সমুদ্রের তলায়,—ঐ বৃষ্টির ফোঁটাটি থেকে সুন্দর মুক্তোটি গড়ে তোলা পর্যন্ত সে বিশ্রাম করতে থাকে।"

ইষ্টনিষ্ঠা-নীতি চিরকাল যেভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে এটা হল তাদের মধ্যে সবচেয়ে কবিত্বময় অথচ সবচেয়ে জোরালো পন্থা। এই একনিষ্ঠা বা একমাত্র আদর্শ-নিষ্ঠাই সবচেয়ে দরকার ধর্মভক্তির ক্ষেত্রে প্রথম পদচারণার জন্য। রামায়ণের হনুমান চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলতে হবে—"আমি জানি, শ্রী-র প্রভু ও জানকীর-প্রভু দুজনেই হল পরমপুরুষের একই অভিব্যক্তি, তবু আমার সর্বস্ব হল কমলনয়ন রাম।" কিংবা তুলসীদাসের মতো তাকে বলতে হবে—"সকলের মাধুর্য গ্রহণ করো, সকলের সঙ্গে উপবেশন করো, সকলের নাম লও; বলো হাঁ, হাঁ, কিন্তু নিজের আসনটি দৃঢ় রেখো।" তারপর ভক্তি-আকাঙ্ক্ষী লোকটি যদি নিষ্ঠাবান হয়, ক্ষুদ্র বীজটি থেকেই বার হবে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ—ভারতের বটবৃক্ষের মতোই সবদিকে শাখার পর শাখা ও শিকড়ের পর শিকড় বিস্তার করে সমস্ত ধর্মক্ষেত্রই আচ্ছাদিত করে তুলবে। এইভাবেই সত্যিকার ভক্ত হৃদয়ঙ্গম করবে, যিনি ছিলেন তার নিজের জীবনের আদর্শ তাঁকেই তো উপাসনা করে সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়—কত নামে কত রূপে।

প্রণালী ও পন্থা

ভক্তিযোগের প্রণালী ও পন্থা প্রসঙ্গে ভগবান রামানুজের বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে আমরা দেখি: "তৎ-এর প্রাপ্তি ঘটে অবিভেদের মাধ্যমে ও কামাদি দমনের মাধ্যমে, অভ্যাস আত্মত্যাগমূলক কর্ম পবিত্রতা শক্তি ও আত্যন্তিক সুখ দমনের মাধ্যমে।" রামানুজের মতে বিবেক বা বিভেদ হল অন্যসব কিছুর মধ্যেই বিশুদ্ধ খাদ্য থেকে অবিশুদ্ধ খাদ্যের বিভেদ-বিচার। তাঁর মতে খাদ্য দূষিত হওয়ার কারণ তিনটি: (১) খাদ্যের স্বনিহিত প্রকৃতি—যেমন রসুন ইত্যাদি; (২) দুষ্ট ও অপরাধী ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাপ্তি এবং (৩) পদার্থগত অপবিত্রতা, যেমন, ময়লা বা লোম প্রভৃতি। শ্রুতি বলেন—"খাদ্য পবিত্র হলে সত্ত্ব উপাদানও পবিত্র হয়, এবং স্মৃতি হয় বিনিশ্চল।"—রামানুজ এটা উদ্ধৃত করেছেন ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে।

ভক্তদের দিক থেকে খাদ্যের প্রশ্নটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো কোনো ভক্তদলের বাড়াবাড়ির কথা বাদ দিলেও এই খাদ্যের প্রশ্নে নিহিত রয়েছে এক বড় সত্য। আমাদের মনে রাখা দরকার সাঙ্খ্য দর্শনের মতে সত্ত্ব: রজ: তম: প্রকৃতির সম্মিলিত এক সাম্য-বস্থা এবং বিশ্বের বৈষম্যমূলক অশান্ত অবস্থা—এই দুই ক্ষেত্রেই তা হল প্রকৃতিরই পদার্থ ও গুণ। প্রত্যেকটি মানবদেহ ঐ উপাদান থেকেই গঠিত হয়েছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সত্ত্ব-উপাদানের প্রাধান্য একান্তভাবেই প্রয়োজন। আমাদের দেহ-সংগঠনে খাদ্য থেকে যে উপাদান আমরা পাই, আমাদের মানসিক গঠনকে তা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে; এবং সেইজন্যই কোন্ খাদ্য আমরা গ্রহণ করছি সে প্রসঙ্গে সচেতন থাকা দরকার। তবে, এ ব্যাপারেও অন্য ব্যাপারের মতোই বহু শিষ্যই যেরকম উন্মাদনা দেখিয়ে থাকে সেরকমটা না হয়ে গুরুদের উপর নির্ভর করাটাই কর্তব্য।

তবে, এই খাদ্যবিচারটা হল গৌণ প্রয়োজনেরই ব্যাপার। উপরি-উদ্ধৃত ঐ অনুচ্ছেদই শঙ্কর তাঁর উপনিষদীয় ভাষ্যে ব্যাখ্যা করেছেন অন্যভাবে—যে—আহার শব্দ সাধারণত খাদ্যরূপে ব্যাখ্যাত হয়ে থাকে তাকে তিনি দিয়েছেন এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থ। তাঁর মতে—"যা আহৃত হয় তাই আহার। শব্দ ইত্যাদি অনুভূতি-লব্ধ জ্ঞান উপভোক্তার উপভোগের জন্যই অন্তরে আহৃত হয়; ইন্দ্রিয় চেতনার পথে যে জ্ঞান লাভ হয় তার বিশুদ্ধীকরণই হল আহারের (খাদ্যের) বিশুদ্ধীকরণ। 'খাদ্য বিশুদ্ধীকরণ শব্দটির অর্থ হল আসক্তি, অনীহা, বিভ্রান্তি; এমনটাই অর্থ। সুতরাং এইরূপ জ্ঞান বা বিশুদ্ধ আহার হল অধিকারীর সত্ত্ব উপাদান-রূপ যা অন্তরঙ্গ বাহন—তারই বিশুদ্ধি-করণ হবে, আর ঐ সত্ত্বের বিশুদ্ধীকরণ হলেই যে অনন্তকে শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে তাঁর প্রকৃত স্বভাবে জানা যায় সেই অনন্তের অব্যাহত স্মরণ জেগে ওঠে।"

উক্ত দুটি ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে বিরোধজনক, কিন্তু দুটিই প্রকৃত ও প্রয়োজনীয়। যাকে সূক্ষ্মদেহ বা মন বলে—তাকে পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করাটা নিশ্চয়ই রক্তমাংসের স্থূল দেহকে নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে উচ্চতর কাজ। কিন্তু সূক্ষ্মতর নিয়ন্ত্রণে

পৌঁছতে হলে অবশ্যই স্থূলতর দিকটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রথম পথচারীকে তাই আবশ্যিকভাবেই শিক্ষাদাতা-প্রদর্শিত পথে আহার নিয়মপদ্ধতির দিকে মনোযোগ দিতে হবে। কিন্তু বাড়াবাড়ি ও অর্থহীন উন্মার্গগামিতা ধর্মকে একেবারে হেঁশেলের জিনিস করে তুলছে (যেমন আমাদের অনেক শ্রেণীর মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়—এবং যেখানে ধর্মের মহৎ সত্য আধ্যাত্মিকতার সূর্যালোকে প্রকাশিত হবে এমন কোনোই আশা নেই) এবং ধর্ম হয়ে উঠেছে স্রেফ বস্তুতান্ত্রিকতা। এটা জ্ঞানও নয়; ভক্তিও নয়; কর্মও নয়; এটা হল একজাতের উন্মত্ততা; আর যারা তাতেই মেতে থাকে তাদের ব্রহ্মলোকে যাবার কথা নয়—যাবার কথা পাগলা গারদে। কাজেই যুক্তিযুক্তভাবে বলা যায়, মানস-গঠনের উচ্চতর ক্ষেত্রে উঠবার উদ্দেশ্যে খাদ্যনির্বাচনে ভেদাভেদ-বিচার প্রয়োজন—অন্যথা তা সহজে হয় না।

কাম দমন হল পরবর্তী মনযোগের বিষয়। ইন্দ্রিয়ভোগের বস্তুর দিকে আকর্ষণ থেকে ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করাট —তাদের নিয়ন্ত্রণ করে ইচ্ছাশক্তির অধীনস্থ করাটা হল ধর্মসংস্কৃতির কেন্দ্রীয় গুণ বিশেষ। এরপরে আসে সংযম অভ্যাস ও অহং-ত্যাগ। অগ্রসর ভক্তের পক্ষে সংগ্রাম ছাড়া এবং এই জাতীয় আভাস ছাড়া অধ্যাত্ম চেতনার বিপুল সম্ভাবনা বাস্তব-রূপ পেতে পারে না। "মনকে সদাসর্বদাই ঈশ্বরের চিন্তা করতে হবে।" মনকে সদাসর্বদাই ঈশ্বরের চিন্তা করতে বাধ্য করাট প্রথম প্রথম বড় কঠিন হয়ে পড়ে, কিন্তু প্রত্যেক প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গেই এমনটা চিন্তা করার ক্ষমতা ক্রমেই বেড়ে ওঠে। "হে কৌন্তেয়, অভ্যাস এবং অনাসক্তির দ্বারাই তা লাভ করা যায়।"—গীতায় বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। তারপর আত্মত্যাগমূলক কর্ম। সাধারণ রীতিমতো পঞ্চ মহাত্যাগ* (পঞ্চমহাযজ্ঞ) দরকার।

পবিত্রতা হল এমন এক ভিত্তিপ্রস্তর যার উপর সমস্ত ভক্তি-সৌধটিই দণ্ডায়মান থাকে। দেহ পরিচ্ছন্ন রাখা বা খাদ্য বিচার করা তো সহজ কাজ, কিন্তু ভিতরের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা বাদ দিয়ে ঐ বাইরের নিয়ম পালন কোনো কাজেরই নয়। রামানুজের মতানুযায়ী পবিত্রতা-সাধক গুণাবলীর মধ্যে পড়ে—সত্য, সত্যভাষণ, আর্জব, নিষ্ঠা, স্বার্থরহিত দয়া; অহিংসা (চিন্তায় কথায় বা কর্মে অন্যকে আঘাত না দেওয়া); অনভিধ্যা, (অন্যের জিনিসে লোভ না করা), বৃথা ভাবনা না ভাবা, অন্যের কাছ থেকে পাওয়া আঘাত নিয়ে মাথা না ঘামানো। এই ফর্দে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য হল অহিংসা অন্যের ক্ষতি না করা। সমস্ত জীবেরই ক্ষতি না করাটা কর্তব্য হিসাবে আমাদের কাছে বাধ্যবাধক হওয়া দরকার। অনেকে যেমন মনে করেন মানুষকে আঘাত না করলেই হল, নীচ জীবনের প্রতি নিষ্ঠুরতাটা কিছুই নয়,—তেমনটা হবে না। আবার অনেকে যেমন কুকুর বা বিড়াল রক্ষণাবেক্ষণ করে—পিঁপড়েকে চিনি খাওয়ায়, কিন্তু কত বীভৎস উপায়ে মানুষ-ভাইদের ক্ষতিগ্রস্ত করার বেলায় হয়ে ওঠে একেবারে বেপরোয়া! এটা খুবই দেখবার বিষয়, এই দুনিয়ায় প্রত্যেকটি সৎ-ভাবকেই একেবারে বাড়াবাড়ির স্তরে ঠেলে তোলা যায়। একটি সৎ অভ্যাসকে

* দেবতা ঋষি, প্রেতাত্মা, অতিথি এবং সর্বজীবের নিকট ত্যাগ

বাধি বাড়াবাড়িতে রূপান্তরিত করা যায় এবং তাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা সুরু যায়, তবে তা বস্তুতই হয়ে ওঠে এক প্রত্যক্ষ পাপবিশেষ। কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের দুর্গন্ধস্রাবী সন্ন্যাসীরা স্নান করে না, কারণ তা হলে গায়ের পোকারা যদি মরে যায়; এরাই কিন্তু মানুষ ভাইদের পক্ষে কী অস্বস্তি ও রোগের কারণ হয় তা একবার ভেবেও দেখে না। এরা তো আর বৈদান্তিক ধর্মের লোক নয়।

অহিংসার পরীক্ষা হল ঈর্ষার অনুপস্থিতিতে। মুহূর্তের আবেগে বা কোন সংস্কার-বশে বা পুরোহিত-কুলের প্রেরণায় কেউ ভালো কাজ করতে পারে বা ভালো কিছু দানও করে বসতে পারে। কিন্তু তিনিই মানবপ্রেমিক যিনি কাউকেই ঈর্ষা করেন না। পৃথিবীর তথাকথিত মহাপুরুষদের দেখা যায় তারা ক্ষুদ্র নামের জন্য বা দুই দানা সোনার জন্য এ-ওকে ঈর্ষা করে থাকে। যে পর্যন্ত এই রকম ঈর্ষা হৃদয়ে থাকবে, অহিংসার পূর্ণরূপও থাকবে বহু বহু দূরে। গরু তো মাংস খায় না, ভেড়াতেও নয়। তারা কি মহাযোগী—মহা-অহিংসক? যে কোনো গবেটও এটা বা ওটা না খেতে পারে, কিন্তু সেজন্যেই নিরামিষাশী জন্তুর চেয়ে সে পৃথক কিছু নয়। যে লোক নিষ্ঠুরভাবে বিধবাদের বা পিতৃমাতৃহীনদের বঞ্চনা করে, অর্থের জন্য জঘন্যতম কাজ করে সে তো পাষণ্ডের চেয়েও অধম—সে কেবলমাত্র ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ করলেও। যাঁর হৃদয় কাউকেই কখনো আঘাত দেবার চিন্তাও পোষণ করে না, যিনি এমনকি তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রুরও সৌভাগ্যে আনন্দিত হন, তিনিই হলেন ভক্ত, তিনিই হলেন যোগী—তিনি সকলের গুরু, তিনি যদি প্রতিদিনই শূকর-মাংস খেয়ে জীবনধারণ করেন, তবুও। সুতরাং আমাদের এটা সর্বদাই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বহিরঙ্গ অভ্যাসের ততটুকুই মূল্য যতটা তা অন্তরের পবিত্রতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। কেবলমাত্র আন্তরিক পবিত্রতা থাকাও ভালো—যখন বহিরঙ্গ নিয়ম-পালনে নিখুঁত মনোযোগ সম্ভব নয়। কিন্তু সেই লোকের এবং সেই দেশেরও দুর্ভাগ্য যে ধর্মের সত্তাকে, অন্তঃপ্রকৃতিকে, আধ্যাত্মিক মূলবিষয়কে বিস্মৃত হয়ে যন্ত্রের মতোই বদ্ধ এক মৃত্যুহীন মুষ্টিতে আঁকড়ে ধরে যত সব বহিরঙ্গ জিনিসকে, এবং ধরেছে তো আর ছাড়তে চায় না। বহিরঙ্গ বিষয়ের ততটাই মূল্য যতটা সে আন্তর জীবনেরই প্রকাশ। যদি তা জীবনকেই প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয় তো তা নির্মমভাবেই ধ্বংস করো।

ভক্তিযোগের পরবর্তী পন্থা হল শক্তি (অনবসাদ)। "আত্মা বলহীনের দ্বারা লভ্য নয়।"—বলেছে শ্রুতি। এখানে শারীরিক ও মানসিক দুরকম দুর্বলতার কথাই বলা হয়েছে। "শক্তিমান ও কষ্টসহিষ্ণু"-ই হয় যোগ্য ছাত্র। বেঁ.ট-খাটো পঙ্গুরা কী বা করবে? যে কোনো যোগাভ্যাসের বলেই যখন দেহ ও মনের রহস্যময় শক্তিগুলি একটু মাত্রও জাগ্রত হয়ে উঠবে, তারা তো টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। একমাত্র "তরুণ, স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমানেরাই" সাফল্য অর্জন করতে পারে। শারীরিক শক্তি তাই অনিবার্যভাবেই প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়সমূহ নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসে যেরকম প্রতিক্রিয়া-জাত সংঘাতের সৃষ্টি হয় তা একমাত্র সহ্য করতে পারে শক্তিশালী দেহই। ভক্ত হতে হলে তাকে শক্তিমান হতে হবে, স্বাস্থ্যবান হতে হবে। সকল

দুর্বল লোকেরা যখন কোনোরকম যোগ চেষ্টা করে, তাদের দুরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টি হতে পারে, অন্যথা তাদের মনই দুর্বল হয়ে পড়বে। আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে দেহকে দুর্বল করে তোলাটা নিশ্চয়ই কোনো ব্যবস্থা-পত্র নয়।

মানসিক দিক থেকে যে দুর্বল সে কখনো আত্মাকে লাভ করতে পারে না। যে ভক্ত হতে চায় তাকে প্রফুল্ল হতে হবে। পাশ্চাত্য জগতে ধার্মিক লোক সম্বন্ধে ধারনাটা হল : সে কখনোই হাসবে না, তার মুখের উপর সব সময়েই ঝুলে থাকবে এক কালো মেঘ—আর সেই মুখের চোয়াল একেবারে হা হয়ে অনড়ভাবে ঝুলে থাকবে! কিন্তু এহেন রুগ্ন ক্ষীণ-দেহ ও ঝুলে-থাকা মুখওয়ালা লোক তো ডাক্তারদেরই যোগ্য বস্তু—নিশ্চয়ই তারা যোগী নয়! একমাত্র হাসিখুশি মনই বেঁচে আছে। একমাত্র শক্তিশালী মনই শত সহস্র বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে পথ কেটে এগোতে পারে। এবং এই যে মায়া-জাল কেটে পথ চলা—এটা সব কিছুর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ব্রত—এবং তা মহাশক্তি-সম্পন্ন মনেরই যোগ্য কাজ।

তবুও এইসঙ্গে অতি-স্ফূর্তিও (অমুদ্ধর্ষ) নিশ্চয়ই উপেক্ষাযোগ্য। অতিখুশি ভাব তীক্ষ্ণ মননের পক্ষে আমাদের অযোগ্য করে তোলে। এটা মনের শক্তিকেও বৃথা ব্যবহারে উবিয়ে দেয়। ইচ্ছাশক্তি যত প্রবল হবে, ভাবাবেগের দোলায় ততই সে কম দুলবে। অতিরিক্ত খোসমেজাজ যেমন আপত্তিকর, তেমনি অতিরিক্ত বিষণ্ণ গাম্ভীর্য। মন যখন সুস্থির ও শান্ত অবস্থায় সুষম সামঞ্জস্যে থাকবে একমাত্র তখনি সব ধর্মবোধ সম্ভব হবে।

এইভাবেই ঈশ্বরকে ভালোবাসতে সুরু করা যায়।

পরাভক্তি

প্রস্তুতিমূলক সর্বত্যাগ

প্রস্তুতিমূলক ভক্তির বিষয়ে আলোচনা আমরা শেষ করেছি এবং এবারে প্রবেশ করছি পরাভক্তি বা পরম ভক্তি বিষয়ে। এই পরাভক্তির অভ্যাসের জন্য কেমন করে প্রস্তুত হতে হয় তাই বলতে হবে। এই অভ্যাস একমাত্র আত্মার বিশুদ্ধীকরণের জন্যই। নাম, ধর্মক্রিয়াকাণ্ড, প্রতীক—এসবই হল আত্মার বিশুদ্ধীকরণের জন্য। সর্বোপরি, সর্বোত্তম যে বিশুদ্ধি-কর্তা ব্যতীত কেউই উচ্চতর ভক্তিমার্গে অর্থাৎ পরাভক্তিতে উন্নীত হতে পারে না, তা হল সর্বত্যাগ। এতে অনেকেই ভয় পেয়ে যায়; তবু তো এটা ছাড়া আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের সমস্ত রকম যোগেই এই সর্বত্যাগ প্রয়োজন হয়। এটা হল ধর্মের ভিত্তিভূমি, এবং সমস্ত অধ্যাত্ম সংস্কৃতির প্রকৃত প্রাণ—এই সর্বত্যাগ। এটাই হল ধর্ম—এই সর্বত্যাগ।

মানবাত্মা যখন পার্থিব সবকিছু থেকে সরে গিয়ে আরো গভীর কিছুতে প্রবেশ করে, মানুষ যে-কোনো ভাবেই হোক যখন বাস্তবকঠিন হয়ে ওঠে, তখন তার কাছে ধরা পড়ে যে সে ওইভাবে ধ্বংস হতে যাচ্ছে, একেবারে ধুলোমাটি হতে যাচ্ছে, এবং সে বাস্তব পদার্থ থেকে মুখ ফেরায়, তখনি সুরু হয় সর্বত্যাগ, তখনি সুরু হয় যথার্থ অধ্যাত্ম উন্নতি। কর্মযোগীর পক্ষে সর্বত্যাগ হল তার সমস্ত রকম কর্মফল ত্যাগ; সে আর তার শ্রমের ফলাফলে আসক্ত থাকে না, সে ইহলোক কি পরলোকের কোনোরকম পুরস্কারের অপেক্ষা রাখে না। রাজযোগী জানে নিখিল প্রকৃতি তাঁর আত্মার জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্র; এবং সে জানে আত্মার সব অভিজ্ঞতা-ফল হল, আত্মা থেকে প্রকৃতি যে চিরন্তনরূপেই স্বতন্ত্র সে প্রসঙ্গে চেতনা। মানবাত্মাকে জানতে হয় বুঝতে হয় চিরন্তন চৈতন্যরূপেই, পদার্থে নয়, এবং পদার্থের সঙ্গে তার সংযোগ হয় এবং হতে পারে সাময়িক মাত্র। রাজযোগী সর্বত্যাগের শিক্ষা গ্রহণ করে প্রকৃতি থেকে তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। জ্ঞানযোগীকে সবচেয়ে নীরস সর্বত্যাগের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়, কারণ একেবারে সুরু থেকেই তাকে বুঝতে হয় কঠিন-দর্শন এই বিশ্ব হল মায়া। তাকে একেবারে সুরু থেকেই জানতে হয় প্রকৃতিতে শক্তির যে-কোনো রকম প্রকাশই আত্মার অধীন,—প্রকৃতির অধীন নয়। তাকে একেবারে সুরু থেকেই জানতে হয় সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত অভিজ্ঞতাই ঘটে আত্মার মধ্যে—প্রকৃতির মধ্যে নয়; তাই অবিলম্বে এবং বুদ্ধিজাত প্রত্যয় বলে তাকে সমস্ত প্রাকৃতিক বন্ধন ছিন্ন করে ফেলতে হয়। প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সবকিছুকে সে ত্যাগ করে—তাদের নিশ্চিহ্ন করে দাঁড়াতে চায় একক।

যত সর্বত্যাগ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ বলা যায় ভক্তিযোগীর সর্বত্যাগ। এখানে নেই কোনোরকম উগ্রতা, নেই পরিত্যাগ করার মতো কিছু, নেই আমাদের থেকে ছিন্ন করার মতো কিছু—এমন কিছুই নেই যা থেকে জোর করে আমাদের ছাড়িয়ে নিতে হবে। ভক্তের সর্বত্যাগ সহজ, সাবলীল প্রবাহবৎ, এবং আমাদের

চতুর্দিকের মতোই স্বাভাবিক। এমনিধারা সর্বত্যাগ দেখতে পাই আমাদের চতুর্দিকে—প্রতিদিনই আমাদের চতুর্দিকে, তবে কিনা ব্যঙ্গকৌতুকের আকারে! একলোক একটি মেয়েকে ভালোবাসতে লাগল, আর তারপরই প্রথম জনকে ছেড়ে আর একজনকে। সেই প্রথম জন তার মন থেকে খসে পড়ে—সহজেই, নীরবেই, এবং সেই মেয়েটির জন্য কোনো রকম অভাব বোধ ছাড়াই। একটি মেয়ে একজন ছেলেকে ভালোবাসল, তারপর আর একজনকে ভালোবাসল, সেই প্রথম জন স্বতই তার মন থেকে খসে পড়ল। একটা লোক তার শহরকে ভালোবাসল, তারপর সে তার দেশকে ভালোবাসল, আর তার সেই ছোট্ট শহরটির জন্য ভালোবাসা চলে গেল স্বচ্ছন্দে, স্বাভাবিকভাবে। আবার, একটি লোক সমস্ত পৃথিবীকে ভালোবাসতে শিখল, তার স্বদেশের জন্য ভালোবাসা—তার তীব্র উন্মাদনাময় স্বদেশপ্রীতি ঝরে পড়ে গেল, তাকে একটুও আঘাত করল না—কোনোরকম উগ্রতার প্রকাশ দেখা দিল না। একজন স্থূল ধরণের লোক ইন্দ্রিয় সুখভোগে মত্ত হল, তার সংস্কৃতি বোধ জন্মালে সে বুদ্ধিজীবীর আনন্দকে ভালোবাসতে লাগল—দিনে দিনে ইন্দ্রিয়-সুখভোগ মন্দা হতে লাগল। কোনো লোকই তো কুকুর বা নেকড়ের মতো তৃপ্তিতে বা সুখে খাবার খেতে পারে না, কিন্তু বুদ্ধিজাত অভিজ্ঞতায় বা কার্য-সম্পাদনে মানুষ যে সুখ পায় কুকুর তা কখনই পেতে পারে না। প্রথম স্তরে সুখ থাকে নিম্নস্তরের অনুভূতির সংস্পর্শে, কিন্তু কোনো জীব জীবনের উচ্চতর স্তরে উঠলেই নিম্নপ্রকারের সুখের তীব্রতা কমে যায়। মানবসমাজে যে মানুষ পশুর যত নিকট স্তরে আছে, তার ইন্দ্রিয়সুখ বোধ তত প্রবল, আর মানুষ যতই উচ্চস্তরে ওঠে ও যতই সাংস্কৃতিবান হয়ে ওঠে, ততই সে বুদ্ধিগত ও অনুরূপ বিষয়ের চর্চায় বেশী আনন্দ পায়। আর অনুরূপভাবেই কোনো মানুষ যখন বুদ্ধি-স্তরের চেয়েও উপরে, কেবলমাত্র মনন স্তরের চেয়েও উপরে উঠে যায়—সে যখন আধ্যাত্মিক স্তরে ও স্বর্গীয় প্রেরণা-লোকে উঠে যায়,—তখন সে এমন এক শান্তির সন্ধান পায় যার তুলনায় সমস্ত ইন্দ্রিয়-সুখভোগ এমন কি মননের আনন্দও মনে হয় কিছু নয়। চাঁদ যখন উজ্জ্বল কিরণ দান করে, সমস্ত তারাই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে; সূর্য যখন দীপ্তি দান করে, চাঁদকেও নিষ্প্রভ দেখায়। ভক্তির জন্য যে সর্বত্যাগ প্রয়োজন তা কিছুকেই হনন করার মাধ্যমে হয় না, বরং সহজভাবেই আসে—যেমন নাকি ক্রমোজ্জ্বল দীপ্তির কাছে কম তীব্র আলো নিষ্প্রভ হতে হতে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তেমনি ঈশ্বর-প্রেমে ইন্দ্রিয়সুখের ভালোবাসা ও বুদ্ধির ভালোবাসা দূরে সরে নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

ঈশ্বরপ্রেম বৃদ্ধি পেতে পেতে হয়ে ওঠে পরা-ভক্তি বা পরম ভক্তি—আকার মিলিয়ে যায়, ধর্মকর্মকাণ্ড উবে যায়। গ্রন্থাদি ছাড়িয়ে, প্রতিমা মঠ-মন্দির, গির্জা, ধর্ম ও সম্প্রদায়, দেশ ও জাতি—এইসব ক্ষুদ্র সীমা ও বন্ধন তাঁর থেকে স্বভাবতই খসে পড়ে—যিনিই এই ঈশ্বর-প্রেম জানেন। তাকে বন্দী করার মতো বা শৃঙ্খলিত করার মতো কিছুই থাকে না। এক চুম্বক পাহাড়ের নিকট হঠাৎ যেন এক জাহাজ এসে পড়ে, আর তার সব লোহার নাট বল্টু ও থামকে আকর্ষণ করে টেনে বার করে নেয়, আলগা তক্তাগুলি তখন মুক্তভাবে ভাসতে থাকে জলের উপর। স্বর্গীয় করুণা অনুরূপভাবেই আত্মার

বন্ধনের সমস্ত নাটবল্টুগুলিকেই আলগা করে দিলে আত্মা মুক্ত হয়। তাই ভক্তির অনুষঙ্গ এই সর্বত্যাগে কোনো কর্কশ ও নীরস কিছু নেই—সংগ্রাম নেই, দমন বা অবদমন কিছুই নেই। ভক্তকে তার কোনো আবেগকেই দমন করতে হয় না, বরং আবেগকে তীব্র করে ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করতেই সে চেষ্টা করে।

ভক্তের সর্বত্যাগ জন্ম নেয় প্রেম থেকে

প্রকৃতিতে সর্বত্রই আমরা প্রেম দেখতে পাই। সমাজে যা কিছুই সৎ, মহৎ ও মহান তা ঐ প্রেমেরই ফল; সমাজে যা অত্যন্তই খারাপ তা ঐ প্রেমাবেগেরই কু-পরিচালিত কর্মরূপ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে পবিত্র-সুন্দর দাম্পত্য প্রেম আর নিম্নস্তরের যে জান্তব কামরূপ ভালোবাসা—এই দুটোই আসে ঐ একই আবেগ থেকে। আবেগ একই কিন্তু তার প্রকাশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয় বিভিন্ন রকম। সুপরিচালিত বা কুপরিচালিত হোক প্রেমের একই অনুভব কোনো মানুষকে প্রেরণা দেয় তার সর্বস্বই দরিদ্রকে দান করতে, আবার অন্যলোককে প্রেরণা দেয় তার ভাইদের গলা কাটতে ও তার সর্বস্ব কেড়ে নিতে। প্রথমট নিজের মতোই ভালোবাসে অন্যকে, দ্বিতীয়টি যেমন ভালোবাসে নিজেকেই। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রেমের পরিচালনাটি হল খারাপ, কিন্তু প্রথমটিতে তা যেমন সৎ তেমনি যথাযোগ্য। যে আগুনে আমাদের খাবার রান্না হয় তাই পোড়াতে পারে শিশুকে, আর তাই যদি করে সেটা আগুনের দোষ নয়। আগুনকে কিভাবে ব্যবহার করা হল তাতেই যা পার্থক্য। কাজেই মিলনের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, দুজনের এক হবার জন্যে তীব্র কামনা এবং শেষ পর্যন্ত একের মধ্যেই সব পাওয়া—এরূপ প্রেম সর্বত্রই ক্ষেত্রবিশেষে কি উচ্চ কি নিম্ন আকারে প্রকাশ পায়।

ভক্তিযোগ হল উচ্চতর প্রেমের বিজ্ঞান। তা আমাদের দেখিয়ে দেয় কিভাবে প্রেমকে পরিচালিত করতে হয়; আমাদের দেখিয়ে দেয় কিভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, কিভাবে তার ব্যবস্থা করতে হয়, কিভাবে তাকে কাজে লাগাতে হয়, কিভাবেই বা তাকে নতুন লক্ষ্য করে সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান পরিণাম লাভ করতে হয়। অর্থাৎ কিনা তাকে অধ্যাত্ম শান্তির দিকে অগ্রসর করে দিতে হয়। ভক্তিযোগ তো বলে না—"ত্যাগ করো"; শুধু বলে—"ভালোবাসো সর্বোচ্চকে পরমোত্তমকে ভালো-বাসো।"—আর যার প্রেম হল সর্বোচ্চ প্রকৃতির তার থেকে নিচ যা-কিছু তা ঝরে পড়ে।

"আমি তো তোমার সম্পর্কে কিছুই বলতে পারি না, কেবল জানি তুমিই আমার প্রেম। তুমি সুন্দর, বড় সুন্দর তুমি! তুমিই সুন্দর স্বয়ং।" এই যোগে আমাদের নিকট থেকে যা চাওয়া হয় তা হল, সুন্দরের জন্য আমাদের তৃষ্ণাকে ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করতে হবে। মানুষের মুখে, আকাশে, তারায় কি চাঁদে সৌন্দর্যটি কেমন? তা হল নিত্য এক সর্বব্যাপী স্বর্গীয় সৌন্দর্যেরই আংশিক উল্লাস। "তিনি প্রদীপ্ত হলে সকলই দীপ্ত হয়। তাঁরই আলোকে সবকিছু আলোকিত হয়।" ভক্তির এই উচ্চাবস্থায় উপনীত হও—এক মুহূর্তে ভুলে যাবে তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব ব্যক্তিত্ব। পৃথিবীর সব ছোট ছোট আসক্তি থেকে নিজেদের সরিয়ে নাও। বিশ্বমানবকে মনে করো না সে তোমার মানবিক কি উচ্চতর স্বার্থের কেন্দ্রাশ্রয়। দাঁড়াও সাক্ষীর মতো, বিদ্যার্থীর মতো,—দেখো প্রকৃতির সব লীলা। মানব সম্পর্কে ব্যক্তিগত অনাসক্তির অনুভব বজায় রাখো, দেখো সমস্ত-জগতে এই বিশাল প্রেমানুভব কাজ করে যাচ্ছে। কখনো কখনো ছোটখাট সংঘর্ষ উপস্থিত হবে, কিন্তু

সেসব উচ্চতর প্রকৃত প্রেম-প্রাপ্তির পথেই কেবল দেখা দেবে। কখনো বা একটু-দ্বন্দ্ব ও একটু পতনও হবে, কিন্তু তা পথেই মাত্র। পথের একপাশে দাঁড়াও এবং ওসব সংঘর্ষকে অবাধে আসতে দাও। তুমি জাগতিক প্রবাহের মধ্যে যতক্ষণ আছ ততক্ষণই ঐ সংঘর্ষ, আর তা থেকে বেরিয়ে যখন একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছ সাক্ষীর মতো, ছাত্রের মতো, দেখতে পাবে কত শত সহস্র প্রবাহে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করছেন প্রেমরূপে।

"যেখানেই শান্তি, এমনকি খুব ভোগাসক্তির জিনিসেও,—সেখানেই চিরন্তন শান্তির স্ফুলিঙ্গরূপে রয়েছেন ভগবান স্বয়ং।" এমনকি সবচেয়ে নিচু ধরনের আসক্তির মধ্যেও রয়েছে স্বর্গীয় প্রেমের বীজ। সংস্কৃতে ভগবানের এক নাম হরি—এই নামটির অর্থ হল তিনি সবকিছুই হরণ করেন নিজের মধ্যে। সত্য সত্যই মানবহৃদয়ের একমাত্র আকর্ষণ তো তিনিই। আত্মাকে কে আর যথার্থই আকর্ষণ করতে সক্ষম? একমাত্র তিনি! তুমি কি মনে কর প্রাণহীন পদার্থ আকর্ষণ করতে পারে আত্মাকে? কখনো তা পারেনি, কখনো তা পারবেও না। কোন সুন্দর মুখের পিছুপিছু যখন কোনো লোক ছুটতে থাকে, তখন কি যথার্থই ঐ অণু-পরমাণুর দ্বারা গঠিত একমুঠো পদার্থই তাকে আকৃষ্ট করে? মোটেই তা নয়। ঐ পদার্থগত অংশাদির পিছনে থাকবেই এবং আছেই স্বর্গীয় লীলাখেলা এবং স্বর্গীয় প্রেম। অজ্ঞান লোকে তা জানে না, তবুও সচেতন বা অচেতন ভাবে সে তার দ্বারা এবং একমাত্র তার দ্বারাই আকৃষ্ট হয়। সুতরাং একেবারে নিচু ধরনের আসক্তিও শক্তি খুঁজে পায় স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকেই। "হে প্রিয়তমে, কেউই তো স্বামীর জন্যই স্বামীকে ভালোবাসে না; এই যে আত্মা—অন্তরের প্রভু যিনি তার জন্যই স্বামীকে ভালোবাসে।" প্রেমিকা স্ত্রীগণ এটা জানে বা নাও জানতে পারে, কিন্তু কথাটা একই। "হে প্রিয়তমে, কেউই তো কখনো স্ত্রীকে স্ত্রীর জন্যই ভালোবাসে না; স্ত্রীর মধ্যে যে আত্মরূপ তাকেই ভালোবাসে।" অনুরূপ ভাবেই কেউ সন্তানকে বা অন্য কিছুকে ভালোবাসে না—অন্তরের মধ্যে যিনি আছেন, একমাত্র তাঁর জন্যই ভালোবাসে। ভগবান হলেন সবচেয়ে বড় চুম্বক, আর আমরা হলাম যেন লোহা; আমরা কেবলই তাঁর দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছি এবং আমরা সকলেই তার কাছে পৌঁছবার জন্য মরীয়া হচ্ছি। এই পৃথিবীতে এই সংগ্রাম নিশ্চয়ই স্বার্থ-লক্ষ্যের জন্য নয়। মূর্খেরা জানে না তারা কী করছে, তবু তো তাদের জীবনের কাজকর্ম সেই মহাচুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এই জীবনের যত প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম তাঁর কাছে পৌঁছবার জন্যই, তাঁর সঙ্গে একাত্ম হবার জন্যই।

ভক্তিযোগী অবশ্য জীবনসংগ্রামের অর্থটা কী তা জানে; সে তা বোঝে। সে নিজেই তো এরকম বহু সংগ্রাম-পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, জেনেছে কী অর্থ তাদের, এবং সংঘর্ষ থেকে মুক্ত থাকবার জন্যই তো তার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা; সে সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছাড়িয়ে সোজা চলে যেতে চায় সমস্ত আকর্ষণের কেন্দ্রে—মহান হরির কাছে। এটাই তো ভক্তের পূর্ণত্যাগ। ভগবানের দিকে এই যে আকর্ষণ এটাই অন্যসব আকর্ষণকে তার কাছে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ঈশ্বরের প্রতি এই প্রবল ও অসীম প্রেম তার হৃদয়ে প্রবেশ করে; সেখানে অন্য কোন রকম প্রেমের জন্যই আর

স্থান রাখে না। এর ভিন্নরূপ কিছু হবে কী করে? ভক্তি তার হৃদয় পরিপূর্ণ করে করে তোলে ঈশ্বর-রূপ প্রেম-সাগরের স্বর্গীয় সলিলে, সেখানে ছোটখাট প্রেমের জন্য আর জায়গা থাকে না। অর্থাৎ কিনা ভক্তের পক্ষে সর্বত্যাগ হল সেই বৈরাগ্য, বা ঈশ্বর ব্যতীত সবকিছুতেই অনাসক্তি, এবং তা অনুরাগ বা ভগবানের প্রতি মহাসক্তি থেকেই জন্মলাভ করে।

পরমভক্তি লাভের জন্য এটাই হল আদর্শ প্রস্তুতি। পূর্ণত্যাগ যখন দেখা দেয়, সমুচ্চ পরাভক্তি বা পরমভক্তির সমুচ্চ লোকের মধ্য দিয়ে পৌঁছবার জন্য দরজা খুলে যায়। আর তখনি আমরা বুঝতে সুরু করি পরাভক্তি কীরকম; অন্য সমস্ত আকার ও প্রতীক ধর্মচেতনার জন্যে অর্থহীন—এমন কথা পরাভক্তির অন্তর মন্দিরে যে প্রবেশ করেছে একমাত্র সে-ই বলবার অধিকারী। একমাত্র সেই প্রেমের সেই পরম দশা-প্রাপ্ত হয়েছে—যাকে সাধারণত বলা হয় মানবভ্রাতৃত্ব; অন্যেরা কেবল তা কথায়ই বলে থাকে। ঐ লোক তো কোনরূপ বিভেদ দেখে না; তার অন্তরে প্রবেশ করেছে প্রেমের মহাসাগর, মানুষের মধ্যে সে মানুষকে দেখে না—সর্বত্রই দেখে তার প্রিয়তমকে; প্রতিটি মুখেই দীপ্তি পায় তার হরি। সূর্য-চন্দ্রের কিরণ তার কাছে তাঁরই প্রকাশ। যেখানেই সৌন্দর্য বা মহত্ত্ব তার কাছে সবই তাঁরই। এমন ভক্ত আজো বেঁচে আছে,—পৃথিবীতে কখনই তাদের অভাব হয় না। এমন যারা সর্পাদষ্ট হলেও বলে শুধু—তাদের প্রিয়তমের নিকট থেকে দূত এসেছিল। এমন লোকেরই অধিকার আছে বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা বলার। তাদের মধ্যে কখনো প্রতিহিংসার ভাব জাগে না—ঘৃণা বা ঈর্ষার আকারে তাদের মন কখনো আক্রান্ত হয় না। বাহিরের যা-কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাদের থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। প্রেমের বলেই তো তারা প্রত্যক্ষ দৃশ্যের পিছনেই সত্যকে দেখতে সমর্থ; তারা কেন ক্রুদ্ধ হবে?

ভক্তিযোগের স্বাভাবিকতা এবং তার কেন্দ্রীয় রহস্য

"যারা নিয়ত মনঃসংযোগে তোমার আরাধনা করে, আর যারা অভেদ ও ব্রহ্মরূপে আরাধনা করে তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ যোগী?"—অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে, তাঁর উত্তর: "নিত্য-সংযোগে আমার উপর মন রেখে যারা আমাকে নিত্য-সংযোগে উপাসনা করে এবং পরম বিশ্বাস রাখে, তারাই আমার শ্রেষ্ঠ উপাসক—তারাই হল সর্বোত্তম যোগী। পরম ব্রহ্ম, অবর্ণনীয়, অভেদরূপী, সর্বত্রবিরাজমান, অচিন্ত্য, সর্বজ্ঞ, অগতি ও চিরন্তনকে যারা ইন্দ্রিয়-ক্রীড়াদিকে চিরন্তন-নিয়ন্ত্রণে উপাসনা করে ও সবকিছুকে সমরূপ দেখে ও বিশ্বাস ক'রে সকল জীবের হিতে ব্রতী হয়—তারাও আমার কাছে এসে পৌঁছায়। কিন্তু, যাদের মন অপ্রকাশিত ব্রহ্মের দিকে অনুরক্ত, সাধনপথে তাদের সংগ্রাম হয় আরো বড় সংগ্রাম; কারণ দেহধারী জীবের পক্ষে প্রকাশাতীত ব্রহ্মে পৌঁছবার পথে বহু কষ্টেই অগ্রসর হতে হয়। যারা তাদের সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ দ্বারা আমার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতার সঙ্গে আমাকে ধ্যান করে এবং কোন কিছুর আসক্তি ছাড়া আমাকে উপাসনা করে—তাদের আমি জন্মমৃত্যু-চক্ররূপ সমুদ্র থেকে উদ্ধার করি—যেহেতু তাদের চিত্ত সম্পূর্ণতই আমাতে আসক্ত।"

(গীতা, ১২)

এখানে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই উভয় সম্পর্কেই বলা হয়েছে। উল্লিখিত অনুচ্ছেদে উভয়েরই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে বলা যায়। জ্ঞানযোগ বড় জিনিস, এটা উচ্চ ধরনের দর্শনশাস্ত্র; আর এটা এক মজার ব্যাপার যে, প্রত্যেক লোকই ভাবে দর্শনের সাহায্যে সে তার প্রয়োজন মতো সবকিছুই করতে পারে। কিন্তু দর্শনোক্ত জীবন-যাপন করাটা সত্যিই কঠিন। দর্শনশাস্ত্র দিয়ে জীবনকে পরিচালিত করতে গিয়ে মহা বিপদে পড়তে হয়। জগৎটায় দুই রকম ব্যক্তি আছে; এক দানব-প্রকৃতির, তারা ভাবে দেহের যত্নাদিই হল জীবনের একমাত্র ব্রত ও একমাত্র লক্ষ্য; অন্য ব্যক্তিরা হলেন দেব-প্রকৃতির—তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে দেহ হল লক্ষ্যলাভের পথে যন্ত্রমাত্র—এবং সে যন্ত্রটি কেবল আত্মার পরিচর্যার জন্যই। শয়তান আর আপন উদ্দেশ্যে শাস্ত্র আওড়াতে পারে এবং তা আওড়ায়ও; এবং বদলোকে যা করতে চায় জ্ঞানের পথই তাতে যেন সমর্থন জানায়,—এবং সৎলোকের ক্ষেত্রেও যতটা প্রেরণা জোগায় ততটা। জ্ঞানযোগের এইখানেই সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ। কিন্তু ভক্তিযোগ হল স্বাভাবিক, মধুর, শান্ত; জ্ঞানযোগীর মতো উর্ধ্ব-চারণা ভক্তরা করে না, এবং তাই তাদের পক্ষে বড় রকমের পতনের সম্ভাবনাও থাকে না। তবে, আত্মার বন্ধন ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত তা মুক্ত হতে পারে না—ধার্মিক ব্যক্তি যে পথই অবলম্বন করুক না কেন।

এখানে একটি অনুচ্ছেদ তুলে দিচ্ছি, এখানে দেখা যাবে কিভাবে ভাগ্যবতী গোপীদের দোষগুণ-রূপী আত্মবন্ধন স্খলিত হয়েছিল। "ভগবৎ-ধ্যানের নিবিড় আনন্দই তাদের সৎকর্মের সমস্ত বন্ধনফল দূর করেছিল। তারপর ভগবানের সঙ্গে

মিলন না ঘটায় আত্যান্তিক দুঃখ-যন্ত্রণার অশ্রুই তাদের সব পাপ-প্রবৃত্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।"

"তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদক্ষীণপুণ্যচয়া তথা।
তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা॥...
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা॥ —(বিষ্ণুপুরাণ)

তাই ভক্তিযোগের কেন্দ্রীয় রহস্যটি হল: মানবহৃদয়ের বিচিত্র অনুভব ও আবেগ স্ব-রূপে মোটেই দোষের কিছু নয়; কেবলমাত্র পরম চমৎকার অবস্থায় না পৌঁছানো পর্যন্ত তাদের সযত্নে নিয়ন্ত্রণ করে ক্রমোচ্চ লক্ষ্যের দিকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে। আর, ঈশ্বরের দিকে যা আমাদের পৌঁছে দেবে সেটাই হল সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পরিচালনা; অন্য যে কোনো রকম পরিচালনাই হল নিচুস্তরের। আমরা জানি আমাদের জীবনে সুখ ও দুঃখ হল একান্ত সাধারণ এক বারংবার লব্ধ অভিজ্ঞতা। অর্থ বা অনুরূপ কোনো পার্থিব পদার্থ নাই বলে কোনো লোক যখন যন্ত্রণা পায় সে তখন অনুভূতিকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। তবু তো দুঃখের প্রয়োজন আছে। সর্বোচ্চকে পাওয়া গেল না, ভগবানকে পাওয়া গেল না—কারো এইরকম দুঃখের অনুভব তাকে মুক্তির পথেই এগিয়ে দেয়। মুঠো-ভর্তি টাকা পেয়েছ বলেই যখন আনন্দিত হও, তখন তো তোমার আনন্দের ক্ষমতাকে ভ্রান্তপথেই যেতে দাও; তাকে উচ্চতর দিকে পরিচালনা করতে হবে, সর্বোচ্চ আদর্শের জন্য তাকে ব্রতী হতে হবে। এই রকম আদর্শের জন্য আনন্দ নিশ্চিতই সর্বোচ্চ আনন্দ। আমাদের অন্যান্য অনুভব প্রসঙ্গেও অনুরূপটাই সত্য। ভক্ত বলে—কোনো কিছুই ভ্রান্ত নয়, সে সব কিছুকেই গ্রহণ করে তাদের অব্যর্থরূপে লক্ষ্যীভূত করে তোলে ভগবানের দিকে।

প্রেমের সাকার রূপ

প্রেম কি রূপে প্রকাশ পায় তার কয়েকটি এখানে দেখানো হচ্ছে। প্রথমেই সম্ভ্রম। মঠমন্দির বা পবিত্র স্থান সম্পর্কে লোকে সম্ভ্রম দেখায় কেন? কারণ সেখানে তাঁর (ঈশ্বরের) উপাসনা হয়, আর এমন সব স্থানেই তাঁর উপস্থিতি রয়েছে এমন ভাবটি বিজড়িত থাকে। প্রত্যেক দেশেরই লোকে কেন ধর্মগুরুদের শ্রদ্ধা জানায়? মনুষ্যহৃদয়ের পক্ষে এটাই তো স্বাভাবিক, কারণ এমন সব গুরুই ঈশ্বরকে প্রচার করে। তলিয়ে দেখলে শ্রদ্ধা জন্ম নেয় ভক্তি থেকেই; যাকে আমরা ভালোবাসি না তাকে শ্রদ্ধা করতে পারি না। এরপরে আসে প্রীতির কথা—অর্থাৎ ঈশ্বরে আনন্দের কথা। ইন্দ্রিয়সুখের বেলায় লোকে কী অপরিসীম আনন্দই না পেয়ে থাকে! তারা যায় যত্রতত্র, বরণ করে যেকোনো বিপদ—কেন? যা ভালোবাসে তার জন্য, যা তাদের ইন্দ্রিয়চেতনা চায় তার জন্য। ভক্তের পক্ষে চাই এমন এক আত্যন্তিক ভালোবাসা যা তাকে অবশ্যই ভগবানের দিকে পরিচালিত করবে। আর তারপর সমস্ত দুঃখের মধ্যে মধুরতম দুঃখ যে বিরহ—প্রিয়তমের অভাবে যে নিবিড় দুঃখ—তার কথা। কেউ যখন এই তীব্র বেদনা অনুভব করে যে একমাত্র যা জানার তা জানতে পারেনি, এবং ভগবানের কাছে পৌঁছতে পারেনি, এবং তার ফলে যখন একান্ত আত্মবিরাগে উন্মাদবৎ হয়ে ওঠে—তখনি হয় বিরহ; এবং এই মানসিক অবস্থায় সে একমাত্র তার প্রিয়তমকে ছাড়া (একরতি বিচিকিৎসা) আর কারো উপস্থিতিতেই বিব্রত বোধ করে। পার্থিব প্রেমে আমরা দেখতে পাই কেমন করে এই বিরহ আসে। আবার, কোনো পুরুষ বা নারী যখন অন্য নারী বা পুরুষকে সত্যই নিবিড়ভাবে ভালোবাসে, তখন তারা যাদের ভালোবাসে না তেমন লোকদের সামনে স্বাভাবিকভাবেই কেমন এক বিরক্তি বোধ করে। ঠিক অমন ভাবেই অ-প্রেমের বিষয়ে মনে এক অধীর অবস্থার সৃষ্টি হয়—যখনই পরাভক্তি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তখন ভগবান ছাড়া আরো কারো কোনো কথা বিস্বাদ লাগে। "তাঁকে চিন্তা করো, তাঁর কথা চিন্তা করো—সব বৃথা বাক্য ত্যাগ করো"—অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ। যারা কেবলমাত্র তাঁর কথাই বলে, সেই ভক্তেরা তাঁকে বন্ধুভাবে পায়—আর যারা অন্যকথা বলে তাদের বন্ধু মনে হয় না। আর, এক প্রেমের আদর্শের জন্যই যখন জীবনধারণ করা হয়, যখন জীবনটাই মনে হয় এই প্রেমহেতুই সুন্দর ও ধারণযোগ্য (তদর্থপ্রাণসংস্থানং) —তখন প্রেমের এক উচ্চতর অবস্থায় পৌঁছানো যায়। তাছাড়া তো এই জীবন একমুহূর্তের জন্যও রাখতে ইচ্ছে হত না। প্রিয়তমের ভাবনা আছে বলেই তো জীবনটা সুন্দর। তদীয়তা (তৎ-ত্ব) আসে কেউ যখন ভক্তি অনুযায়ী সম্পূর্ণ হয়—যখন সে আশীর্বাদ-ধন্য হয়, যখন তার ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয়, যখন—যাকে বলে তাঁর পাদস্পর্শ ঘটেছে। তখন তার সমস্ত প্রকৃতিই পবিত্র হয়, এবং রূপান্তরিত হয়। তার জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্যই তখন সার্থক হয়। তা, এরকম বহুভক্তই তাঁকে শুধু আরাধনা করার জন্যই বেঁচে থাকে। তাই হল স্বর্গসুখ, তাই হল জীবনের একমাত্র আনন্দ, আর কিছুতেই এ আনন্দ তারা ত্যাগ করবে না। যারা সমস্ত কিছুর সুখ ও সন্তোষ

লাভ করেছে, যাদের সমস্ত হৃদয়-বন্ধন ছিন্ন হয়েছে তারাও "হে রাজন, কেবলমাত্র ভালোবাসার জন্যই ভগবানকে ভালোবাসে—যে ভগবানকে আরাধনা করে সব দেবতারা ও সমস্ত মুক্তিপ্রেমীরা এবং সব ব্রহ্মজ্ঞগণ,—এমনটাই হল শ্রীহরির স্বর্গীয় গুণ!"—যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি (নৃ. তপ. উপ)। প্রেমের এমনই প্রতাপ। কোনো মানুষ যখন সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়, যখন তার মনে হয় না তার কিছু অধিকার আছে, তখনি সে তদীয়তা প্রাপ্ত হয়; সকলই তার কাছে পবিত্র, কারণ তা প্রিয়তমের। এমন কি পার্থিব প্রেম সম্পর্কে প্রেমিক ভাবে প্রিয়তমের অধিকারস্থ সব কিছুই পবিত্র, এবং তাই তা তার কাছে প্রিয়। তার প্রাণবধুর একটুকরা কাপড়ও তার প্রিয়। ঠিক এইরূপেই কেউ বিশ্বপ্রভুকে ভালোবাসলে সমস্ত বিশ্বই তার কাছে হয়ে ওঠে প্রিয়, কারণ তা যে প্রভুরই।

বিশ্বপ্রেম এবং কিভাবে তা হয়ে ওঠে আত্মসমর্পণ

সমষ্টি বা সর্বজনীনকে ভালোবাসলে কী করে আমরা ভালোবাসব ব্যষ্টিকে বা নির্দিষ্ট কিছুকে? ঈশ্বর হল সমষ্টি—সাধারণীকৃত এক সর্বজনীন সম্পূর্ণতার গুণ; যে বিশ্ব আমরা দেখি তা হল ব্যষ্টি—সুনির্দিষ্ট কিছু। সমস্ত বিশ্বকে ভালোবাসা সম্ভব সমষ্টি বা সর্বজনীনকে ভালোবাসার মাধ্যমেই—অনেকটা যা এমন এক একক যার মধ্যে রয়েছে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐক্য। ভারতের দার্শনিকগণ বিশেষে এসেই থামেন না; তাঁরা একবার বিশেষগুলির উপরে চকিত দৃষ্টি ফেলেই ব্রতী হন অবিশেষ বা সাধারণ রূপের সন্ধানে—যেখানে বর্তমান রয়েছে সমস্ত বিশেষ। ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের একমাত্র সন্ধান হল সর্বজনীনের জন্য সন্ধান। জ্ঞানীর লক্ষ্য হল কোনো কিছুর সম্পূর্ণতার দিকে—পরম ও সাধারণ এক সত্তার দিকে—যাকে জানলে সবই জানা হয়। ভক্তেরা বুঝতে চায় সেই সাধারণ এক বিমূর্ত ব্যক্তিকে—যাকে ভালবাসলে সমস্ত বিশ্বকেই ভালোবাসা হয়। যোগী অধিকারে আনতে চায় ঐ শক্তিরই সাধারণ এক বিমূর্ত রূপকে—যাকে নিয়ন্ত্রণ করে সে নিখিল বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ভারতীয় মানস তার সমস্ত ইতিহাসেই পরিচালিত হয়েছে সবকিছুর মধ্যে সর্বজনীনের সন্ধানে—কি বিজ্ঞানে, কি মনস্তত্ত্বে, কি প্রেমতত্ত্বে, কি দর্শনে। তাই ভক্ত এই সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয় যে তুমি যদি একের পর এককে কেবল ভালোবাসতে থাকো, তুমি চিরকালই তা করতে পারবে—কিন্তু সমস্ত পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে কখনোই ভালবাসতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য যখন এই কেন্দ্রীয় ভাবে এসে পৌঁছতে হয় যে সমস্ত ভালোবাসার যোগফলই হল ভগবান—বিশ্বের সমস্ত আত্মার সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার যোগফলই হল ভগবান—তা এই আত্মা মুক্তই হোক বা বদ্ধই হোক, বা মুক্তি প্রয়াসীই হোক,—তখনই কারো পক্ষে বিশ্বপ্রেম প্রকাশ করা সম্ভব। ঈশ্বর হল সমষ্টি, এবং এই দৃশ্যমান বিশ্ব হল ঈশ্বরের ভেদাত্মক রূপ এবং প্রকাশ রূপ। আমরা যদি এর যোগফলকে ভালোবাসি তো সবকিছুকেই ভালোবাসি। তখন পৃথিবীকে ভালোবাসা এবং তার জন্য ভালো কিছু করাটা সহজ হবে। একমাত্র ভগবানকে ভালোবেসেই প্রথমে আমাদের ওই শক্তি অর্জন করতে হবে, অন্যথা পৃথিবীর কল্যাণ করা অত চাট্টিখানি কথা নয়। ভক্ত বলে—"সব কিছু তাঁরই, সে আমার প্রিয়; আমি তাকে ভালোবাসি।" এইভাবে সবকিছুই ভক্তের কাছে হয়ে ওঠে পবিত্র, কারণ সবকিছু তো তাঁরই। সকলেই তাঁর সন্তান, তাঁর শরীর, তাঁর প্রকাশ। তাহলে কী করে আমরা কাউকে আঘাত করতে পারি? তাহলে কী করে আমরা কাউকে ভালো না বেসে পারি? ভগবৎ-প্রেমের সঙ্গে সঙ্গেই ফলস্বরূপ আসবে বিশ্বের প্রত্যেকের জন্য ভালোবাসা। আমরা যতই ভগবানের কাছে এসে পৌঁছাই ততই তাঁর মধ্যে সব কিছুই দেখা শুরু করি। এই পরম প্রেমের পরমানন্দ কাজে লাগাতে আত্মা যখন সফল হয় তখনই সব কিছুর মধ্যে তাঁকে দেখাটাও শুরু হয়। আমাদের হৃদয় এইভাবে প্রেমের এক চিরন্তন উৎস হয়ে ওঠে। আর, এই প্রেমের

আরও উচ্চতর অবস্থায় পৌঁছলে পৃথিবীর সব জিনিসের মধ্যে ছোটখাটো সব পার্থক্যই সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায় ; মানুষকে দেখা হয় মানুষরূপে আর নয়—একমাত্র ভগবানরূপে ; কোন প্রাণীকে আর প্রাণীরূপে দেখা হয় না—দেখা হয় ভগবানরূপে ; এমন কি বাঘও আর বাঘ থাকে না, হয়ে ওঠে ঈশ্বরেরই প্রকাশ। এইভাবে ভক্তির এই আত্যন্তিক অবস্থায় আরাধনা করা হয় প্রত্যেককেই—প্রত্যেক জীবনকে, প্রত্যেক অস্তিত্বকে।

এবং সর্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।
কর্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্বভূতময়ং হরিম্‌॥

"প্রভু হরি সর্বজীবেই বিরাজমান, তাই জেনে বিজ্ঞেরা সমস্ত জীবের প্রতি অনড়-প্রেম প্রকাশ করে থাকেন।"

এইরকম সর্বাত্মক নিবিড় প্রেমের ফল-স্বরূপ আসে পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব এবং এই বিশ্বাস যে কোন কিছুই আমাদের বিরুদ্ধে (অপ্রাতিকূল্য) নয়। তখন প্রেমের সত্তা বেদনার মধ্যেও বলতে পারে—"এস যত দুঃখ।" কষ্ট এলে বলতে পারে, "এসো কষ্ট, তোমরাও তো প্রিয়তমের কাছ থেকে এসেছো।" যদি সাপ আসে সে বলবে "এস !" যদি মৃত্যু আসে এই ভক্ত একটু হেসে তাকে অভ্যর্থনা করবে। "আমি ভাগ্যবান, তারা সবাই আমার কাছে আসছে।" "ঈশ্বরের এবং তাঁর সৃষ্ট সবকিছুর প্রেম থেকে উদ্ভূত এই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের অবস্থায় ভক্ত সুখ দুঃখে আক্রান্ত হয়েও তাদের মধ্যে পার্থক্য হারিয়ে ফেলে। সে জানে না কি নিয়ে অভিযোগ করতে হবে ; ভগবানের ইচ্ছার কাছে—যিনি হলেন সম্পূর্ণ প্রেমস্বরূপ তাঁর ইচ্ছার কাছে এই জাতীয় অভিযোগ-শূন্য আত্মসমর্পণ সত্য সত্যই এক মহত্তর অধিকার—বড়বড় বীরত্বের ক্রিয়াকাণ্ডের গৌরবের চেয়েও এটা সত্য সত্যই যোগ্যতর।

মানবজাতির অধিকাংশের কাছেই দেহটাই হলো সব কিছু, এই দেহটাই তাঁদের কাছে বিশ্বজগৎ ; দৈহিক সুখভোগই তাদের সব কিছু। এই দেহদানবের ও দেহের সব কিছুর পূজাপদ্ধতি আমাদের সবার মধ্যে প্রবেশ করেছে। আমরা বড় বড় কথায় অভ্যস্ত, বড় বড় লম্ফঝম্ফ মারি কিন্তু আমরা যে শকুন সেই শকুন ; আমাদের মন ছুটে যায় নীচে মড়ার উপর। আচ্ছা, বাঘ থেকে আমাদের দেহটাকে বাঁচাব কেন ? কেন আমরা বাঘটাকে তা দিয়ে দেব না ? বাঘটা তো তাতে খুশীই হবে, এবং সেটা আত্মোৎসর্গ বা উপাসনার চেয়ে একেবারেই স্বতন্ত্র কিছু নয়। এমন একটা অবস্থার কথা ভাবতে পারো যেখানে সমস্ত আত্মচেতনাই হারিয়ে যায় ? প্রেমধর্মের শিখরে এটা একটা অত্যন্ত অস্বচ্ছ-উচ্চ অবস্থা, আর পৃথিবীর খুব কম লোকই সেখানে আরোহণ করেছে . কিন্তু কোন লোক নিত্য-প্রস্তুত ও নিত্য-আগ্রহী আত্মসমর্পণের উচ্চতম বিন্দুতে না পৌঁছান পর্যন্ত পূর্ণভক্ত হতে পারে না। কমবেশী খুশী মতো ও কমবেশী ফাঁকমতো আমরা সবাই আমাদের দেহকে নিয়ে যা-খুশী করতে পারি। তাহলেও আমাদের দেহকে যেতেই হবে, তার কোন চিরস্থায়িত্ব নেই। পরহিত ব্রতে যাদের দেহ ধ্বংস হয় তারা তো ভাগ্যবান। সাধুপুরুষ "সম্পদ এবং জীবন পর্যন্ত অন্যের সেবার জন্য সদা প্রস্তুত রাখেন। এই পৃথিবীতে

একটা জিনিস সুনিশ্চিত, তা হল মৃত্যু ; খারাপ কারণে না হয়ে সৎ কোন কারণে এই দেহের যদি মৃত্যু ঘটে সে তো আরও ভালো।" আমরা আমাদের জীবনকে পঞ্চাশ কি শতবর্ষ পর্যন্ত টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু তারপরে, তারপর কী ? যা-কিছুই সংমিশ্রণের ফল তা তো একাকার হয়ে যাবেই। এক সময় আসবে—এবং আসবেই যখন তার পচন-ক্রিয়া শুরু হবে। যীশু, বুদ্ধ ও মহম্মদ সকলেই মৃত; সমস্ত মহান ধর্মগুরু এবং শিক্ষকবৃন্দই পরলোকগত।

"এই বিলীয়মান পৃথিবীতে যেখানে প্রত্যেক কিছুই ভঙ্গুর, তখন যে সময়টুকু আমরা পাচ্ছি তা সর্বোচ্চ কাজে ব্যবহার করতে হবে।"—বলছে ভক্ত ; এবং সত্যই জীবনের সর্বোচ্চ ব্যবহার হল সর্বজীবের সেবায়ই তা ধারণ করা। ভয়ঙ্কর দেহ-ভাবনাই পৃথিবীতে যত স্বার্থপরতার জন্ম দেয় ; এ-এক বিভ্রান্তি যে আমরা হলাম পুরোপুরি এই দেহটাই, এবং এই দেহটাকেই যথাসাধ্য রক্ষা করতে হবে এবং তৃপ্ত রাখতে হবে। তুমি তোমার দেহ ছাড়াও নিশ্চিত আর কিছু—এটা বুঝলে যে কারও সঙ্গেই তোমার ঝগড়ারও কিছু নেই বা মারামারিরও নয়, তখন সমস্ত স্বার্থপর ভাবই তোমার কাছে মৃত। তাই ভক্তজন ঘোষণা করছে আমাদের এমন ভাব রাখতে হবে যেন পৃথিবীর সব কিছুর কাছেই আমরা একেবারে মৃত ; এবং সেটাই হল আত্মসমর্পণ। সব জিনিসই যেমন আসে আসুক না। "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক"—কথাটার অর্থই তাই ; অবশ্য ঝগড়াঝাটি মারামারি করতে করতে এটা ভাবা নয় যে আমাদের সমস্ত দুর্বলতা এবং সমস্ত পার্থিব উচ্চাশাই ভগবানের ইচ্ছা। হতে পারে আমাদের স্বার্থপরতার সংগ্রাম থেকেই ভালটা আসে ; কিন্তু সেটা তো ভগবানেরই দেখবার বিষয়। আদর্শ ভক্তের ভাব-ভাবনা কখনোই তার নিজের জন্য ভাবনা বা কাজ নয়। "প্রভু, তোমার নামে ওরা উঁচু উঁচু মন্দির গড়ে, তোমার নামে দান করে বড় বড় উপচার। আমি গরিব, আমার কিছুই নেই ; তাই আমি আমার এই দেহকে তোমার পায়ের কাছে রাখলাম। হে প্রভু, আমাকে ত্যাগ কোরো না।" ভক্ত-হৃদয়ের গভীর থেকেই উৎসারিত হয় এমন প্রার্থনা। প্রেমময় প্রভুর কাছে অহং-এর এই চির-আত্মসমর্পণ হল সমস্ত সম্পদ ও প্রতাপ অপেক্ষা, খ্যাতি ও উপভোগের সমস্ত ঊর্ধ্বগামী ভাব-ভাবনা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর,—যাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে তারাই তা জানে। ভক্তের সুস্থির আত্মসমর্পণের শান্তি হল এমন শান্তি যা সমস্ত বোধের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং অতুলনীয় মূল্যে মহীয়ান। তাঁর অপ্রাতিকূল্য হল মনের এমন এক অবস্থা যেখানে কোনই স্বার্থ নেই, এবং স্বতই বিরুদ্ধ-কিছু জানা নেই। এই মহান আত্মসমর্পণের অবস্থায় আসক্তিরূপ সবকিছুই সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়, থাকে কেবলমাত্র তাঁর সর্বগ্রাহী ভালবাসা—যার মধ্যে সমস্ত কিছুই প্রাণ ধারণ করে বিচরণ করে, এবং অস্তিত্ব পায়। ঈশ্বরের প্রতি এই প্রেমাসক্তি সত্যসত্যই আত্মাকে বন্ধনাধীন করে না, বরং কার্যতই সমস্ত বন্ধন ভেঙে দেয়।

যথার্থ প্রেমিকের কাছে উচ্চতর জ্ঞান ও উচ্চতর প্রেম একই

উপনিষদে উচ্চতর নিম্নতর জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে, কিন্তু ভক্তের কাছে এই উচ্চতর জ্ঞান ও তার উচ্চতর ভালবাসার (পরাভক্তির) মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। মুণ্ডক উপনিষদে বলছে :

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরাচৈবপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

"ব্রহ্মজ্ঞগণ স্পষ্ট বলেছেন জ্ঞাতব্য দুই রকমের জ্ঞান আছে, যথা—উচ্চতর (পরা) এবং নিম্নতর (অপরা)। উভয়ের মধ্যে নিম্নতর জ্ঞানের কথা আছে ঋগ্বেদে, যজুর্বেদে, সামবেদে, অথর্ববেদে, শিক্ষাশাস্ত্রে (অর্থাৎ উচ্চারণ ও শ্বাসঘাত-বিষয়ক বিজ্ঞানে), কল্পশাস্ত্রে (অর্থাৎ বলিদান প্রাসঙ্গিক প্রার্থনাদিতে), ব্যাকরণে, নিরুক্ত শাস্ত্রে (অর্থাৎ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থগত বিজ্ঞানে), ছন্দশাস্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে ; এবং উচ্চতর হল যে জ্ঞানের দ্বারা অব্যয়কে জানা যায়।"

এইভাবে উচ্চতর জ্ঞানকেই দেখান হয়েছে ব্রহ্মজ্ঞানরূপে ; দেবী ভাগবতে উচ্চতর প্রেম (পরাভক্তি) সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া আছে— "এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে তৈল যেমন এক অব্যাহত রেখায় পতিত হয় তেমনই মন এক অব্যাহত ধারায় যখন ঈশ্বরের চিন্তা করে, তখনই আমরা পরম প্রেম বা পরাভক্তি পাই।" ঈশ্বরের প্রতি হৃদয় ও মনের এইরকম অবিচ্ছিন্ন আসক্তির মতো অব্যাহত ও সদাজাগ্রত গতিই হল মানবিক ভালোবাসার উচ্চতর প্রকাশ। ভক্তির অন্য সব রূপই সর্বোচ্চ রূপ প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুতি মাত্র, যেমন পরাভক্তি প্রেমরূপে পরিচিত হলেও তা অনুরক্তির পরই আগত প্রেম (রাগানুরাগ)। মানুষের হৃদয়ে যখন এই পরম প্রেম একবার উদিত হয় তখন তার মন কেবলই ঈশ্বর-চিন্তা করতে থাকে, তার আর কিছুই স্মরণ হয় না। ঈশ্বর-চিন্তা ছাড়া তার হৃদয়ে আর কোন স্থান থাকে না, এবং তার আত্মা অজেয়রূপেই পবিত্র থাকে, এবং স্বয়ং মন ও পদার্থের সমস্ত বন্ধন ভেঙ্গে শান্ত ও মুক্ত হয়। একমাত্র সে-ই হৃদয়ই ঈশ্বর উপাসনা করতে পারে ; তার কাছে আকারাদি, প্রতীকাদি, গ্রন্থাদি এবং নীতি-নির্দেশাদি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, এবং তারা যে কোনদিক থেকেই ব্রতযোগ্য প্রমাণিত হয় না। এইরূপে ঈশ্বরকে ভালবাসাটা সহজ নয়। সাধারণত দেখা যায় যেখানে প্রতিদান পাওয়া যায় সেখানেই মানবিক প্রেম বিকশিত হয়, আর যেখানে প্রত্যাখ্যাত হয় সেখানে স্বাভাবিক ভাবে দেখা দেয় কঠিন ঔদাসীন্য। অবশ্য, যেখানে প্রেমের কোন প্রতিদান নেই সেখানেও প্রেমের প্রকাশ খুব কমই দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ এই জাতীয় প্রেমকে আগুনের জন্য পতঙ্গের প্রেমের সঙ্গেই তুলনা করতে পারি ; পতঙ্গ আগুন ভালোবাসে, তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ও মরে যায়। এই পতঙ্গের স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে অমন ধরনের ভালবাসা। ভালোবাসা, কারণ ভালোবাসার স্বভাবই হল ভালো-বাসা—পৃথিবীতে যত রকমের উচ্চতম এবং সর্বাপেক্ষা স্বার্থপরতাহীন প্রেমের প্রকাশ আছে এটা তাই। এহেন ভালোবাসা অধ্যাত্ম স্তরে দেখা দিলে অবশ্যই তা পরাভক্তি প্রাপ্তির দিকে নিয়ে যাবে।

প্রেমের ত্রিভুজ

আমরা প্রেমকে একটি ত্রিভুজরূপে উপস্থিত করতে পারি, এই ত্রিভুজের প্রত্যেকটি কোণই তার অচ্ছেদ্য এক-এক বৈশিষ্ট্যের বাহক। ত্রিকোণ ছাড়া কোন ত্রিভুজ হয় না। তিনটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও কোন সত্যিকার ভালবাসা হয় না। আমাদের প্রেম-ত্রিভুজের প্রথম কোণটি হল সেই ভালবাসা যা কোন লাভালাভের আশা রাখে না। যেখানে কোন না কোন প্রতিদানের অপেক্ষা থাকে সেখানে সত্যিকার ভালবাসা থাকতে পারে না; তা একেবারে দোকানদারির মত হয়ে পড়ে। যে পর্যন্ত আমাদের মনে শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের প্রতিদান-স্বরূপ ভগবানের কাছ থেকে কোন রকম অনুগ্রহ লাভ করার ভাব থেকে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সত্যিকার ভালবাসা জন্মাতে পারে না। ভগবান তাদের উপরে কৃপা বর্ষণ করবে—এই ভেবেই যারা ভগবানকে উপাসনা করে তারা নিশ্চয়ই ভগবানের উপাসনা করে না—বিশেষত ঐ অনুগ্রহ যদি দেখা না দেয়। ভক্ত ভগবানকে ভালোবাসে কারণ সে ভালোবাসবারই যোগ্য। সত্যকার ভক্তের এই স্বর্গীয় আবেগের সৃষ্টি ও পরিচালনার অন্য আর কোন উদ্দেশ্যই নেই। আমরা শুনেছি একবার এক মহারাজ নাকি এক বনে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে এক ঋষির দেখা পেলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে তার পবিত্রতায় ও জ্ঞানে বিশেষ প্রীত হলেন। মহারাজ তখন ঋষিকে উপহার গ্রহণ করে বাধিত করতে বললেন। ঋষি তাতে অসম্মত হয়ে বললেন—"এই বনের ফলমূলাদি আমার পক্ষে পর্যাপ্ত খাদ্য; পর্বত-নিঃসৃত পবিত্র জলধারা আমাকে যথেষ্ট পানীয় দান করে; বৃক্ষবল্কল যোগায় যথেষ্ট আচ্ছাদন; আর পর্বতগুহাই হল আমার গৃহ। আমি কেন তোমার বা আর কারও কাছ থেকে অনুগ্রহ গ্রহণ করবো?" রাজা বললেন, "আমার উপকারের জন্যই আমার হাত দিয়ে অনুগ্রহ করে কিছু গ্রহণ করুন, একটিবার আমার সঙ্গে রাজ-ধানীতে আমার প্রাসাদে আসুন।" বহু অনুনয়-বিনয়ের পরে ঋষি রাজার ইচ্ছানুসারে রাজী হলেন, তার সঙ্গে রাজপ্রাসাদে গেলেন। ঋষিকে উপহার দেবার আগে রাজা এই বলে বারংবার প্রার্থনা জানালেন—"প্রভু, আমাকে আরও সন্তান দিন; প্রভু, আমাকে ধন দিন; প্রভু, আমাকে আরও রাজ্য দিন; প্রভু, আমার দেহে আরও স্বাস্থ্য দিন।"—এবং আরও অনেক কিছু বললেন। রাজা তার প্রার্থনা শেষ করার আগেই ঋষি গাত্রোত্থান করে ঘর থেকে নিঃশব্দে চলে গিয়েছেন। এতে রাজা বড়ই বিব্রত হয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন, উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, "আপনি যে চলে যাচ্ছেন, আমার উপহার তো গ্রহণ করেন নি।" ঋষি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—"আমি ভিখারীর কাছে ভিক্ষা করি না। তুমি নিজেই তো এক ভিক্ষুক, তুমি আমাকে কি দেবে? তোমার মত ভিখারীর কাছ থেকে কোন জিনিস নেব এমন মূর্খ আমি নই। চলে যাও, আমাকে অনুসরণ করো না।"

এখানে যে একেবারেই ভিখারী আর যে সত্যিকার ঈশ্বর-প্রেমিক তাদের উভয়ের মধ্যে চমৎকার ভেদরেখা টানা হয়েছে। ভিক্ষা করাটা প্রেমের ভাষা নয়। এমনকি

মুক্তি বা অন্য যে কোন পুরস্কারের জন্যও ভগবানের উপাসনা সমভাবেই অধঃপতিত করে। প্রেম কোন পুরস্কার চায় না। সর্বদাই প্রেমের জন্যই প্রেম। ভক্ত ভালবাসে কারণ—সে ভালো না বেসে পারে না। তুমি যখন কোন সুন্দর দৃশ্য দেখে তার প্রেমে পড় তখন তো সে দৃশ্যের কাছ থেকে অনুগ্রহরূপে কিছুই দাবি কর না। কিংবা সে দৃশ্যও তোমার কাছ থেকে কিছু দাবি করে না। তবু তো সেই দৃশ্য তোমার মনে এনে দেয় স্বর্গসুখ, তোমার মনের মধ্যে ঘটায় সমস্ত বিরোধের অবসান; তোমাকে করে তোলে শান্ত, তোমাকে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও যেন তুলে ধরে তোমার মর্ত-প্রকৃতির ঊর্ধ্বে—তোমাকে এক পরিপূর্ণ আনন্দ-উৎসের কাছে নিয়ে যায়। প্রকৃত ভালোবাসার এই প্রকৃতিটি হল আমাদের ত্রিভুজের প্রথম কোণ। তোমার ভালোবাসার জন্য প্রতিদানে কিছু চেয়ো না; তোমার অবস্থাটি সর্বদাই হয় যেন দাতার; ভালোবাসা দাও ভগবানকেই,—এমনকি তাঁর কাছ থেকেও কোনরকম প্রতিদান চেয়ো না।

ত্রিভুজের দ্বিতীয় কোণ হল সেই ভালোবাসা, যে ভালোবাসা নির্ভয়। ভয় থেকে যারা ভগবানকে ভালবাসে তারা হল নিম্নস্তরের মানুষ—মানুষ হিসেবে একেবারেই অপরিণত। তারা ভগবানের উপাসনা করে শাস্তিভয় থেকে। তিনি তাদের কাছে যেন এক মহাব্যক্তি বিশেষ—একহাতে চাবুক, অন্য হাতে ধর্মদণ্ড, তাঁকে যদি মান্য করা না হয় তবে ভয় তাদেরকে প্রহার করা হবে। শাস্তির ভয়ে ভগবানের উপাসনা করা হল অধঃপতন; এইরকম উপাসনা যদি উপাসনাই হয় তো তা হল প্রেমোপাসনারই স্থূলরূপ। যে পর্যন্ত হৃদয়ে কোনোরকম ভয় আছে সেখানে প্রেমও কি করে থাকবে? প্রেম স্বভাবতই সকল ভয়কে জয় করে। মনে কর পথের এক অল্পবয়সী মাকে, এবং একটা কুকুর তার দিকে ঘেউ ঘেউ ডাকছে; সে ভয় পেয়ে কাছের বাড়িতে ছুটে গেল। কিন্তু ধরা যাক, পরের দিন সেই পথেই সে তার বাচ্চাকে নিয়ে বসে আছে, আর একটা সিংহ বাচ্চাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তখন তার অবস্থাটা হবে কিরকম? অবশ্যই ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে সে সিংহের মুখের মধ্যে গিয়ে পড়বে। ভালোবাসা সমস্ত ভয়কেই জয় করে। বিশ্ব থেকে নিজেকে কেটে বাদ দেবার মতো স্বার্থপর ভাবনা থেকে ভয়ের জন্ম হয়। যতই আমি নিজেকে আরও ছোট ও আরও স্বার্থপর করে তুলব, ততই ভয় হবে। কেউ যদি ভাবে সে হল পুঁচকে একটা বাজে-কিছু, তবে নিশ্চয়ই ভয় তাকে আচ্ছন্ন করবে। নিজেকে তুচ্ছ ব্যক্তি রূপে যতটা কম ভাববে ততই ভয় তোমার কাছে কম আসবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কণামাত্র ভয়ও তোমার মধ্যে থাকবে, প্রেমও থাকবে না। ভালবাসা ও ভয় একত্র থাকতে পারে না। ভগবানকে যারা ভালবাসে—তারা তো ভগবানকে কখনই ভয় করে না। ধর্মাদেশ হল "তোমার প্রভু ভগবানের নাম বৃথাই নিও না।"—ভগবানের প্রকৃত প্রেমিকের কাছে এটা উপহাসের বিষয়। ভালোবাসার রাজ্যে নিন্দার স্থান কোথায়? যতই তুমি প্রভুর নাম কর ততই ভাল,—যে ভাবেই কর না কেন তুমি তাঁরই নামের পুনরাবৃত্তি করছ, যেহেতু তুমি তাকে ভালোবাস।

প্রেম-ত্রিভুজের তৃতীয় কোণ হল সেই প্রেম, যে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, কারণ তার

মধ্যে সর্বদাই বর্তমান থাকে প্রেমের সর্বোচ্চ আদর্শ। প্রেমের আধার আমাদের কাছে সর্বোচ্চ আদর্শ না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত প্রেম আসতে পারে না। বহু ক্ষেত্রেই মানবপ্রেম ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হতে পারে এবং ভুলক্ষেত্রে স্থাপিত হতে পারে, কিন্তু যে ভালোবাসে তার কাছে ভালোবাসার ধন সর্বদাই হয় তার সর্বোচ্চ আদর্শ। একজন তার আদর্শ দেখতে পারে জঘন্যতম লোকের মধ্যেই, আবার অন্যজন সর্বোচ্চ ধরনের ব্যক্তির মধ্যে; যে দিক থেকে হক একমাত্র আদর্শকেই যথার্থভাবে এবং নিবিড়ভাবে ভালোবাসা যায়। প্রত্যেকেরই সর্বোচ্চ আদর্শকে বলা হয় ভগবান। মূর্খ কি বিজ্ঞ, সাধু কি পাপী, পুরুষ কি নারী, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন কি সংস্কৃতিহীন—প্রত্যেক মানুষের কাছেই তার সর্বোচ্চ আদর্শ হল ভগবান। সৌন্দর্যের, মহত্ত্বের, এবং শক্তির সর্বোচ্চ আদর্শসমূহের সমন্বিত রূপটি আমাদের কাছে তুলে ধরে প্রেমময় ও প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের পূর্ণতম ধ্যান-ধারণা।

এই আদর্শসমূহ স্বভাবতই কোন না কোন আকারে প্রত্যেকের মনের মধ্যে বিরাজ করে; আমাদের সকলের মনেরই এসব হল অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানব-স্বভাবের সমস্ত জীবন্ত প্রকাশই হল আমাদের বাস্তব জীবনে ঐ আদর্শ বোধের জন্যেই সংগ্রাম। সমাজে আমাদের চতুর্দিকে যত রকম আন্দোলন দেখি তা বিচিত্র রকম আত্মিক গৌরব, এবং আদর্শের বহিঃ-প্রকাশের প্রয়াসে ও বাস্তবরূপ গ্রহণের কারণেই ঘটে থাকে। যা ভিতরে তাই বাইরে আসবার জন্য চাপ দিতে থাকে। আদর্শের এই চিরন্তনরূপে প্রবল প্রভাব হল এক গতিবেগ—এক উদ্দেশ্যগত শক্তি, এবং মানবজাতির মধ্যে তাকে নিয়তই ক্রিয়াশীল দেখা যায়। শত শত জন্মের পরে, শত সহস্র জন্মের সংগ্রামের পরেই এমনটা হতে পারে যে, মানুষ বৃথাই অন্তরের আদর্শকে বাহিরের অবস্থাদির সঙ্গে সম্পূর্ণত মেলাতে পারে এবং তাদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে পারে; এটা বুঝবার পরে সে আর স্বীয় আদর্শকে বাহিরের জগতে উপস্থাপিত করতে সচেষ্ট হয় না। বরং প্রেমের সর্বোচ্চ মান-রূপে আদর্শকেই আদর্শ রূপে উপাসনা করে। এইরকম আদর্শগত দিক থেকে পূর্ণ আদর্শই সমস্ত নিম্নতর আদর্শকে আলিঙ্গন করে নেয়।

এই কথার যথার্থতা সকলেই স্বীকার করে যে, প্রেমিক ব্যক্তি হেলেনের সৌন্দর্য দেখতে পায় এক কুশ্রী আফ্রিকাবাসীর মুখেও। যে লোক দর্শক হিসেবে দাঁড়িয়ে সে দেখে প্রেম এখানে ভুল জায়গায় আসন গ্রহণ করেছে; যে প্রেমিক সে কিন্তু হেলেনকেই দেখতে পায়—কুশ্রী এক আফ্রিকাবাসীকে মোটেই দেখে না। হেলেন বা ঐ আফ্রিকাবাসী হল প্রেমেরই আশ্রয় বিশেষ, তাকে কেন্দ্র করেই আমাদের প্রেমের আদর্শ প্রতিমা-রূপ গ্রহণ করে। পৃথিবী সাধারণত যাকে উপাসনা করে সে কে? নিশ্চয়ই এই সর্বাত্মক ও আদর্শগত দিক থেকে পরমভক্ত ও সরস প্রেমিকের পূর্ণ আদর্শ নয়।

নরনারী সাধারণত যে আদর্শের আরাধনা করে তা নিজেদেরই মধ্যকার কিছু; প্রত্যেক লোকই তার আদর্শকে বাহিরের পৃথিবীতে উদ্ভাসিত করে তোলে এবং তার সম্মুখে নতজানু হয়। এই জন্যেই আমরা দেখতে পাই যারা নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু

তারা রক্তপিপাসু দেবতাকে ধারণায় গড়ে তোলে, কারণ তারা তাদের সর্বোচ্চ আদর্শকেই কেবলমাত্র ভালবাসতে পারে। আর সেইজন্যেই সজ্জনেরা ভগবানের খুব উঁচু আদর্শ ধারণ করে এবং তাদের আদর্শ সত্যই খুব স্বতন্ত্র ধরনের হয়ে থাকে।

প্রেমের দেবতা নিজেই তার নিজের প্রমাণ

যে প্রেমিক স্বার্থপরতার, লাভালাভের বাইরে সম্পূর্ণভাবেই চলে গেছেন এবং যিনি নির্ভয় সেই প্রেমিকের আদর্শটি কেমন? তিনি এমন কি মহান ভগবানের কাছে—বলেন, "আমি তোমাকে আমার সর্বস্ব দেব, আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই চাই না; সত্য সত্যই আমার তো নিজের বলতে কিছুই নেই।" কোন মানুষ যখন এই বিশ্বাস অর্জন করে, তার আদর্শ হয়ে ওঠে আদর্শ প্রেমেরই সম্পূর্ণ নির্ভয়-রূপ। এইরকম ব্যক্তির সর্বোচ্চ আদর্শে কোন বিশেষিত সংকীর্ণতা আর থাকে না; এ হল সর্বজনীন প্রেম, বন্ধনমুক্ত অসীম প্রেম, প্রেম নিজেই, পরম প্রেম। প্রেমধর্মের এই মহা আদর্শকেই পরমরূপে আরাধনা করা ও ভালবাসা হয়—কোনরকম প্রতীক বা আভিভাব (ইঙ্গিত-রূপ) ছাড়া। আদর্শরূপেই এমন সর্বাত্মক আদর্শের আরাধনাই হল পরাভক্তির সর্বোচ্চ আদর্শ; ভক্তির অন্যসব রূপই এখানে পৌঁছবার পথে সোপান-শ্রেণী মাত্র। প্রেমধর্মের অনুসরণ পথে আমাদের যত ব্যর্থতা ও সাফল্য সবই এক আদর্শবোধের পথে বিন্যস্ত। একের পর এক বিষয়কে গ্রহণ করা হয়, আর আভ্যন্তরীণ আদর্শ ক্রমান্বয়ে তাদের ওপর প্রতিফলিত হয়; এইরূপ বহিরঙ্গ সমস্ত বিষয়াশ্রয়ই ক্রমপ্রসারী আভ্যন্তরীণ আদর্শকে প্রকাশ করবার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে এবং স্বভাবতই একের পর এক প্রত্যাখ্যাত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ভাবতে শুরু করে বহির্বিষয়াশ্রয় আদর্শকে উপলব্ধি করার চেষ্টা বৃথা মাত্র, এবং আদর্শের তুলনায় সমস্ত বহির্বিষয় কিছুই নয়; কালক্রমে তিনি এমন এক সর্বোচ্চ ও সর্বসাধারণীকৃত বিশুদ্ধ আদর্শকে সম্পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করার শক্তি অর্জন করেন যে বিশুদ্ধ আদর্শ তাঁর কাছে হয়ে ওঠে সম্পূর্ণরূপে জীবন্ত সত্য। ভক্ত এই শীর্ষে পৌঁছলে তিনি আর এই জিজ্ঞাসায় উদগ্রীব হন না যে, ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় কিনা, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী কিনা। তাঁর কাছে তিনি কেবলমাত্র প্রেমের দেবতা; তিনি প্রেমের সর্বোচ্চ আদর্শ—এবং তাঁর সব উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এটাই যথেষ্ট। প্রেমরূপে তিনি স্ব-প্রকাশ। প্রেমিকের কাছে প্রিয়তমের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করার জন্য কোন প্রমাণের দরকার হয় না। অন্যান্য ধর্মের বাহাদুর ভগবানেরা তাঁদেরকে প্রমাণের জন্য বহুরকম প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন, কিন্তু ভক্ত যে সে এরকম ভগবানদের কথা মোটেই চিন্তা করে না বা চিন্তা করতে পারে না। তার কাছে ভগবান আছেন একমাত্র প্রেমরূপে। "প্রিয়তমে, স্বামীকে কেউ স্বামীর জন্যই ভালবাসে না। স্বামীর মধ্যে যে আত্মরূপ আছে তাঁর জন্যই স্বামীকে ভালবাসে; প্রিয়তমে, স্ত্রীর জন্যই কেউ স্ত্রীকে ভালবাসে না, স্ত্রীর মধ্যে যে আত্মরূপ আছে তাঁর জন্যেই ভালবাসে।"

কেউ কেউ বলে থাকেন, সমস্ত মানবিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যাত্মক একমাত্র শক্তিই হল স্বার্থ। এটাও হল বিশেষিত রূপের দ্বারা অবনত ভালবাসা। আমি যখন আমাকে বিশ্বব্যাপী ভাবি তখন নিশ্চয়ই আমার মধ্যে কোন স্বার্থ থাকতে পারে না; কিন্তু আমি যখন ভ্রান্তিবশত মনে করি যে আমি ছোট্ট একটু-কিছু তখনই

আমার ভালোবাসা বিশেষিত ও সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে। ভালবাসার ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ ও সংকুচিত করে তোলার জন্যই এমন ভ্রান্তি ঘটে থাকে। বিশ্বের সমস্ত কিছুই ঈশ্বর-উদ্ভূত এবং ভালোবাসার যোগ্য; অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে, পূর্ণের ভালোবাসার মধ্যে অংশের ভালোবাসাও রয়েছে। এই পূর্ণরূপই হল ভক্তের ভগবান। আর অন্য সব দেবতাগণ, স্বর্গের পিতৃপুরুষগণ, শাসকগণ বা স্রষ্টাগণ, এবং যত সব মত ও নীতি এবং গ্রন্থাদির কোন উদ্দেশ্য বা অর্থই ভক্তের কাছে নেই। কারণ তিনি তাঁর পরম প্রেম ও ভক্তির মাধ্যমে ওসবের একেবারেই উর্ধ্বে চলে গেছেন।

হৃদয় বিশুদ্ধ প্রেমের স্বর্গীয় সুধায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হলে অন্য সব ঈশ্বরাদর্শই একেবারে তুচ্ছ হয়ে যায় এবং অপর্যাপ্ত ও অযোগ্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়। পরাভক্তি বা পরমপ্রেমের এমনই প্রতাপ; পূর্ণরূপ ভক্ত আর ঈশ্বর-দর্শনের জন্য মন্দির বা গির্জায় যান না। তিনি জানেন এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তাঁকে দেখা যায় না। তিনি তাঁকে মন্দিরেও দেখেন, মন্দিরের বাইরেও দেখতে পান; তিনি তাঁকে সাধুসন্তের সত্তায় দেখতে পান, আবার বদলোকের বদচরিত্রেও দেখতে পান; কারণ তাঁর আপন হৃদয়ে তিনি সেই ভগবানকে স্ব-মহিমায় সমাসীন করেছেন—চির-ভাস্বর ও চির-বিরাজমান প্রেমের সর্বশক্তিমান এক চির-প্রোজ্জ্বল প্রেমালোক-রূপে।

প্রেমের স্বর্গীয় আদর্শের মানবিক প্রকাশ

প্রেমের এই পরম ও অসীম আদর্শ যে কী তা মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মানবিক কল্পনার সর্বোচ্চ বিস্তর এর অসীম পূর্ণতা এবং সৌন্দর্যকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়। তবু প্রেমধর্মের শিষ্যগণ সবদেশেই উচ্চ কি নিম্ন আকারে মানুষের অপর্যাপ্ত ভাষাকেই ব্যবহার করেছেন তাঁদের স্বীয় প্রেমাদর্শকে বুঝবার জন্য এবং সংজ্ঞা-রূপ দেবার জন্য। কেবল তাই নয়, মানবিক প্রেম তার বহু-বিচিত্র আকারে এই অব্যক্ত স্বর্গীয় প্রেমকে প্রতীক রূপ দান করেছেন। মানুষ কেবলমাত্র তার মানবিক ভঙ্গিতেই স্বর্গীয় কিছু ভাবতে পারে। প্রযুক্ত অসীমকে কেবলমাত্র সম্পর্কযুক্ত ভাষায় আমাদের কাছে প্রকাশ করা যায়। নিখিল বিশ্ব আমাদের কাছে সীমিত ভাষায় অসীমের লিখন। তাই ভক্তেরা ভগবান সম্পর্কে ও তার প্রেমোপাসনা সম্পর্কে সাধারণ মানবিক প্রেমের সাধারণ পরিভাষাই ব্যবহার করে থাকেন।

পরাভক্তি প্রসঙ্গে কোন কোন মহান গ্রন্থকার এই স্বর্গীয় প্রেমকে বহু স্বতন্ত্র পন্থায় বুঝতে ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে চেষ্টা করেছেন। সবচেয়ে নিম্ন যে আকারে এই ভালোবাসাকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় তাকে বলা হয় শান্তিময় অর্থাৎ শান্ত। হৃদয়ে ভালবাসার আগুন না থাকলেও, মস্তিষ্কে পাগলামি না ঢুকলেও, কেউ যখন ভগবানের আরাধনা করে, যখন সে ভালবাসা হয়ে ওঠে সাধারণ ধরনেরই প্রশান্ত ভালবাসা, কেবলমাত্র রূপ ও ক্রিয়াকাণ্ড বা প্রতীকের চেয়ে কিছুটা উপরের কিছু, কিন্তু প্রাণচঞ্চল নিবিড় প্রেমের পাগলামির দ্বারা বিশেষিত নয়,—তাকেই বলা হয় শান্ত। আমরা পৃথিবীতে কিছু কিছু লোক দেখি যারা ধীরে ধীরে চলে, আবার অন্যেরা ঝড়ের মত আসে যায়। শান্ত ভক্ত হল ধীর স্থির শান্তিময় ও বিনীত।

দ্বিতীয় উচ্চতর রূপ হল দাস্য অর্থাৎ সেবা; এটা আসে মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের দাস ভাবলে। প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত ভৃত্যের আসক্তিই হল তার আদর্শ।

এর পরের প্রেমরূপ হল সখ্য অর্থাৎ বন্ধুত্ব,—ভাবটা হল 'তুমি আমার প্রাণের বন্ধু'। বন্ধু যেমন বন্ধুর কাছে হৃদয় খুলে দেয়, যেমন সে জানে বন্ধু তার দোষ-ত্রুটির জন্য তাকে কখনই ভর্ৎসনা করবে না, বরং সব সময়েই তার সহায়তা করতে চেষ্টা করবে, কারণ তার ও তার বন্ধুর মধ্যে তো সমভাব রয়েছে। তাই সমভাবটি উপাসক ও তার বন্ধুরূপী ভগবানের মধ্যে ভিতরে-বাহিরে প্রবাহিত হয়। এইভাবে ভগবানই আমাদের বন্ধু হয়ে ওঠে—যে বন্ধু হল নিকটের বন্ধু, যার কাছে আমরা অবাধে জীবনের সব কথা বলতে পারি। নিরাপত্তার আশ্বাস ও সমর্থন পেয়ে আমাদের হৃদয়ের ভিতরের সর্বাপেক্ষা সঙ্গোপন কিছুও আমরা তাঁর কাছে খুলে ধরতে পারি। ভক্ত এই বন্ধুকে তার সমান বলে গ্রহণ করে। ভগবানকে এখানে খেলার সাথীরূপে দেখা হয়। আমরা বলতে পারি এই বিশ্বে আমরা সকলে খেলা করছি। শিশুরা যেমন তাদের খেলা খেলে, বিখ্যাত রাজা-মহারাজারা যেমন তাদের খেলা খেলে, তেমনই প্রেমময় প্রভু নিজেই বিশ্বের সঙ্গে খেলা করছেন। তিনি সম্পূর্ণ, তিনি কিছুই চান না। তিনি সৃষ্টি করলেন কেন? কোন অভাবের পূর্ণতার

জন্য আমাদের কাজ করতেই হয় আর এই অভাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে অসম্পূর্ণতা। ঈশ্বর হলেন সম্পূর্ণ, তাঁর কোন অভাব নেই। তিনি কেন সদা কর্মচঞ্চল এই বিশ্বকে সৃষ্টি করে চলবেন? এ কোন্ উদ্দেশ্য তাঁর? আমরা গল্পে দেখি ভগবান কোন না কোন লক্ষ্যে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন,—এসব গল্প, গল্প হিসাবে ভালোই, কিন্তু অন্যরূপে নয়। সবই সত্যি সত্যি খেলা; এই বিশ্ব তার চলমান খেলা। সমস্ত বিশ্ব নিশ্চয় তাঁর কাছে বেশ বড় একখণ্ড খুশীর কৌতুক। তুমি দরিদ্র হলে কৌতুকরূপে উপভোগ করবে, ধনী হলে ধনী হওয়াটাকেই কৌতুক ভেবে উপভোগ করবে; বিপদ এলে তাও তো এক চমৎকার কৌতুক, সুখ এলে আরও চমৎকার কৌতুক। জগৎ হল ঠিক যেন এক খেলার মাঠ, আর আমরা এখানে খেলার কৌতুক উপভোগ করছি, এবং ভগবানও সব সময় আমাদের সঙ্গে খেলছেন—আমাদেরই চিরন্তন খেলার সাথীরূপে। তিনি কী সুন্দর খেলা করছেন। আর এক চক্র যখন শেষ হয় সেই খেলাও শেষ হয়ে যায়। তারপর কম বা বেশী সময়ের জন্য বিশ্রাম, তারপর সবাই আবার বেরিয়ে আসে ও খেলা শুরু করে দেয়। এ সবই খেলা, আর তুমি নিজেও খেলায় সহায়তা করছ,—একথা তুমি যখন ভুলে যাও তখনই দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে। তখন হৃদয় ভারী হয়ে ওঠে, জগৎ ভয়ঙ্কর শক্তি পেয়ে তোমার ওপর চেপে বসে। কিন্তু যখনই জীবনের এই দু-তিন মিনিটের পরিবর্তনশীল ঘটনাকে বাস্তবেরই তীক্ষ্ণ চেতনা না ভেবে তাকে পরিত্যাগ করবে এবং জানবে তা রঙ্গমঞ্চ মাত্র এবং সেখানে আমরা খেলা করছি—তাঁর খেলায় সহায়তা করছি, তখন এক মুহূর্তেই তোমার সব-দুঃখ কষ্ট চলে যাবে। তিনি প্রত্যেক অণুপরমাণুতেই খেলা করছেন। তিনি খেলা করছেন পৃথিবী ও চন্দ্রসূর্য গড়ে; তিনি খেলা করছেন মানবহৃদয়ের সঙ্গে, জীবজন্তুর সঙ্গে, গাছপালার সঙ্গে। আমরা হচ্ছি তাঁর দাবার বোড়ে। তিনি বোড়েগুলিকে দাবার ছকে বসিয়ে ঝাঁকিয়ে দেন। প্রথমে তিনি একভাবে সাজান তারপর আর একভাবে। এবং আমরা সচেতন বা অচেতনভাবে তাঁকে তাঁর খেলায় সাহায্য করছি। আঃ! কি আনন্দ, আমরা তাঁর খেলার সাথী।

পরবর্তী স্তর হল, যাকে বলে বাৎসল্য—ভগবানকে পিতারূপে নয়, সন্তান রূপে ভালবাসা। এটা খুব অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু ভগবানের ধারণা থেকে প্রতাপমূলক সমস্ত ভাবকে বিচ্ছিন্ন করার যোগ্যতা-সৃষ্টির জন্যই এই নিয়ম-ব্যবস্থা। প্রতাপের সঙ্গে রয়েছে ভয়-বিস্ময় কিন্তু ভালবাসায় তার কোন স্থান নেই। চরিত্র গঠনের জন্য দরকার শ্রদ্ধা ও বাধ্যতার ভাব, কিন্তু চরিত্র গড়ে উঠলে, প্রেমের শান্ত ও শান্তিময় ভাবের আস্বাদ পেলে, এবং তার তীব্র উন্মাদনার কিছুটা পেলে, প্রেমিককে আর নীতিশাস্ত্র ও নিয়ম-ব্যবস্থার কথা ভাবতে হয় না। ভগবানকে মহাশক্তিমান মহামহিম ভাবতে—বিশ্বপ্রভু বা দেবতাদের ঈশ্বররূপে ভাবতে ভক্তেরা চায় না। ভগবান প্রসঙ্গে এই শংকা-সৃষ্টিকারী প্রতাপের চেতনাকে বাদ দেবার জন্যই ভক্তেরা ভগবানকে দেখে আপন সন্তান রূপেও; বাবা-মা সন্তান সম্পর্কে কোনরকম ভয়-বিস্ময়ের দ্বারা সে বিচলিত হয় না, সন্তানের জন্য কোনরকম শ্রদ্ধাবোধও থাকতে পারে না। তার কাছ থেকে কোন রকম অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষার কথাও তারা

ভাবতে পারে না। সন্তানের অবস্থাটা সব সময়ই হয় গ্রহণকারীর ভূমিকা এবং সন্তানের প্রতি স্নেহেই বাবা-মা তাদের দেহকে শত শত বার বিসর্জন দিয়ে থাকে। শত সহস্র জীবন তাদের একটি সন্তানের জন্যই তারা বলিদান দিতে পারে। তাই ভগবানকেই ভালবাসা হয় সন্তানরূপে। ভগবানকে সন্তানরূপে ভালবাসার ভাবটি জন্ম নেয় ও স্বভাবতই বেড়ে ওঠে সেইসব ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে, যারা ভগবানের আবির্ভাবে বিশ্বাস করে। মুসলমানদের পক্ষে ভগবানকেই সন্তানরূপে ভাবাটা অসম্ভব, সভয়ে তারা এমন ধ্যানধারণা থেকে সরে দাঁড়াবে। কিন্তু খ্রীষ্টান কি হিন্দু তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, কারণ তাদের রয়েছে শিশু যীশু বা শিশু কানাই। ভারতের নারীরা প্রায়ই নিজেদের ভাবেন কানাই-এর মা; খ্রীষ্টান মায়েরাও নিজেদের ভাবতে পারেন খ্রীষ্টের মা, এবং তাতে পাশ্চাত্যজগতে জন্ম নেবে ভগবানের স্বর্গীয় মাতৃত্বের জ্ঞান এবং এটা তাদের খুবই প্রয়োজন।

ঈশ্বর সম্পর্কে ভয় বিস্ময় ও শ্রদ্ধার কুসংস্কার আমাদের হৃদয়ের গভীরে শিকড় মেলে আছে, আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তির ভাবকে প্রেমের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে তলিয়ে দিতে বহু সময় লাগে।

প্রেমের স্বর্গীয় আদর্শের আরও এক মানবিক প্রকাশ আছে। তাকে বলা হয় মধুর—এবং এটাই হল এমন সমস্ত প্রকাশের মধ্যে সর্বোচ্চরূপ। এই পৃথিবীতে প্রেমের সর্বোচ্চ প্রকাশের উপরেই তা প্রতিষ্ঠিত এবং এই প্রেম মনুষ্যজগতে সবচেয়ে শক্তিমান। মানুষের সমস্ত স্বভাবকে এই প্রেম উলটপালট করে দেয়, তার অস্তিত্বের প্রতি অণু-পরমাণুতে প্রবাহিত হয়—তাকে পাগল করে তোলে, তার আপন স্বভাবতোই ভুলিয়ে দেয়, তাকে রূপান্তরিত করে, তাকে করে তোলে ভগবান নয়তো দানব,—নরনারীর মধ্যকার এই প্রেম কী না করতে পারে? ভগবৎ প্রেমের এই মধুর রূপেই দেখা দেয় স্বামী। আমরা সকলেই নারী, এ পৃথিবীতে কেউই পুরুষ নয়; পুরুষ আছেন কেবল মাত্র একজন এবং তিনি হলেন ঈশ্বর—আমাদের প্রেমময়। যে ভালবাসা পুরুষ নারীকে দান করে বা নারী পুরুষকে দান করে সেই ভালবাসাই প্রভু ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে হবে।

পৃথিবীতে আর যে সব প্রকারের ভালবাসা দেখতে পাই এবং জানি আমরা কেবল খেলাই করছি, তাদেরও এক লক্ষ্য হল ভগবান; কিন্তু দুঃখের বিষয় মানুষ জানে না কোন্ অসীম সাগরে এই প্রবল প্রেমের নদী নিত্য নিয়তই প্রবাহিত হচ্ছে, আর তাই মূর্খের মতো সে মানবাকারের ছোট ছোট পুতুলের দিকেই সেই প্রেমকে প্রায় সময়ই পরিচালিত করে। সন্তানের জন্য যে প্রবল ভালবাসা মানব-প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে তা তো শিশুরূপ ছোট্ট পুতুলটির জন্যই নয়; অন্ধভাবে এবং একমাত্র রূপে সন্তানের প্রতি যে তা সমর্পণ করবে তার পরিণামে কষ্ট পেতে হবে। কিন্তু এই কষ্টের মধ্য দিয়েই যে চেতনার জাগরণ হবে তাতেই তুমি বুঝবে, এই প্রেম কোনো মানুষকে দিলে শীঘ্রই হোক বা বিলম্বই হোক পরিণামে তা দুঃখ যন্ত্রণা আনবেই। তাই আমাদের ভালোবাসাকে সমর্পণ করতে হবে তাঁর কাছে যিনি অমর ও অপরিবর্তনীয়—তাঁর কাছে যাঁর প্রেম-সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা নাই;·প্রেমকে তার সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে হবে—

যিনি অসীম প্রেমসাগর তাঁর কাছেই। সমস্ত নদীই সমুদ্রেএসে পড়ে, পর্বতগাত্র থেকে আগত এক বিন্দু জলও ঝর্ণা বা নদীতে পৌঁছেও থেমে পড়ে না—সে নদী বা ঝর্ণা যত বড়ই হক না; শেষ পর্যন্ত সেই বিন্দুটিই যেভাবেই হক সমুদ্রের পথ খুঁজে পায়। আমাদের সমস্ত কামনা-বাসনার একমাত্র লক্ষ্য হল ভগবান। ক্রুদ্ধ হতে চাও তাঁর উপরেই ক্রুদ্ধ হও। তোমার প্রিয়তমকে, তোমার বন্ধুকেই ভৎ'সনা কর। তাকে ছাড়া আর কাকেই বা এমন নিরাপদে ভৎ'সনা করবে? মর্ত্যের মানুষ তো তোমার ক্রোধকে সহ্য করবে না,—একটা প্রতিক্রিয়া হবেই। আমার ওপর ক্রুদ্ধ হলে আমি নিশ্চয়ই প্রত্যাঘাত হানবার জন্য প্রস্তুত হব; কারণ, আমি তোমার ক্রোধকে ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি না। প্রিয়তমের উদ্দেশে বলো—"তুমি আমার কাছে আস না কেন, তুমি কেন আমাকে একা ফেলে রেখে যাচ্ছ?" তাকে ছাড়া আনন্দ কোথায়? একমুঠো মাটিতে কি আনন্দ থাকতে পারে? আমাদের সন্ধান করতে হবে অসীম আনন্দের দীপ্ত নির্বাস, এবং তাই হল ভগবান। আমাদের সমস্ত কামনা-বাসনা তাঁর দিকে চালিত হক। ওসব তো তাঁর জন্যই, ওসব যদি তাদের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নীচের দিকে নেমেআসে তবে তা জঘন্য হয়ে পড়ে। আর, তা যখন ঠিক লক্ষ্যের দিকে যায়—প্রভুর দিকে যায়, তখন নিকৃষ্টতমও রূপান্তর লাভ করে। মানুষের দেহমনের সমস্ত শক্তিকে যেভাবেই সে প্রকাশ করুক না কেন, তার এক লক্ষ্য—তার একায়ন হল প্রভু ঈশ্বর। মানব-হৃদয়ে সমস্ত ভালোবাসা ও কামনা-বাসনাকে ভগবানের দিকেই যেতে হবে। তিনি প্রেমময়। তাঁকে ছাড়া আর কাকে এ হৃদয় ভালবাসতে পারে? তিনি সর্বসুন্দর, সর্বাপেক্ষা মহান। তিনিই সুন্দর—তিনি অসীম মহত্ত্ব। এই বিশ্বে তাঁর চেয়ে সুন্দর কে? এই বিশ্বে তিনি ছাড়া কে আর স্বামী হবার যোগ্য? এই বিশ্বে তিনি ছাড়া কে আর ভালোবাসার ক্ষেত্রে যোগ্যতর? তাই তাঁকেই স্বামী হতে দাও, তাঁকেই হতে দাও প্রিয়তম।

অনেক সময়েই এমন হয় যে স্বর্গীয় স্তরের প্রেমিকেরা স্বর্গীয় প্রেমের গান গাইতে গিয়ে মানবিক প্রেমকে তার সমস্ত রূপে বর্ণনা করার মতো যথাযোগ্য ভাষাকেই বরণ করে থাকেন। মূর্খেরা তা বোঝে না, বুঝবেও না। তারা শুধু চর্মচক্ষেই দেখে তো! তারা এই অধ্যাত্ম প্রেমের পাগলামিটা বুঝতে পারে না। কি করে বুঝবে? "তোমার ওষ্ঠের একটি চুম্বনের জন্যই! হে প্রেমময়, তুমি যাকে চুম্বন করেছ, তোমার জন্য তার তৃষ্ণা তো চিরদিনের জন্যই; তার সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণাই তো দূর হয়ে যায়, সে ভুলে যায় সবকিছুকেই—একমাত্র তোমাকে ছাড়া। লালায়িত হও, প্রিয়তমের একটি সেই চুম্বনের জন্যই তার ওষ্ঠের সেই স্পর্শের জন্য—যা পাগল করে তোলে ভক্তকে, মানুষকে করে তোলে দেবতা। এই চুম্বন লাভে যে ধন্য হয়েছে তার সমস্ত স্বভাবই তো পরিবর্তিত হয়ে যায়। পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, চন্দ্র সূর্য মরে যায়, এবং সমস্ত বিশ্বই মিলিয়ে যায় সেই এক অসীম প্রেম-সাগরে। প্রেমের পাগলামির পূর্ণতা এখানেই॥

না, যথার্থ অধ্যাত্ম প্রেমিক এখানে থামে না, এমন কি স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসাও তার কাছে উন্মাদনার নয়। ভক্তেরা এমন কি অবৈধ প্রেমের ভাবকেও বরণ করে

থাকেন,কারণ তা এত প্রবল ; এর অন্যায় দিকটা তাদের চোখেই পড়ে না। এ প্রেমের প্রকৃতি এমন, যত বাধা সেখানে সবই অবাধ লীলা খেলার জন্য, কামনা প্রবল হয়ে ওঠে এবং ক্রমেই তা হয় প্রবলতর। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা হয় সহজ সাবলীল, সেখানে কোন বাধা থাকে না। তাই ভক্তেরা এমনটি ভাবেন : • একটি মেয়ে যেন তার প্রেমিকের প্রেমে বাঁধা পড়েছে, আর তার বাবা-মা বা স্বামী তাতে বাধা দিচ্ছে ; এই প্রেমের গতিতে যতই কেউ বাধা দিচ্ছে ততই তার প্রেম শক্তি-শালী হয়ে উঠছে। কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে পাগলের মতো কি ভাবে গোপীরা ভাল-বেসেছিল, কেমন করে কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর শুনে ভাগ্যবতী গোপীরা তার কাছে ছুটে এসেছিল—সবকিছু ভুলে, এই পৃথিবীকে ভুলে—তার বন্ধন তার কর্তব্য তার সুখ দুঃখ সমস্ত ভুলে। হে মানব, তুমি ভগবৎ প্রেমের কথা বলে থাক, অথচ সেই সঙ্গেই তুমি এই পৃথিবীর মিথ্যা অহংকারের বিষয়ে মন দাও—তুমি কি যথার্থই নিষ্ঠাবান ? "যেখানে রাম সেখানে কোন আকাঙ্ক্ষার স্থান নেই, যেখানে আকাঙ্ক্ষা সেখানে রামের স্থান নেই ; দুটোই কখনো একসঙ্গে থাকতে পারে না—আলো ও অন্ধকারের মতোই তারা কখনই একত্র হয় না।

উপসংহার

প্রেমের এই সর্বোচ্চ আদর্শে পৌছলে দর্শনশাস্ত্র কোথায় থাকে, তার জন্য কার আর মাথাব্যাথা? স্বাধীনতা, মুক্তি, নির্বাণ—সবই দূরে ছুঁড়ে ফেলতে হয়; ভগবৎ প্রেমের আনন্দে থাকলে কে আর স্বাধীন হতে চায়? "প্রভু আমি সম্পদ চাই না, বন্ধু চাই না, বিদ্যা চাই না, এমন কি স্বাধীনতা চাই না। আমি বারংবার যেন জন্মগ্রহণ করি, আর তোমাকে প্রেমিকরূপে পাই। তুমি চিরকাল—চিরকালই আমার প্রেমিক থাকো।" ভক্ত বলছেন—"চিনি হতে চাই নে, চিনি খেতে ভালবাসি।" এরপর কে আর স্বাধীন হবার আকাঙ্ক্ষা রাখে—ভগবানের সঙ্গে এক হতে চায়? "আমি জানতে পারি—আমিই তিনি। তবুও আমি তাঁর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, প্রিয়তমের প্রেমে মত্ত হবার জন্যই স্বতন্ত্র হব।" কোন ভক্ত প্রেম ছাড়া আর কিছুই চায় না,—চায় কেবলমাত্র ভালবাসতে ও ভালবাসা পেতে। তার অপার্থিব ভালবাসা হল নদীর জোয়ারের মতো; যে প্রেমিক নদীর জোয়ারের বিরুদ্ধে উজিয়ে ওঠে। সমস্ত দুনিয়াই তাকে পাগল বলে। আমি একজনের কথা বলছি দুনিয়া তাকে পাগল বলে ডাকত, আর তার জবাবটা ছিল—"ভাইরা, সমস্ত দুনিয়াটাই তো একটা উন্মাদ-আশ্রম। কেউ পার্থিব প্রেমের জন্য পাগল, কেউ নামের জন্য, কেউ যশের জন্য, কেউ অর্থের জন্য, আবার কেউ কেউ মুক্তির জন্য এবং স্বর্গের জন্য। এই বৃহৎ উন্মাদ-আশ্রমে আমিও পাগল, আমি ভগবানের জন্য পাগল। তুমি অর্থের জন্য পাগল, আমি ভগবানের জন্য পাগল। তুমিও পাগল আমিও পাগল। আমি তো মনে করি আমার পাগলামি, সবচেয়ে ভালো।" সত্যকার ভক্তের ভালোবাসা হল এই দীপ্ত উন্মত্ততা—যার সামনে আর সবকিছুই মিলিয়ে যায়। সমস্ত বিশ্বই তার কাছে প্রেমময়, এবং প্রেম দ্বারাই পরিপূর্ণ; প্রেমিকের কাছে এমনটাই মনে হয়। এই প্রেম কারও মধ্যে থাকলে সে চিরন্তনরূপে ধন্য হয়, সুখী হয়। একমাত্র এই স্বর্গীয় প্রেমের মহান উন্মত্ততাই আমাদের মধ্যকার পার্থিব ব্যাধিকে চিরদিনের মতো নিরাময় করতে পারে। আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই স্বার্থপরতা দূর হয়ে যায়। সে ভগবানের কাছে চলে আসে—আগে যে সমস্ত বৃথা আকাঙ্ক্ষায় সে পূর্ণ ছিল তার সবই সে দূর করে দিয়েছে।

প্রেমের রাজ্যে আমাদের সকলকেই দ্বৈতবাদীরূপে শুরু করতে হবে। ভগবান আমাদের কাছে স্বতন্ত্র কিছু; আর আমরাও অনুভব করি যে আমরাও স্বতন্ত্র। ভালবাসা এসে দাঁড়ায় মধ্যস্থলে এবং ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়, এবং ভগবানও ক্রমে ক্রমে মানুষের নিকট থেকে নিকটতর হয়। মানুষ বরণ করে নেয় জীবনের সমস্ত রকম সম্পর্ককেই—পিতারূপে, মাতারূপে, পুত্ররূপে, বন্ধুরূপে, প্রভুরূপে, প্রেমিকরূপে, এবং তাদেরকে তাঁর ভালবাসার আদর্শের উপর—তার ভগবানের উপর প্রতিফলিত করে। তার কাছে এই সবকিছুর মতোই ভগবান আছেন। সে যখন উন্নতির শেষ-শীর্ষে সে পৌঁছয়, সে তখন অনুভব করে আরাধনার আশ্রয়ে সে সম্পূর্ণ ভাবেই নিমজ্জিত হয়েছে। আমরা সকলেই নিজেদেরকে ভালোবেসেই ভালোবাসা শুরু করি,

কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র সত্তার অন্যায় দাবি এমন কি প্রেমকেও করে তোলে স্বার্থপর। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দেখা দেয় পরিপূর্ণ জ্যোতি, আর তার মধ্যে এই ক্ষুদ্র সত্তা একাত্ম হয়ে যায় অসীমের সঙ্গে। এই প্রেম-জ্যোতির সম্মুখে মানুষ রূপান্তরিত হয়ে যায়, সে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারে সুন্দর ও প্রেরণাদায়ক এই সত্যকে: প্রেম, প্রেমিক এবং প্রেমময় সেই একই।

LECTURES ON
THE RAMAYANA
AND
THE MAHABHARATA

THE RAMAYANA

(This lecture was delivered at the Shakespeare Club, Pasadena, California, January 31, 1900)

There are two great epics in the Sanskrit language, which are very ancient. Of course, there are hundreds of other epic poems. The Sanskrit language and literature have been continued down to the present day, although, for more than two thousand years, it has ceased to be a spoken language. I am now going to speak to you of the most ancient epics, called the Ramayana and the Mahabharata. They embody the manners and customs, the state of society, civilisation, etc., of the ancient Indians. The oldest of these epics is called Ramayana, "The Life of Rama". There was some poetical literature before this—most of the Vedas, the sacred books of the Hindus, are written in a sort of metre—but this book is held by common consent in India as the very beginning of poetry.

The name of the poet or sage was Valmiki. Later on, a great many poetical stories were fastened upon that ancient poet; and subsequently, it became a very general practice to attribute to his authorship very many verses that were not his. Notwithstanding all these interpolations, it comes down to us as a very beautiful arrangement, without equal in the literatures of the world.

There was a young man that could not in any way support his family. He was strong and vigorous and, finally, became a highway robber: he attacked persons in the street and robbed them, and with that money he supported his father, mother, wife and children. This went on continually, until one day a great saint called Narada was passing by, and the robber attacked him. The sage asked the robber, "Why are you going to rob me? It is a great sin to rob human beings and kill them. What do you incur all this sin for?" The robber said, "Why, I want to support my family with this money." "Now", said the sage, "do you think that they take a share of your sin also?" "Certainly they do,"

replied the robber. "Very good," said the sage, "make me safe by tying me up here, while you go home and ask your people whether they will share your sin in the same way as they share the money you make." The man accordingly went to his father, and asked, "Father, do you know how I support you ?" He answered, "No, I do not." "I am a robber, and I kill persons and rob them." "What ! you do that, my son ? Get away ! You outcast !" He then went to his mother and asked her, "Mother, do you know how I support you ?" "No," she replied. "Through robbery and murder." "How horrible it is !" cried the mother. "But, do you partake in my sin ?" said the son. "Why should I ? I never committed a robbery," answered the mother. Then, he went to his wife and questioned her, "Do you know how I maintain you all ?" "No," she responded. "Why, I am a highwayman," he rejoined, "and for years have been robbing people ; that is how I support and maintain you all. And what I now want to know is, whether you are ready to share in my sin." "By no means. You are my husband, and it is your duty to support me."

The eyes of the robber were opened. "That is the way of the world—even my nearest relatives, for whom I have been robbing, will not share in my destiny." He came back to the place where he had bound the sage, unfastened his bonds, fell at his feet, recounted everything and said, "Save me ! What can I do ?" The sage said, "Give up your present course of life. You see that none of your family really loves you, so give up all these delusions. They will share your prosperity ; but the moment you have nothing, they will desert you. There is none who will share in your evil, but they will all share in your good. Therefore worship Him who alone stands by us whether we are doing good or evil. He never leaves us, for love never drags down, knows no barter, no selfishness."

Then the sage taught him how to worship. And this man left everything and went into a forest. There he went on praying and meditating until he forgot himself so entirely that the ants came and built ant-hills around him, and he was quite unconscious of it. After many years had passed, a voice came saying, "Arise, O sage !" Thus aroused he exclaimed, "Sage ? I am a robber !" "No more 'robber'," answered the voice, "a purified sage art thou. Thine old name is gone. But now, since the meditation was so deep and great that thou didst not remark even the ant-hills which surrounded

thee, henceforth, thy name shall be Valmiki—'he that was born in the ant hill'." So, he became a sage.

And this is how he became a poet. One day as this sage, Valmiki, was going to bathe in the holy river Ganga, he saw a pair of doves wheeling round and round, and kissing each other. The sage looked up and was pleased at the sight, but in a second an arrow whisked past him and killed the male dove. As the dove fell down on the ground, the female dove went on whirling round and round the dead body of its companion in grief. In a moment the poet became miserable, and looking round he saw the hunter. "Thou art a wretch," he cried, "without the smallest mercy! Thy slaying hand would not even stop for love!" "What is this? What am I saying?" the poet thought to himself, "I have never spoken in this sort of way before." And then a voice came: "Be not afraid. This is poetry that is coming out of your mouth. Write the life of Rama in poetic language for the benefit of the world." And that is how the poem first began. The first verse sprang out of pity from the mouth of Valmiki, the first poet. And it was after that, that he wrote the beautiful Ramayana, "The Life of Rama".

There was an ancient Indian town called Ayodhya—and it exists even in modern times. The province in which it is still located is called Oudh, and most of you may have noticed it in the map of India. That was the ancient Ayodhya. There, in ancient times, reigned a king called Dasharatha. He had three queens, but the king had not any children by them. And like good Hindus, the king and the queens, all went on pilgrimages fasting and praying, that they might have children and, in good time, four sons were born. The eldest of them was Rama.

Now, as it should be, these four brothers were thoroughly educated in all branches of learning. To avoid future quarrels there was in ancient India a custom for the king in his own lifetime to nominate his eldest son as his successor, the Yuvaraja, young king, as he is called.

Now, there was another king, called Janaka, and this king had a beautiful daughter named Sita. Sita was found in a field; she was a daughter of the Earth, and was born without parents. The word "Sita" in ancient Sanskrit means the furrow made by a plough. In the ancient mythology of India you will find persons born of one

parent only, or persons born without parents, born of sacrificial fire, born in the field, and so on—dropped from the clouds as it were. All those sorts of miraculous birth were common in the mythological lore of India.

Sita, being the daughter of the Earth, was pure and immaculate. She was brought up by King Janaka. When she was of a marriageable age, the king wanted to find a suitable husband for her.

There was an ancient Indian custom called Svayamvara, by which the princesses used to choose husbands. A number of princes from different parts of the country were invited, and the princess in splendid array, with a garland in her hand, and accompanied by a crier who enumerated the distinctive claims of each of the royal suitors, would pass in the midst of those assembled before her, and select the prince she likes for her husband by throwing the garland of flowers round his neck. They would then be married with much pomp and grandeur.

There were numbers of princes who aspired for the hand of Sita; the test demanded on this occasion was the breaking of a huge bow, called Haradhanu. All the princes put forth all their strength to accomplish this feat, but failed. Finally, Rama took the mighty bow in his hands and with easy grace broke it in twain. Thus Sita selected Rama, the son of king Dasharatha for her husband, and they were wedded with great rejoicings. Then Rama took his bride to his home, and his old father thought that the time was now come for him to retire and appoint Rama as Yuvaraja. Everything was accordingly made ready for the ceremony, and the whole country was jubilant over the affair, when the younger queen Kaikeyi was reminded by one of her maidservants of two promises made to her by the king long ago. At one time she had pleased the king very much, and he offered to grant her two boons: "Ask any two things in my power and I will grant them to you," said he, but she made no request then. She had forgotten all about it; but the evil-minded maidservant in her employ began to work upon her jealousy with regard to Rama being installed on the throne, and insinuated to her how nice it would be for her if her own son had succeeded the king, until the queen was almost mad with jealousy. Then the servant suggested to her to ask from the king the two promised boons: one would be that her own son Bharata should be placed on the throne,

and the other, that Rama should be sent to the forest and be exiled for fourteen years.

Now, Rama was the life and soul of the old king and when this wicked request was made to him, he as a king felt he could not go back on his word. So he did not know what to do. But Rama came to the rescue and willingly offered to give up the throne and go into exile, so that his father might not be guilty of falsehood. So Rama went into exile for fourteen years, accompanied by his loving wife Sita and his devoted brother Lakshmana, who would on no account be parted from him.

The Aryans did not know who were the inhabitants of these wild forests. In those days the forest tribes they called "monkeys", and some of the so called "monkeys", if unusually strong and powerful, were called "demons".

So, into the forest, inhabited by demons and monkeys, Rama, Lakshmana, and Sita went. When Sita had offered to accompany Rama, he exclaimed, "How can you, a princess, face hardships and accompany me into a forest full of unknown dangers !" But Sita replied, "Wherever Rama goes, there goes Sita. How can you talk of 'princess' and 'royal birth' to me ? I go before you !" So, Sita went. And the younger brother, he also went with them. They penetrated far into the forest, until they reached the river Godavari. On the banks of the river they built little cottages, and Rama and Lakshmana used to hunt deer and collect fruits. After they had lived thus for some time, one day there came a demon giantess. She was the sister of the giant king of Lanka (Ceylon). Roaming through the forest at will, she came across Rama, and seeing that he was a very handsome man, she fell in love with him at once. But Rama was the purest of men, and also he was a married man ; so of course he could not return her love. In revenge, she went to her brother, the giant king, and told him all about the beautiful Sita, the wife of Rama.

Rama was the most powerful of mortals ; there were no giants or demons or anybody else strong enough to conquer him. So, the giant king had to resort to subterfuge. He got hold of another giant who was a magician and changed him into a beautiful golden deer ; and the deer went prancing round about the place where Rama lived, until Sita was fascinated by its beauty and asked Rama to go and capture the deer for her. Rama went into the forest to catch the

deer, leaving his brother in charge of Sita. Then Lakshmana laid a circle of fire round the cottage, and he said to Sita, "Today I see something may befall you; and, therefore, I tell you not to go outside of this magic circle. Some danger may befall you if you do." In the meanwhile, Rama had pierced the magic deer with his arrow, and immediately the deer, changed into the form of a man, died.

Immediately, at the cottage was heard the voice of Rama, crying, "Oh, Lakshmana, come to my help!" and Sita said, "Lakshmana, go at once into the forest to help Rama!" "That is not Rama's voice," protested Lakshmana. But at the entreaties of Sita, Lakshmana had to go in search of Rama. As soon as he went away, the giant king, who had taken the form of a mendicant monk, stood at the gate and asked for alms. "Wait awhile," said Sita, "until my husband comes back and I will give you plentiful alms." "I cannot wait, good lady," said he, "I am very hungry, give me anyhting you have." At this, Sita, who had a few fruits in the cottage, brought them out. But the mendicant monk, after many persuasions, prevailed upon her to bring the alms to him, assuring her that she need have no fear as he was a holy person. So Sita came out of the magic circle, and immediately the seeming monk assumed his giant body, and grasping Sita in his arms he called his magic chariot, and putting her therein, he fled with the weeping Sita. Poor Sita! She was utterly helpless, nobody was there to come to her aid. As the giant was carrying her away, she took off a few of the ornaments from her arms and at intervals dropped them to the ground.

She was taken by Ravana to his kingdom, Lanka, the island of Ceylon. He made proposals to her to become his queen, and tempted her in many ways to accede to his request. But Sita who was chastity itself, would not even speak to the giant; and he, to punish her, made her live under a tree, day and night until she should consent to be his wife.

When Rama and Lakshmana returned to the cottage and found that Sita was not there, their grief knew no bounds. They could not imagine what had become of her. The two brothers went on seeking, seeking everywhere for Sita, but could find no trace of her. After long searching, they came across a group of "monkeys", and in the midst of them was Hanuman, the "divine monkey". Hanuman, the best of the monkeys, became the most faithful servant of Rama and

helped him in rescuing Sita, as we shall see later on. His devotion to Rama was so great that he is still worshipped by the Hindus as the ideal of a true servant of the Lord. You see, by the "monkeys" and "demons" are meant the aborigines of South India.

So, Rama, at last, fell in with these monkeys. They told him that they had seen flying through the sky a chariot, in which was seated a demon who was carrying away a most beautiful lady, and that she was weeping bitterly, and as the chariot passed over their heads she dropped one of her ornaments to attract their attention. Then they showed Rama the ornament. Lakshmana took up the ornament, and said, "I do not know whose ornament this is." Rama took it from him and recognised it at once, saying, "Yes, it is Sita's." Lakshmana could not recognise the ornament, because in India the wife of the elder brother was held in so much reverence that he had never looked upon the arms and the neck of Sita. So you see, as it was a necklace, he did not know whose it was. There is in this episode a touch of the old Indian custom. Then, the monkeys told Rama who this demon king was and where he lived, and then they all went to seek for him.

Now, the monkey-king Vali and his younger brother Sugriva were then fighting amongst themselves for the kingdom. The younger brother was helped by Rama, and he regained the kingdom from Vali, who had driven him away; and he, in return, promised to help Rama. They searched the country all round, but could not find Sita. At last Hanuman leaped by one bound from the coast of India to the island of Ceylon, and there went looking all over Lanka for Sita, but nowhere could he find her.

You see, this giant king had conquered the gods, the men, in fact the whole world; and he had collected all the beautiful women and made them his concubines. So, Hanuman thought to himself, "Sita cannot be with them in the palace. She would rather die than be in such a place." So Hanuman went to seek for her elsewhere. At last, he found Sita under a tree, pale and thin, like the new moon that lies low in the horizon. Now Hanuman took the form of a little monkey and settled on the tree, and there he witnessed how giantesses sent by Ravana came and tried to frighten Sita into submission, but she would not even listen to the name of the giant king.

Then, Hanuman came nearer to Sita and told her how he became the messenger of Rama, who had sent him to find out where Sita

was ; and Hanuman showed to Sita the signet ring which Rama had given as a token for establishing his identity. He also informed her that as soon as Rama would know her whereabouts, he would come with an army and conquer the giant and recover her. However, he suggested to Sita that if she wished it, he would take her on his shoulders and could with one leap clear the ocean and get back to Rama. But Sita could not bear the idea, as she was chastity itself, and could not touch the body of any man except her husband. So, Sita remained where she was. But she gave him a jewel from her hair to carry to Rama; and with that Hanuman returned.

Learning everything about Sita from Hanuman, Rama collected an army, and with it marched towards the southernmost point of India. There Rama's monkeys built a huge bridge, called Setu-Bandha, connecting India with Ceylon. In very low water even now it is possible to cross from India to Ceylon over the sand-banks there.

Now Rama was God incarnate, otherwise, how could he have done all these things ? He was an Incarnation of God, according to the Hindus. They in India believe him to be the seventh Incarnation of God.

The monkeys removed whole hills, placed them in the sea and covered them with stones and trees, thus making a huge embankment. A little squirrel, so it is said, was there rolling himself in the sand and running backwards and forwards on to the bridge and shaking himself. Thus in his small way he was working for the bridge of Rama by putting in sand. The monkeys laughed, for they were bringing whole mountains, whole forests, huge loads of sand for the bridge—so they laughed at the little squirrel rolling in the sand and then shaking himself. But Rama saw it and remarked : "Blessed be the little squirrel ; he is doing his work to the best of his ability, and he is therefore quite as great as the greatest of you." Then he gently stroked the squirrel on the back, and the marks of Rama's fingers, running lengthways, are seen on the squirrel's back to this day.

Now, when the bridge was finished, the whole army of monkeys, led by Rama and his brother, entered Ceylon. For several months afterwards tremendous war and bloodshed followed. At last, this demon king, Ravana, was conquered and killed ; and his capital, with all the palaces and everything, which were entirely of solid gold, was taken . In far-way villages in the interior of India, when

I tell them that I have been in Ceylon, the simple folk say, "There, as our books tell, the houses are built of gold." So, all these golden cities fell into the hands of Rama, who gave them over to Vibhishana, the younger brother of Ravana, and seated him on the throne in the place of his brother, as a return for the valuable services rendered by him to Rama during the war.

Then Rama with Sita and his followers left Lanka. But there ran a murmur among the followers. "The test! The test!" they cried, "Sita has not given the test that she was perfectly pure in Ravana's household." "Pure! she is chastity itself!" exclaimed Rama. "Never mind! We want the test," persisted the people. Subsequently, a huge sacrificial fire was made ready, into which Sita had to plunge herself. Rama was in agony, thinking that Sita was lost; but in a moment, the God of fire himself appeared with a throne upon his head, and upon the throne was Sita. Then, there was universal rejoicing, and everybody was satisfied.

Early during the period of exile, Bharata, the younger brother had come and informed Rama, of the death of the old king and vehemently insisted on his occupying the throne. During Rama's exile Bharata would on no account ascend the throne and out of respect placed a pair of Rama's wooden shoes on it as a substitute for his brother. Then Rama returned to his capital, and by the common consent of his people, he became the king of Ayodhya.

After Rama regained his kingdom, he took the necessary vows which in olden times the king had to take for the benefit of his people. The king was the slave of his people, and had to bow to public opinion, as we shall see later on. Rama passed a few years in happiness with Sita, when the people again began to murmur that Sita had been stolen by a demon and carried across the ocean. They were not satisfied with the former test and clamoured for another test, otherwise she must be banished.

In order to satisfy the demands of the people, Sita was banished, and left to live in the forest, where was the hermitage of the sage and poet Valmiki. The sage found poor Sita weeping and forlorn, and hearing her sad story, sheltered her in his Ashrama. Sita was expecting soon to become a mother, and she gave birth to twin boys. The poet never told the children who they were. He brought them up together in the Brahmacharin life. He then composed the poem known as Ramayana, set it to music, and dramatised it.

The drama, in India, was a very holy thing. Drama and music are themselves held to be religion. Any song—whether it be a love-song or otherwise—if one's whole soul is in that song, one attains salvation, one has nothing else to do. They say it leads to the same goal as meditation.

So, Valmiki dramatised "The Life of Rama", and taught Rama's two children how to recite and sing it.

There came a time when Rama was going to perform a huge sacrifice, or Yajna, such as the old kings used to celebrate. But no ceremony in India can be performed by a married man without his wife: he must have the wife with him, the Sahadharmini, the "co-religionist"– that is the expression for a wife. The Hindu householder has to perform hundreds of ceremonies, but not one can be duly performed according to the Shastras, if he has not a wife to complement it with her part in it.

Now Rama's wife was not with him then, as she had been banished. So, the people asked him to marry again. But at this request Rama for the first time in his life stood against the people. He said, "This cannot be. My life is Sita's." So, as a substitute, a golden statue of Sita was made, in order that the ceremony could be accomplished. They arranged even a dramatic entertainment, to enhance the religious feeling in the great festival. Valmiki, the great sage-poet, came with his pupils, Lava and Kusha, the unknown sons of Rama. A stage had been erected and everything was ready for the performance. Rama and his brother attended with all his nobles and his people– a vast audience. Under the direction of Valmiki, the life of Rama was sung by Lava and Kusha, who fascinated the whole assembly by their charming voice and appearance. Poor Rama was nearly maddened, and when in the drama, the scene of Sita's exile came about, he did not know what to do. Then the sage said to him, "Do not be grieved, for I will show you Sita." Then Sita was brought upon the stage and Rama delighted so see his wife. All of a sudden, the old murmur arose : "The test ! The test !" Poor Sita was so terribly overcome by the repeated cruel slight on her reputation that it was more than she could bear. She appealed to the gods to testify to her innocence, when the Earth opened and Sita exclaimed, "Here is the test ', and vanished into the bosom of the Earth. The people were taken aback at this tragic end. And Rama was overwhelmed with grief.

A few days after Sita's disappearance, a messenger came to Rama from the gods, who intimated to him that his mission on earth was finished and he was to return to heaven. These tidings brought to him the recognition of his own real Self. He plunged into the waters of Sarayu, the mighty river that laved his capital, and joined Sita in the other world.

This is the great, ancient epic of India. Rama and Sita are the ideals of the Indian nation. All children, especially girls, worship Sita. The height of a woman's ambition is to be like Sita, the pure, the devoted, the all-suffering! When you study these characters, you can at once find out how different is the ideal in India from that of the West. For the race, Sita stands as the ideal of suffering. The West says, "Do! Show your power by doing." India says, "Show your power by suffering." The West has solved the problem of how much a man can have: India has solved the problem of how little a man can have. The two extremes, you see, Sita is typical of India—the idealised India. The question is not whether she ever lived, whether the story is history or not, we know that the ideal is there. There is no other Pauranika story that has so permeated the whole nation, so entered into its very life, and has so tingled in every drop of blood of the race, as this ideal of Sita. Sita is the name in India for everything that is good, pure and holy—everything that in woman we call womanly. If a priest has to bless a women he says, "Be Sita!" If he blesses a child, he says "Be Sita!" They are all children of Sita, and are struggling to be Sita, the patient, the all-suffering, the ever-faithful, the ever-pure wife. Through all this suffering she experiences, there is not one harsh word against Rama. She takes it as her own duty, and performs her own part in it. Think of the terrible injustice of her being exiled to the forest! But Sita knows no bitterness. That is, again, the Indian ideal. Says the ancient Buddha, "When a man hurts you, and you turn back to hurt him, that would not cure the first injury; it would only create in the world one more wickedness." Sita was a true Indian by nature; she never returned injury.

Who knows which is the truer ideal? The apparent power and strength, as held in the West, or the fortitude of suffering, of the East?

The West says, "We minimise evil by conquering it." India

says. "We destroy evil by suffering, until evil is nothing to us, it becomes positive enjoyment." Well, both are great ideals. Who knows which will survive in the long run? Who knows which attitude will really most benefit humanity? Who knows which will disarm and conquer animality? Will it be suffering, or doing?

In the meantime, let us not try to destroy each other's ideals. We are both intent upon the same work, which is the annihilation of evil. You take up your method; let us take up our method. Let us not destroy the ideal. I do not say to the West, "Take up our method." Certainly not. The goal is the same, but the method can never be the same. And so, after hearing about the ideals of India, I hope that you will say in the same breath to India "We know, the goal, the ideal, is all right for us both. You follow your own ideal. You follow your method in your own way, and Godspeed to you!" My message in life is to ask the East and West not to quarrel over different ideals, but to show them that the goal is the same in both cases, however opposite it may appear. As we went our way through this mazy vale of life, let us did each other Godspeed.

THE MAHABHARATA

(This lecture was delivered at the Shakespeare Club, Pasadena, California, February 1, 1900)

The other epic about which I am going to speak to you this evening, is called the Mahabbharata. It contains the story of a race descended from King Bharata, who was the son of Dushyanta and Shakuntala. Maha means great, and Bharata means the descendants of Bharata, from whom India has derived its name, Bharata. Mahabharata means Great India, or the story of the great descendants of Bharata. The scene of this epic is the ancient kingdom of the Kurus, and the story is based on the great war which took place between the Kurus and the Panchalas. So the region of the quarrel, is not very big. This epic is the most popular one in India ; and it exercise the same authority in India as Homer's poems did over the Greeks. As ages went on, more and more matter was added to it, until it has become a huge book of about a hundred thousand couplets. All sorts of tales, legends and myths, philosophical treatises, scraps of history, and various discussions have been added to it from time to time, until it is a vast, gigantic mass of literature ; and through it all runs the old, original story. The central story of the Mahabharata is of a war between two families of cousins, one family, called the Kauravas, the other the Pandavas—for the empire of India.

The Aryans came into India in small companies. Gradually, these tribes began to extend, until, at last, they became the undisputed rulers of India, and then arose this fight to gain the mastery, between two branches of the same family. Those of you who have studied the Gita know how the book opens with a description of the battle-field, with two armies arrayed one against the other. That is the war of the Mahabharata.

There were two brothers, sons of the emperor. The elder one was called Dhritarashtra, and the other was called Pandu. Dhritarashtra, the elder one, was born blind. According to Indian law, no blind halt, maimed, consumptive, or any other constitutionally diseased person, can inherit. He can only get a maintenance.

So, Dhritarashtra could not ascend the throne, though he was the elder son, and Pandu became the emperor.

Dhritarashtra had a hundred sons, and Pandu had only five. After the death of Pandu at an early age, Dhritarashtra became king of the Kurus and brought up the sons of Pandu along with his own children. When they grew up, they were placed under the tutorship of the great priest-warrior, Drona, and were well trained in the various material arts and sciences befitting princes. The education of the princes being finished, Dhritarashtra put Yudhishthira, the eldest of the sons of Pandu, on the throne of his father. The sterling virtues of Yudhishthira and the valour and devotion of his other brothers aroused jealousies in the hearts of the sons of the blind king, and at the instigation of Duryodhana, the eldest of them, the five Pandava brothers were prevailed upon to visit Varanavata, on the plea of a religious festival that was being held there. There they were accommodated in a palace made under Duryodhana's instructions, of hemp, resin, and lac, and other inflammable materials,which were subsequently set fire to secretly. But the good Vidura, the step-brother of Dhritarashtra, having become cognisant of the evil intentions of Duryodhana and his party, had warned the Pandavas of the plot, and they managed to escape without anyone's knowledge. When the Kurus saw the house was reduced to ashes, they heaved a sigh of relief and thought all obstacles were now removed out of their path. Then the children of Dhritarashtra got hold of the kingdom. The five Pandava brothers had fled to the forest with their mother, Kunti. They lived there by begging, and went about in disguise giving themselves out as Brahmana students. Many were the hardships and adventures they encountered in the wild forests, but their fortitude of mind, and strength, and valour made them conquer all dangers. So things went on until they came to hear of the approaching marriage of the princess of a neighbouring country.

I told you last night of the peculiar form of the ancient Indian marriage. It was called Svayamvara, that is, the choosing of the husband by the princess. A great gathering of princes and nobles assembled, amongst whom the princess would choose her husband. Preceded by her trumpeters and heralds she would approach, carrying a garland of flowers in her hand. At the throne of each candidate for her hand, the praises of that prince and all his great deeds

in battle would be declared by the heralds. And when the princess decided which prince she desire to have for a husband, she would signify the fact by throwing the marriage-garland round his neck. Then the ceremony would turn into a wedding. King Drupada was a great king, king of the Panchalas, and his daughter, Draupadi, famed far and wide for her beauty and accomplishments, was going to choose a hero.

At a Svayamvara there was always a great feat of arms or something of the kind. On this occasion, a mark in the form of a fish was set up high in the sky ; under that fish was a wheel with a hole in the centre, continually turning round, and beneath was a tub of water. A man looking at the reflection of the fish in the tub of water was asked to send an arrow and hit the eye of the fish through the Chakra or wheel, and he who succeeded would be married to the princess. Now, there came kings and princes from different parts of India, all anxious to win the hand of the princess, and one after another they tried their skill, and every one of them failed to hit the mark.

You know, there are four castes in India : the highest caste is that of the hereditary priest, the Brahmana ; next is the caste of the Kshatriya, composed of kings and fighters ; next, the Vaishyas, the traders or businessmen, and then Shudras, the servants. Now, this princess was, of course, a Kshatriya, one of the second caste.

When all those princes failed in hitting the mark, then the son of King Drupada rose up in the midst of the court and said : "The Kshatriya, the king caste has failed ; now the contest is open to the other castes. Let a Brahmana, even a Shudra, take part in it ; whosoever hits the mark, marries Draupadi."

Among the Brahmanas were seated the five Pandava brothers. Arjuna, the third brother, was the hero of the bow. He arose and stepped forward. Now, Brahmanas as a caste are very quiet and rather timid people. According to the law, they must not touch a warlike weapon, they must not wield a sword, they must not go into any enterprise that is dangerous. Their life is one of contemplation, study, and control of the inner nature. Judge, therefore, how quiet and peaceable a people they are. When the Brahmanas saw this man get up, they thought this man was going to bring the wrath of the Kshatriyas upon them, and that they would all be killed. So they tried to dissuade him, but Arjuna did not

listen to them, because he was a soldier. He lifted the bow in his hand, strung it without any effort, and drawing it, sent the arrow right through the wheel and hit the eye of the fish.

Then their was great jubilation. Draupadi, the princess, approached Arjuna and threw the beautiful garland of flowers over his head. But there arose a great cry among the princes, who could not bear the idea that this beautiful princess who was a Kshatriya should be won by a poor Brahmana, from among this huge assembly of kings and princes. So they wanted to fight Arjuna and snatch her from him by force. The brothers had a tremendous fight with the warriors, but held their own, and carried off the bride in triumph.

The five brothers now returned home to Kunti with the princess. Brahmanas have to live by begging. So they, who lived as Brahmanas, used to go out, and what they got by begging they brought home and the mother divided it among them. Thus the five brothers, with the princess came to the cottage where the mother lived. They shouted out to her jocosely, "Mother, we have brought home a most wonderful alms today." The mother replied, "Enjoy it in common, all of you, my children." Then the mother seeing the princess, exclaimed, "Oh ! what have I said ! It is a girl !" But what could be done ! The mother's word was spoken once for all. It must not be disregarded. The mother's words must be fulfilled. She could not be made to utter an untruth, as she never had done so. So Draupadi became the common wife of all the five brothers.

Now, you know, in every society there are stages of development. Behind this epic there is a wonderful glimpse of the ancient historic times. The author of the poem mentions the fact of the five brothers marrying the same woman, but he tries to gloss it over, to find an excuse and a cause for such an act : it was the mother's command, the mother sanctioned this strange betrothal, and so on. You know, in every nation there has been a certain stage in society that allowed polyandry—all the brothers of a family would marry one wife in common. Now, this was evidently a glimpse of the past polyandrous stage.

In the meantime, the brother of the princess was perplexed in his mind and thought : "Who are these people ? Who is this man whom my sister is going to marry ? They have not any chariots,

horses, or anything. Why, they go on foot !" So he had followed them at a distance, and at night overheard their conversation and became fully convinced that they were really Kshatriyas. Then king Drupada came to know who they were and was greatly delighted.

Though at first much objection was raised, it was declared by Vyasa that such a marriage was allowable for these princes, and it was permitted. So the king Drupada had to yield to this polyandrous marriage, and the princess was married to the five sons of Pandu.

Then the Pandavas lived in peace and prosperity and became more powerful every day. Though Duryodhana and his party conceived of fresh plots to destroy them, King Dhritarashtra was prevailed upon by the wise counsels of the elders to make peace with the Pandavas ; and so he invited them home amidst the rejoicings of the people and gave them half of the kingdom. Then, the five brothers built for themselves a beautiful city, called Indraprastha, and extended their dominions, laying all the people under tribute to them. Then the eldest Yudhishthira, in order to declare himself emperor over all the kings of ancient India, decided to perform a Rajasuya Yajna or Imperial Sacrifice, in which the conquered kings would have to come with tribute and swear allegiance, and help the performance of the sacrifice by personal services. Shri Krishna, who had become their friend and a relative, came to them and approved of the idea. But there was one obstacle to its performance. A king, Jarasandha by name, who intended to offer a sacrifice of a hundred kings, had eighty-six of them kept as captives with him. Shri Krishna counselled an attack on Jarasandha. So he, Bhima, and Arjuna challenged the king, who accepted the challenge and was finally conquered by Bhima after fourteen days' continuous wrestling. The captive kings were then set free.

Then the four younger brothers went out with armies on a conquering expedition, each in a different direction, and brought all the kings under subjection to Yudhishthira. Returning, they laid all the vast wealth they secured at the feet of the eldest brother to meet the expenses of the great sacrifice.

So, to this Rajasuya sacrifice all the liberated kings came, along with those conquered by the brothers, and rendered homage to

Yudhishthira. King Dhritarashtra and his sons were also invited to come and take a share in the performance of the sacrifice. At the conclusion of the sacrifice, Yudhishthira was crowned emperor, and declared as lord paramount. This was the sowing of the future feud. Duryodhana came back from the sacrifice filled with jealousy against Yudhishthira, as their sovereignty and vast splendour and wealth were more than he could bear ; and so he devised plans to effect their fall by guile, as he knew that to overcome them by force was beyond his power. This king, Yudhishthira, had the love of gambling, and he was challenged at an evil hour to play dice with Shakuni, the crafty gambler and the evil genius of Duryodhana. In ancient India, if a man of the military caste was challenged to fight, he must at any price accept the challenge to uphold his honour. And if he was challenged to play dice, it was a point of honour to play, and dishonourable to decline the challenge. King Yudhishthira, says the Epic, was the incarnation of all virtues. Even he, the great sage-king, had to accept the challenge. Shakuni and his party had made false dice. So Yudhishthira lost game after game, and stung with his losses, he went on with the fatal game, staking everything he had, and losing all, until all his possessions, his kingdom and everything, were lost. The last stage came when, under further challenge, he had no other resources left but to stake his brothers, and then himself, and last of all, the fair Draupadi, and lost all. Now they were completely at the mercy of the Kauravas, who cast all sorts of insults upon them, and subjected Draupadi to most inhuman treatment. At last through the intervention of the blind king, they got their liberty, and were asked to return home and rule their kingdom. But Duryodhana saw the danger and forced his father to allow one more throw of the dice in which the party which would lose, should retire to the forests for twelve years, and then live unrecognised in a city for one year ; but if they were found out, the same term of exile should have to be undergone once again and then only the kingdom was to be restored to the exiled. This last game also Yudhishthira lost, and the five Pandava brothers retired to the forests with Draupadi, as homeless exiles. They lived in the forests and mountains for twelve years. There performed many deeds of virtue and valour, and would go out now and then on a long round of pilgrimages, visiting many holy places. That part of the poem is very interesting and instructive, and various are

the incidents, tales, and legends with which this parts of the book is replete. There are in it beautiful and sublime stories of ancient India, religious and philosophical. Great sages came to see the brothers in their exile and narrated to them many telling stories of ancient India, so as to make them bear lightly the burden of their exile. One only I will relate to you here.

There was a king called Ashvapati. The king had a daughter, who was so good and beautiful that she was called Savitri, which is the name of a sacred prayer of the Hindus. When Savitri grew old enough, her father asked her to choose a husband for herself. These ancient Indian princesses were very independent, you see, and chose their own princely suitors.

Savitri consented and travelled in distant regions, mounted in a golden chariot, with her guards and aged courtiers to whom her father entrusted her, stopping at different courts, and seeing different princes, but not one of them could win the heart of Savitri. They came at last to a holy hermitage in one of those forest that in ancient India were reserved for animals, and where no animals were allowed to be killed. The animals lost the fear of man—even the fish in the lakes came and took food out of the hand. For thousands of years no one had killed anything therein. The sages and the aged went there to live among the deer and the birds. Even criminals were safe there. When a man got tired of life, he would go to the forest; and in the company of sages, talking of religion and meditating thereon, he passed the remainder of his life.

Now it happened that there was a king, Dyumatsena, who was defeated by his enemies and was deprived of his kingdom when he was struck with age and had lost his sight. This poor, old, blind king, with his queen and his son, took refuge in the forest and passed his life in rigid penance. His boy's name was Satyavan.

It came to pass that after having visited all the different royal courts, Savitri at last came to this hermitage, or holy place. Not even the greatest king could pass by the hermitages, or Ashramas as they were called, without going to pay homage to the sages, for such honour and respect was felt for these holy men. The greatest emperor of India would be only too glad to trace his descent to some sage who lived in a forest, subsisting on roots and fruits, and clad in rags. We are all children of sages. That is the respect that is paid to religion. So, even kings, when they pass by the hermitages,

feel honoured to go in and pay their respects to the sages. If they approach on horseback, they descend and walk as they advance towards them. If they arrive in a chariot, chariot and armour must be left outside when they enter. No fighting man can enter unless he comes in the manner of a religious man quiet and gentle.

So Savitri came to this hermitage and saw there Satyavan, the hermit's son, and her heart was conquered. She had escaped all the princes of the palaces and the courts, but here in the forest-refuge of King Dyumastsena, his son, Satyavan, stole her heart.

When Savitri returned to her father' house, he asked her, "Savitri, dear daughter, speak. Did you see anybody whom you would like to marry ?" Then softly with blushes, said Savitri, "Yes, father." "What is the name of the prince ?" "He is no prince, but the son of King Dyumatsena who has lost his kingdom—a prince without a patrimony, who lives a monastic life, the life of a Sannyasin in a forest, collecting roots and herbs, helping and feeding his old father and mother, who live in a cottage."

On hearing this the father consulted the Sage Narada, who happened to be then present there, and he declared it was the most ill-omened choice thas was ever made. The king then asked him to explain why it was so. And Narada said, "Within twelve months from this time the young man will die." Then the king started with terror, and spoke, "Savitri, this young man is going to die in twelve months, and you will become a widow : think of that ! Desist from your choice, my child, you shall never be married to a short-lived and fated bridegroom." "Never mind, father ; do not ask me to marry another person and sacrifice the chastity of mind for I love and have accepted in my mind that good and brave Satyavan only as my husband. A maiden chooses only once, and she never departs from her truth." When the king found that Savitri was resolute in mind and heart, he complied. Then Savitri married prince Satyavan, and she quietly went from the palace of her father into the forest, to live with her chosen husband and help her husband's parents. Now, though Savitri knew the exact date when Satyavan was to die, she kept it hidden from him. Daily he went into the depths of the forest, collected fruits and flowers, gathered faggots, and then came back to the cottage, and cooked the meals and helped the old people. Thus their lives went on until

the fatal day came near, and three short days remained only. She took a severe vow of three nights' penance and holy fasts, and kept her hard vigils. Savitri spent sorrowful and sleepless nights with fervent prayers and unseen tears, till the dreaded morning dawned. That day Savitri could not bear him out of her sight, even for a moment. She begged permission from his parents to accompany her husband, when he went to gather the usual herbs and fuel, and gaining their consent she went. Suddenly, in faltering accents, he complained to his wife of feeling faint, "My head is dizzy, and my senses reel, dear Savitri, I feel sleep stealing over me ; let me rest beside thee for a while." In fear and trembling she replied, "Come, lay your head upon my lap my dearest lord." And he laid his burning head in the lap of his wife, and ere long sighed and expired. Clasping him to her, her eyes flowing with tears, there she sat in the lonesome forest, until the emissaries of Death approached to take away the soul of Satyavan. But they could not come near to the place where Savitri sat with the dead body of her husband, his head resting in her lap. There was a zone of fire surrounding her, and not one of the emissaries of Death could come within it. They all fled back from it, returned to King Yama, the God of Death, and told him why they could not obtain the soul of this man.

Then came Yama, the God of Death, the Judge of the dead. He was the first man that died—the first man that died on earth—and he had become the presiding deity over all those that die. He judges whether, after a man has died, he is to be punished or rewarded. So he came himself. Of course, he could go inside that charmed circle, as he was a god. When he came to Savitri, he said, "Daughter, give up this dead body, for know, death is the fate of mortals, and I am the first of mortals who died. Since then, everyone has had to die. Death is the fate of man." Thus told, Savitri walked off and Yama drew the soul out. Yama having possessed himself of the soul of the young man proceeded on his way. Before he had gone far, he heard footfalls upon the dry leaves. He turned back. "Savitri, daughter, why are you following me ? This is the fate of all mortals." "I am not following thee, Father," replied Savitri, "but this is, also, the fate of woman, she follows where her love takes her, and the Eternal Law separates not loving man and faithful wife." Then said the God of Death, "Ask for any boon, except the life of your

husband." "If thou art pleased to grant a boon, O Lord of Death, I ask that my father-in-law may be cured of his blindness and made happy." "Let they pious wish be granted, duteous daughter." And then the King of Death travelled on with the soul of Satyavan. Again the same footfall was heard from behind. He looked round. "Savitri, my daughter, you are still following me?" "Yes, my Father; I cannot help doing so; I am trying all the time to go back, but the mind goes after my husband and the body follows. The soul has already gone, for in that soul is also mine; and when you take the soul, the body follows, does it not?" "Pleased am I with your words, fair Savitri. Ask yet another boon of me, but it must not be the life of your husband." "Let my father-in-law regain his lost wealth and kingdom, Father, if thou art pleased to grant another supplication." "Loving daughter," Yama answered, "this boon I now bestow; but return home, for living mortal cannot go with King Yama." And then Yama pursued his way. But Savitri, meek and faithful, still followed her departed husband. Yama again turned back. "Noble Savitri, follow not in hopeless woe." "I cannot choose but follow where thou takest my beloved one." "Then suppose, Savitri, that your husband was a sinner and has to go to hell. In that case goes Savitri with the one she loves?" "Glad am I to follow where he goes, be it life or death, heaven or hell," said the loving wife. "Blessed are your words, my child, pleased am I with you, ask yet another boon, but the dead come not to life again." "Since you so permit me, then, let the imperial line of my father-in law be not destroyed; let his kingdom descend to Satyavan's sons." And then the God of Death smiled. "My daughter, thou shalt have thy desire now: here is the soul of thy husband, he shall live again. He shall live to be a father and thy children also shall reign in the due course. Return home. Love has conquered Death! Woman never loved like thee, and thou art the proof that even I, the God of Death, am powerless against the power of the true love that abideth!"

This is the story of Savitri, and every girl in India must aspire to be like Savitri, whose love could not be conquered by death, and who through this tremendous love snatched back from even Yama, the soul of her husband.

The book is full of hundreds of beautiful episodes like this. I began by telling you that the Mahabharata is one of the greatest

books in the world and consists of about a hundred thousand verses in eighteen Parvans, or volumes.

To return to our main story. We left the Pandava brothers in exile. Even there they were not allowed to remain unmolested from the evil plots of Duryodhana ; but all of them were futile.

A story of their forest life, I shall tell you here. One day the brothers became thirsty in the forest. Yudhishthira bade his brother, Nakula, go and fetch water. He quickly proceeded towards the place where there was water and soon came to a crystal lake, and was about to drink of it, when he heard a voice utter these words : "Stop, O child. First answer my question and then drink of this water." But Nakula, who was exceedingly thirsty, disregarded these words, drank of the water, and having drunk of it, dropped down dead. As Nakula did not return, King Yudhishthira told Sahadeva to seek his brother and bring back water with him. So Sahadeva proceeded to the lake and beheld his brother lying dead. Afflicted at the death of his brother and suffering severely from thirst, he went towards the water, when the same words were heard by him : "O child, first answer my questions and then drink of the water." He also disregarded these words, and having satisfied his thirst, dropped down dead Subsequently, Arjuna and Bhima were sent, one after the other, on a similar quest, but neither returned, having drunk of the lake and dropped down dead Then Yudhishthira rose up to go in search of his brothers At length, he came to th beautiful lake and saw his brothers lying dead His heart was full of grief at the sight, and he began to lament. Suddenly he heard the same voice saying, "Do not, O child, act rashly. I am a Yaksha living as a crane on tiny fish. It is by me that thy younger brothers have been brought under the sway of the Lord of departed spirits. If thou, O Prince, answer not the questions put by me, even thou shalt number the fifth corpse. Having answered my questions first, do thou, O Kunti's son, drink and carry away as much as thou requirest." Yudhishthira replied, "I shall answer thy questions according to my intelligence. Do thou ask me !" The Yaksha then asked him several questions, all of which Yudhishthira answered satisfactorily. One of the questions asked was : 'What is the most wonderful fact in this world ?" "We see our fellow-beings every moment falling off around us ; but those that are left behind think that they will never die. This is the most

curious fact: in face of death, none believes that he will die!" Another question asked was: "What is the path of knowing the secret of religion?" And Yudhishthira answered, "By argument nothing can be settled; doctrines there are many; various are the scriptures, one part contradicting the other. There are not two sages who do not differ in their opinions. The secret of religion is buried deep, as it were, in dark caves. so the path to be followed is that which the great ones have trodden." Then the Yaksha said, "I am pleased. I am Dharma, the God of Justice in the form of the crane. I came to test you. Now, your brothers, see, not one of them is dead. It is all my magic. Since abstention from injury is regarded by thee as higher than both profit and pleasure, therefore, let all thy brothers live, O Bull of the Bharata race." And at these words of the Yaksha, the Pandavas rose up.

Here is a glimpse of the nature of King Yudhishthira. We find by his answers that he was more of a philosopher, more of a Yogi, than a king.

Now, as the thirteenth year of the exile was drawing nigh, the Yaksha bade them go to Virata's kingdom and live there in such disguises as they would think best.

So, after the term of the twelve years' exile had expired, they went to the kingdom of Virata in different disguises to spend the remaining one year in concealment, and entered into menial service in the king's household. Thus Yudhishthira became a Brahmana courtier of the king, as one skilled in dice; Bhima was appointed a cook; Arjuna, dressed as a eunuch, was made a teacher of dancing and music to Uttara, the princess, and remained in the inner apartments of the king; Nakul became the keeper of the king's horses; and Sahadeva got the charge of the cows; and Draupadi, disguised as a waiting-woman, was also admitted into the queen's household. Thus concealing their identity the Pandava brothers sefely spent a year, and the search of Duryodhana to find them out was of no avail. They were only discovered just when the year was out.

Then Yudhisthira sent an ambassador to Dhritarashtra and demanded that half of the kingdom should, as their share, be restored to them. But Duryodhana hated his cousins and would not consent to their legitimate demands. They were even willing to accept a single province, nay, even five villages. But the headstrong Duryodhana declared that he would not yield without fight even as much land as

a needle's point would hold. Dhritarashtra pleaded again and again for peace, but all in vain. Krishna also went and tried to avert the impending war and death of kinsmen, so did the wise elders of the royal court; but all negotiations for a peaceful partition of the kingdom were futile. So, at last, preparations were made on both sides for war, and all the warlike nations took part in it.

The old Indian customs of the Kshatriyas were observed in it. Duryodhana took one side, Yudhishthira, the other. From Yudhishthira messengers were at once sent to all the surrounding kings, entreating their alliance, since honourable men would grant the request that first reached them. So, warriors from all parts assembled to espouse the cause of either the Pandavas or the Kurus according to the precedence of their requests; and thus one brother joined this side, and the other that side, the father on one side, and the son on the other. The most curious thing was the code of war of those days; as soon as the battle for the day ceased and evening came, the opposing parties were good friends, even going to each others' tents; however, when the morning came, again they proceeded to fight each other. That was the strange trait that the Hindus carried down to the time of the Mohammedan invasion. Then again, a man on horseback must not strike one on foot; must not poison the weapon; must not vanquish the enemy in any unequal fight, or by dishonesty; and must never take undue advantage of another, and so on. If any deviated from these rules he would be covered with dishonour and shunned. The Kshatriyas were trained in that way. And when the foreign invasion came from Central Asia, the Hindus treated the invaders in the selfsame way. They defeated them several times, and on as many occasions sent them back to their homes with presents etc. The code laid down was that they must not usurp anybody's country; and when a man was beaten, he must be sent back to his country with due regard to his position. The Mohammedan conquerors treated the Hindu kings differently, and when they got them once, they destroyed them without remorse.

Mind you, in those days—in the times of our story, the poem says—the science of arms was not the mere use of bows and arrows at all; it was magic archery in which the use of Mantras, concentration, etc., played a prominent part. One man could fight millions of men and burn them at will. He could send one arrow, and it

would rain thousands of arrows and thunder ; he could make anything burn, and so on—it was all divine magic. One fact is most curious in both these poems—the Ramayana and the Mahabharata —along with these magic arrows and all these things going on, you see the cannon already in use. The cannon is an old, old thing, used by the Chinese and the Hindus. Upon the walls of the cities were hundreds of curious weapons made of hollow iron tubes, which filled with powder and ball would kill hundreds of men. The people believed that the Chinese, by magic, put the devil inside a hollow iron tube, and when they applied a little fire to a hole, the devil came out with a terrific noise and killed many people.

So in those old days, they used to fight with magic arrows. One man would be able to fight millions of others. They had their military arrangements and tactics : there were the foot soldiers, termed the Pada ; then the cavalry, Turaga ; and two other divisions which the moderns have lost and given up—there was the elephant corps—hundreds and hundreds of elephants, with men on their backs, formed into regiments and protected with huge sheets of iron mail ; and these elephants would bear down upon a mass of the enemy—then, there were the chariots, of course (you have all seen pictures of those old chariots, they were used in every country). These were the four divisions of the army in those old days.

Now, both parties alike wished to secure the alliance of Krishna. But he declined to take an active part and fight in this war, but offered himself as charioteer to Arjuna, and as the friend and counsellor of the Pandavas, while to Duryodhana he gave his army of mighty soldiers.

Then was fought on the vast plain of Kurukshetra the great battle in which Bhisma, Drona, Karna, and the brothers of Duryodhana with the kinsmen on both sides and thousands of other heroes fell. The war lasted eighteen days. Indeed, out of the eighteen Akshauhinis of soldiers very few men were left. The death of Duryodhana ended the war in favour of the Pandavas. It was followed by the lament of Gandhari, the queen, and the widowed women, and the funerals of the deceased warriors.

The greatest incident of the war was the marvellous and immortal poem of the Gita, the Song Celestial. It is the popular scripture of India and the loftiest of all teachings. It consists of a dialogue held by Arjuna with Krishna, just before the commencement of the fight

on the battle-field of Kurukshetra. I would advise those of you who have not read that book to read it. If you only knew how much it has influenced your own country even! If you want to know the source of Emerson's inspiration, it is this book, the Gita. He went to see Carlyle, and Carlyle made him a present of the Gita; and that little book is responsible for the Concord Movement. All the broad movements in America, in one way or other, are indebted to the Concord party.

The central figure of the Gita is Krishna. As you worship Jesus of Nazareth as God come down as man, so the Hindus worship many Incarnations of God. They believe in not one or two only, but in many, who have come down from time to time, according to the needs of the world, for the preservation of Dharma and destruction of wickedness. Each sect has one, and Krishna is one of them. Krishna, perhaps, has a larger number of followers in India than any other Incarnation of God. His followers hold that he was the most perfect of those Incarnations. Why? "Because," they say, "look at Buddha and other Incarnations: they were only monks, and they had no sympathy for married people. How could they have? But look at Krishna: he was great as a son, as a king, as a father, and all through his life he practised the marvellous teachings which he preached." "He who in the midst of the greatest activity finds the sweetest peace, and in the midst of the greatest calmness is most active, he has known the secret of life." Krishna shows the way how to do this—by being non-attached: do everything but do not get identified with anything. You are the soul, the pure, the free, all the time; you are the Witness. Our misery comes, not from work, but by our getting attached to something. Take for instance, money: money is a great thing to have, earn it, says Krishna; struggle hard to get money, but don't get attached to it. So with children, with wife, husband, relatives, fame, everything; you have no need to shun them, only don't get attached. There is only one attachment and that belongs to the Lord, and to none other. Work for them, love them, do good to them, sacrifice a hundred lives, if need be, for them, but never be attached. His own life was the exact exemplification of that.

Remember that the book which delineates the life of Krishna is several thousand years old, and some parts of his life are very similar to those of Jesus of Nazareth. Krishna was of royal birth;

there was a tyrant king, called Kamsa, and there was a prophecy that one would be born of such and such a family, who would be king. So Kamsa ordered all the male children to be massacred. The father and mother of Krishna were cast by King Kamsa into prison, where the child was born. A light suddenly shone in the prison and the child spoke saying, "I am the Light of the world, born for the good of the world." You find Krishna again symbolically represented with cows—"The Great Cowherd," as he is called. Sages affirmed that God Himself was born, and they went to pay him homage. In other parts of the story, the similarity between the two does not continue.

Shri Krishna conquered this tyrant Kamsa, but he never thought of accepting or occupying the throne himself. He had nothing to do with that. He had done his duty and there it ended.

After the conclusion of the Kurukshetra War, the great warrior and venerable grandsire, Bhisma, who fought ten days out of the eighteen days' battle, still lay on his deathbed and gave instructions to Yudhishthira on various subjects, such as the duties of the king, the duties of the four castes, the four stages of life, the laws of marriage, the bestowing of gifts, etc. basing them on the teachings of the ancient sages. He explained Sankhya philosophy and Yoga philosophy and narrated numerous tales and traditions about saints and gods and kings. These teachings occupy nearly one-fourth of the entire work and form an invaluable storehouse of Hindu laws and moral codes. Yudhishthira had in the meantime been crowned king. But the awful bloodshed and extinction of superiors and relatives weighed heavily on his mind ; and then, under the advice of Vyasa, he performed the Ashvamedha sacrifice.

After the war, for fifteen years Dhritarashtra dwelt in peace and honour, obeyed by Yudhisthira and his brothers. Then the aged monarch leaving Yudhishthira on the throne, retired to the forest with his devoted wife and Kunti, the mother of the Pandava brothers, to pass his last days in asceticism.

Thirty-six years had now passed since Yudhishthira regained his empire. Then came to him the news that Krishna had left his mortal body. Krishna, the sage, his friend, his prophet, his counsellor, had departed. Arjuna hastened to Dwaraka and came back only to confirm the sad news that Krishna and the Yadavas were all dead. Then the king and the other brothers, overcome with sorrow

declared that the time for them to go, too, had arrived. So they cast off the burden of royalty, placed Parikshit, the grandson of Arjuna, on the throne, and retired to the Himalayas, on the Great Journey, the Mahaprasthana. This was a peculiar form of Sanyasa. It was a custom for old kings to become Sannyasins. In ancient India when men became very old, they would give up everything. So did the kings. When a man did not want to live any more, then he went towards the Himalayas, without eating or drinking and walked on and on till the body failed. All the time thinking of God, he just marched on till the body gave way.

Then came the gods, the sages, and they told King Yudhishthira that he should go and reach heaven. To go to heaven one has to cross the highest peaks of the Himalayas. Beyond the Himalayas is Mount Meru. On the top of Mount Meru is heaven. None ever went there in this body. There the gods reside. And Yudhisthira was called upon by the gods to go there.

So the five brothers and their wife clad themselves in robes of bark, and set out on their journey. On the way, they were followed by a dog. On and on they went, and they turned their weary feet northward to where the Himalayas lifts his lofty peaks, and they saw the mighty Mount Meru in front of them. Silently they walked on in the snow, until suddenly the queen fell, to rise no more. To Yudhishthira who was leading the way, Bhima, one of the brothers said, "Behold, O King, the queen has fallen." The king shed tears, but he did not look back. "We are going to meet Krishna," he says. "No time to look back. March on." After a while, again Bhima said, "Behold, our brother, Sahadeva has fallen." The king shed tears ; but paused not. "March on,' he cried.

One after the other, in the cold and snow, all the four brothers dropped down, but unshaken, though alone, the king advanced onward. Looking behind, he saw the faithful dog was still following him. And so the king and the dog went on, through snow and ice, over hill and dale, climbing higher and higher, till they reached Mount Meru ; and there they began to hear the chimes of heaven, and celestial flowers were showered upon the virtuous king by the gods. Then descended the chariot of the gods, and Indra prayed him, "Ascend in this chariot, greatest of mortals : thou that alone art given to enter heaven without changing the mortal body." But no, that Youdhishthira would not do without his devoted brothers

and his queen : then Indra explained to him that the brothers had already gone thither before him.

And Yudhishthira looked around and said to his dog, "Get into the chariot, child." The god stood aghast. "What ! the dog ?" he cried. "Do thou cast off this dog ! The dog goeth not to heaven ! Great King, what dost thou mean ? Art thou mad ? Thou, the most virtuous of the human race, thou only canst go to heaven in thy body." "But he has been my devoted companion through snow and ice. When all my brothers were dead my queen dead, he alone never left me. How can I leave him now ?" "There is no place in heaven for men with dogs. He has to be left behind. There is nothing unrighteous in this." "I do no go to heaven," replied the king, "without the dog. I shall never give up such a one who has taken refuge with me, until my own life is at an end. I shall never swerve from righteousness, nay, not even for the joys of heaven or the urging of a god." "Then," said Indra, "on one condition the dog goes to heaven. You have been the most virtuous of mortals and he has been a dog, killing and eating animals ; he is sinful, hunting, and taking other lives. You can exchange heaven with him." "Agreed," says the kin "Let the dog go to heaven."

At once, the scene changed. Hearing these noble words of Yudhishthira, the dog revealed himself as Dharma ; the dog was no other than Yama, the Lord of Death and Justice. And Dharma exclaimed, "Behold, O King, no man was ever so unselfish as thou, willing to exchange heaven with a little dog, and for his sake disclaiming all his virtues and ready to go to hell even for him. Thou art well born, O King of kings. Thou hast compassion for all creatures, O Bharata, of which this is a bright example. Hence, regions of undying felicity are thine ! Thou hast won them, O King, and thine is a celestial and high goal."

Then Yudhishthira, with Indra, Dharma, and other gods, proceeds to heaven in a celestial car. He undergoes some trials, bathes in the celestial Ganga, and assumes a celestial body. He meets his brothers who are now immortals, and all at last is bliss.

Thus ends the story of the Mahabharata, setting forth in a sublime poem the triumph of virtue and defeat of vice.

In speaking of the Mahabharata to you, it is simply impossible for me to present the unending array of the grand and majestic characters of the mighty heroes depicted by the genius and master-

mind of Vyasa. The internal conflicts between righteousness and filial affection in the mind of the god-fearing, yet feeble, old, blind King Dhritarashtra ; the majestic character of the grandsire Bhisma ; the noble and virtuous nature of the royal Yudhishthira, and of the other four brothers, as mighty in valour as in devotion and loyalty ! the peerless character of Krishna, unsurpassed in human wisdom ; and not less brilliant, the characters of the women —the stately queen Gandhari, the loving mother Kunti, the ever-devoted and all-suffering Draupadi—these and hundreds of other characters of this Epic and those of the Ramayana have been the cherished heritage of the whole Hindu world for the last several thousands of years and form the basis of their thoughts and of their moral and ethical ideas. In fact, the Ramayana and the Mahabharata are the two encyclopaedias of the ancient Aryan life and wisdom, portraying an ideal civilisation which humanity has yet to aspire after.

পরিশিষ্ট

নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়

বেদপ্রমুখ শাস্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্বজ্ঞ হয়েন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের এই কালের আচরণ দেখিয়া পূর্বোক্ত শাস্ত্রবাক্য ধ্রুবসত্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কারণ, দেখা যায়, তিনি যে এখন কেবলমাত্র ব্রহ্মের সগুণ-নির্গুণ উভয় ভাবের এবং ব্রহ্মশক্তি মায়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইয়া সকল প্রকার সংশয় ও মলিনতার পরপারে গমনপূর্বক স্বয়ং সদানন্দে অবস্থান করিতেছেন তাহা নহে; কিন্তু ভাবমুখে সর্বদা অবস্থানপূর্বক মায়ার রাজ্যের যে গূঢ় রহস্য যখনই জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন তখনই তাহা জানিতে পারিতেছেন। তাঁহার সুসূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন মনের সম্মুখে উহা আর নিজস্বরূপ গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ঐরূপ হইবারই কথা। কারণ, ভাবমুখ ও মায়াধীশ ঈশ্বরের বিরাট মন—যাহাতে বিশ্বরূপ-কল্পনা কখন প্রকাশিত এবং কখন বিলুপ্তভাবে অবস্থান করে—উভয় একই পদার্থ; এবং যিনি আপনার ক্ষুদ্র আমিত্বের গণ্ডি অতিক্রমপূর্বক উহার সহিত একীভূত হইয়া অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, বিরাট মনে উদিত সমুদয় কল্পনাই তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হয়। উক্ত অবস্থায় পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুর তাঁহার ভক্তদিগের আগমনের পূর্বেই নিজ পূর্ব পূর্ব জন্মসকলের কথা জানিয়া লইয়াছিলেন। বিরাট মনের কোন্ বিশেষ লীলাপ্রকাশের জন্য তাঁহার বর্তমান শরীরধারণ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। উক্ত লীলার পুষ্টির জন্য কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর সাধক ব্যক্তি ঈশ্বরেচ্ছায় জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, এ কথা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। উহাদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি সেই লীলাপ্রকাশে তাঁহাকে অল্পাধিক সহায়তা করিবেন এবং কাঁহারাই বা তাহার ফলভোগী মাত্র হইয়া কৃতার্থ হইবেন তাহা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং ঐ সকল ভক্তের আগমন-কাল সন্নিকট জানিয়া তাঁহাদিগের নিমিত্ত সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। মায়ার রাজ্যের অন্তরে থাকিয়া পূর্বোক্ত গূঢ় রহস্যসকল যিনি জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাকে সর্বজ্ঞ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

নিজ চিহ্নিত ভক্তসকলের আগমন-কাল সন্নিকট জানিয়া দিব্যভাবারূঢ় ঠাকুর এইকালে তাহাদিগের জন্য কিরূপ আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীস্বামী বিবেকানন্দের তাঁহার নিকটে প্রথমাগমনের কথা অনুধাবন করিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন, ঠাকুরের নিকটে তাঁহার আগমনের প্রায় সমসমান কালে কলিকাতার সিমলা নামক পল্লীনিবাসী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। প্রথম দর্শনের দিন হইতেই শ্রীযুত সুরেন্দ্র ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং স্বল্পকালেই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজালয়ে ল.য়া যাইয়া আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। সুকণ্ঠ গায়কের অভাব হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ ঐ দিবসে নিজ প্রতিবেশী শ্রীযুত বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র শ্রীমান নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুরের নিকটে ভজন গাহিবার জন্য নিজালয়ে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। ঠাকুর ও তাঁহার প্রধান লীলাসহায়ক স্বামী বিবেকানন্দের

পরস্পর পরস্পরকে প্রথম দর্শন করা ঐরূপে সংঘটিত হইয়াছিল। তখন সন ১২৮৮ সালের হেমন্তের শেষভাগ—ইং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর হইবে; এবং অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক নরেন্দ্রনাথ ঐ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্. এ. পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন, নরেন্দ্রনাথকে সেদিন দেখিবামাত্র ঠাকুর যে তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, প্রথমে সুরেন্দ্রনাথকে এবং পরে রামচন্দ্রকে নিকটে আহ্বানপূর্বক সুগায়ক যুবকের পরিচয় যতদূর সম্ভব জানিয়া লয়েন এবং একদিবস তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার সকাশে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। আবার ভজন সাঙ্গ হইলে স্বয়ং যুবকের নিকট আগমনপূর্বক তাঁহার অঙ্গলক্ষণসকল বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সহিত দুই-একটি কথা কহিয়া অবিলম্বে একদিবস দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্. এ. পরীক্ষা হইয়া গেল এবং নরেন্দ্রনাথের পিতা সহরের কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, পাত্রী শ্যামবর্ণা ছিল বলিয়া তাঁহার পিতা উক্ত বিবাহে দশ সহস্র মুদ্রা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র দত্তপ্রমুখ নরেন্দ্রনাথের আত্মীয়বর্গ তাঁহার পিতার প্রেরণায় তাঁহাকে উক্ত বিবাহে সম্মত করাইবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের বিষম আপত্তিতে উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হয় নাই। রামচন্দ্র নরেন্দ্রনাথের পিতার সংসারে প্রতিপালিত হইয়া ক্রমে চিকিৎসক হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। ধর্মভাবের প্রেরণা হইতে নরেন্দ্র বিবাহ করিলেন না, একথা বুঝিতে পারিয়া তিনি তখন তাঁহাকে এক দিবস বলিয়াছিলেন, "যদি ধর্মলাভ করিতে তোমার যথার্থ বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি স্থলে ঘুরিয়া না বেড়াইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে চল।" প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথও তাঁহাকে এই সময়ে এক দিবস তাঁহার সহিত গাড়ি করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। নরেন্দ্রনাথ উহাতে সম্মত হইয়া দুই-তিন জন বয়স্য সমভিব্যাহারে সুরেন্দ্রনাথের সহিত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া ঐ দিবস ঠাকুরের যাহা মনে হইয়াছিল, কথাপ্রসঙ্গে তাহা তিনি একদিন সংক্ষেপে আমাদিগকে এইরূপে বলিয়াছিলেন—

"পশ্চিমের (গঙ্গার দিকের) দরজা দিয়া নরেন্দ্র প্রথম দিন এই ঘরে ঢুকিয়াছিল। দেখিলাম, নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নাই, মাথার চুল ও বেশভূষার কোনরূপ পারিপাট্য নাই, বাহিরের কোন পদার্থেই ইতর-সাধারণের মত একটা আঁট নাই, সবই যেন তার আলগা এবং চক্ষু দেখিয়া মনে হইল তাহার মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন সর্বদা জোর করিয়া টানিয়া রাখিয়াছে! দেখিয়া মনে হইল বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভবে!

"মেঝেতে মাদুর পাতা ছিল, বসিতে বলিলাম। যেখানে গঙ্গাজলের জালাটি রহিয়াছে তাহার নিকটেই বসিল। তাহার সঙ্গে সেদিন দুই-চারি জন আলাপী

ছোক্‌রাও আসিয়াছিল। বুঝিলাম, তাহাদিগের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত—সাধারণ বিষয়ী লোকের যেমন হয়; ভোগের দিকেই দৃষ্টি।

"গান গাহিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বাঙ্গালা গান সে দুই-চারিটি মাত্র তখন শিখিয়াছে। তাহাই গাহিতে বলিলাম, তাহাতে সে ব্রাহ্মসমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে'* গানটি ধরিল ও ষোল আনা মনপ্রাণ ঢালিয়া ধ্যানস্থ হইয়া যেন উহা গাহিতে লাগিল—শুনিয়া আর সামলাইতে পারিলাম না, ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম।

"পরে সে চলিয়া যাইলে, তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণের ভিতরটা চব্বিশ ঘণ্টা এমন ব্যাকুল হইয়া রহিল যে, বলিবার নহে। সময়ে সময়ে এমন যন্ত্রণা হইত যে, মনে হইত বুকের ভিতরটা যেন কে গামছা-নিংড়াইবার মত জোর করিয়া নিংড়াইতেছে! তখন আপনাকে আর সামলাইতে পারিতাম না, ছুটিয়া বাগানের উত্তরাংশের ঝাউতলায়, যেখানে কেহ বড় একটা যায় না, যাইয়া 'ওরে তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকৃতে পার্‌চি না' বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতাম! খানিকটা এইরূপে কাঁদিয়া তবে আপনাকে সামলাইতে পারিতাম। ক্রমান্বয়ে ছয় মাস ঐরূপ হইয়াছিল! আর সব ছেলেরা যারা এখানে আসিয়াছে, তাদের কাহারও কাহারও জন্য কখন কখন মন কেমন

---

* মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে।
বিষয়পঞ্চক আর ভূতগণ,
সব তোর পর, কেহ নয় আপন,
পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন
ভুলিছ আপন জনে।
সত্যপথে মন কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল লহ ভক্তিধন
গোপনে অতি যতনে।
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ,
পথিকের করে সর্বস্ব শোষণ,
তাই বলি মন রেখরে প্রহরী
শম দম দুই জনে।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,
শ্রান্ত হলে তথায় করিও বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে শুধাইও পথ
সে পান্থনিবাসিগণে।
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার,
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ
শমন ডরে যাঁর শাসনে।

করিয়াছে, কিন্তু নরেন্দ্রের জন্য যেমন হইয়াছিল তাহার তুলনায় সে কিছুই নয় বলিলে চলে।"

নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে দেখিয়া ঠাকুরের মনে যে অপূর্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার অনেকটা ঢাকিয়া যে তিনি ঐরূপে আমাদিগের নিকটে বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা পরে বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়াছি। শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ একদিন উক্ত দিবসের কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"গান তো গাহিলাম, তাহার পরে ঠাকুর সহসা উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া তাঁহার ঘরের উত্তরে যে বারাণ্ডা আছে, তথায় লইয়া যাইলেন। তখন শীতকাল, উত্তরে-হাওয়া নিবারণের জন্য উক্ত বারাণ্ডার থামের অন্তরালগুলি ঝাঁপ দিয়া ঘেরা ছিল; সুতরাং উহার ভিতরে ঢুকিয়া ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলে ঘরের ভিতরের বা বাহিরের কোন লোককে দেখা যাইত না। বারাণ্ডায় প্রবিষ্ট হইয়াই ঠাকুর ঘরের দরজাটি বন্ধ করায় ভাবিলাম, আমাকে বুঝি নির্জনে কিছু উপদেশ দিবেন। কিন্তু যাহা বলিলেন ও করিলেন তাহা একেবারে কল্পনাতীত। সহসা আমার হাত ধরিয়া দরদরিতধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং পূর্বপরিচিতের ন্যায় আমাকে পরম স্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এতদিন পরে আসিতে হয়? আমি তোমার জন্য কিরূপে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি তাহা একবার ভাবিতে নাই? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে আমার কান ঝল্‌সিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে; প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে না পাইয়া আমার পেট ফুলিয়া রহিয়াছে।'—ইত্যাদি কত কথা বলেন ও রোদন করেন! পরক্ষণেই আবার আমার সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া দেবতার মত আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, 'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীরধারণ করিয়াছ' ইত্যাদি!

"আমি তো তাঁহার ঐরূপ আচরণে একেবারে নির্বাক—স্তম্ভিত! মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, এ তো একেবারে উন্মাদ—না হইলে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র আমি, আমাকে এইসব কথা বলে? যাহা হউক, চুপ করিয়া রহিলাম, অদ্ভুত পাগল যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। পরক্ষণে আমাকে তথায় থাকিতে বলিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মাখন, মিছরি ও কতকগুলি সন্দেশ আনিয়া আমাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। আমি যত বলিতে লাগিলাম, 'আমাকে খাবারগুলি দিন। আমি সঙ্গীদের সহিত ভাগ করিয়া খাইগে', তিনি তাহা কিছুতে শুনিলেন না। বলিলেন, 'উহারা খাইবে এখন, তুমি খাও।'—বলিয়া সকলগুলি আমাকে খাওয়াইয়া তবে নিরস্ত হইলেন। পরে হাত ধরিয়া বলিলেন, 'বল, তুমি শীঘ্র একদিন এখানে আমার নিকটে একাকী আসিবে?' তাঁহার ঐরূপ একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা 'আসিব' বলিলাম এবং তাঁহার সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক সঙ্গীদিগের নিকটে উপবিষ্ট হইলাম।

"বসিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তাঁহার চালচলনে, কথাবার্তায় অপর সকলের সহিত আচরণে উন্মাদের মত কিছুই নাই। তাঁহার সদালাপ ও ভাবসমাধি দেখিয়া মনে হইল সত্যসত্যই ইনি ঈশ্বরার্থে সর্বত্যাগী

এবং যাহা বলিতেছেন তাহা স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়াছেন। 'তোমাদিগকে যেমন দেখিতেছি, তোমাদিগের সহিত যেমন কহিতেছি, এইরূপে ঈশ্বরকে দেখা যায় ও তাঁহার সহিত কথা কহা যায়, কিন্তু ঐরূপ করিতে চাহে কে? লোকে স্ত্রীপুত্রের শোকে ঘটি ঘটি চক্ষের জল ফেলে, বিষয় বা টাকার জন্য ঐরূপ করে, কিন্তু ঈশ্বরকে পাইলাম না বলিয়া ঐরূপ কে করে বল? তাঁহাকে পাইলাম না বলিয়া যদি ঐরূপ ব্যাকুল হইয়া কেহ তাঁহাকে ডাকে তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় তাহাকে দেখা দেন'—তাঁহার মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া মনে হইল তিনি অপর ধর্মপ্রচারক-সকলের ন্যায় কল্পনা বা রূপকের সহায়তা লইয়া ঐরূপ বলিতেছেন না, সত্য সত্যই সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া এবং সম্পূর্ণ মনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন। তখন তাঁহার ইতিপূর্বের আচরণের সহিত ঐসকল কথার সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া এবারক্রম্বি-প্রমুখ ইংরাজ দার্শনিকগণ তাঁহাদিগের গ্রন্থমধ্যে যে-সকল অর্ধোন্মাদের (monomaniac) উল্লেখ করিয়াছেন, এই সকল দৃষ্টান্ত মনে উদিত হইল এবং দৃঢ়নিশ্চয় করিলাম, ইনিও ঐরূপ হইয়াছেন। ঐরূপ নিশ্চয় করিয়াও কিন্তু ইঁহার ঈশ্বরার্থে অদ্ভুত ত্যাগের মহিমা ভুলিতে পারিলাম না। নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, উন্মাদ হইলেও ঈশ্বরের জন্য ঐরূপ ত্যাগ জগতে বিরল ব্যক্তিই করিতে সক্ষম; উন্মাদ হইলেও এ ব্যক্তি মহাপবিত্র, মহাত্যাগী এবং ঐ জন্য মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাইবার যথার্থ অধিকারী! ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেদিন তাঁহার চরণবন্দনা ও তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্বক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।"

যাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুরের মনে ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল তাঁহার পূর্বকথা পাঠকের জানিবার স্বতই কৌতূহল হইবে, এজন্য আমরা এখন সংক্ষেপে উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রীযুত নরেন্দ্র তখন কেবলমাত্র বিদ্যার্জনে এবং সঙ্গীতশিক্ষায় কালযাপন করিতেছিলেন না—কিন্তু ধর্মভাবের তীব্র প্রেরণায় অখণ্ড ব্রহ্মচর্য-পালনে ও কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিরামিষভোজী হইয়া ভূমি অথবা কম্বলশয্যায় রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার পিত্রালয়ের সন্নিকটে তদীয় মাতামহীর একখানি ভাড়াটিয়া বাটী ছিল; প্রবেশিকা পরীক্ষার পর হইতে উহার বহির্ভাগের দ্বিতলের একটি ঘরেই তিনি প্রধানত বাস করিতেন। যখন কোন কারণে সেখানে থাকার অসুবিধা হইত তখন উক্ত বাটীর নিকটে একখানি ঘর ভাড়া করিয়া আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গ হইতে দূরে পৃথক্‌ভাবে অবস্থানপূর্বক তিনি নিজ উদ্দেশ্য-সাধনে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার সদাশয় পিতা ও বাটীর অন্যান্য সকলে জানিত, বাটীতে বহুপরিবারের নানা গণ্ডগোলে পাঠাভ্যাসের সুবিধা হয় না বলিয়াই তিনি পৃথক্ অবস্থান করেন।

শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ তখন ব্রাহ্মসমাজেও গমনাগমন করিতেছিলেন এবং নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার ধ্যানে অনেক কাল অতিবাহিত করিতেন। তর্কযুক্তিসহায়ে নিরাকার ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠামাত্র করিয়াই তিনি ইতর-সাধারণের ন্যায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। পূর্ব পুণ্যসংস্কারসমূহের প্রেরণায় তাঁহার প্রাণ তাঁহাকে নিরন্তর বলিতেছিল—যদি শ্রীভগবান সত্য সত্যই থাকেন তাহা হইলে মানব-হৃদয়ের

ব্যাকুল আহ্বানে তিনি কখন নিজস্বরূপ গোপন করিয়া রাখিবেন না, তাঁহাকে লাভ করিবার পথ তিনি নিশ্চয়ই করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহাকে লাভ করা ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদিগের স্মরণ আছে এক সময়ে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"যৌবনে পদার্পণ করিয়া পর্যন্ত প্রতিরাত্রে শয়ন করিলেই দুইটি কল্পনা আমার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিত। একটিতে দেখিতাম যেন আমার অশেষ ধন-জন-সম্পদ ঐশ্বর্যাদি লাভ হইয়াছে, সংসারে যাহাদের বড় লোক বলে তাহাদিগের শীর্ষস্থানে যেন আরূঢ় হইয়া রহিয়াছি, মনে হইত ঐরূপ হইবার শক্তি আমাতে সত্য সত্যই রহিয়াছে। আবার পরক্ষণে দেখিতাম, আমি যেন পৃথিবীর সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ভরপূর্বক কৌপীনধারণ, যদৃচ্ছালব্ধ ভোজন এবং বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিয়া কাল কাটাইতেছি। মনে হইত ইচ্ছা করিলে আমি ঐভাবে ঋষিমুনিদের ন্যায় জীবনযাপনে সমর্থ। ঐরূপে দুই প্রকারে জীবন নিয়মিত করিবার ছবি কল্পনায় উদিত হইয়া পরিশেষে শেষোক্তটিই হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত। ভাবিতাম ঐরূপেই মানব পরমানন্দ-লাভ করিতে পারে, আমি ঐরূপই করিব। তখন ঐপ্রকার জীবনের সুখ ভাবিতে ভাবিতে ঈশ্বরচিন্তায় মন নিমগ্ন হইত এবং ঘুমাইয়া পড়িতাম। আশ্চর্যের বিষয় প্রত্যহ অনেক দিন পর্যন্ত ঐরূপ হইয়াছিল!"

ধ্যানকেই নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরলাভের একমাত্র প্রশস্ত পথরূপে এই বয়সেই স্বতঃ ধারণা করিয়াছিলেন। উহা তাঁহার পূর্বসংস্কারজ জ্ঞান বলিয়া বেশ বুঝা যায়। তাঁহার বয়স যখন চারি-পাঁচ বৎসর হইবে তখন সীতারাম, মহাদেব প্রভৃতি দেবদেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃন্ময়মূর্তিসকল বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনয়নপূর্বক পুষ্পাভরণে সজ্জিত করিয়া উহাদিগের সম্মুখে ধ্যানের ভানে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে চাহিয়া দেখিতেন, ইতিমধ্যে তাঁহার মাথায় সুদীর্ঘ জটা লম্বিত হইয়া বৃক্ষাদির মূলের ন্যায় মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল কি না—কারণ বাটীর বৃদ্ধা স্ত্রীলোক-দিগের নিকটে তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, ধ্যান করিতে করিতে মুনিঋষিদের মাথায় জটা হয় এবং উহা ঐপ্রকারে মাটির ভিতর নামিয়া যায়। তাঁহার পূজনীয়া মাতা বলিতেন, ঐ সময়ে এক দিবস নরেন্দ্রনাথ হরি নামক এক প্রতিবেশী বালকের সহিত সকলের অজ্ঞাতে বাটীর এক নিভৃত প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া এত অধিককাল ঐরূপ ধ্যানের ভানে বসিয়াছিলেন যে, সকলে বালকের অন্বেষণে চারিদিকে ধাবিত হইয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল পথ হারাইয়া বালক কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পরে বাটীর ঐ অংশ অর্গলবদ্ধ দেখিয়া একজন উহা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া দেখে—বালক তখন নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিয়াছে। বাল্য-কল্পনা হইলেও উহা হইতে বুঝা যায় শ্রীযুত নরেন্দ্র কিরূপ অদ্ভুত সংস্কার লইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে তাঁহার আত্মীয়বর্গের প্রায় কেহই জানিতেন না যে, তিনি নিত্য ধ্যানাভ্যাস করিয়া থাকেন। কারণ রাত্রিতে সকলে শয়ন করিবার পরে গৃহ অর্গলবদ্ধ করিয়া তিনি ধ্যান করিতে বসিতেন এবং কখন কখন উহাতে এতদূর নিমগ্ন হইতেন যে, সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইবার পরে তাঁহার ঐ বিষয়ের জ্ঞান হইত।

এই কালের কিছু পূর্বের একটি ঘটনায় শ্রীযুত নরেন্দ্রের ধ্যান করিবার প্রবৃত্তি বিশেষ উৎসাহ লাভ করিয়াছিল। বয়স্য-বর্গের সহিত তিনি একদিন আদি ব্রাহ্ম-সমাজের পূজ্যপাদ আচার্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মহর্ষি যুবকগণকে সেদিন সাদরে নিকটে বসাইয়া অনেক সদুপদেশ প্রদানপূর্বক নিত্য ঈশ্বরের ধ্যানাভ্যাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, তোমাতে যোগীর লক্ষণসকল প্রকাশিত রহিয়াছে, তুমি ধ্যানাভ্যাস করিলে যোগশাস্ত্রনির্দিষ্ট ফলসকল শীঘ্রই প্রত্যক্ষ করিবে। মহর্ষির পুণ্য চরিত্রের জন্য নরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি পূর্ব হইতেই শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ঐরূপ কথায় তিনি যে এখন হইতে ধ্যানাভ্যাসে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাল্যকাল হইতেই নানাবিষয়ে নরেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইত। পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করিবার পূর্বে তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সমগ্র সূত্রগুলি আবৃত্তি করিতে পারিতেন। এক বৃদ্ধ আত্মীয় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া পিতৃপুরুষের নামাবলী, দেবদেবী- স্তোত্রসমূহ এবং উক্ত ব্যাকরণের সূত্রগুলি শিখাইয়াছিলেন। ছয় বৎসর বয়সকালে তিনি রামায়ণের সমগ্র পালা কণ্ঠস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পাড়ার কোন স্থানে রামায়ণ-গান হইতেছে শুনিলেই তথায় উপস্থিত হইতেন। শুনা যায় তাঁহার বাটীর নিকটে এক স্থলে এক রামায়ণ-গায়ক এক দিবস পালাবিশেষ গাহিতে গাহিতে উহার কোন অংশ স্মরণ করিতে পারিতেছিল না, নরেন্দ্রনাথ তাহাকে উহা তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিয়া তাহার নিকট বিশেষ সমাদর ও কিছু মিষ্টান্নলাভ করিয়াছিলেন। রামায়ণ শুনিতে উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ তখন মধ্যে মধ্যে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেন, শ্রীরামচন্দ্রের দাস মহাবীর হনুমান তাঁহার প্রতিশ্রুতিমত গান শুনিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন কি না! শ্রুতিধরের ন্যায় নরেন্দ্রনাথের প্রবল স্মৃতিশক্তির বিকাশ ছিল। কোন বিষয় একবার শুনিলেই উহা তাঁহার আয়ত্ত হইয়া যাইত। আবার ঐরূপে একবার কোনও বিষয় আয়ত্ত হইলে তাঁহার স্মৃতি হইতে উহা কখনও অপসারিত হইত না। সেজন্য শৈশব হইতেই তাঁহার পাঠাভ্যাসের রীতি ইতরসাধারণ বালকের ন্যায় ছিল না। বাল্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার পরে দৈনিক পাঠাভ্যাস করাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, "তিনি বাটীতে আসিলে আমি ইংরাজী, বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তকগুলি তাঁহার নিকটে আনয়ন করিয়া কোন্ পুস্তকের কোথা হইতে কতদূর পর্যন্ত সে দিন আয়ত্ত করিতে হইবে তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া যদৃচ্ছা শয়ন বা উপবেশন করিয়া থাকিতাম। মাস্টার মহাশয় যেন নিজে পাঠাভ্যাস করিতেছেন এইরূপভাবে পুস্তকগুলির ঐসকল স্থানের বানান উচ্চারণ ও অর্থাদি দুই-তিন বার আবৃত্তি করিয়া চলিয়া যাইতেন। উহাতেই ঐ সকল আমার আয়ত্ত হইয়া যাইত।" বড় হইয়া তিনি পরীক্ষার দুই-তিন মাস মাত্র থাকিবার কালে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকসকল আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিতেন; অন্য সময়ে আপন অভিরুচিমত অন্য পুস্তকসকল পড়িয়া কাল কাটাইতেন। ঐরূপে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্বে তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালার সমগ্র সাহিত্য ও

অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐরূপ করিবার ফলে কিন্তু পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাকে কখন কখন অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত। আমাদিগের স্মরণ আছে, একদিন তিনি পূর্বোক্ত কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "প্রবেশিকা পরীক্ষার আরম্ভের দুই-তিন দিন মাত্র থাকিতে দেখি জ্যামিতি কিছুমাত্র আয়ত্ত হয় নাই; তখন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উহা পাঠ করিতে লাগিলাম এবং চব্বিশ ঘণ্টায় উহার চারিখানি পুস্তক আয়ত্ত করিয়া পরীক্ষা দিয়া আসিলাম।" ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি দৃঢ় শরীর ও অপূর্ব মেধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই ঐরূপ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য।

অন্য পুস্তকসকল পড়িয়া নরেন্দ্রনাথ কাল কাটাইতেন শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন, তিনি নভেল-নাটকাদি পড়িয়াই সময় নষ্ট করিতেন। এক এক সময়ে এক এক বিষয়ের পুস্তকপাঠে তাঁহার একটা প্রবল আগ্রহ আসিয়া উপস্থিত হইত। তখন ঐ বিষয়ক যত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেন, সকল আয়ত্ত করিয়া লইতেন। যেমন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার বৎসরের আরম্ভ হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস-সমূহ পড়িবার তাঁহার বিশেষ আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং মার্শম্যান, এলফিন্‌স্টোন-প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থসকল পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন—এফ. এ. পড়িবার কালে ন্যায়শাস্ত্রের যত প্রকারের ইংরাজী গ্রন্থ ছিল, যথা, হোয়েটলি, জেভন্‌স, মিল-প্রমুখ গ্রন্থকারগণের পুস্তকসকল একে একে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বি. এ. পড়িবার কালে ইংলণ্ডের ও ইউরোপের সকল প্রদেশের প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহাস ও ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রসমূহ আয়ত্ত করিবার তাঁহার একান্ত বাসনা হইয়াছিল—এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হইবে।

এইরূপে বহু গ্রন্থপাঠের ফলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার কাল হইতে শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথের দ্রুত পাঠের শক্তি বিশেষ বিকশিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, "এখন হইতে কোন পুস্তক পাঠ করিতে বসিলে উহার প্রতি ছত্র পর পর পড়িয়া গ্রন্থকারের বক্তব্য বুঝিবার আমার আবশ্যক হইত না। প্রতি প্যারার প্রথম ও শেষ ছত্র পাঠ করিলেই উহার ভিতর কি বলা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতাম। ক্রমে ঐ শক্তি পরিণত হইয়া প্রতি প্যারাও আর পড়িবার আবশ্যক হইত না। প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ চরণ পড়িয়াই বুঝিয়া ফেলিতাম। আবার পুস্তকের যেখানে গ্রন্থকার কোন বিষয় তর্ক-যুক্তির দ্বারা বুঝাইতেছেন সেখানে প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা যুক্তিবিশেষ বুঝাইতে যদি চারি-পাঁচ বা ততোধিক পৃষ্ঠা লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত যুক্তির প্রারম্ভ মাত্র পড়িয়াই ঐ পৃষ্ঠাসকল বুঝিতে পারিতাম।"

বহু পাঠ ও গভীর চিন্তার ফলে শ্রীযুত নরেন্দ্র এই কালে বিষম তর্কপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মিথ্যা তর্ক কখন করিতেন না, মনে জ্ঞানে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তর্কের দ্বারা সর্বত্র তাহারই সমর্থন করিতেন। কিন্তু তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহার বিপরীত কোনপ্রকার ভাব বা মত কেহ তাঁহার সমক্ষে প্রকাশ করিলে তিনি চুপ করিয়া উহা কখনও শুনিয়া যাইতে পারিতেন না। কঠোর যুক্তি ও প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষের মত খণ্ডন করিয়া বাদীকে নিরস্ত করিতেন। বিরল ব্যক্তিই তাঁহার যুক্তিসকলের নিকট মস্তক অবনত করিত না।

আবার তর্কে পরাজিত হইয়া অনেকে যে তাঁহাকে সুনয়নে দেখিত না, এ কথা বলা বাহুল্য। তর্ককালে বাদীর দুই-চারিটি কথা শুনিয়াই তিনি বুঝিতে পারিতেন, সে কিরূপ যুক্তিসহায়ে নিজ পক্ষ সমর্থন করিবে এবং উহার উত্তর তাঁহার মনে পূর্ব হইতেই যোগাইয়া থাকিত। তর্ককালে বাদীকে নিরস্ত করিতে ঐরূপ তীক্ষ্ণ যুক্তি-প্রয়োগ তাঁহার মনে কিরূপে উদিত হয় এই কথা জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে কয়টা নূতন চিন্তাই বা আছে! সেই কয়টা জানা থাকিলে এবং তাহাদিগের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে কয়টা যুক্তি এপর্যন্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই কয়টা আয়ত্ত থাকিলে বাদীকে ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিবার প্রয়োজন থাকে না। কারণ বাদী যে কথা যে ভাবেই সমর্থন করুক না, উহা ঐ সকলের মধ্যে পড়িবেই পড়িবে। জগৎকে কোন বিষয়ে নূতন ভাব ও চিন্তা প্রদান করিতে সমর্থ এমন ব্যক্তি বিরল জন্মগ্রহণ করেন।"

সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অদৃষ্টপূর্ব মেধা ও গভীর চিন্তাশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ সকল বিষয় স্বল্পকালে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। সেজন্য পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার স্বচ্ছন্দ বিহার ও বয়স্যবর্গের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিবার অবকাশের অভাব হইত না। লোকে তাঁহাকে ঐরূপে অনেককাল কাটাইতে দেখিয়া ভাবিত, তাঁহার লেখা-পড়ায় আদৌ মন নাই। ইতরসাধারণ অনেক বালক তাঁহার দেখাদেখি আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাইতে যাইয়া কখন কখন আপনাদিগের পাঠাভ্যাসের ক্ষতি করিয়া বসিত।

জ্ঞানার্জনের ন্যায় ব্যায়াম-অভ্যাসেও নরেন্দ্রনাথের বাল্যকাল হইতে অশেষ অনুরাগ ছিল। পিতা তাঁহাকে শৈশবে একটি ঘোটক কিনিয়া দিয়াছিলেন। ফলে বয়োবৃদ্ধির সহিত তিনি অশ্বচালনায় সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন জিম্ন্যাস্টিক, কুস্তি, মুদ্গরহেলন, যষ্টিক্রীড়া, অসিচালনা, সন্তরণ প্রভৃতি যে-সকল বিদ্যা শারীরিক বলের ও শক্তিপ্রয়োগকৌশলের উৎকর্ষসাধন করে প্রায় সেই সকলেই তিনি অল্পবিস্তর পারদর্শী হইয়াছিলেন। শ্রীযুত নবগোপাল মিত্র-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলায় তখন পূর্বোক্ত বিদ্যাসকলের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের পারদর্শিতার পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক পারিতোষিক প্রদান করা হইত। আমরা শুনিয়াছি, নরেন্দ্রনাথ কখন কখন উক্ত পরীক্ষা-প্রদানেও অগ্রসর হইয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে নরেন্দ্রনাথের জীবনে বয়স্যপ্রীতি ও অসীম সাহসের পরিচয় পাওয়া যাইত। ছাত্রজীবনে এবং পরে তাঁহাকে দলপতি ও নেতৃত্বপদে আরূঢ় করাইতে ঐ গুণদ্বয় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। সাত-আট বৎসর বয়সকালে একদিন তিনি বয়স্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতার দক্ষিণে মেটেবুরুজ নামক স্থলে লক্ষ্ণৌ প্রদেশের ভূতপূর্ব নবাব ওয়াজিদ্ আলি সাহেবের পশুশালা-সন্দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। বালকগণ আপনাদিগের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া চাঁদপাল ঘাট হইতে একখানি টাপুরে ডিঙ্গী যাতায়াতের জন্য ভাড়া করিয়াছিল। ফিরিবার কালে তাহাদিগের একজন অসুস্থ হইয়া নৌকামধ্যে বমন করিয়া ফেলিল। মুসলমান মাঝি তাহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া চাঁদপাল ঘাটে নৌকা লাগাইবার পরে তাহাদিগকে বলিল, নৌকা পরিষ্কার করিয়া না দিলে তাহাদিগের কাহাকেও নামিতে দিবে না।

বালকেরা তাহাকে অপরের দ্বারা উহা পরিষ্কার করাইয়া লইতে বলিয়া উহার নিমিত্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিতে চাহিলেও সে উহাতে সম্মত হইল না। তখন বচসা উপস্থিত হইয়া ক্রমে উভয় পক্ষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হওয়ায়, ঘাটে যত নৌকার মাঝি ছিল, সকলে মিলিত হইয়া বালকদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। বালকগণ উহাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। মাঝিদিগের সহিত বচসার গোলযোগে তিনি পাশ কাটাইয়া নৌকা হইতে নামিয়া পড়িলেন। নিতান্ত বালক দেখিয়া মাঝিরা তাঁহার ঐ কার্যে বাধা দিল না। তীরে দাঁড়াইয়া ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইতেছে দেখিয়া তিনি এখন বয়স্যবর্গকে রক্ষা করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, দুইজন ইংরাজ সৈনিকপুরুষ ময়দানে বায়ুসেবনের জন্য অনতিদূরে রাস্তা দিয়া গমন করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ দ্রুতপদে তাঁহাদিগের নিকট গমন ও অভিবাদনপূর্বক তাঁহাদিগের হস্তধারণ করিলেন এবং ইংরাজী ভাষায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইলেও, দুই-চারিটি কথায় ও ইঙ্গিতে তাঁহাদিগকে ব্যাপারটা যথাসম্ভব বুঝাইতে বুঝাইতে ঘটনাস্থলে লইয়া যাইবার জন্য আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রিয়দর্শন অল্পবয়স্ক বালকের ঐরূপ কার্যে সদাশয় সৈনিকদ্বয়ের হৃদয় মুগ্ধ হইল। তাঁহারা অবিলম্বে নৌকাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা বুঝিতে পারিলেন এবং হস্তস্থিত বেত্র উঠাইয়া বালকদিগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য মাঝিকে আদেশ করিলেন। পল্টনের গোরা দেখিয়া মাঝিরা ভয়ে যে যাহার নৌকায় সরিয়া পড়িল এবং নরেন্দ্রনাথের বয়স্যবর্গও অব্যাহতি পাইল। নরেন্দ্রনাথের ব্যবহারে সৈনিকদ্বয় সেদিন তাঁহার উপর প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত তাঁহাকে থিয়েটার দেখিতে যাইতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ উহাতে সম্মত না হইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাল্যজীবনের অন্যান্য ঘটনাও নরেন্দ্রনাথের অশেষ সাহসের পরিচয় প্রদান করে। ঐরূপ দুই-একটির এখানে উল্লেখ করা প্রসঙ্গ-বিরুদ্ধ হইবে না। ভূতপূর্ব ভারত-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যে বৎসর 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স'রূপে ভারতপরিভ্রমণে আগমন করেন, সেই বৎসর নরেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম দশ-বার বৎসর ছিল। বৃটিশরাজের 'সিরাপিস' নামক একখানি বৃহৎ রণতরী ঐ সময়ে কলিকাতায় আসিয়াছিল এবং আদেশপত্র গ্রহণপূর্বক কলিকাতার বহু ব্যক্তি ঐ তরীর অভ্যন্তর দেখিতে গিয়াছিল। বালক নরেন্দ্রনাথ বয়স্যবর্গের সহিত উহা দেখিতে অভিলাষী হইয়া আদেশপত্র পাইবার আশায় একখানি আবেদন লিখিয়া চৌরঙ্গীর আফিসগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বাররক্ষক বিশেষ বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন আবেদনকারীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। তখন অনতিদূরে দণ্ডায়মান হইয়া সাহেবের সহিত দেখা করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে তিনি, যাঁহারা ভিতরে যাইয়া আদেশপত্র লইয়া ফিরিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত আফিসের ত্রিতলের এক বারাণ্ডায় গমন করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, ঐখানেই সাহেব আবেদন গ্রহণপূর্বক আদেশ দিতেছেন। তখন ঐস্থানে গমন করিবার অন্য কোন পথ আছে কিনা অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইলেন,

উক্ত বারাণ্ডার পশ্চাতের ঘরে সাহেবের পরিচারকদিগের যাইবার জন্য বাটীর অন্যদিকে একপার্শ্বে একটি অপ্রশস্ত লৌহময় সোপান রহিয়াছে। কেহ দেখিতে পাইলে লাঞ্ছিত হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়াও তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া তদবলম্বনে ত্রিতলে উঠিয়া যাইলেন এবং সাহেবের গৃহের ভিতর দিয়া বারাণ্ডায় প্রবেশপূর্বক দেখিলেন, সাহেবের চারিদিকে আবেদনকারীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং সাহেব সম্মুখস্থ টেবিলে মাথা হেঁট করিয়া ক্রমাগত আদেশপত্রসকলে সহি করিয়া যাইতেছেন। তিনি তখন সকলের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন এবং যথাকালে আদেশপত্র পাইয়া সাহেবকে অভিবাদন করিয়া অন্য সকলের ন্যায় সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া আফিসের বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

সিমলা-পল্লীর বালকদিগকে ব্যায়ামশিক্ষা দিবার জন্য তখন কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের উপরে একটি জিম্‌ন্যাস্টিকের আখড়া ছিল। হিন্দুমেলা প্রবর্তক শ্রীযুত নবগোপাল মিত্রই উহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাটীর অতি সন্নিকটে থাকায় নরেন্দ্রনাথ বয়স্য-বর্গের সহিত ঐ স্থানে নিত্য আগমনপূর্বক ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন। পাড়ার লোক নবগোপালবাবুর সহিত পূর্ব হইতে পরিচয় থাকায় তাঁহাদিগের উপরেই তিনি আখড়ার কার্যভার প্রদান করিয়াছিলেন। আখড়ায় একদিন ট্রাপিজ (দোল্‌না) খাটাইবার জন্য বালকেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও উহার গুরুভার দারুময় ফ্রেম খাড়া করিতে পারিতেছিল না। বালকদিগের ঐ কার্য দেখিতে রাস্তায় লোকের ভিড় হইয়াছিল; কিন্তু কেহই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেছিল না। জনতার মধ্যে একজন বলবান্ ইংরাজ 'সেলার'-কে দণ্ডায়মান দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ সাহায্য করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন। সেও তাহাতে সানন্দে সম্মত হইয়া বালকদিগের সহিত যোগদান করিল। তখন দড়ি বাঁধিয়া বালকেরা ট্রাপিজের শীর্ষদেশ টানিয়া উত্তোলন করিতে লাগিল এবং সাহেব পদদ্বয় গর্তমধ্যে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করাইতে সহায়তা করিতে লাগিল। ঐরূপে কার্য বেশ অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় দড়ি ছিঁড়িয়া ট্রাপিজের দারুময় শরীর পুনরায় ভূতলশায়ী হইল এবং উহার এক পদ সহসা উঠিয়া পড়ায় সাহেবের কপালে বিষম আঘাত লাগিয়া সে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেল। সাহেবকে অচৈতন্য ও তাহার ক্ষতস্থান হইতে অনর্গল রুধিরস্রাব হইতেছে দেখিয়া সকলে তাঁহাকে মৃত স্থির করিয়া পুলিশ-হাঙ্গামার ভয়ে যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। কেবল নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দুই-এক জন বিশেষ ঘনিষ্ঠ সঙ্গী মাত্রই ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায়-উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ নিজের বস্ত্র ছিন্ন ও আর্দ্র করিয়া সাহেবের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহার মুখে জলসেচন ও ব্যজন করিয়া তাহার চৈতন্যসম্পাদনে যত্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সাহেবের চৈতন্য হইলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া সম্মুখস্থ 'ট্রেনিং একাডেমি' নামক স্কুলগৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যাইয়া শয়ন করাইয়া, নবগোপালবাবুকে শীঘ্র একজন ডাক্তার লইয়া আসিবার নিমিত্ত সংবাদ প্রেরিত হইল। ডাক্তার আসিলেন এবং পরীক্ষা করিয়া বলিলেন আঘাত সাংঘাতিক নহে, এক সপ্তাহের শুশ্রূষায় সাহেব আরোগ্য হইবে। নরেন্দ্রনাথের শুশ্রূষায় এবং ঔষধ ও পথ্যাদির সহায়ে সাহেব ঐ কালের মধ্যেই সুস্থ হইল। তখন পল্লীর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকটে চাঁদা

সংগ্রহপূর্বক সাহেবকে কিঞ্চিৎ পাথেয় দিয়া নরেন্দ্রনাথ বিদায় করিলেন। ঐরূপ বিপদে পড়িয়া অবিচলিত থাকা সম্বন্ধে অনেকগুলি ঘটনা আমরা নরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে শ্রবণ করিয়াছি।

বাল্যকাল হইতেই শ্রীযুত নরেন্দ্র সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া তাঁহার উক্ত নিষ্ঠা বিশেষ বর্ধিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, "মিথ্যা কথা হইবে বলিয়া ছেলেদের কখনও জুজুর ভয় দেখাই নাই, এবং বাটীতে কেহ ঐরূপ করিতেছে দেখিলে তাহাকে বিষম তিরস্কার করিতাম। ইংরাজী পড়িয়া এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের ফলে বাচনিক সত্যনিষ্ঠা তখন এতদূর বাড়িয়া গিয়াছিল।"

সুদৃঢ় শরীর, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অদ্ভুত মেধা ও পবিত্রতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে নিয়ত সদানন্দে থাকিতে দেখা যাইত। ব্যায়াম, সঙ্গীত, বাদ্য ও নৃত্যশিক্ষা, বয়স্য-বর্গের সহিত নির্দোষ রঙ্গ পরিহাস প্রভৃতি সর্ববিধ ব্যাপারেই তিনি নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হইতেন। বাহিরের লোকে তাঁহার ঐরূপ আনন্দের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময় তাঁহার চরিত্রে দোষকল্পনা করিয়া বসিত। তেজস্বী নরেন্দ্রনাথ কিন্তু লোকের প্রশংসা বা নিন্দায় কখনও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। লোকের অযথা নিন্দাবাদকে অপ্রমাণিত করিতে তাঁহার গর্বিত হৃদয় কখনও নিজ মস্তক নত করিত না।

দরিদ্রের প্রতি দয়া করা নরেন্দ্রনাথের আজীবন স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তাঁহার শৈশবকালে বাটীতে ভিক্ষুক আসিয়া বস্ত্র, তৈজসাদি যাহা চাহিত, তিনি তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া বসিতেন। বাটীর লোকেরা উহা জানিতে পারিয়া বালককে তিরস্কার করিতেন এবং ভিক্ষুককে পয়সা দিয়া ঐসকল ছাড়াইয়া লইতেন। কয়েকবার ঐরূপ হওয়ায় মাতা একদিন বালক নরেন্দ্রকে বাটীর দ্বিতলে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। জনৈক ভিক্ষুক ঐসময়ে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষার জন্য উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা জ্ঞাপন করায় বালক গবাক্ষ দিয়া তাহার মাতার কয়েকখানি উত্তম বস্ত্র তাহাকে প্রদান করিয়া বসিয়াছিল।

মাতা বলিতেন, "শৈশবকাল হইতে নরেন্দ্রের একটা বড় দোষ ছিল। কোন কারণে যদি কখনও তাহার ক্রোধ উপস্থিত হইত, তাহা হইলে সে যেন একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইত এবং বাটীর আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তছনছ করিত। পুত্রকামনায় কাশীধামে ৺বীরেশ্বরের নিকট বিশেষ মানত করিয়াছিলাম। ৺বীরেশ্বর বোধ হয় তাঁহার একটা ভূতকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। না হইলে ক্রোধ হইলে সে অমন ভূতের মত অশান্ত ব্যবহার করে কেন?" বালকের ঐরূপ ক্রোধের তিনি চমৎকার ঔষধ বাহির করিয়াছিলেন। যখন দেখিতেন, তাহাকে কোনমতে শান্ত করিতে পারিতেছেন না, তখন ৺বীরেশ্বরকে স্মরণ করিয়া শীতল জল দুই-এক ঘড়া তাহার মাথায় ঢালিয়া দিতেন। বালকের ক্রোধ উহাতে এককালে প্রশমিত হইত। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত মিলিত হইবার কিছুকাল পরে নরেন্দ্রনাথ একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ধর্ম-কর্ম করিতে আসিয়া আর কিছু না হউক, ক্রোধটা তাঁহার (ঈশ্বরের) কৃপায় আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি। পূর্বে ক্রুদ্ধ হইলে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতাম, এবং পরে উহার জন্য অনুতাপে দগ্ধ হইতাম। এখন

কেহ নিষ্কারণে প্রহার করিলে অথবা নিতান্ত অপকার করিলেও তাহার উপর পূর্বের ন্যায় বিষম ক্রোধ উপস্থিত হয় না।”

মস্তিষ্ক ও হৃদয় উভয়ের সমসমান উৎকর্ষপ্রাপ্তি সংসারে বিরল লোকের দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহাদের ঐরূপ হয় তাঁহারাই মনুষ্যসমাজে কোন না কোন বিষয়ে নিজ মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। আবার আধ্যাত্মিক জগতে যাঁহারা নিজ অসাধারণত্ব সপ্রমাণ করিয়া যান, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সহিত কল্পনা-শক্তির প্রবৃদ্ধিও বাল্যকাল হইতে তাঁহাদিগের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। নরেন্দ্রনাথের জীবনালোচনায় পূর্বোক্ত কথা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐ বিষয়ের একটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

নরেন্দ্রনাথের পিতা এক সময়ে বিষয়কর্মোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। অধিককাল তথায় থাকিতে হইবে বুঝিয়া নিজ পরিবারবর্গকে তিনি কিছুকাল পরে ঐ স্থানে আনাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার ভার ঐকালে নরেন্দ্রনাথের উপরই অর্পিত হইয়াছিল্। নরেন্দ্রের বয়স তখন চৌদ্দ-পনের বৎসর মাত্র ছিল। ভারতের মধ্যপ্রদেশে তখন রেল হয় নাই, সুতরাং রায়পুর যাইতে হইলে শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া একপক্ষেরও অধিককাল গো-যানে করিয়া যাইতে হইত। ঐরূপে অশেষ শারীরিক কষ্টভোগ করিতে হইলেও নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, বনস্থলীর অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শনে উক্ত কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই তাঁহার মনে হয় নাই এবং অযাচিত হইয়াও যিনি ধরিত্রীকে ঐরূপ অনুপম বেশভূষায় সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার অসীম শক্তি ও অনন্ত প্রেমের সাক্ষাৎ পরিচয় প্রথম প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, “বনমধ্যগত পথ দিয়া যাইতে যাইতে ঐকালে যাহা দেখিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি, তাহা স্মৃতি-পত্রে চিরকালের জন্য দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ একদিনের কথা। উন্নতশীর্ষ বিন্ধ্যগিরির পাদদেশ দিয়া সেদিন আমাদিগকে যাইতে হইয়াছিল। পথের দুইপার্শ্বেই গিরিশৃঙ্গসকল গগন স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান ; নানাজাতীয় বৃক্ষ-লতা ফল-পুষ্প সম্ভারে অবনত হইয়া পর্বত-পৃষ্ঠের অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিয়া রহিয়াছে ; মধুর কাকলিতে দিক পূর্ণ করিয়া নানাবর্ণের বিহগকুল কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে গমন, অথবা আহার-অন্বেষণে কখন কখন ভূমিতে অবতরণ করিতেছে,—ঐ সকল বিষয় দেখিতে দেখিতে মনে একটা অপূর্ব শান্তি অনুভব করিতেছিলাম। ধীর-মন্থর গতিতে চলিতে চলিতে গো-যানসকল ক্রমে ক্রমে এমন একস্থলে উপস্থিত হইল যেখানে পর্বতশৃঙ্গদ্বয় যেন প্রেমে অগ্রসর হইয়া বনপথকে এককালে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। তখন তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশ বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখি, এক পার্শ্বের পর্বতগাত্রে মস্তক হইতে পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সুবৃহৎ ফাট রহিয়াছে এবং ঐ অন্তরালকে পূর্ণ করিয়া মক্ষিকাকুলের যুগযুগান্তর পরিশ্রমের নিদর্শনস্বরূপ একখানি প্রকাণ্ড মধুচক্র লম্বিত রহিয়াছে! তখন বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া সেই মক্ষিকা-রাজ্যের আদি-অন্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে মন ত্রিজগৎ-নিয়ন্তা ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির উপলব্ধিতে এমনভাবে তলাইয়া গেল যে, কিছুকালের নিমিত্ত বাহ্যসংজ্ঞার এককালে লোপ হইল। কতক্ষণ ঐ ভাবে গো-যানে পড়িয়াছিলাম, স্মরণ হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল তখন দেখিলাম, উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া অনেক

দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। গো-যানে একাকী ছিলাম বলিয়া ঐ কথা কেহ জানিতে পারে নাই।" প্রবল কল্পনাসহায়ে ধ্যানের রাজ্যে আরূঢ় হইয়া এককালে তন্ময় হইয়া যাওয়া নরেন্দ্রনাথের জীবনে বোধ হয় ইহাই প্রথম।

নরেন্দ্রনাথের পিতৃপরিচয় সংক্ষেপে প্রদানপূর্বক আমরা বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বহু শাখায় বিভক্ত সিমলার দত্তপরিবারেরা কলিকাতার প্রাচীন বংশসকলের মধ্যে অন্যতম ছিল। ধনে, মানে এবং বিদ্যাগৌরবে এই বংশ মধ্যবিত্ত কায়স্থ-গৃহস্থদিগের অগ্রণী ছিল। নরেন্দ্রনাথের প্রপিতামহ শ্রীযুত রামমোহন দত্ত ওকালতি করিয়া বেশ উপার্জনক্ষম হইয়াছিলেন এবং বহুগোষ্ঠী-পরিবৃত হইয়া সিমলার গৌরমোহন মুখার্জি লেনস্থ নিজ ভবনে সসম্মানে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র দুর্গাচরণ পিতার বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও স্বল্পবয়সে সংসারে বীতরাগ হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। শুনা যায়, বাল্যকাল হইতেই শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাধু-সন্ন্যাসি-ভক্ত ছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া অবধি পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি তাঁহাকে শাস্ত্র-অধ্যয়নে নিযুক্ত রাখিয়া স্বল্পকালে সুপণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। বিবাহ করিলেও দুর্গাচরণের সংসারে আসক্তি ছিল না। নিজ উদ্যানে সাধুসঙ্গেই তাঁহার অনেক কাল অতিবাহিত হইত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, তাঁহার পিতামহ শাস্ত্রমর্যাদা রক্ষাপূর্বক পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবার স্বল্পকাল পরেই চিরদিনের মত গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। সংসার পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেও বিধাতার নির্বন্ধে শ্রীযুত দুর্গাচরণ নিজ সহধর্মিণী ও আত্মীয়বর্গের সহিত দুইবার স্বল্পকালের জন্য মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ যখন দুই-তিন বৎসরের হইবে, তখন তাঁহার সহধর্মিণী ও আত্মীয়বর্গ বোধ হয় তাঁহারই অন্বেষণে ৺কাশীধামে গমনপূর্বক কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। রেলপথ না থাকায় সম্ভ্রান্তবংশীয়েরা তখন নৌকাযোগেই কাশীতে আসিতেন। দুর্গাচরণের সহধর্মিণীও ঐরূপ করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে শিশু বিশ্বনাথ একস্থানে নৌকা হইতে জলে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার মাতাই উহা সর্বাগ্রে দর্শন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে ঝম্প-প্রদান করিয়াছিলেন। অশেষ চেষ্টার পরে সংজ্ঞাশূন্য মাতাকে জলগর্ভ হইতে নৌকায় উঠাইতে যাইয়া দেখা গেল, তিনি নিজ সন্তানের হস্ত তখনও দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ঐরূপে মাতার অপার স্নেহই সেইবার বিশ্বনাথের প্রাণ-রক্ষার হেতু হইয়াছিল।

কাশী পৌঁছিবার পরে শ্রীযুত দুর্গাচরণের সহধর্মিণী নিত্য ৺বিশ্বনাথ-দর্শনে গমন করিতেন। বৃষ্টি হইয়া পথ পিচ্ছিল হওয়ায় একদিন শ্রীমন্দিরের সম্মুখে তিনি সহসা পড়িয়া যাইলেন। ঐ স্থান দিয়া গমন করিতে করিতে জনৈক সন্ন্যাসী উহা দেখিতে পাইয়া দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং সযত্নে উত্তোলনপূর্বক তাঁহাকে মন্দিরের সোপানে বসাইয়া, শরীরের কোন স্থানে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে কি না পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু চারি চক্ষের মিলন হইবামাত্র দুর্গাচরণ ও তাঁহার সহধর্মিণী পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন এবং সন্ন্যাসী দুর্গাচরণ দ্বিতীয়বার তাঁহার দিকে না দেখিয়া দ্রুতপদে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

শাস্ত্রে বিধি আছে, প্রব্রজ্যাগ্রহণের দ্বাদশ বৎসর পরে সন্ন্যাসী ব্যক্তি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' নিজ জন্মভূমি সন্দর্শন করিবেন। শ্রীযুত দুর্গাচরণ ঐ জন্য দ্বাদশ বৎসর পরে

একবার কলিকাতায় আগমনপূর্বক জনৈক পূর্ববন্ধুর ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন—যাহাতে তাঁহার আগমন-বার্তা তাঁহার আত্মীয়বর্গের মধ্যে প্রচারিত না হয়। সংসারী বন্ধু সন্ন্যাসী দুর্গাচরণের ঐ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া গোপনে তাঁহার আত্মীয়দিগকে ঐ সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহারা সদলবলে আসিয়া একপ্রকার জোর করিয়া শ্রীযুত দুর্গাচরণকে বাটীতে লইয়া যাইলেন। দুর্গাচরণ ঐরূপে বাটীতে যাইলেন বটে, কিন্তু কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া চক্ষু নিমীলিত করিয়া গৃহমধ্যে এক কোণে বসিয়া রহিলেন। শুনা যায়, একাদিক্রমে তিন অহোরাত্র তিনি ঐরূপে একাসনে বসিয়াছিলেন। তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন ভাবিয়া তাঁহার আত্মীয়বর্গ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং গৃহদ্বার পূর্বের ন্যায় রুদ্ধ না রাখিয়া উন্মুক্ত করিয়া রাখিলেন। পরদিন দেখা গেল, সন্ন্যাসী দুর্গাচরণ সকলের অলক্ষ্যে গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত দুর্গাচরণের পুত্র বিশ্বনাথ বয়োবৃদ্ধির সহিত ফার্সি ও ইংরাজীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভপূর্বক কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি হইয়াছিলেন। তিনি দানশীল ও বন্ধুবৎসল ছিলেন এবং বেশ উপার্জন করিলেও কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতৃধর্ম পুত্রে অনুগত হইয়াই বোধ হয় তাঁহাকে সঞ্চয়ী ও মিতব্যয়ী হইতে দেয় নাই। বাস্তবিক, অনেক বিষয়েই বিশ্বনাথের স্বভাব সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় ছিল না। তিনি কল্যকার ভাবনায় কখন ব্যস্ত হইতেন না, পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়াই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন, স্নেহপরায়ণ হইলেও বিদেশে দূরে অবস্থানকালে অনেকদিন পর্যন্ত আত্মীয়-পরিজনের কিছুমাত্র সংবাদ না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন—ঐরূপ অনেক বিষয় তাঁহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী ছিলেন। সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, তাঁহার পিতা সুকণ্ঠ ছিলেন এবং রীতিমত শিক্ষা না করিয়াও নিধুবাবুর টপ্পা প্রভৃতি সুন্দর গাহিতে পারিতেন। সঙ্গীতচর্চাকে নির্দোষ আমোদ বলিয়া ধারণা ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথকে বিদ্যার্জনের সহিত সঙ্গীত শিখিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীও বৈষ্ণব ভিক্ষুক ও রাতভিখারীসকলের ভজনগান একবার-মাত্র শ্রবণ করিয়াই সুর-তাল-লয়ের সহিত সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারিতেন।

খ্রীষ্টান-পুরাণ-বাইবেলপাঠে এবং ফার্সি কবি হাফেজের বয়েৎসকল আবৃত্তি করিতে শ্রীযুত বিশ্বনাথের বিশেষ প্রীতি ছিল। মহামহিম ঈশার পুণ্যচরিতের দুই-এক অধ্যায় তাঁহার নিত্যপাঠ্য ছিল, এবং উহার ও হাফেজের প্রেমগর্ভ কবিতাসকলের কিছু কিছু তিনি নিজ স্ত্রীপুত্রদিগকে কখন কখন শ্রবণ করাইতেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লক্ষ্ণৌ, লাহোর প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান স্থানসকলে কিছুকাল বাস করিয়া তিনি মুসলমানদিগের আচার-ব্যবহারের কিছু কিছুর প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিত্য পলান্নভোজন করার প্রথা বোধ হয় ঐরূপেই তাঁহার পরিবারমধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ একদিকে যেমন ধীর গম্ভীর ছিলেন, আবার তেমনি রঙ্গপ্রিয়

ছিলেন। পুত্রকন্যার মধ্যে কেহ কখন অন্যায় আচরণ করিলে তিনি তাহাকে কঠোর বাক্যে শাসন না করিয়া তাহার ঐরূপ আচরণের কথা তাহার বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট এমনভাবে প্রচার করাইয়া দিতেন, যাহাতে সে আপনিই লজ্জিত হইয়া আর কখনও ঐরূপ করিত না। দৃষ্টান্তস্বরূপে একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ একদিন কোন বিষয় লইয়া মাতার সহিত বচসা করিয়া তাঁহাকে দুই-একটি কটু কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীযুত বিশ্বনাথ তাঁহাকে ঐজন্য কিছুমাত্র তিরস্কার না করিয়া যে গৃহে নরেন্দ্র তাঁহার বয়স্যবর্গের সহিত উঠা-বসা করিতেন, তাহার দ্বারের উপরিভাগে একখণ্ড কয়লা দ্বারা বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছিলেন—'নরেনবাবু তাঁহার মাতাকে অদ্য এই সকল কথা বলিয়াছেন।' নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বয়স্যবর্গ ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে যাইলেই ঐ কথাগুলি তাঁহাদের চক্ষে পড়িত এবং নরেন্দ্র উহাতে অনেকদিন পর্যন্ত নিজ অপরাধের জন্য বিষম সঙ্কোচ অনুভব করিতেন।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ বহু আত্মীয়কে প্রতিপালন করিতেন। অন্নদানে তিনি সর্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। দূরসম্পর্কীয় কেহ কেহ তাঁহার অন্নে জীবনধারণ করিয়া আলস্যে কাল কাটাইত, কেহ কেহ আবার নেশা-ভাঙ্গ খাইয়া জীবনের অবসাদ দূর করিত। নরেন্দ্রনাথ বড় হইয়া ঐ সকল অযোগ্য ব্যক্তিকে দানের জন্য পিতাকে অনেক সময় অনুযোগ করিতেন। শ্রীযুত বিশ্বনাথ তাহাকে বলিতেন, "মনুষ্যজীবন যে কতদূর দুঃখময়, তাহা তুই এখন কি বুঝিবি? যখন বুঝিতে পারিবি, তখন ঐ দুঃখের হস্ত হইতে ক্ষণিক মুক্তির জন্য যাহারা নেশা-ভাঙ্গ করে, তাহাদিগকে পর্যন্ত দয়ার চক্ষে দেখিতে পারিবি!"

বিশ্বনাথের অনেকগুলি পুত্র-কন্যা হইয়াছিল। তাহারা সকলেই অশেষ সদ্‌গুণ-সম্পন্ন ছিল। কন্যাগুলির অনেকেই কিন্তু দীর্ঘজীবন লাভ করে নাই। তিন-চারি কন্যার পরে নরেন্দ্রনাথের জন্ম হওয়ায় তিনি পিতামাতার বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে নরেন্দ্রনাথ যখন বি. এ. পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতা সহসা হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার স্ত্রীপুত্রেরা এককালে নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথের মাতা শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীর মহত্ত্ব-সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি কেবলমাত্র সুরূপা এবং দেবভক্তি-পরায়ণা ছিলেন না, কিন্তু বিশেষ বুদ্ধিমতী এবং কার্যকুশলা ছিলেন। তাঁহার পতির সুবৃহৎ সংসারের সমস্ত কার্যের ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত ছিল। শুনা যায়, তিনি অবলীলাক্রমে উহার সুচারু বন্দোবস্ত করিয়া বয়নাদি শিল্পকার্য সম্পন্ন করিবার মত অবসর করিয়া লইতেন। রামায়ণ-মহাভারতাদি ধর্মগ্রন্থপাঠ ভিন্ন তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা অধিকদূর অগ্রসর না হইলেও নিজ স্বামী ও পুত্রাদির নিকট হইতে তিনি অনেক বিষয় মুখে মুখে এমন শিখিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার সহিত কথা কহিলে তাঁহাকে শিক্ষিতা বলিয়া মনে হইত। তাঁহার স্মৃতি ও ধারণাশক্তি বিশেষ প্রবল ছিল। একবার মাত্র শুনিয়াই তিনি কোন বিষয় আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং বহুপূর্বের কথা ও বিষয়সকল তাঁহার কল্যসংঘটিত ব্যাপারসকলের ন্যায় স্মরণ থাকিত। স্বামীর মৃত্যুর পরে দারিদ্র্যে

পতিতা হইয়া তাঁহার ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণরাজি বিশেষ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সহস্রমুদ্রা ব্যয় করিয়া যিনি প্রতিমাসে সংসার পরিচালনা করিতেন, সেই তাঁহাকে তখন মাসিক ত্রিশ টাকায় আপনার ও নিজ পুত্রগণের ভরণপোষণ নির্বাহ করিতে হইত। কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে একদিনের নিমিত্ত বিষণ্ণ দেখা যাইত না। ঐ স্বল্প আয়েই তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের সকল বন্দোবস্ত এমনভাবে সম্পন্ন করিতেন যে, লোকে দেখিয়া তাঁহার মাসিক ব্যয় অনেক অধিক বলিয়া মনে করিত। বাস্তবিক, পতির সহসা মৃত্যুতে শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী তখন কিরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে হৃদয় অবসন্ন হয়। সংসার নির্বাহের কোনরূপ নিশ্চিত আয় নাই—অথচ তাঁহার সুখপালিতা বৃদ্ধা মাতা ও পুত্রসকলের ভরণপোষণ এবং বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত কোনরূপে নির্বাহ করিতে হইবে—তাঁহার পতির সহায়ে যে-সকল আত্মীয়গণ বেশ দুই পয়সা উপার্জন করিতেছিলেন তাঁহারা সাহায্য করা দূরে থাকুক, সময় পাইয়া তাঁহারা ন্যায্য অধিকারসকলেরও লোপসাধনে কৃতসঙ্কল্প—তাঁহার অশেষসদ্‌গুণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ নানাপ্রকারে চেষ্টা করিয়াও অর্থকর কোনরূপ কাজকর্মের সন্ধান পাইতেছেন না এবং সংসারের উপর বীতরাগ হইয়া চিরকালের নিমিত্ত উহা ত্যাগের দিকে অগ্রসর হইতেছেন—ঐরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিত হইয়াও শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী যেরূপ ধীরস্থিরভাবে নিজ কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভক্তি-শ্রদ্ধার স্বতই উদয় হয়। ঠাকুরের সহিত নরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আলোচনায় আমাদিগকে পরে পাঠকের সম্মুখে তাঁহার এইকালের পারিবারিক অভাব প্রভৃতির কথার উত্থাপন করিতে হইবে। সেজন্য এখানে ঐ বিষয় বিবৃত করিতে আর অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া, আমরা তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয়বার আগমনের কথা এখন পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হই।

নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন

যথার্থ পুরুষকারসম্পন্ন স্থিরলক্ষ্যবিশিষ্ট পুরুষসকলে অপরের মহত্ত্বের পরিচয় পাইলে মুক্তকণ্ঠে উহা স্বীকারপূর্বক প্রাণে অপূর্ব উল্লাস অনুভব করিতে থাকেন। আবার সেই মহত্ত্ব যদি কখন কাহারও মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব অভাবনীয়রূপে প্রকাশিত দেখেন তবে তচ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া তাঁহাদিগের মন কিছুকালের জন্য মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। ঐরূপ হইলেও কিন্তু ঐ ঘটনা তাঁহাদিগকে নিজ গন্তব্যপথ হইতে বিচালত করিয়া ঐ পুরুষের অনুকরণে কখন প্রবৃত্ত করে না। অথবা বহুকালব্যাপী সঙ্গ, সাহচর্য ও প্রেমবন্ধন ব্যতীত তাঁহাদিগের জীবনের কার্যকলাপ ঐ পুরুষের বর্ণে সহসা রঞ্জিত হইয়া উঠে না। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের প্রথম দর্শনলাভ করিয়া নরেন্দ্রনাথের ঠিক ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল। ঠাকুরের অপূর্ব ত্যাগ এবং মন ও মুখের একান্ত ঐক্যদর্শনে মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হইলেও নরেন্দ্রের হৃদয় জীবনের আদর্শরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সহসা সম্মত হয় নাই। সুতরাং বাটীতে ফিরিবার পরে তাঁহার মনে ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব চরিত্র ও আচরণ কয়েক দিন ধরিয়া পুনঃ পুনঃ উদিত হইলেও নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিতে তাঁহার নিকটে পুনরায় গমনের কথা তিনি দূর ভবিষ্যতের গর্ভে ঠেলিয়া রাখিয়া আপন কর্তব্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ঠাকুরকে অর্ধোন্মাদ বলিয়া ধারণা করাই যে তাঁহাকে ঐ বিষয়ে অনেকটা সহায়তা করিয়াছিল, একথা বুঝিতে পারা যায়। আবার, ধ্যানাভ্যাস এবং কলেজে পাঠ ব্যতীত নরেন্দ্র তখন নিত্য সঙ্গীত ও ব্যায়াম-চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন—তদুপরি বয়স্যবর্গের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে তাঁহাদিগকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজের অনুসরণে কলিকাতায় নানাস্থানে প্রার্থনা ও আলোচনা-সমিতিসকল গঠন করিতেছিলেন। সুতরাং সহস্রকর্মে রত নরেন্দ্রনাথের মনে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার কথা কয়েক পক্ষ চাপা পড়িয়া থাকিবে, ইহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দৈনন্দিন কর্ম তাঁহাকে ঐরূপে ভুলাইয়া রাখিলেও তাঁহার স্মৃতি ও সত্যনিষ্ঠা অবসর পাইলেই তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে একাকী গমনপূর্বক নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে উত্তেজিত করিতেছিল। সেজন্যই প্রথম দর্শনের প্রায় মাসাবধি-কাল পরে আমরা শ্রীযুত নরেন্দ্রকে একদিবস একাকী পদব্রজে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরা-ভিমুখে গমন করিতে দেখিতে পাইয়া থাকি। উক্ত দিবসের কথা তিনি পরে এক সময়ে আমাদিগকে যেভাবে বলিয়াছিলেন, আমরা সেইভাবেই উহা এখানে পাঠককে বলিতেছি—

"দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী যে কলিকাতা হইতে এত অধিক দূরে তাহা ইতিপূর্বে গাড়ী করিয়া একবার মাত্র যাইয়া বুঝিতে পারি নাই। বরাহনগরে দাশরথি সান্যাল, সাতকড়ি লাহিড়ী প্রভৃতি বন্ধুদিগের নিকটে পূর্ব হইতে যাতায়াত ছিল। ভাবিয়াছিলাম রাসমণির বাগান তাহাদের বাটীর নিকটেই হইবে, কিন্তু যত যাই পথ যেন আর ফুরাইতে চাহে না! যাহা হউক, জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কোনরূপে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলাম এবং একেবারে ঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি পূর্বের ন্যায় তাঁহার

শয্যাপার্শ্বে অবস্থিত ছোট তক্তাপোশখানির উপর একাকী আপন মনে বসিয়া আছেন—নিকটে কেহই নাই। আমাকে দেখিবামাত্র সাহ্লাদে নিকটে ডাকিয়া উহারই একপ্রান্তে বসাইলেন। বসিবার পরেই কিন্তু দেখিতে পাইলাম, তিনি যেন কেমন একপ্রকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন এবং অস্পষ্টস্বরে আপনা-আপনি কি বলিতে বলিতে স্থির দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে, আমার দিকে সরিয়া আসিতেছেন। ভাবিলাম, পাগল বুঝি পূর্ব দিনের ন্যায় আবার কোনরূপ পাগলামি করিবে। ঐরূপ ভাবিতে না ভাবিতে তিনি সহসা নিকটে আসিয়া নিজ দক্ষিণপদ আমার অঙ্গে সংস্থাপন করিলেন এবং উহার স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে আমার এক অপূর্ব উপলব্ধি উপস্থিত হইল। চক্ষু চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, দেওয়ালগুলির সহিত গৃহের সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে। তখন দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, মনে হইল—আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ সম্মুখে—অতি নিকটে। সামলাইতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ওগো, তুমি আমায় এ'কি করলে, আমার যে বাপ মা আছেন!" অদ্ভুত পাগল আমার ঐ কথা শুনিয়া খলখল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং হস্তদ্বারা আমার বক্ষ স্পর্শ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'তবে এখন থাক্, একেবারে কাজ নাই, কালে হইবে!' আশ্চর্যের বিষয়, তিনি ঐরূপে স্পর্শ করিয়া ঐ কথা বলিবামাত্র আমার সেই অপূর্ব প্রত্যক্ষ এককালে অপনীত হইল; প্রকৃতিস্থ হইলাম, এবং ঘরের ভিতরের ও বাহিরের পদার্থসকলকে পূর্বের ন্যায় অবস্থিত দেখিতে পাইলাম।

"বলিতে এত বিলম্ব হইলেও ঘটনাটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া গেল এবং উহার দ্বারা মনে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এটা কি হইল? দেখিলাম তো উহা এই অদ্ভুত পুরুষের প্রভাবে সহসা উপস্থিত হইয়া সহসা লয় হইল। পুস্তকে Mesmerism (মোহিনী ইচ্ছাশক্তি-সঞ্চারণ) ও Hypnotism (সম্মোহনবিদ্যা) সম্বন্ধে পড়িয়াছিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, উহা কি ঐরূপ কিছু একটা? কিন্তু ঐরূপ সিদ্ধান্তে প্রাণ সায় দিল না। কারণ, দুর্বল মনের উপরেই প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঐসকল অবস্থা আনয়ন করেন; কিন্তু আমি তো ঐরূপ নহি, বরং এতকাল পর্যন্ত বিশেষ বুদ্ধিমান ও মানসিক-বল সম্পন্ন বলিয়া অহঙ্কার করিয়া আসিতেছি। বিশিষ্ট গুণশালী পুরুষের সঙ্গলাভপূর্বক ইতরসাধারণে যেমন মোহিত এবং তাঁহার হস্তের ক্রীড়াপুত্তলিস্বরূপ হইয়া পড়ে, আমি তো ইঁহাকে দেখিয়া সেইরূপ হই নাই; বরং প্রথম হইতেই ইঁহাকে অর্ধোন্মাদ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি। তবে আমার সহসা ঐরূপ হইবার কারণ কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; প্রাণের ভিতর একটা বিষম গোল বাঁধিয়া রহিল। মহাকবির কথা মনে পড়িল—'পৃথিবীতে ও স্বর্গে এমন অনেক তত্ত্ব আছে, মানব-বুদ্ধি-প্রসূত দর্শনশাস্ত্র যাহাদিগের স্বপ্নেও রহস্যভেদের কল্পনা করিতে পারে না।' মনে করিলাম, উহাও ঐরূপ একটা; ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, উহার কথা বুঝিতে পারা যাইবে না। সুতরাং দৃঢ় সংকল্প করিলাম, অদ্ভুত পাগল নিজ প্রভাব বিস্তার

করিয়া আর যেন কখনও ভবিষ্যতে আমার মনের উপর আধিপত্য লাভপূর্বক ঐরূপ ভাবান্তর উপস্থিত করিতে না পারে।

"আবার ভাবিতে লাগিলাম, ইচ্ছামাত্রেই এই পুরুষ যদি আমার ন্যায় প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মনের দৃঢ়সংস্কারময় গঠন ঐরূপে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া কাদার তালের মত করিয়া উহাকে আপন ভাবে ভাবিত করিতে পারেন, তবে ইঁহাকে পাগলই বা বলি কিরূপে? কিন্তু প্রথম দর্শনকালে আমাকে একান্তে লইয়া যাইয়া যেরূপে সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন সেই-সকলকে ইঁহার পাগলামির খেয়াল ভিন্ন সত্য বলিয়া কিরূপে মনে করিতে পারি? সুতরাং পূর্বোক্ত অদ্ভুত উপলব্ধির কারণ যেমন খুঁজিয়া পাইলাম না, শিশুর ন্যায় পবিত্র ও সরল এই পুরুষের সম্বন্ধেও কিছু একটা স্থিরনিশ্চয় করিতে পারিলাম না। বুদ্ধির উন্মেষ হওয়া পর্যন্ত দর্শন, অনুসন্ধান ও যুক্তিতর্কসহায়ে প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে একটা মতামত স্থির না করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই, অদ্য সেই স্বভাবে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রাণে একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। ফলে, মনে পুনরায় প্রবল সংকল্পের উদয় হইল, যেরূপে পারি এই অদ্ভুত পুরুষের স্বভাব ও শক্তির কথা যথাযথভাবে বুঝিতে হইবেই হইবে।

"ঐরূপে নানা চিন্তা ও সংকল্পে সেদিন আমার সময় কাটিতে লাগিল। ঠাকুর কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনার পরে যেন এক ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া গেলেন এবং পূর্ব দিবসের ন্যায় নানাভাবে আমাকে আদর-যত্ন করিয়া খাওয়াইতে ও সকল বিষয়ে বহুকালের পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অতি প্রিয় আত্মীয় বা সখাকে বহুকাল পরে নিকটে পাইলে লোকের যেরূপ হইয়া থাকে, আমার সহিত তিনি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। খাওয়াইয়া, কথা কহিয়া, আদর এবং রঙ্গ-পরিহাস করিয়া তাঁহার যেন আর আশ মিটিতেছিল না। তাঁহার ঐরূপ ভালবাসা ও ব্যবহারও আমার স্বল্প চিন্তার কারণ হয় নাই। ক্রমে অপরাহ্ণ অতীতপ্রায় দেখিয়া আমি তাঁহার নিকটে সেদিনকার মত বিদায় যাচ্ঞা করিলাম। তিনি যেন তাহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া 'আবার শীঘ্র আসিবে, বল' বলিয়া পূর্বের ন্যায় ধরিয়া ব'সলেন। সুতরাং সেদিনও আমাকে পূর্বের ন্যায় আসিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে বাটীতে ফিরিতে হইয়াছিল।"

উহার কতদিন পরে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে পুনরায় আগমন করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। তবে ঠাকুরের ভিতরে পূর্বোক্তরূপ অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইবার পরে, তাঁহাকে জানিবার-বুঝিবার জন্য তাঁহার মনে প্রবল বাসনার উদয় দেখিয়া মনে হয়, এবার দক্ষিণেশ্বরে আসিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। উক্ত আগ্রহই তাঁহাকে যত শীঘ্র সম্ভব ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে উপস্থিত করিয়াছিল, তবে কলেজের অনুরোধে উহা সপ্তাহকাল বিলম্বে হওয়াই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কোন বিষয় অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি মনে একবার জাগিয়া উঠিলে নরেন্দ্রনাথের আহার-বিহার ও বিশ্রামাদির দিকে লক্ষ্য থাকিত না এবং যতক্ষণ না ঐ বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিতেন ততক্ষণ তাঁহার প্রাণে শান্তি হইত না। অতএব ঠাকুরকে জানিবার সম্বন্ধে তাঁহার মন যে এখন ঐরূপ হইবে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। আবার পাছে তাঁহার পূর্বের ন্যায়

ভাবান্তর আসিয়া উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় শ্রীযুত নরেন্দ্র যে নিজ মনকে বিশেষভাবে দৃঢ় ও সতর্ক করিয়া তৃতীয় দিবসে ঠাকুরের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন একথাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঘটনা কিন্তু তথাপি অভাবনীয় হইয়াছিল। ঠাকুরের ও শ্রীযুত নরেন্দ্রের নিকটে তৎসম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহাই এখন পাঠককে বলিতেছি।

দক্ষিণেশ্বরে সেদিন জনতা ছিল বলিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, ঠাকুর ঐদিন নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার সহিত শ্রীযুত যদুলাল মল্লিকের পার্শ্ববর্তী উদ্যানে বেড়াইতে যাইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। যদুলালের মাতা ও তিনি স্বয়ং ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং উদ্যানের প্রধান কর্মচারীর প্রতি তাঁহাদিগের আদেশ ছিল যে, তাঁহারা উপস্থিত না থাকিলেও ঠাকুর যখনই উদ্যানে বেড়াইতে আসিবেন তখনই গঙ্গার ধারের বৈঠকখানা-ঘর তাঁহার বসিবার নিমিত্ত খুলিয়া দিবে। ঐ দিবসেও ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত উদ্যানে ও গঙ্গাতীরে কিছুক্ষণ পরিভ্রমণ করিয়া নানা কথা কহিতে কহিতে ঐ ঘরে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্র অনতিদূরে বসিয়া ঠাকুরের উক্ত অবস্থা স্থিরভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন, এমন সময় ঠাকুর পূর্বদিনের ন্যায় সহসা আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। নরেন্দ্র পূর্ব হইতে সতর্ক থাকিয়াও ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে এককালে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পূর্বদিনের মত না হইয়া উহাতে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইল! কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁহার পুনরায় চৈতন্য হইল তখন দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া মৃদুমধুর হাস্য করিতেছেন!

বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত হইবার পরে শ্রীযুত নরেন্দ্রের ভিতরে সেদিন কিরূপ অনুভব উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে কোন কথা বলেন নাই। আমরা ভাবিয়াছিলাম, বিশেষ রহস্যের কথা বলিয়া তিনি উহা আমাদিগের নিকটে প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর এক দিবস ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, নরেন্দ্রের উহা স্মরণ না থাকিবারই কথা। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

"বাহ্যসংজ্ঞার লোপ হইলে নরেন্দ্রকে সেদিন নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—কে সে, কোথা হইতে আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে (জন্মগ্রহণ করিয়াছে), কতদিন এখানে (পৃথিবীতে) থাকিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেও তদবস্থায় নিজের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঐসকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম ও ভাবিয়াছিলাম তাহার ঐ কালের উত্তরসকল তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছিল। সে-সকল কথা বলিতে নিষেধ আছে। উহা হইতেই কিন্তু জানিয়াছি, সে (নরেন্দ্র) যেদিন জানিতে পারিবে সে কে, সেদিন আর ইহলোকে থাকিবে না, দৃঢ়সংকল্পসহায়ে যোগমার্গে তৎক্ষণাৎ শরীর পরিত্যাগ করিবে। নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ।"

নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুরের ইতিপূর্বে যে-সকল দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু তিনি পরে এক সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। পাঠকের সুবিধার

জন্য উহা আমরা এখানেই বলিতেছি। কারণ, ঠাকুরের নিকট উক্ত দর্শনের কথা শুনিয়া মনে হইয়াছিল, নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বেই তাঁহার ঐ দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

"একদিন দেখিতেছি—মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে ; চন্দ্র-সূর্য-তারকামণ্ডিত স্থূলজগৎ সহজে অতিক্রম করিয়া উহা প্রথমে সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল। ঐ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর স্তরসমূহে উহা যতই আরোহণ করিতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচিত্র মূর্তিসমূহ পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। ক্রমে উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় উহা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিলাম এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান (বেড়া) প্রসারিত থাকিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল, দেখিলাম—সেখানে মূর্তিবিশিষ্ট কেহ বা কিছুই আর নাই, দিব্যদেহধারী দেবদেবীসকলে পর্যন্ত যেন এখানে প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইয়া বহুদূর নিম্নে নিজ নিজ অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম দিব্যজ্যোতিঃঘনতনু সাত জন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইঁহারা মানব তো দূরের কথা দেবদেবীকে পর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া ইঁহাদিগের কথা ও মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্র-বিরহিত, সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হইল। ঐ দেব-শিশু ইঁহাদিগের অন্যতমের নিকটে অবতরণপূর্বক নিজ অপূর্ব সুললিত বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল ; পরে বীণানিন্দিত নিজ অমৃতময়ী বাণী দ্বারা সাদরে আহ্বানপূর্বক সমাধি হইতে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে অশেষ প্রযত্ন করিতে লাগিল। সুকোমল প্রেমস্পর্শে ঋষি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন এবং অর্ধস্তিমিত নির্নিমেষ লোচনে সেই অপূর্ব বালককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের প্রসন্নোজ্জ্বল ভাব দেখিয়া মনে হইল, বালক যেন তাঁহার বহুকালের পূর্বপরিচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেব-শিশু তখন অসীম আনন্দ প্রকাশ-পূর্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিল, 'আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।' ঋষি তাঁহার ঐরূপ অনুরোধে কোন কথা না বলিলেও তাঁহার প্রেমপূর্ণ নয়ন তাঁহার অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল। পরে ঐরূপ সপ্রেম দৃষ্টিতে বালককে কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন বিস্মিত হইয়া দেখি, তাঁহারই শরীর মনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে! নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি।"[১]

---

১ ঠাকুর তাঁহার অপূর্ব সরল ভাষায় উক্ত দর্শনের কথা আমাদিগকে বলিয়া-ছিলেন। সেই ভাষার যথাযথ প্রয়োগ আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অগত্যা তাঁহার ভাষা যথাসাধ্য রাখিয়া আমরা উহা এখানে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম। দর্শনোক্ত দেবশিশু-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা অন্য এক সময়ে জানিয়াছিলাম, ঠাকুর স্বয়ং ঐ শিশুর আকার ধারণ করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, ঠাকুরের অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে নরেন্দ্রের মনে দ্বিতীয়বার ঐরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হওয়াতে তিনি যে এককালে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন একথা বলা বাহুল্য। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, এই দুরতিক্রমণীয় দৈবশক্তির নিকটে তাঁহার মন ও বুদ্ধির শক্তি কতদূর অকিঞ্চিৎকর! ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁহার ইতিপূর্বের অর্ধোন্মাদ বলিয়া ধারণা পরিবর্তিত হইল, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে প্রথম উপস্থিত হইবার দিবসে তিনি তাঁহাকে একান্তে যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, সে-সকলের অর্থ ও উদ্দেশ্য যে এই ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ঠাকুর দেবশক্তিসম্পন্ন অলৌকিক মহাপুরুষ। ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার ন্যায় মানবের মনকে ফিরাইয়া তিনি উচ্চপথে চালিত করিতে পারেন; তবে বোধ হয়, ভগবদিচ্ছার সহিত তাঁহার ইচ্ছা সম্পূর্ণ একীভূত হওয়াতেই সকলের সম্বন্ধে তাঁহার মনে ঐরূপ ইচ্ছার উদয় হয় না; এবং এই অলৌকিক পুরুষের ঐরূপ অযাচিত কৃপালাভ তাঁহার পক্ষে স্বল্প ভাগ্যের কথা নহে।

পূর্বোক্ত মীমাংসায় নরেন্দ্রনাথকে বাধ্য হইয়াই আসিতে হইয়াছিল এবং ইতিপূর্বের অনেকগুলি ধারণাও তাঁহাকে উহার অনুসরণে পরিবর্তিত করিতে হইয়াছিল। আপনার ন্যায় দুর্বল, স্বল্প দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানবকে অধ্যাত্মজগতের পথপ্রদর্শক বা শ্রীগুরুরূপে গ্রহণ করিতে এবং নির্বিচারে তাঁহার সকল কথা-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে ইতিপূর্বে তাঁহার একান্ত আপত্তি ছিল। ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ ধারণা সমধিক পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, একথা বলিতে হইবে না। পূর্বোক্ত দুই দিবসের ঘটনার ফলে তাঁহার ঐ ধারণা বিষম আঘাতপ্রাপ্ত হইল। তিনি বুঝিলেন, বিরল হইলেও সত্য সত্যই এমন মহাপুরুষসকল সংসারে জন্মপরিগ্রহ করেন যাঁহাদিগের অলৌকিক ত্যাগ, তপস্যা, প্রেম ও পবিত্রতা সাধারণ মানবের ক্ষুদ্র মনবুদ্ধিপ্রসূত ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণাকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া থাকে,—সুতরাং ইঁহাদিগকে গুরুরূপে গ্রহণ করিলে তাহাদিগের মঙ্গল সাধিত হয়। ফলতঃ, ঠাকুরকে গুরুরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেও তিনি নির্বিচারে তাঁহার সকল কথা গ্রহণে এখনও সম্মত হয়েন নাই।

ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হয় না, পূর্বসংস্কারবশতঃ এই ধারণা নরেন্দ্রনাথের মনে বাল্যকাল হইতেই প্রবল ছিল। তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইলেও তন্মধ্যগত দাম্পত্য-জীবনসংস্কার সম্বন্ধীয় সভা-সমিতিতে যোগদানে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। সর্বস্বত্যাগী ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও অপূর্ব শক্তির পরিচয়লাভে তাঁহাতে উক্ত ত্যাগের ভাব এখন হইতে বিশেষরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা একটি বিষয় এখন হইতে শ্রীযুত নরেন্দ্রের চিন্তার বিষয় হইল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এরূপ শক্তিশালী মহাপুরুষের সংস্রবে আসিয়া মানব-মন অর্ধ-পরীক্ষা, অথবা পরীক্ষা না করিয়াই, তাঁহার সকল কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বসে। উহা হইতে আপনাকে বাঁচাইতে হইবে। সেজন্য পূর্বোক্ত দুই দিবসের ঘটনায় ঠাকুরের প্রতি তাঁহার মনে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধার উদয় হইলেও তিনি এখন হইতে দৃঢ়সংকল্প করিয়াছিলেন যে, বিশেষ পরীক্ষাপূর্বক স্বয়ং অনুভব বা প্রত্যক্ষ না করিয়া তাঁহার অদ্ভুত দর্শন-সম্বন্ধীয় কোন কথা কখন গ্রহণ করিবেন না, ইহাতে তাঁহার অপ্রিয়ভাজন হইতে হয় তাহাও স্বীকার। সুতরাং আধ্যাত্মিক জগতের অভিনব

অদৃষ্টপূর্ব তত্ত্বসকল গ্রহণ করিবার জন্য মনকে সর্বদা প্রস্তুত রাখিতে একদিকে তিনি যেমন যত্নশীল হইয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনি আবার ঠাকুরের প্রত্যেক অদ্ভুত দর্শন ও ব্যবহারের কঠোর বিচারে আপনাকে এখন হইতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে ইহা সহজেই প্রতিভাত হইয়াছিল যে, প্রথম দিবসের যে-সকল কথার জন্য তিনি ঠাকুরকে অর্ধোন্মাদ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিলেই কেবলমাত্র সেই সকল কথার অর্থবোধ হয়। কিন্তু তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসু যুক্তিপরায়ণ মন ঐ কথা সহসা স্বীকার করে কিরূপে? সুতরাং ঈশ্বর যদি কখন তাঁহাকে ঐ সকল কথা বুঝিবার সামর্থ্য প্রদান করেন তখন উহাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া তিনি উহাদিগের সম্বন্ধে একটা মতামত স্থির করিতে অগ্রসর না হইয়া, কেমন করিয়া ঈশ্বর-দর্শন করিয়া স্বয়ং কৃতকৃতার্থ হইবেন, এখন হইতে ঠাকুরের নিকট আগমনপূর্বক তদ্বিষয় শিক্ষা ও আলোচনা করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তেজস্বী মন কোনরূপ নূতনত্ব গ্রহণকালে নিজ পূর্বমতের পরিবর্তন করিতে আপনার ভিতরে একটা প্রবল বাধা অনুভব করিতে থাকে। নরেন্দ্রনাথেরও এখন ঠিক ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ঠাকুরের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়াও তাঁহাকে সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না, এবং আকৃষ্ট অনুভব করিয়াও তাহা হইতে দূরে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার ঐরূপ চেষ্টার ফলে কতদূর কি দাঁড়াইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ

আমরা বলিয়াছি, অদ্ভুত পুণ্যসংস্কারসমূহ লইয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেজন্য অপর সাধারণ হইতে ভিন্ন ভাবের প্রত্যক্ষসকল তাঁহার জীবনে নানা বিষয়ে ইতিপূর্বেই উপস্থিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপে ঐরূপ কয়েকটির উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। নরেন্দ্র বলিতেন—"আজীবন, নিদ্রা যাইব বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ভ্রূমধ্যভাগে এক অপূর্ব জ্যোতির্বিন্দু দেখিতে পাইতাম এবং একমনে উহার নানারূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে থাকিতাম। উহা দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া লোকে যেভাবে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করে, আমি সেইভাবে শয্যায় শয়ন করিতাম। ঐ অপূর্ব বিন্দু নানাবর্ণে পরিবর্তিত ও বর্ধিত হইয়া ক্রমে বিম্বাকারে পরিণত হইত এবং পরিশেষে ফাটিয়া যাইয়া আপাদমস্তক শুভ্র-তরল জ্যোতিতে আবৃত করিয়া ফেলিত!—ঐরূপ হইবামাত্র চেতনালুপ্ত হইয়া নিদ্রাভিভূত হইতাম! আমি জানিতাম, ঐরূপেই সকলে নিদ্রা যায়। বহুকাল পর্যন্ত ঐরূপ ধারণা ছিল। বড় হইয়া যখন ধ্যানাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম তখন চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ঐ জ্যোতির্বিন্দু প্রথমেই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং উহাতেই চিত্ত একাগ্র করিতাম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশে কয়েকজন বয়স্যের সহিত যখন নিত্য ধ্যানাভ্যাস করিতে লাগিলাম, তখন ধ্যান করিবার কালে কাহার কিরূপ দর্শন ও উপলব্ধি উপস্থিত হইল, পরস্পরে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতাম। ঐ সময়ে তাহাদিগের কথাতেই বুঝিয়াছিলাম, ঐরূপ জ্যোতিদর্শন তাহাদিগের কখনও হয় নাই এবং তাহাদিগের কেহই আমার ন্যায় পূর্বোক্ত ভাবে নিদ্রা যায় না!

"আবার বাল্যকাল হইতে সময়ে সময়ে কোন বস্তু, ব্যক্তি বা স্থানবিশেষ দেখিবামাত্র মনে হইত উহাদিগের সহিত আমি বিশেষ পরিচিত, ইতিপূর্বে কোথায় উহাদিগকে দেখিয়াছি। স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতাম, কিছুতেই মনে আসিত না—কিন্তু কোনমতে ধারণা হইত না যে উহাদিগকে ইতিপূর্বে দেখি নাই! প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ঐরূপ হইত। হয়তো, বয়স্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কোন স্থানে নানা বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে এমন সময় তাহাদিগের মধ্যে একজন একটা কথা বলিল, অমনি সহসা মনে হইল—তাই তো এই গৃহে, এই সকল ব্যক্তির সহিত, এই বিষয় লইয়া আলাপ যে ইতিপূর্বে করিয়াছি এবং তখনও যে এই ব্যক্তি এইরূপ কথা বলিয়াছিল! কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুতেই স্থির করিতে পারিতাম না—কোথায়, কবে ইহাদিগের সহিত ইতিপূর্বে এইরূপ আলাপ হইয়াছিল। পুনর্জন্মবাদের বিষয় যখন অবগত হইলাম তখন ভাবিয়াছিলাম, তবে বুঝি জন্মান্তরে ঐসকল দেশ ও পাত্রের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম, এবং তাহারই আংশিক স্মৃতি কখন কখন আমার অন্তরে ঐরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। পরে বুঝিয়াছি, ঐ বিষয়ের ঐরূপ মীমাংসা যুক্তিযুক্ত নহে। এখন[১] মনে হয়, ইহজন্মে যে-সকল বিষয় ও ব্যক্তির সহিত আমাকে পরিচিত হইতে

---

১ এই অদ্ভুত প্রত্যক্ষের কথা শ্রীযুত নরেন্দ্র তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরেই আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, এবং শেষ জীবনে তিনি উহার সম্বন্ধে এইরূপ কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন।

হইবে, জন্মিবার পূর্বে সেই সকলকে চিত্রপরম্পরায় আমি কোনরূপে দেখিতে পাইয়াছিলাম এবং উহারই স্মৃতি, জন্মিবার পরে, আমার অন্তরে আজীবন সময়ে সময়ে উদিত হইয়া থাকে।"

ঠাকুরের পবিত্র জীবন এবং সমাধিস্থ হইবার কথা নানা লোকের[১] নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কোনরূপ অবস্থান্তর বা অদ্ভুত প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইবে, একথা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। ঘটনা কিন্তু অন্যরূপ দাঁড়াইল। দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে আগমন করিয়া উপর্যুপরি দুই দিন তাঁহার যেরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইল তাহার তুলনায় তাঁহার পূর্বপরিদৃষ্ট প্রত্যক্ষসকল নিতান্ত ম্লান ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং তাহার ইয়ত্তা করিতে তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি পরাভব স্বীকার করিল। সুতরাং ঠাকুরের বিষয় অনুধাবন করিতে যাইয়া তিনি এখন বিষম সমস্যায় পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, ঠাকুরের অচিন্ত্য দৈবশক্তি-সহায়েই যে তাঁহার ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এ বিষয়ে সংশয় করিবার তিনি বিন্দুমাত্র কারণও অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হন নাই, এবং মনে মনে ঐ বিষয়ে যতই আলোচনা করিয়াছিলেন ততই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

বাস্তবিক ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথের সহসা যেরূপ অদ্ভুত প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। শাস্ত্র বলেন, স্বল্পশক্তিসম্পন্ন সামান্য-অধিকারী মানবের জীবনে ঐরূপ প্রত্যক্ষ বহুকালের ত্যাগ ও তপস্যায়

---

১ আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে শ্রীযুত নরেন্দ্র কলিকাতার জেনারেল এসেম্‌ব্লিস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন নামক বিদ্যালয় হইতে এফ. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। উদারচেতা সুপণ্ডিত হেষ্টি সাহেব তখন উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। সাহেবের বহুমুখী প্রতিভা, পবিত্র জীবন এবং ছাত্রদিগের সহিত সরল সপ্রেম আচরণের জন্য নরেন্দ্রনাথ ইঁহাকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। সাহিত্যের অধ্যাপক সহসা অসুস্থ হইয়া পড়ায় হেষ্টি সাহেব একদিন এফ.এ. ক্লাসের ছাত্রবৃন্দকে সাহিত্য অধ্যয়ন করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুভবে উক্ত কবির ভাবসমাধি হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ সমাধির কথা বুঝিতে না পারায় তিনি তাহাদিগকে উক্ত অবস্থার কথা যথাবিধি বুঝাইয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, "চিত্তের পবিত্রতা ও বিষয়বিশেষে একাগ্রতা হইতে উক্ত অবস্থার উদয় হইয়া থাকে; ঐ প্রকার অবস্থার অধিকারী ব্যক্তি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়—একমাত্র দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আজকাল ঐরূপ অবস্থা হইতে দেখিয়াছি—তাঁহার উক্ত অবস্থা একদিন দর্শন করিয়া আসিলে তোমারা এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। ঐরূপে হেষ্টি সাহেবের নিকট হইতে শ্রীযুত নরেন্দ্র ঠাকুরের কথা প্রথম শ্রবণ করিবার পরে সুরেন্দ্রনাথের আলয়ে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। আবার ব্রাহ্মসমাজে ইতিপূর্বে গতিবিধি থাকায় তিনি ঠাকুরের কথা ঐস্থানেও শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

বিরল উপস্থিত হয় এবং কোনরূপে একবার উপস্থিত হইলে শ্রীগুরুর ভিতরে ঈশ্বর-প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া মোহিত হইয়া সে এককালে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। নরেন্দ্র যে ঐরূপ করেন নাই—ইহা স্বল্প বিস্ময়ের কথা নহে ; এবং উহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় তিনি আধ্যাত্মিক জগতে কতদূর উচ্চ অধিকারী ছিলেন। অতি উচ্চ আধার ছিলেন বলিয়াই ঐ ঘটনায় তিনি এককালে আত্মহারা হইয়া পড়েন নাই, এবং সংযত থাকিয়া ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র ও আচরণের পরীক্ষা ও কারণ নির্ণয়ে আপনাকে বহুকাল পর্যন্ত নিযুক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অভিভূত না হইলেও এবং এককালে বশ্যতা স্বীকার না করিলেও, তিনি এখন হইতে ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে অকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথম সাক্ষাতের দিবস হইতে ঠাকুরও অন্যপক্ষে নরেন্দ্রনাথের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। অপরোক্ষবিজ্ঞানসম্পন্ন মহানুভব গুরু সুযোগ্য শিষ্যকে দেখিবামাত্র আপনার সমুদয় জীবন-প্রত্যক্ষ তাহার অন্তরে ঢালিয়া দিবার আকুল আগ্রহে যেন এককালে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে গভীর আগ্রহের পরিমাণ হয় না, সে স্বার্থগন্ধশূন্য অহেতুক অধৈর্য, পূর্ণসংযত-আত্মারাম গুরুগণের হৃদয়ে কেবলমাত্র দৈব প্রেরণাতেই উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐরূপ প্রেরণাবশেই জগদ্গুরু মহাপুরুষগণ উত্তম অধিকারী শিষ্যকে দেখিবামাত্র অভয় ব্রহ্মজ্ঞ-পদবীতে আরূঢ় করাইয়া তাহাকে আপ্তকাম ও পূর্ণ করিয়া থাকেন।[১]

নরেন্দ্রনাথ যেদিন দক্ষিণেশ্বরে একাকী আগমন করেন, ঠাকুর যে ঐ দিন তাঁহাকে এককালে সমাধিস্থ করিয়া ব্রহ্মপদবীতে আরূঢ় করাইতে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই। কারণ, উহার তিন-চারি বৎসর পরে শ্রীযুত নরেন্দ্র যখন সম্পূর্ণরূপে ঠাকুরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং নির্বিকল্প সমাধি-লাভের জন্য ঠাকুরের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর তাঁহাকে আমাদিগের সম্মুখে অনেক সময় বলিতেন, "কেন ? তুই যে তখন বলিয়াছিলি তোর বাপ-মা আছে, তাদের সেবা করিতে হইবে ?" আমার কখন বা বলিতেন, "দেখ,একজন মরিয়া ভূত হইয়াছিল। অনেককাল একাকী থাকায় সঙ্গীর অভাব অনুভব করিয়া সে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কোন স্থানে মরিয়াছে শুনলেই সে সেখানে ছুটিয়া যাইত। ভাবিত, এইবার বুঝি তার একজন সঙ্গী জুটিবে। কিন্তু দেখিত, মৃতব্যক্তি গাঙ্গবারি-স্পর্শে বা অন্য কোন উপায়ে উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিয়া সে পুনরায় পূর্বের ন্যায় একাকী কালযাপন করিত। ঐরূপে সে ভূতের সঙ্গীর অভাব আর কিছুতেই ঘুচে নাই। আমারও ঠিক ঐরূপ দশা হইয়াছে। তোকে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম এইবার বুঝি আমারও একটি সঙ্গী জুটিল—কিন্তু তুইও বললি, তোর বাপ-মা আছে। কাজেই আমারও আর সঙ্গী পাওয়া হইল না।" ঐরূপে ঐ দিবসের ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর অতঃপর নরেন্দ্রনাথের সহিত অনেক সময় রঙ্গ-পরিহাস করিতেন।

১ শাস্ত্রে ইহা শাম্ভবী দীক্ষা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। শাম্ভবী দীক্ষার বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'গুরুভাব, উত্তরার্ধ—৪র্থ অধ্যায়' দ্রষ্টব্য।

সে যাহা হউক, সমাধিস্থ হইবার উপক্রমে নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হইতে দেখিয়া ঠাকুর সেদিন যেরূপে নিরস্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। ঘটনা ঐরূপ হওয়ায় নরেন্দ্রের সম্বন্ধে ইতিপূর্বে তিনি যাহা দর্শন ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ঠাকুরের সন্দিহান হওয়া বিচিত্র নহে। আমাদিগের অনুমান, সেইজন্যই তিনি নরেন্দ্র তৃতীয় দিবস দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলে শক্তিবলে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া তাঁহার জীবন সম্বন্ধে নানা রহস্যকথা তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইয়াছিলেন এবং নিজ প্রত্যক্ষসকলের সহিত উহাদিগের ঐক্য দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। উক্ত অনুমান সত্য হইলে ইহাই বুঝিতে হয় যে, নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া পূর্বোক্ত দুই দিবসে একই প্রকারের সমাধি-অবস্থা লাভ করেন নাই। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত দুই দিবসে তাঁহার দুই বিভিন্ন প্রকারের উপলব্ধি উপস্থিত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথকে পূর্বোক্তভাবে পরীক্ষা করিয়া ঠাকুর একভাবে নিশ্চিন্ত হইলেও, তাঁহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন বলিতে পারা যায় না। কারণ, তিনি দেখিয়াছিলেন, যে-সকল গুণ বা শক্তিপ্রকাশের মধ্যে একটির বা দুইটির মাত্র অধিকারী হইয়া মানব সংসারে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল প্রতিপত্তি লাভ করে, নরেন্দ্রনাথের অন্তরে ঐরূপ আঠারটি শক্তি প্রকাশ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, এবং ঈশ্বর, জগৎ ও মানব-জীবনের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে চরম-সত্য উপলব্ধি করিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র উহাদিগকে সম্যক্‌রূপে আধ্যাত্মিক পথে নিযুক্ত করিতে না পারিলে ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে। ঠাকুর বলিতেন, ঐরূপ হইলে নরেন্দ্র অন্য সকল নেতাদিগের ন্যায় এক নবীন মত ও দলের সৃষ্টিমাত্র করিয়া জগতে খ্যাতিলাভ করিয়া যাইবে ; কিন্তু বর্তমান যুগ-প্রয়োজন পূর্ণ করিবার জন্য যে উদার আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপলব্ধি ও প্রচার আবশ্যক, তাহা প্রত্যক্ষ করা এবং উহার প্রতিষ্ঠাকল্পে সহায়তা করিয়া জগতের যথার্থ কল্যাণসাধন করা তাহার দ্বারা সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং নরেন্দ্র যাহাতে স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার সদৃশ আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকলের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারে, সেজন্য এখন হইতে ঠাকুরের প্রাণে অসীম আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর সর্বদা বলিতেন —গেঁড়ে, ডোবা প্রভৃতি যে-সকল জলাধারে স্রোত নাই সেখানেই যেমন দল বা নানারূপ উদ্ভিজ্জ-দামের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতে যেখানে আংশিক সত্যমাত্রকে মানব পূর্ণ সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসে, সেখানেই দল বা গণ্ডিনিবদ্ধ সম্প্রদায়সকলের উদয় হইয়া থাকে। অসাধারণ মেধা ও মানসিক-গুণসম্পন্ন নরেন্দ্রনাথ বিপথে গমন করিয়া পাছে ঐরূপ করিয়া বসেন, এই ভয়ে ঠাকুর কতরূপে তাঁহাকে পূর্ণসত্যের অধিকারী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইবার প্রথম হইতেই ঠাকুর নানা কারণে তাঁহার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন এবং যতদিন না তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নরেন্দ্রের আর পূর্বোক্তভাবে বিপথে গমন করিবার সম্ভাবনা নাই, ততদিন পর্যন্ত উক্ত আকর্ষণ তাঁহাতে সহজ স্বাভাবিক ভাব ধারণ করে নাই। ঐসকল কারণের অনুধাবনে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়, উহাদের কতকগুলি নরেন্দ্রনাথের

সম্বন্ধে ঠাকুরের নিজ অদ্ভুত দর্শনসমূহ হইতে সম্ভূত হইয়াছিল এবং অবশিষ্টগুলি, পাছে নরেন্দ্র কালধর্মপ্রভাবে দারৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা প্রভৃতি কোনরূপ বন্ধনকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার মহৎ জীবনের চরমলক্ষ্যসাধনে আংশিকভাবে অসমর্থ হন, এই ভয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল।

বহুকালব্যাপী ত্যাগ ও তপস্যার ফলে ক্ষুদ্র 'অহং মম'-বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হওয়ায় জগৎ-কারণের সহিত নিত্য অদ্বৈতভাবে অবস্থিত ঠাকুর ঈশ্বরের জনকল্যাণ-সাধনরূপ কর্মকে আপনার বলিয়া অনুক্ষণ উপলব্ধি করিতেছিলেন। উহারই প্রভাবে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল যে, বর্তমান যুগের ধর্মগ্লানি-নাশ-রূপ সুমহৎ কার্য তাঁহার শরীর-মনকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া সাধিত হয়, ইহাই বিরাটেচ্ছার অভিপ্রেত। আবার উহারই প্রভাবে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র স্বার্থসুখসাধনের জন্য শ্রীযুত নরেন্দ্র জন্মপরিগ্রহ করেন নাই, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগে পূর্বোক্ত জনকল্যাণ-সাধনরূপ কর্মে তাঁহাকে সহায়তা করিতেই আগমন করিয়াছেন। সুতরাং স্বার্থশূন্য নিত্যমুক্ত নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার পরমাত্মীয় বলিয়া বোধ হইবে এবং তাঁহার প্রতি তিনি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইবেন, ইহাতে বিচিত্র কি? অতএব আপাতদৃষ্টিতে নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের আকর্ষণ দেখিয়া বিস্ময়ের উদয় হইলেও, উহা যে স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী তাহা স্বল্পচিন্তার ফলেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রথম দর্শনের দিন হইতেই ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কতদূর নিকট-আত্মীয় জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং কিরূপ তন্ময়ভাবে ভালবাসিয়াছিলেন তাহার আভাস প্রদান করা একপ্রকার সাধ্যাতীত বলিয়া আমাদিগের মনে হইয়া থাকে। সংসারী মানব যে-সকল কারণে অপরকে আপনার জ্ঞান করিয়া হৃদয়ের ভালবাসা অর্পণ করিয়া থাকে, তাহার কিছুমাত্র এখানে বর্তমান ছিল না; কিন্তু নরেন্দ্রের বিরহে এবং মিলনে ঠাকুরের যেরূপ ব্যাকুলতা এবং উল্লাস দর্শন করিয়াছি তাহার বিন্দুমাত্রেরও দর্শন অন্যত্র কোথাও আমাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। নিষ্কারণে একজন অপরকে সে এতদূর ভালবাসিতে পারে, ইহা আমাদিগের ইতিপূর্বে জ্ঞান ছিল না। নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের অদ্ভুত প্রেম দর্শন করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছে, কালে সংসারে এমন দিন আসিবে যখন মানব মানবের মধ্যে ঈশ্বরপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া সত্য সত্যই ঐরূপ নিষ্কারণে ভালবাসিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে।

ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রের আগমনের কিছুকাল পরে স্বামী প্রেমানন্দ দক্ষিণেশ্বরে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে সপ্তাহ বা কিঞ্চিদধিক কাল দক্ষিণেশ্বরে আসিতে না পারায় ঠাকুর তাঁহার জন্য কিরূপ উৎকণ্ঠিতচিত্তে তখন অবস্থান করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে তিনি মোহিত হইয়া ঐ বিষয় আমাদের নিকট অনেকবার কীর্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত হাটখোলার ঘাটে নৌকায় উঠিতে যাইয়া ঐদিন রামদয়ালবাবুকে তথায় দেখিতে পাইলাম। তিনিও দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন জানিয়া আমরা একত্রেই এক নৌকায় উঠিলাম এবং প্রায় সন্ধ্যার সময় রানী রাসমণির কালীবাটীতে পৌঁছিলাম। ঠাকুরের ঘরে আসিয়া শুনিলাম, তিনি মন্দিরে ৺জগদম্বাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাদিগকে ঐস্থানে অপেক্ষা

করিতে বলিয়া তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে ধারণ করিয়া 'এখানটায় সিঁড়ি, উঠিতে হইবে —এখানটায় নামিতে হইবে' ইত্যাদি বলিতে বলিতে লইয়া আসিতেছেন, দেখিতে পাইলাম। ইতিপূর্বেই তাঁহার ভাববিভোর হইয়া বাহ্যসংজ্ঞা হারাইবার কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এজন্য ঠাকুরকে এখন ঐরূপে মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে আসিতে দেখিয়া বুঝিলাম তিনি ভাবাবেশে রহিয়াছেন। ঐরূপে গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি ছোট তক্তাপোশখানির উপর উপবেশন করিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসাপূর্বক আমার মুখ ও হস্ত-পদাদির লক্ষণপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কনুই হইতে অঙ্গুলি পর্যন্ত আমার হাতখানির ওজন পরীক্ষা করিবার জন্য কিছুক্ষণ নিজহস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন, 'বেশ'। ঐরূপে কি বুঝিলেন, তাহা তিনিই জানেন। উহার পরে রামদয়ালবাবুকে শ্রীযুত নরেন্দ্রের শারীরিক কল্যাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি ভাল আছেন জানিয়া বলিলেন, 'সে অনেকদিন এখানে আসে নাই, তাহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে, একবার আসিতে বলিও।'

"ধর্মবিষয়ক নানা কথাবার্তায় কয়েক ঘণ্টা বিশেষ আনন্দে কাটিল। ক্রমে দশটা বাজিবার পরে আমরা আহার করিলাম এবং ঠাকুরের ঘরের পূর্বদিকে—উঠানের উত্তরে যে বারাণ্ডা আছে তথায় শয়ন করিলাম। ঠাকুর এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্য ঘরের ভিতরেই শয্যা প্রস্তুত হইল। শয়ন করিবার পরে এক ঘণ্টাকাল অতীত হইতে-না-হইতে ঠাকুর পরিধেয় বস্ত্রখানি বালকের ন্যায় বগলে ধারণ করিয়া ঘরের বাহিরে আমাদিগের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া রামদয়ালবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ওগো, ঘুমুলে ?' আমরা উভয়ে শশব্যস্তে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, 'আজ্ঞে না।' উহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'দেখ, নরেন্দ্রের জন্য প্রাণের ভিতরটা যেন গামছা-নিংড়াবার মত জোরে মোচড় দিচ্ছে ; তাকে একবার দেখা করে যেতে বোলো ; সে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ ; তাকে মাঝে মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না।' রামদয়ালবাবু কিছুকাল পূর্ব হইতেই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেছিলেন, সেজন্য ঠাকুরের বালকের ন্যায় স্বভাবের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি ঠাকুরের ঐরূপ বালকের ন্যায় আচরণ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন, এবং রাত্রি পোহাইলেই নরেন্দ্রের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে আসিতে বলিবেন ইত্যাদি নানা কথা কহিয়া ঠাকুরকে শান্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে রাত্রে ঠাকুরের সেই ভাবের কিছুমাত্র প্রশমন হইল না। আমাদিগের বিশ্রামের অভাব হইতেছে বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য নিজ শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলেও, পরক্ষণেই ঐকথা ভুলিয়া আমাদিগের নিকটে পুনরায় আগমনপূর্বক নরেন্দ্রের গুণের কথা এবং তাহাকে না দেখিয়া তাঁহার প্রাণে যে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকরুণভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরূপ কাতরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইঁহার কি অদ্ভুত ভালবাসা এবং যাহার জন্য ইনি ঐরূপ করিতেছেন সে ব্যক্তি কি কঠোর। সেই রাত্রি ঐরূপে আমাদিগের অতিবাহিত হইয়াছিল। পরে রজনী প্রভাত হইলে মন্দিরে যাইয়া

৺জগদম্বাকে দর্শন করিয়া ঠাকুরের চরণে প্রণত হইয়া বিদায়গ্রহণপূর্বক আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।"

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে আমাদিগের জনৈক বন্ধু[১] দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নরেন্দ্রনাথ অনেকদিন আসেন নাই বলিয়া ঠাকুর বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বলেন, "সেদিন ঠাকুরের মন যেন নরেন্দ্রময় হইয়া রহিয়াছে, মুখে নরেন্দ্রের গুণানুবাদ ভিন্ন অন্য কথা নাই! আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দেখ, নরেন্দ্র শুদ্ধসত্ত্বগুণী; আমি দেখিয়াছি সে অখণ্ডের ঘরের চারিজনের একজন এবং সপ্তর্ষির একজন; তাহার কত গুণ তাহার ইয়ত্তা হয় না!'—বলিতে বলিতে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য এককালে অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং পুত্রবিরহে মাতা যেরূপ কাতর হন সেইরূপে অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। পরে কিছুতেই আপনাকে সংযত করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া এবং আমরা তাঁহার এরূপ ব্যবহারে কি ভাবিব মনে করিয়া ঘরের উত্তর দিকে বারাণ্ডায় দ্রুতপদে চলিয়া যাইলেন, এবং 'মাগো, আমি তাকে না দেখে আর থাকতে পারি না,' ইত্যাদি রুদ্ধস্বরে বলিতে বলিতে বিষম ক্রন্দন করিতেছেন, শুনিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে আপনাকে কতকটা সংযত করিয়া তিনি গৃহমধ্যে আমাদিগের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া কাতর-করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'এত কাঁদলাম, কিন্তু নরেন্দ্র তো এল না; তাকে একবার দেখবার জন্য প্রাণে বিষম যন্ত্রণা হচ্ছে, বুকের ভিতরটায় যেন মোচড় দিচ্চে; কিন্তু আমার এই টানটা সে কিছু বুঝে না'—এইরূপ বলিতে বলিতে আবার অস্থির হইয়া তিনি গৃহের বাহিরে চলিয়া যাইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বুড়ো মিন্‌সে, তার জন্য এইরূপে অস্থির হয়েছি ও কাঁদচি দেখে লোকেই বা কি বলবে, বল দেখি? তোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে লজ্জা হয় না, কিন্তু অপরে দেখে কি ভাববে, বল দেখি? কিন্তু কিছুতেই সামলাতে পাচ্চি না!' নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া রহিলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম নিশ্চয়ই নরেন্দ্র দেবতুল্য পুরুষ হইবেন, নতুবা তাঁহার প্রতি ঠাকুরের এত টান কেন? পরে ঠাকুরকে শান্ত করিবার জন্য বলিতে লাগিলাম, 'তাই তো মহাশয়, তার ভারি অন্যায়, তাকে না দেখে আপনার এত কষ্ট হয়—একথা জেনেও সে আসে না!' এই ঘটনার কিছুকাল পরে অন্য এক দিবসে ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের বিরহে ঠাকুরকে যেমন অধীর দেখিয়াছি তাঁহার সহিত মিলনে আবার তাঁহাকে তেমনি উল্লসিত হইতে দেখিয়াছি। পূর্বোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুরের জন্মতিথি দিবসে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ভক্তগণ সেদিন তাঁহাকে নূতন বস্ত্র, সচন্দন-পুষ্প-মাল্যাদি পরাইয়া মনোহর সাজে সাজাইয়াছিল। তাঁহার ঘরের পূর্বে, বাগানের দিকের বারাণ্ডায় কীর্তন হইতেছিল। ঠাকুর ভক্তগণপরিবৃত হইয়া উহা শুনিতে শুনিতে কখন কিছুক্ষণের জন্য ভাবাবিষ্ট হইতেছিলেন, কখন বা এক একটি মধুর আঁখর দিয়া কীর্তন জমাইয়া দিতেছিলেন; কিন্তু নরেন্দ্র না আসায় তাঁহার আনন্দের ব্যাঘাত হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে চারিদিকে

১ শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল

দেখিতেছিলেন এবং আমাদিগকে বলিতেছিলেন, 'তাই তো নরেন্দ্র আসিল না।' বেলা প্রায় দুই প্রহর, এমন সময়ে নরেন্দ্র আসিয়া সভামধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঠাকুর একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া তাঁহার স্কন্ধে বসিয়া গভীর ভাবাবিষ্ট হইলেন। পরে সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত কথায় ও তাঁহাকে আহারাদি করাইতে ব্যাপৃত হইলেন। সেদিন তাঁহার আর কীর্তন শুনা হইল না।"

ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র যে দেবদুর্লভ প্রেমের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। উহাতে অবিচলিত থাকিয়া তিনি যে যথার্থ সত্যলাভের আশায় ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া লইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, সত্যানুরাগ তাঁহার ভিতরে কতদূর প্রবল ছিল। অন্যপক্ষে ঠাকুর যে নরেন্দ্রের ঐরূপ ভাবে ক্ষুণ্ণ না হইয়া শিষ্যের কল্যাণের নিমিত্ত পরীক্ষা প্রদানপূর্বক তাঁহাকে আধ্যাত্মিক সকল বিষয় উপলব্ধি করাইয়া দিতে পরম আহ্লাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার নিরভিমানিত্ব এবং মহানুভবত্বের কথা অনুধাবন করিয়া বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ঐরূপে নরেন্দ্রের সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধের কথা আমরা যতই আলোচনা করিব ততই একপক্ষে পরীক্ষা করিয়া লইবার এবং অন্যপক্ষে পরীক্ষা প্রদানপূর্বক উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল উপলব্ধি করাইয়া দিবার আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইব, এবং বুঝিতে পারিব, যথার্থ গুরু উচ্চ অধিকারী ব্যক্তির ভাব রক্ষা করিয়া কিরূপে শিক্ষাদানে অগ্রসর হন ও পরিণামে কিরূপে তাহার হৃদয়ে চিরকালের নিমিত্ত শ্রদ্ধা ও পূজার স্থল অধিকার করিয়া বসেন।

ঠাকুরের ভক্তসঙ্ঘ ও নরেন্দ্রনাথ

ঠাকুর যোগদৃষ্টিসহায়ে যে-সকল ভক্তের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কথা বহু পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা সকলেই ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ অতীত হইবার পূর্বে তাঁহার নিকটে আগমন করিয়াছিল। কারণ, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে পূর্ণ তাঁহার নিকটে আসিয়াছিল এবং তাঁহাকে কৃপা করিবার পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "এখানে আসিবে বলিয়া যাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম, পূর্ণের আগমনে সেই শ্রেণীর ভক্তসকলের আসা সম্পূর্ণ হইল ; অতঃপর ঐ শ্রেণীর আর কেহ এখানে আসিবে না।"

পূর্বোক্ত শ্রেণীর ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই আবার ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগের ভিতরে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। নরেন্দ্র তখন সাংসারিক অভাব-অনটনের সহিত সংগ্রামে ব্যস্ত এবং রাখাল কিছুকালের জন্য শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সকল ভক্তদিগের মধ্যে কাহারও আসিবার কথা, ঠাকুর সমীপস্থ ব্যক্তিদিগের নিকটে "আজ (উত্তর-দক্ষিণাদি কোন দিক্ দেখাইয়া) এই দিক্ হইতে এখানকার একজন আসিতেছে" এইরূপে পূর্বেই নির্দেশ করিতেন। কেহ বা উপস্থিত হইবামাত্র "তুমি এখানকার লোক" বলিয়া পূর্ব-পরিচিতের ন্যায় সাদরে গ্রহণ করিতেন। কোন ভাগ্যবানের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পরে তাহাকে পুনরায় দেখিবার, খাওয়াইবার ও তাহার সহিত একান্তে ধর্মালাপ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিতেন। কোন ব্যক্তির স্বভাব সংস্কারাদি লক্ষ্য করিয়া পূর্বাগত সমসংস্কারসম্পন্ন কোন ভক্তবিশেষের সহিত তাহাকে পরিচিত করাইয়া তাহার সহিত ধর্মালোচনায় যাহাতে সে অবসরকাল অতিবাহিত করিতে পারে, তদ্বিষয়ের সুযোগ করিয়া দিতেন। আবার কাহারও গৃহে অযাচিতভাবে উপস্থিত হইয়া সদালাপে অভিভাবকদিগের সন্তোষ উৎপাদনপূর্বক যাহাতে তাঁহারা তাহাকে মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে আসিতে নিষেধ না করেন তদ্বিষয়ে পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেন।

ঐসকল ভক্তের আগমনমাত্র অথবা আসিবার স্বল্পকাল পরে ঠাকুর তাহাদিগের প্রত্যেককে একান্তে আহ্বানপূর্বক ধ্যান করিতে বসাইয়া তাহাদিগের বক্ষ, জিহ্বা প্রভৃতি শরীরের কোন কোন স্থান দিব্যাবেশে স্পর্শ করিতেন। ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে তাহাদিগের মন বাহিরের বিষয় সমূহ হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সংহৃত ও অন্তর্মুখী হইয়া পড়িত এবং সঞ্চিত ধর্মসংস্কারসকল অন্তরে সহসা সজীব হইয়া উঠিয়া সত্যস্বরূপ-ঈশ্বরের দর্শন-লাভের জন্য তাহাদিগকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিত। ফলে, উহার প্রভাবে কাহারও দিব্য-জ্যোতিমাত্রের অথবা দেব-দেবীর জ্যোতির্ময় মূর্তিসমূহের দর্শন, কাহারও গভীর ধ্যান ও অভূতপূর্ব আনন্দ, কাহারও হৃদ্গ্রন্থিসকল সহসা উন্মোচিত হইয়া ঈশ্বরলাভের জন্য প্রবল ব্যাকুলতা, কাহারও ভাবাবেশ ও সবিকল্প সমাধি এবং বিরল কাহারও নির্বিকল্প সমাধির পূর্বাভাস আসিয়া উপস্থিত হইত। তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া ঐরূপে জ্যোতির্ময় মূর্তি প্রভৃতির দর্শন কত লোকের যে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা হয় না। তারকের মনে ঐরূপে বিষম ব্যাকুলতা ও ক্রন্দনের উদয় হইয়া অন্তরের

গ্রন্থিসকল একদিন সহসা উন্মোচিত হইয়াছিল এবং ছোট নরেন উহার প্রভাবে স্বল্পকালে নিরাকারের ধ্যানে সমাধিস্থ হইয়াছিল, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। কিন্তু ঐরূপ স্পর্শে এককালে নির্বিকল্প অবস্থার আভাস প্রাপ্ত হওয়া একমাত্র নরেন্দ্রনাথের জীবনেই হইতে দেখা গিয়াছিল। ভক্তদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে ঠাকুর ঐরূপে স্পর্শ করা ভিন্ন কখন কখন আণবী মন্ত্রদীক্ষাও প্রদান করিতেন। ঐ দীক্ষাপ্রদানকালে তিনি সাধারণ গুরুগণের ন্যায় শিষ্যের কোষ্ঠি-বিচারাদি নানাবিধ গণনা ও পূজাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু যোগদৃষ্টিসহায়ে তাহার জন্মজন্মাগত মানসিক সংস্কারসমূহ অবলোকনপূর্বক 'তোর এই মন্ত্র' বলিয়া মন্ত্র নির্দেশ করিয়া দিতেন। নিরঞ্জন, তেজচন্দ্র, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি কয়েকজনকে তিনি ঐরূপে কৃপা করিয়াছিলেন, একথা আমরা তাহাদিগের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। শাক্ত বা বৈষ্ণব বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়াই তিনি কাহাকেও সেই মন্ত্রে দীক্ষাপ্রদান করিতেন না। কিন্তু অন্তঃসংস্কার নিরীক্ষণপূর্বক শক্ত্যুপাসক কোন কোন ব্যক্তিকে বিষ্ণুমন্ত্রে এবং বৈষ্ণব কাহাকেও বা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন। অতএব বুঝা যাইতেছে, যে ব্যক্তি যেরূপ অধিকারী তাহা লক্ষ্য করিয়াই তিনি তাহার উপযোগী ব্যবস্থা সর্বদা প্রদান করিতেন।

ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্রে মহাপুরুষগণ অন্তরের আধ্যাত্মিক শক্তি অপরে সংক্রমণপূর্বক তাহার মনের গতি উচ্চপথে পরিচালিত করিয়া দিতে সমর্থ, এই কথা শাস্ত্রগ্রন্থসকলে লিপিবদ্ধ আছে। অন্তরঙ্গ শিষ্যবর্গের তো কথাই নাই—বেশ্যা লম্পটাদি দুষ্কৃতকারী-দিগের জীবনও ঐরূপে মহাপুরুষদিগের শক্তিপ্রভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি যে-সকল মহাপুরুষগণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া সংসারে অদ্যাবধি পূজিত হইতেছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের জীবনেই ঐ শক্তির স্বল্পবিস্তর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শাস্ত্রে ঐরূপ থাকিলে কি হইবে, ঐ শ্রেণীর পুরুষদিগের অলৌকিক কার্যকলাপের সাক্ষাৎ পরিচয় বহুকাল পর্যন্ত হারাইয়া সংসার এখন ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বরাবতারে বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, ঈশ্বর-বিশ্বাসও এখন অনেক স্থলে কুসংস্কারপ্রসূত মানসিক দুর্বলতার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইয়া থকে। মানবসাধারণের চিত্ত হইতে ঐ অবিশ্বাস দূর করিয়া তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন করিতে ঠাকুরের ন্যায় অলৌকিক পুরুষের সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করা বর্তমান যুগে একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। পূর্বোক্ত শক্তির প্রকাশ তাঁহাতে অবলোকন করিয়া আমরা এখন পূর্ব পূর্ব যুগের মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধেও ঐ বিষয়ে বিশ্বাসবান্ হইতেছি। ঈশ্বরাবতার বলিয়া ঠাকুরকে বিশ্বাস না করিলেও তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা ও চৈতন্যপ্রমুখ মহাপুরুষসকলের সমশ্রেণীভুক্ত লোকোত্তর পুরুষ, এবিষয়ে উহা দেখিয়া কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পূর্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণের মধ্যে বালক ও বৃদ্ধ, সংসারী ও অসংসারী, সাকার ও নিরাকারোপাসক, শাক্ত, বৈষ্ণব অথবা অন্য ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থা ও অশেষপ্রকার ভাবের লোক বিদ্যমান ছিল। ঐরূপ অশেষ প্রভেদ বিদ্যমান থাকিলেও এক বিষয়ে তাহারা সকলে সমভাবসম্পন্ন ছিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত ও পথে আন্তরিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং নিষ্ঠাবান থাকিয়া ঈশ্বরলাভের নিমিত্ত অশেষ ত্যাগ স্বীকারে

সর্বদা প্রস্তুত ছিল। ঠাকুর তাহাদিগকে নিজ স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের ভাব রক্ষাপূর্বক সামান্য বা গুরুতর সকল বিষয়ে তাহাদিগের সহিত এমন ব্যবহার করিতেন যে তাহারা প্রত্যেকেই অনুমান করিত তিনি সকল ধর্মমতে পারদর্শী হইলেও সে যে পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাতেই অধিকতর প্রীতিসম্পন্ন। ঐরূপ ধারণাবশতঃ তাঁহার উপর তাহাদিগের ভক্তি ও ভালবাসার অবধি থাকিত না। আবার তাঁহার সদ্‌গুণে এবং শিক্ষা-দীক্ষাপ্রভাবে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডিসমূহ একে একে অতিক্রমপূর্বক উদার-ভাবসম্পন্ন হইবামাত্র তাঁহাতেও ঐ ভাবের পূর্ণতা দেখিতে পাইয়া তাহারা প্রত্যেকে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপে এখানে সামান্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি :

কলিকাতা বাগবাজারনিবাসী শ্রীযুত বলরাম বসু বৈষ্ণববংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সংসারে থাকিলেও ইনি অসংসারী ছিলেন এবং যথেষ্ট ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইলেও ইঁহার হৃদয়ে অভিমান কখনও স্থান পায় নাই। ঠাকুরের নিকটে আসিবার পূর্বে প্রাতে পূজা-পাঠে চারি-পাঁচ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিতেন। অহিংসাধর্মপালনে তিনি এতদূর যত্নবান ছিলেন যে, কীট-পতঙ্গাদিকেও কখন কোন কারণে আঘাত করিতেন না। ঠাকুর ইঁহাকে দেখিয়াই পূর্বপরিচিতের ন্যায় সাদরে গ্রহণপূর্বক বলিয়াছিলেন, "ইনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সাঙ্গোপাঙ্গের অন্যতম—এখানকার লোক ; শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুপাদদিগের সহিত সঙ্কীর্তনে হরিপ্রেমের বন্যা আনিয়া কিরূপে মহাপ্রভু দেশের আবালবৃদ্ধ নরনারীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, ভাবাবেশে তাহা দর্শন করিবার কালে ঐ অদ্ভুত সঙ্কীর্তনদলের মধ্যে ইঁহাকে (বলরামকে) দেখিয়াছিলাম।"

ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে বলরামের মন নানারূপে পরিবর্তিত হইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়াছিল। বাহ্যপূজাদি বৈধী ভক্তির সীমা অতিক্রমপূর্বক স্বল্পকালেই তিনি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও সদসদ্বিচারবান্ হইয়া সংসারে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্ত্রী-পুত্র-ধন-জনাদি সর্বস্ব তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন-পূর্বক দাসের ন্যায় তাঁহার সংসারে থাকিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন এবং ঠাকুরের পূতসঙ্গে যতদূর সম্ভব কাল অতিবাহিত করাই ক্রমে বলরামের জীবনোদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুরের কৃপায় স্বয়ং শান্তির অধিকারী হইয়াই বলরাম নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। নিজ আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি সকলেই যাহাতে ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া যথার্থ সুখের আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে অবসর অন্বেষণ-পূর্বক তিনি সর্বদা সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐরূপে বলরামের আগ্রহে বহুব্যক্তি ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয়লাভে ধন্য হইয়াছিল।

বাহ্যপূজার ন্যায় অহিংসাধর্মপালন সম্বন্ধীয় মতও বলরামের কিছুকাল পরে পরিবর্তিত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে অন্য সময়ের কথা দূরে থাকুক, উপাসনাকালেও মশকাদি দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তিনি তাহাদিগকে আঘাত করিতে পারিতেন না ; মনে হইত, উহাতে সমূহ ধর্মহানি উপস্থিত হইবে। এখন ঐরূপ সময়ে সহসা একদিন তাঁহার মনে উদয় হইল,—সহস্রভাবে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শ্রীভগবানে সমাহিত করাই ধর্ম, মশকাদি কীটপতঙ্গের জীবনরক্ষায় উহাকে সতত নিযুক্ত রাখা নহে, অতএব দুই

চারিটা মশক নাশ করিয়া কিছুক্ষণের জন্যও যদি তাঁহাতে চিত্ত স্থির করিতে পারা যায় তাহাতে অধর্ম হওয়া দূরে থাকুক সমধিক লাভই আছে। তিনি বলিতেন, "অহিংসাধর্ম প্রতিপালনে মনের এতকালের আগ্রহ ঐরূপ ভাবনায় প্রতিহত হইলেও চিত্ত ঐবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহনির্মুক্ত হইল না। সুতরাং ঠাকুরকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে দক্ষিণেশ্বরে চলিলাম। যাইবার কালে ভাবিতে লাগিলাম, অন্য সকলের ন্যায় তাঁহাকে কোন দিন মশকাদি মারিতে দেখিয়াছি কি ?—মনে হইল না ; স্মৃতির আলোকে যতদূর দেখিতে পাইলাম তাহাতে আমাপেক্ষাও তাঁহাকে অহিংসাব্রতপরায়ণ বলিয়া বোধ হইল। মনে পড়িল, দূর্বাদল-শ্যামল ক্ষেত্রের উপর দিয়া অপরকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া নিজবক্ষে আঘাত অনুভবপূর্বক তিনি যন্ত্রণায় এক সময়ে অধীর হইয়াছিলেন—তৃণরাজিমধ্যগত জীবনীশক্তি ও চৈতন্য এত সুস্পষ্ট এবং পবিত্র ভাবে তাঁহার নয়নে প্রতিভাসিত হইয়াছিল! স্থির করিলাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই, আমার মনই আমাকে প্রতারণা করিতে পূর্বোক্ত চিন্তার উদয় করিয়াছে। যাহা হউক, তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসি, মন পবিত্র হইবে।

"দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া ঠাকুরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে দূর হইতে তাঁহাকে যাহা করিতে দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি নিজ উপাধান হইতে ছারপোকা বাছিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন! নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করাতেই তিনি বলিলেন, 'বালিশটাতে বড় ছারপোকা হইয়াছে, দিবারাত্র দংশন করিয়া চিত্তবিক্ষেপ এবং নিদ্রার ব্যাঘাত করে সেজন্য মারিয়া ফেলিতেছি।' জিজ্ঞাসা করিবার আর কিছুই রহিল না, ঠাকুরের কথায় এবং কার্যে মন নিঃসংশয় হইল। কিন্তু স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, গত দুই তিন বৎসরকাল ইঁহার নিকটে যখন তখন আসিয়াছি, দিনে আসিয়াছি রাত্রে ফিরিয়াছি, সন্ধ্যায় আসিয়া রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছি। প্রতি সপ্তাহে তিন-চারি দিন ঐরূপে আসা যাওয়া করিয়াছি, কিন্তু একদিনও ইঁহাকে এইরূপ কর্মে প্রবৃত্ত দেখি নাই—ঐরূপ কেমন করিয়া হইল ? তখন নিজ অন্তরে ঐ বিষয়ের মীমাংসার উদয় হইয়া বুঝিলাম, ইতিপূর্বে ইঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিলে আমার ভাব নষ্ট হইয়া ইঁহার উপরে অশ্রদ্ধার উদয় হইত—পরম কারুণিক ঠাকুর সেজন্য এই প্রকারের অনুষ্ঠান আমার সমক্ষে পূর্বে কখনও করেন নাই।"

পূর্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণ ভিন্ন অন্য অনেক নরনারী এইকালে ঠাকুরকে দর্শনপূর্বক শান্তি লাভের জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদিগকে তিনি সস্নেহে গ্রহণপূর্বক কাহাকেও উপদেশ দানে, আবার কাহাকেও বা দিব্যাবেশে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ঐরূপে যত দিন যাইতেছিল ততই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এক বৃহৎ ভক্তসঙ্ঘ স্বতঃ গঠিত হইতেছিল। তন্মধ্যে বালক ও অবিবাহিত যুবকদিগের ধর্মজীবনগঠনে তিনি অধিকতর লক্ষ্য রাখিতেন। ঐ বিষয়ের কারণ নির্দেশপূর্বক তিনি বহুবার বলিয়াছেন, "ষোলআনা মন না দিলে ঈশ্বরের পূর্ণদর্শন কখনও লাভ হয় না। বালকদিগের সম্পূর্ণ মন তাহাদের নিকটে আছে—স্ত্রী পুত্র, ধন সম্পত্তি, মান যশ প্রভৃতি পার্থিব বিষয়সকলে ছড়াইয়া পড়ে নাই ; এখন হইতে চেষ্টা করিলে ইহারা ষোলআনা মন ঈশ্বরে অর্পণপূর্বক তাঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইতে

পারিবে—ঐজন্যই ইহাদিগকে ধর্মপথে পরিচালিত করিতে আমার অধিক আগ্রহ।" সুযোগ দেখিলেই ঠাকুর ইহাদিগের প্রত্যেককে একান্তে লইয়া যাইয়া যোগধ্যানাদি ধর্মের উচ্চাঙ্গসকলের এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনে উপদেশ করিতেন। অধিকারী নির্বাচন করিয়া ইহাদিগকেও তিনি ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য নির্দেশ করিয়া দিতেন এবং শান্তদাস্যাদি যে ভাবের সম্বন্ধ ইষ্টদেবতার সহিত পাতাইলে তাহারা প্রত্যেকে উন্নতিপথে সহজে অগ্রসর হইতে পারিবে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন।

বালকদিগকে শিক্ষাপ্রদানে ঠাকুরের সমধিক আগ্রহের কথা শুনিয়া কেহ যেন না ভাবিয়া বসেন, সংসারী গৃহস্থ ভক্তদিগের প্রতি তাঁহার কৃপা ও করুণা স্বল্প ছিল। উচ্চাঙ্গের ধর্মতত্ত্বসকলের অভ্যাস ও অনুশীলনে তাহাদিগের অনেকের সময় ও সামর্থ্য নাই দেখিয়াই তিনি তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে বলিতেন না। কিন্তু কাম-কাঞ্চন-ভোগ-বাসনা ধীরে ধীরে কমাইয়া ভক্তিমার্গ দিয়া যাহাতে তাহারা কালে ঈশ্বরলাভে ধন্য হইতে পারে, এইরূপ তাহাদিগকে নিত্য পরিচালিত করিতেন। ধনী ব্যক্তির গৃহে দাসদাসীদের ন্যায় মমতা বর্জনপূর্বক ঈশ্বরের সংসারে অবস্থান ও নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিতে তিনি তাহাদিগকে সর্বাগ্রে উপদেশ করিতেন। "দুই-একটি সন্তান জন্মিবার পরে ঈশ্বরে চিত্ত অর্পণ করিয়া ভ্রাতা-ভগ্নীর ন্যায় স্ত্রী-পুরুষের সংসারে থাকা কর্তব্য"—ইত্যাদি বলিয়া যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। তদ্ভিন্ন নিত্য সত্যপথে থাকিয়া সকলের সহিত সরল ব্যবহার করিতে, বিলাসিতা বর্জনপূর্বক 'মোটা ভাত মোটা কাপড়' মাত্র লাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া শ্রীভগবানের দিকে সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে এবং প্রত্যহ দুই সন্ধ্যা ঈশ্বরের স্মরণ-মনন, পূজা, জপ ও সঙ্কীর্তনাদি করিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন। গৃহস্থদিগের মধ্যে যাহারা ঐসকল করিতেও অসমর্থ বুঝিতেন, তাহাদিগকে সন্ধ্যাকালে একান্তে বসিয়া হাততালি দিয়া হরিনাম করিতে এবং আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত মিলিত হইয়া নাম-সঙ্কীর্তনের উপদেশ করিতেন। সাধারণ নরনারীগণকে একত্রে উপদেশকালে আমরা তাঁহাকে অনেক সময়ে ঐকথা এইরূপে বলিতে শুনিয়াছি, কলিতে কেবলমাত্র নারদীয়-ভক্তি—উচ্চরোলে নামকীর্তন করিলেই জীব উদ্ধার হইবে; কলির জীব অন্নগতপ্রাণ, অল্পায়ু, স্বল্পশক্তি—সেইজন্যই ধর্মলাভের এত সহজ পথ তাহাদিগের নিমিত্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে। আবার যোগধ্যানাদি কঠোর সাধনমার্গের কথাসকল শুনিয়া পাছে তাহারা ভগ্নোৎসাহ হয়, এজন্য কখন কখন বলিতেন, "যে সন্ন্যাসী হইয়াছে সে তো ভগবানকে ডাকিবেই। কারণ, এজন্যই তো সে সংসারের সকল কর্তব্য ছাড়িয়া আসিয়াছে—তাহার ঐরূপ করায় বাহাদুরি বা অসাধারণত্ব কি আছে? কিন্তু যে সংসারে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদির প্রতি কর্তব্যের বিষম ভার ঘাড়ে করিয়া চলিতে চলিতে একবারও তাঁহাকে স্মরণ-মনন করে, ঈশ্বর তাহার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হন, ভাবেন, 'এত বড় বোঝা স্কন্ধে থাকা সত্ত্বেও এই ব্যক্তি যে আমাকে এতটুকুও ডাকিতে পারিয়াছে, ইহা স্বল্প বাহাদুরি নহে, এই ব্যক্তি বীরভক্ত'।"

নবাগত শ্রেণীভুক্ত নরনারীদের তো কথাই নাই, পূর্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণের ভিতরেও ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কত উচ্চাসন প্রদান করিতেন তাহা বলা যায় না। উহাদিগের মধ্যে কয়েকজনকে নির্দেশ করিয়া তিনি বলিতেন, ইহারা ঈশ্বরকোটী, অথবা

শ্রীভগবানের কার্যবিশেষ সাধন করিবার নিমিত্ত সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। ঐ কয়েক ব্যক্তির সহিত নরেন্দ্রের তুলনা করিয়া তিনি এক দিবস আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্র যেন সহস্রদল কমল; এই কয়েকজনকে ঐ জাতীয় পুষ্প বলা যাইলেও, ইহাদিগের কেহ দশ, কেহ পনর, কেহ বা বড় জোর বিশদলবিশিষ্ট।" অন্য এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "এত সব লোক এখানে আসিল, নরেন্দ্রের মত একজনও কিন্তু আর আসিল না।" দেখাও যাইত, ঠাকুরের অদ্ভুত জীবনের অলৌকিক কার্যাবলীর এবং প্রত্যেক কথার যথাযথ মর্ম গ্রহণ ও প্রকাশ করিতে তিনি যতদূর সমর্থ ছিলেন, অন্য কেহই তদ্রূপ ছিল না। এই কাল হইতেই নরেন্দ্রের নিকটে ঠাকুরের কথাসকল শুনিয়া আমরা সকলে সময়ে সময়ে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতাম, তাই তো ঐ সকল কথা আমরাও ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, কিন্তু উহাদিগের ভিতরে যে এত গভীর অর্থ রহিয়াছে তাহা তো বুঝিতে পারি নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে ঐরূপ একটি কথার এখানে উল্লেখ করিতেছি :

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে আমাদিগের জনৈক বন্ধু দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গৃহমধ্যে ভক্তগণপরিবৃত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। শ্রীযুত নরেন্দ্রও সেখানে উপস্থিত। নানা সদালাপ এবং মাঝে মাঝে নির্দোষ রঙ্গরসের কথাবার্তাও চলিয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের কথা উঠিল এবং ঐ মতের সারমর্ম সমবেত সকলকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া তিনি বলিলেন, "তিনটি বিষয় পালন করিতে নিরন্তর যত্নবান থাকিতে ঐ মতে উপদেশ করে—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-পূজন। যেই নাম সেই ঈশ্বর—নাম-নামী অভেদ জানিয়া সর্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্বদা সাধু-ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করিবে; এবং কৃষ্ণেরই জগৎ-সংসার একথা হৃদয়ে ধারণ করিয়া "সর্বজীবে দয়া" (প্রকাশ করিবে)। 'সর্ব জীবে দয়া' পর্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন! কতক্ষণ পরে অর্ধবাহ্য-দশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া কর্‌বি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!"

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐকথা সকলে শুনিয়া যাইল বটে, কিন্তু উহার গূঢ় মর্ম কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পরে বাইরে আসিয়া বলিলেন, "কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম! শুষ্ক, কঠোর ও নির্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকেই প্রদর্শন করিলেন! অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে—এই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। ফলে ঐরূপে উহা লাভ করিতে যাইয়া জগৎ-সংসার ও তন্মধ্যগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্মপথের অন্তরায় জানিয়া তাহাদিগের উপরে ঘৃণার উদয় হইয়া সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল

কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে, সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল—ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ—তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? ঐরূপে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব বলিয়া ধারণা কারতে পারিবে।

"ঠাকুরের ঐ কথায় ভক্তিপথেও বিশেষ আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায়, ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি-লাভ সাধকের পক্ষে সুদূরপরাহত থাকে। শিব বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা করিলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শনপূর্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্তসাধক স্বল্পকালেই কৃতকৃতার্থ হইবে, একথা বলা বাহুল্য। কর্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে যে-সকল সাধক অগ্রসর হইতেছে তাহারাও ঐকথায় বিশেষ আলোক পাইবে। কারণ, কর্ম না করিয়া দেহী যখন একদণ্ডও থাকিতে পারে না, তখন শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ কর্মানুষ্ঠানই যে কর্তব্য এবং উহা করিলেই তাহারা লক্ষ্যে আশু পেঁছাইবে. একথা বলিতে হইবে না। যাহা হউক, ভগবান যদি কখন দিন দেন তো আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব!"

লোকান্তর ঠাকুর ঐরূপে সমাধিরাজ্যে নিরন্তর প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞান, প্রেম, যোগ ও কর্ম সম্বন্ধে অদৃষ্টপূর্ব আলোক প্রতিনিয়ত আনয়নপূর্বক মানবের জীবনপথ সমুজ্জ্বল করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা তাঁহার কথা তখন ধারণা করিতে পারিতাম না। মনস্বী নরেন্দ্রনাথই কেবল ঐসকল দেববাণী যথাসাধ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশপূর্বক আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেন।